নষ্ট দর্শন

আবদুল মবিন

নষ্ট দর্শন

আবদুল মবিন

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম ❑ ঢাকা

নষ্ট দর্শন

আবদুল মবিন

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৬ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণঃ জানুয়ারী-২০১১

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
ডিজাইন ওয়ান
পল্টন টাওয়ার
৮৭ পুরানা পল্টন লীন (৮ম তলা) ঢাকা
ফোনঃ ৮৩৫০৮৪৫, মোবাইলঃ ০১৭৩০১৭৭৫৫৫

মূল্য ঃ ২৪০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

Nashta Darshan : Writen by mobin, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk. 240 U$: 05

ISBN. 984-49

প্রকাশকের কথা

বুদ্ধিজীবীর খোলস পরে যেসব সংস্কৃতিজীবী সমাজে সীমাহীন অপকর্ম করে চলেছেন সেসব সংস্কৃতিজীবীদের অপকর্মের বিশ্লেষণ, সমালোচনা এবং প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেই নষ্ট দর্শনের সৃষ্টি।

গ্রন্থকার আবদুল মবিন একজন কলামিস্ট। এই পুস্তকে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি 'সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান' পত্রিকায় 'নষ্ট দর্শন' শিরোনামে কলাম হিসাবে এবং 'মাসিক বাণিজ্য বিচিত্রায়' অর্থনৈতিক প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের অপকর্মের সমালোচনাকে উপলক্ষ্য করে গ্রন্থকার প্রবন্ধগুলিতে ভাষার যে কাব্যিক বিন্যাস করেছেন, বর্ণনায় যে রসচাতুর্য প্রদর্শন করেছেন এবং যেসব চিত্তাকর্ষক উদাহরণ, উপমা ব্যবহার করেছেন তদ্বারা তিনি পাঠক সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

নারীর অধিকার আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে আজকাল কিছু অতি উৎসাহী দুর্বুদ্ধিজীবী মানুষ মহিলাদের জন্য জরায়ুর স্বাধীনতা নামক এক আজব দাবীর প্রলাপ বকে চলেছে। গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন আদিকাল হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কোন মহিলাকে এ ধরনের প্রলাপ বকতে দেখা গেলে তাকে ভূতে বা জ্বীনে ধরেছে বলে মনে করা হয়। যৌবনবতি মেয়েরাই সাধারণত এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অতিরিক্ত কাম তাড়নাই এই রোগের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্যেও এ রোগের উল্লেখ আছে।

অন্নদা মঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীর আমলে রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে মানসিংহের যুদ্ধকালে ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ব্রাহ্মণ মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় মানসিংহ প্রতিদান হিসাবে ঐ ব্রাহ্মণকে একটি জায়গীর দেওয়ার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ঐ অনুরোধ প্রথমে রক্ষা করেন নি। ফলে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ পূজা দ্বারা অন্নপূর্ণা দেবীকে খুশী করলে দেবী জ্বীন-ভূত-প্রেত ও পিশাচের বলে বলিয়ান হয়ে বাদশাহী মহলের বেগমদের উপরে সওয়ার হয়ে উৎপাত শুরু করেন। তাতে সম্রাট পরাভব স্বীকারে বাধ্য হন। অন্নদা মঙ্গল কাব্যে জ্বীন ভূতের ঐ উৎপাতকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল
ওঝার ধমকে বিবির ইজার ছিড়িল

ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্রে পড়ে যত
বিবিরে লইয়া ভূতের খুশী বাড়ে তত।
বিবি ছাড়ি বান্দিরেও যেই ধরিল ভূতে
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে
এমন খবিস কাম না শুনি কোথায়
তাবিজ ছিঁড়িয়া বিবি ওঝারে কিলায়।

এমনি ধরনের চমকপ্রদ বর্ণনা দ্বারা লেখক একদিকে পাঠকের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, অপর দিকে বিকৃত বুদ্ধিজীবীদের সমাজ বিরোধী হীন চক্রান্ত এবং হীন মানসিকতার মগজ ব্যবচ্ছেদ করেছেন।

যেসব চক্রান্ত এবং যে সব দুষ্কর্ম আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশৃংখলার বীজ বপন করে চলেছে, সে সবের বিরুদ্ধে গ্রন্থকারের কলম অত্যন্ত কঠোর। অত্যন্ত ধারালো যুক্তি ও চমৎকার ব্যঙ্গ-দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি সেগুলিকে দুর্বুদ্ধিজীবীদের দুর্বাক্য হিসাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। যেসব দুষ্কর্ম তাঁর মধ্যে প্রতিবাদের এবং লিখার তাড়না সৃষ্টি করেছে, তার কয়েকটি, তাঁর ভাষায় নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশে এক শ্রেণীর দুর্বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা সাহিত্যে কাব্যে, সভা সমিতিতে, বক্তৃতায় বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলে ভারতের সাথে মিশে যাওয়ার খায়েস ব্যক্ত করে চলেছে।

২। নারীর অধিকার আন্দোলনের নামে এক শ্রেণীর নরক বিলাসী মানুষ নারীর শরীরের স্বাধীনতা এবং জরায়ুর স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন দ্বারা বাংলাদেশকে একটা নরককুন্ড বানাবার প্রয়াস ব্যক্ত করেছে।

৩। রাজনীতিকরা কলকারখানাসহ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সিবিএগুলির দলীয়করণ করে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে, কর্মসংস্থানের পথ সঙ্কুচিত করে দিয়েছে।

৪। রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিযোগিতামূলকভাবে ছাত্রদের রাজনৈতিক দলভূক্ত করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বিদ্যালয়গুলিকে রাজনৈতিক দলের ক্যান্টনমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। সুতরাং বিদ্যালয়ে এখন আর লেখা পড়া হয় না। এখন আর বিদ্যালয় হতে জ্ঞানীগুণী বের হয় না, বের হয় অজ্ঞান মূর্খ তেজী শিংওয়ালা গরু, এখন আর সেখান থেকে বৈদ্য বের হয়না, বের হয় ব্যধি।

৫। বিমান বন্দরের কর্মচারী কর্মকর্তারা ঐ ক্যান্টনমেন্ট বিদ্যালয়ের মূর্খ শিক্ষিত হওয়ায় তারা বাংলাদেশে আসা বিদেশী খদ্দের ও বিমান যাত্রীদের

লাগেজ পরীক্ষার নামে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। বিদেশী খদ্দের এবং দেশী-বিদেশী কোটিপতিদের উপর বিমান বন্দরের সিপাহী, দারোয়ান ও চাপরাশিদের দৈহিক হামলা এবং মানসিক নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে থাকে। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেশী এক সি.আই.পি কোটিপতি শিল্পপতির নাজেহালের কথা উল্লেখ করেছেন। একজন চাপরাশি ঘুষি মেরে তার সামনের একটি দাঁত এবং চশমা ভেঙ্গে ফেলে, তাকে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে চেয়ারের পায়ার সাথে বেঁধে রাখে। তাও দুজন বিদেশীনির সামনে, যারা ঐ সিআইপির সাথে এসেছিলেন বাংলাদেশ হতে গার্মেন্টস পণ্য ক্রয় করার জন্য। ঠিক তেমনি তিনি আর একজন মালয়েশিয়ান শিল্পপতির বিমান বন্দরে নাজেহাল হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

নিজ দেশে ঐ মালয়েশিয়ান শিল্পপতির সম্পদের পরিমাণ ছয় শত কোটি ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা। মালয়েশিয়ায় তার কারখানায় অন্যান্য দেশের শ্রমিকের সাথে পাঁচ হাজার বাংলাদেশী চাকুরী করে। তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মচারী নেওয়ার এবং বাংলাদেশে একটি বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য। তিনি ফিরে যাবার দিন (৯ আগষ্ট, ১৯৯৪) বিমান বন্দর কর্মচারীরা তার দেহ তল্লাশীর নামে তাকে প্লেনে উঠতে দেয়নি।

প্লেন মিস করিয়ে তাকে বিমান বন্দরে সারা রাত একটা চোরের মত বসিয়ে রাখে। কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার, কর্মকর্তাদের চাল-চলন এবং অশোভন আচার-আচরণ দেখে ঐ শিল্পপতি যাবার মুহূর্তে সাংবাদিকদের কাছে বলে গেছেন; "এমন অসভ্য দেশে আমি আর কোনদিন আসব না।" অর্থাৎ এদেশে তার আর বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা হল না, আরও শ্রমিক নেওয়া হল না। বরঞ্চ তার প্রতিষ্ঠানে যে ৫০০০ বাংলাদেশী কাজ করে কে জানে তাদেরও বের করে না দেয়।

উক্ত ঘটনাগুলি যে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য পীড়াদায়ক যে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বরঞ্চ এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিশ্বাসই করা যায় না। কারণ ঘটনাগুলি যে কোন দেশের রাজনৈতিক এবং সভ্য রীতিনীতির পরিপন্থি।

বিদগ্ধচিত্ত লেখক কোনদিনই এধরনের কোন অনাচারের সামনে নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নি। তাঁর গোচরীভূত হওয়া প্রতিটি ঘটনার বিরুদ্ধে তার লেখনী চঞ্চল হয়ে উঠেছে বহুদিন পূর্ব হতে। এ ধরনের বিষয়ের উপর লিখিত তাঁর আরও কয়েকখানা পুস্তক বাজারে আছে। বইগুলির নামের মধ্যেই

তার বক্তব্যের পরিচয় রয়েছে। যেমন সাংস্কৃতিক বখাটেপনা (বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত), সাংস্কৃতিক নষ্টামি (মদীনা পাবলিকেসন্স কর্তৃক প্রকাশিত),

এই গ্রন্থে আলোচিত সমালোচিত সমস্যাগুলি আপাতদৃষ্টিতে সাময়িক মনে হলেও সমস্যাগুলি বহুযুগ ধরে চলে আসছে এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হওয়ায় এগুলো জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে আমাদের দেশের মানুষের মেধা ও মননশীলতার দৈন্যতা এবং মানসিক বিভ্রান্তির প্রবণতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বশেষ প্রবন্ধটির নাম 'বুরোক্র্যাটিক'। এই প্রবন্ধটিতে যেন নাগরিক জীবনের দৈনন্দিনের বিড়ম্বনাগুলির নির্যাস বের করে লেখক গল্পের ঢঙে চমৎকারভাবে পুস্তকটির সার সংক্ষেপ উপস্থাপনা করেছেন। আবার পুস্তকের ভূমিকায়ও তার আভাস দিয়েছেন।

সমসাময়িক সমস্যার কথা বলতে গিয়ে লেখক তাঁর অপূর্ব রচনাশৈলীর মাধ্যমে দেশবাসীর মন-মানসিকতার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। কথায় কথায় প্রাসঙ্গিক উপায়ে তিনি প্রাচীন কালের হারিয়ে যাওয়া বহু চমকপ্রদ কথা ও কাহিনী আমাদের গোচরিভূত করেছেন, যা জানতে এবং শুনতে ভাল লাগে। লেখক আব্দুল মবিন "নষ্ট দর্শন" নামক বইতে তিনি এহেন শিক্ষনীয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর রচনা শৈলীতে পাঠকের চাহিদা পূরন করার প্রয়াসে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ১৯৯৬ সালে বইখানা প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং তা শেষ হওয়ায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পাঠকদের চাহিদা থাকায় সোসাইটি বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি পাঠক সমাজ পুস্তক খানা পাঠ করে আনন্দ পাবেন তাহলেই সোসাইটির প্রকাশনার সার্থকতা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি হতেই থাকবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক ইনচার্জ ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ভূমিকা

নষ্ট দর্শন কোন দার্শনিক তত্ত্বালোচনা নয় বা কোন দার্শনিক পর্যালোচনাও তার উদ্দেশ্য নয়। আসলে সংসারে বহু নষ্ট মানুষ আছে যারা তাদের চাল চলনে কোন সভ্য রীতি-নীতির ধার ধারে না। তাদের নষ্ট কর্মকান্ড সমাজ জীবনের উপর বহু নষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে এবং সে কারণে সমাজ জীবনের উপর বহু দুর্বিষহ যাতনা নেমে আসে।

আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা বড় আবেগ প্রবণ মানুষ। অতি সাধারণ ইন্ধনেই আমরা স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠি। স্ফুলিঙ্গ যেমন উড়ে দিয়ে কোন দাহ্য পদার্থের সাথে যুক্ত হয়ে বিরাট অগ্নুৎপাৎ ঘটাতে পারে আমরাও অনেক সময় সামান্য ইন্ধনেই অনেক আত্মঘাতি বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। পরিণতিতে আমরা নিজেরাই যে স্বগোত্রে, স্ববংশে তজ্জনিত বিশৃংখলার দুঃখ যাতনা ভোগ করে থাকি তা উপলব্ধি করার মত মানসিক শক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলি।

যে কোন অঞ্চলে একজন নষ্ট মানুষের নষ্ট কর্ম দাবানলের মত বহু দূর অঞ্চলে নষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তদ্বারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারি দুখ যাতনার চাপ সৃষ্টি হতে পারে। নষ্ট দর্শনে ঐসব নষ্ট মানুষদের নষ্ট কর্মকান্ডের পর্যালোচনা এবং তাদের নষ্ট মানসিকতার ধরন ধারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা যতই সভ্যতার চর্চা করিনা কেন এবং সভ্যতার যতই অগ্রগতি হোকনা কেন তদ্বারা আমাদের ভিতরকার আদিম প্রবৃত্তিটার কোন পরিবর্তন হয়না। কারণ আমরা যে প্রবৃত্তিপ্রবণ জীবজগতেরই একটা প্রজাতি মাত্র। সভ্যতার চর্চা দ্বারা আমরা শুধুমাত্র আদিম উচ্ছাসটাকে সাপুড়েদের সাপ বশীকরণের মত সভ্যতার মন্ত্রদ্বারা বশ মানিয়ে রাখি আদিমতাটা আড়ালে আবডালেও যাতে আদিম উল্লাসে মেতে উঠতে না পারে তজ্জন্য সভ্যতা আমাদের জন্য ধর্ম নামক এক শক্তিশালী পুলিশের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা সভ্যতার মোড়কে বহু আদিম সুখ উপভোগের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছি। যেমনঃ

১। আদিকালে যখন আমরা রান্না করতে জানতাম না, তখন আমরা মাছ, মাংস আগুনে পুড়ে আদিম আনন্দে আহার করেছি। হারানো দিনের সেই-সুখ স্মৃতি আমরা ভুলে যাইনি। তাই আমরা আজও কাবাবের নামে মাছ মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে মজলিশ বসিয়ে সবান্ধবে পরমানন্দে আহার করে থাকি। আবার আদিম অরণ্য পরিবেশ তৈরীর জন্য ঘরের টবে গাছ লাগিয়ে অথবা বাগানে গাছের সান্নিধ্যে বসে কাবাব খাই।

২। আদি যুগে, সভ্যতার সূচনা লগ্নে শবরী ডুম্বিনী নামের একজাতের অস্পৃশ্য মানুষ ছিল। তারা লোকালয়ের বাইরে দূর দূরান্তের পাহাড়ের গায়ে, টিলায়, বনাঞ্চলে কুঁড়ে ঘর তৈরী করে মানবেতর জীবন যাপন করত। বাঁশ বেতের হস্তশিল্প যথাঃ ডালা, কুলা, চাঙ্গারী ইত্যাদি তৈরী করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের যৌবনবতী মেয়েরা সেসব ডালা কূলার পসরা নিয়ে লোকালয়ে গিয়ে নেচে গেয়ে যৌবন প্রদর্শন করে তাদের ডালা কুলার প্রতি গৃহস্থদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাদের দেহ সৌন্দর্যে মুগ্ধ গৃহস্থরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনেও ডালা কুলাগুলি কিনে নিত এবং রাত্রি বেলায় গৃহস্থ বাড়ীর বাবুরা শবরী ডুম্বীনীদের ঘরের দরজার কড়া নাড়ত। সেই স্মৃতিও আমরা ভুলে যাইনি।

আজকাল মডেলিং এর নামে আমরাও শবরী ডুম্বিনীদের মত নেচে গেয়ে যৌবন প্রদর্শন করে ডালা-কুলা বিক্রির টেকনিকটিকেই ব্যবহার করে চলেছি। আমাদের যৌবনবতী মেয়েরাও পত্র পত্রিকায় এবং টেলিভিশনে নেচে গেয়ে নিজেদের যৌবন প্রদর্শন করে শাড়ী, গয়না, তেল, সাবান, স্নো, পাউডার এমনকি রঙ, বার্নিশ, আলকাতরার প্রতিও খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। আড়ালে আবডালে সমঝদারেরা তাদেরও দরজার কড়া নাড়ে অথবা টেলিফোনে কল করে।

৩। এই সেদিনও এদেশের বিত্তবানেরা ভোগ উপভোগের জন্য শহরের নির্জন উপকণ্ঠে এবং বসত বাড়ী হতে দূরে কোথাও বাগান বাড়ী তৈরী করে ভোগ উপভোগের জন্য নামী দামী সুন্দরী বাইজী ভাড়া করে এনে অভিজাত নাচের আসর বসাত। অলস বিত্তের মালিক বিত্তবানেরা সেখানে রাতের পর রাত পঞ্চরসের ভোগ উপভোগে কাটিয়ে দিত। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এসে বাইজীরা এখন আর বিত্তবানের বলয়ে আবদ্ধ নেই। বাইজীর উপর এখন জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাইজীদের এখন আর গোপন বাগান বাড়ীতে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে নাচতে হয় না। এখন আমাদের উচ্চ শিক্ষিতা মা বোনেরা অভিনয়ের নামে, মডেলিং এর নামে আরও উন্নত মুদ্রার

নাচ নাচে, নাটকের নামে খোলা ময়দানে, সিনেমার নামে প্রাসাদানুপম মঞ্চে দর্শকদের চোখ ধাধায়।

তখনকার দিনে বিত্তবানেরা বাইজী নাচ উপভোগ করত জমিদারীর আয়ের টাকা খরচ করে। এখনকার বাইজীর নাচ উপভোগ করে কৃষক শ্রমিকসহ সকল স্তরের খেটে খাওয়া মানুষেরা তাদের সারাদিনের উপার্জনের অর্থ ব্যয় করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঘরে অপুষ্টির শিকার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে উপবাসে রেখে।

আবার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমাদের নষ্ট মানসিকতা মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার বিরাট বিপর্যয় ঘটাতে পারে। গণতান্ত্রিক জীবনে এসে দেখেছি ইলেকশানের মৌসুম এলেই রাজনীতিকরা আমাদের সাধারণ মানুষের সকল আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য, আমাদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য বেচেইন হয়ে ওঠেন। ডজন ডজন রাজনীতিকের আশ্বাসে দেশের আকাশ বাতাস উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, প্রশ্বাসে আমাদের আরাম পিয়াসী অন্তর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার মত পোড় খাওয়া মানুষেরা কোনদিনই ওসব আশ্বাস প্রশ্বাসে বিশ্বাস করে না। তার কারণ, এই যে এই ঢাকা শহরটায় পাঁচ যুগ ধরে আছি, কে কত সুখে আছি তার তো হিসাব আমাদের আছে। আমার একটা দিনের দুর্ভোগের কথাই বলি, যে দুর্ভোগ বেশীর ভাগ নগরবাসী গত ৫০ বছর ধরেই ভুগছে।

৮ই মে ১৯৯৬ তারিখে ঢাকার তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী। সারাদিন পার্কে, বাগানে গাছের নীচে ঘর্মাক্ত মানুষের ভীড়। বুড়িগঙ্গায়, ধানমন্ডির লেইকে, গুলশানের লেইকে, রমনা পার্কের লেইকসহ যেখানে যত লেইক বা জলাশয় আছে সকল জলাশয়ে যেন গঙ্গা স্নানার্থীদের ভীড়ের মত ভীড় লেগে গেছে। এমনও দিনে কিনা লোকে লোকারণ্য শহরের বেশির ভাগ মহল্লার বাড়িতেই পানি নেই। গোসলের পানি, রান্নার পানি নেইতো নেই এমনকি পায়খানা পেশাব করে শৌচ করার পানিও নেই। এটাই তিলোত্তমা নগরী ঢাকার গত ৪০ বছরের কারবালা কান্ডের ইতিহাস। পানি না হয়ে অন্যকিছু হলে এতদিনে হয়তো গা সওয়া হয়ে যেতো। কিন্তু এযে পানি যার অপর নাম জীবন। রাজধানীতে প্রতিনিয়ত কতই না হত্যা, ছিনতাই, হাইজ্যাক হয়, খুন হয়। সেসবও তো মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। শুধু পানির নিপীড়নটা, গা সওয়া হতে পারল না।

প্রতি বছর মার্চ মাস এলেই শুরু হয়ে এই নিপীড়নের ধারা, চলত জুলাই মাস পর্যন্ত। কিন্তু এখন চলে সারা বছর। উপরে মাঠফাটা রোদ, নীচে পানি বিহীন শহর। একদিকে গৃহবধুরা নামছে শূন্য কলসীর মিছিল নিয়ে, আবার কখনও নামছে ঝাড়ু মিছিল নিয়ে, অপরদিকে ওয়াসার কর্তাব্যক্তিরা নামছেন আষাঢ়ী ব্যাঙের মত মৌসুমী বক্তব্য নিয়ে। প্রতি বছর পানির কাহাতের এই সময়টা এলেই; তাদের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর বকবকানী শুরু হয়। কখনও শীতলক্ষা প্রকল্প, কখনও ডেমরা প্রকল্প, কখনও গভীর নলকূপ প্রকল্প, কখনও সায়দাবাদ প্রকল্প ইত্যাদি বহু প্রকল্পের গল্প পত্রিকায় ছাপিয়ে মানুষকে খুশী করার চেষ্টা করেন। আশ্চর্য, গৃহবধুদের ঝাড়ু মিছিলের, কলসী মিছিল আর ওয়াসার কর্তাব্যক্তিদের ঐসব গল্প পত্রিকার পাতায় এমনভাবে পাশাপাশি প্রকাশিত হয় যেন সাপ আর নেইলের মুখোমুছি রুদ্র অবস্থান। দেখতে কখনও মনে হয় মজাদার আবার কখনও মনে হয় লজ্জাকর।

সারাদিন গোসল করতে পারিনি, মেজাজ তেতে আছে। তদুপরি আবার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ফ্যান চালিয়ে একটু আরাম করব তারও উপায় নেই। রাতে দিনের দুই ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে তো দুই ঘন্টা থাকে না। গরম মাথা নিয়ে সারাদিন পার্কের গাছ তলায় শুয়ে বসে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার খানিক পূর্বে বাড়ি পৌছলে গিন্নী জানালেন, নীচের রিজার্ভারে সামান্য পানি এসেছে। আমার ফিরার অপেক্ষায় এতক্ষণ পাম্প ছাড়া হয়নি। কারণ পানি খুবই সামান্য। ভাল রকম গোসল করলে আমাদের পাঁচজন মানুষের গোসলেই সবটুকু শেষ হয়ে যাবে। এখন পাম্প ছেড়ে উপরের ট্যাংকে পানি উঠাতে হবে। রান্নার জন্য কিছু পানি আগে ভাগেই গ্যালন ভর্তি করে স্টোর রুমের তাকে উঠিয়ে রুমটির তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। কারণ কাজের ছেলেটা একটা গাঁইয়া ছোকরা, অল্প পানিতে গোসল করতে পারে না। স্টোর রুম থেকে পানির গ্যালন চুরি করে নিয়ে সে তার গোসলের কাজে লাগায়। তাকে শাসন করা যায় না। সোজা কথায় বলে দেয়, "বাংলাদেশের মানুষ সারা বছর বর্ষায়, বানে, বন্যায় ডুইবা মরি। আর অহন শহরে সাহেব গো বাড়িতে আইস্যা গোসল বিনে থাকুম বা দুই চার মগ পানি শইল্লে ছড়াইয়া কাউয়া গোসল করুম, আমারে দিয়া হেইডা অইবো না স্যার। তয় আমি দেশেই চইল্লা যাইগা।"

যাই হোক। তবুও পানি আসার সংবাদের জন্য আল্লাহর শোকর করে আর গিন্নীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাথরুমে তেল সাবান-তোয়ালে সাজালাম। এবার নীচে গিয়ে পাম্পের সুইচ অন করে তাজ্জব বনে যাই। পাম্প চলে না।

মাত্র গতবার পাম্পটা কিনেছি, এত শীঘ্রই খারাপ হয়ে যাওয়ায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। গ্যারান্টির সময় এখনও আছে। তাড়াতাড়ি পাম্পের ক্যাশ ম্যামোটা বের করতে ঘরে এলাম। ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। লাইট জ্বলাবার জন্য সুইচ টিপলাম। কিন্তু কি সর্বনাশ বাল্ব জ্বলে না। বাল্বও তো নতুন। কিন্তু বিশ্বাস নেই। বাংলাদেশের কলকারখানার শ্রমিকরাতো সিবিএ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পণ্যের মানের খবর দিয়েতো তাদের দরকার নেই, চাকুরি তো বেতনের জন্য। হঠাৎ গিন্নী রান্না ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওগো শুনছ, আসলে কারেন্টই তো নাই। পাম্প চলবে কি করে আর বাতিই বা জ্বলবে কি করে।

মাথায় যেন বাজ পড়ার অবস্থা। পানি এসেছে গোসল করব আনন্দে যেন ভুলেই বসেছিলাম যে পাম্প, বাল্ব নষ্ট হলে যেমন সুইচ টিপে ওগুলো চালানো আর জ্বালানো যায় না তেমনি কারেন্ট না থাকলে হাজার সুইচ টিপলেও পাম্প চলবে না, লাইট জ্বলবে না– যেন গত ৪০ বছর যাবৎ কলসী মিছিল, ঝাড়ু মিছিল করেও শহরের পানি সমস্যার সমাধান করা যায়নি। তার উপর বেড়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট।

সন্ধ্যাতো হয়েই গেল। কারেন্ট আসার কোন লক্ষণ নাই। এশার আযান হয়ে গেছে। এবার বালতিতে রশি লাগিয়ে রিজার্ভার থেকে সামান্য পানি তুলে কোন রকম একটা গোসল হল। ন'টা বাজল, কারেন্ট আসার খবর নাই। মোম জ্বালিয়ে রাতের খানাও খেয়ে নিলাম। হঠাৎ রাত ১০টার দিকে ঘড় ঘড় করে পানির পাম্প চেঁচিয়ে উঠল, সারা বাড়ির সকল লাইট আলাদীনের প্রদীপের মত জ্বল জ্বল করে উঠল। সারাদিন যে যেখানেই সুইচ টিপেছে সেই সুইচ আর কেউ বন্ধ করেনি।

কে বলে দেশে কোন কাজ কর্ম কেউ করে না। না করলে এই পানি এল কি করে, কোথা হতে। এই লাইট জ্বলল কি করে। কার বদৌলতে? গোসল হয়েছে, খানাপিনা হয়েছে, লাইট জ্বলেছে আর কিসের অভিযোগ? এবার মহানন্দে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে জ্বল জ্বল করা লাইটের আলোয় দিনের পত্রিকাখানা চোখের সামনে মেলে ধরি।

গণতন্ত্রের দেশ বাংলাদেশ, রাজাহীন রাজ্য বাংলাদেশের সিংহাসন নিয়ে ইলেকশানের নামে মরা গরু নিয়ে শকুনের কাড়াকাড়ির মত ভোট প্রার্থীরা দেশের অশিক্ষিত, অজ্ঞান, স্বল্প-জ্ঞান মানুষকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যেন পাগলপারা হয়ে ওঠে। আমি কিন্তু তাদের ঐসব আশ্বাসকে মোটেই বিশ্বাস করি না। বরঞ্চ নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতার দখল নিয়ে

তারা যে হরতাল ও ধর্মঘট করে, শ্রমিকের ভাত মেরে আন্দোলন করে এবং সেসব আন্দোলন সফল করার জন্য যেভাবে নিরীহ মানুষকে গোলাগুলির মুখে ঠেলে দিয়ে শত শত মানুষ খুন করায়, সেসব তৎপরতার কথা মনে পড়লে তাদের আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপনতো দূরের কথা, দীর্ঘশ্বাসে বুক ফেটে যেতে চায়।

আজকের ৮ই মে ১৯৯৬ তারিখের পত্রিকাটিতেও রাজনৈতিক দলগুলির বহু নষ্ট আশ্বাস আছে। কিন্তু তার মাঝে তিনটি নষ্ট সংবাদ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি নষ্ট ঘটনা দর্শন করি; নষ্ট মানুষের নষ্ট মানসিকতার ব্যবচ্ছেদ করি। সুতরাং এ তিনটি সংবাদের মধ্যেও আমি নির্বাচন চাঞ্চলের চেয়েও বেশি চাঞ্চল্যকর দর্শন দেখতে পেলাম।

সংবাদ তিনটির প্রথম দুটি ছিল আজকের পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই এর মত গণদুর্দশা সম্পর্কিত প্রসঙ্গ, আর তৃতীয়টিতে ছিল সেই দুর্দশার কারণের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ। যেমনঃ

প্রথম সংবাদটির শিরোনাম ছিল। "অবশেষে মাষ্টার্স পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করলেন ইসলামী ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ।" খবরে প্রকাশ, দীর্ঘ এক বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২ সনের মাষ্টার্স পরীক্ষার (অনুষ্ঠিত ১৯৯৫ সনে) ফলাফল গত পরশু সোমবার ৬ই মে ১৯৯৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৫ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ১৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা এই ফল প্রকাশের দাবিতে গত এক বছর যাবত মিছিল, ধর্মঘট, স্মারকলিপি প্রদান, কোর্টে মামলা দায়ের এবং শেষ পর্যন্ত গত রবিবার ৫ই মে ১৯৯৬ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করার পর কর্তৃপক্ষ এই ফল প্রকাশ করলেন। ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায়, ১২ জন ছাত্র পরীক্ষার পর বিভিন্ন কলেজে চাকুরীর ইন্টারভিউ দিয়ে এম,এ, পরীক্ষার ফল দাখিল সাপেক্ষে চাকুরীও পায়। কিন্তু ফল প্রকাশে বিলম্ব হেতু তাদের নিয়োগ পত্র বাতিল হয়ে যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? ১৯৯২ সালের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে ১৯৯৫ সনে। ছাত্র সংখ্যা ৩১ জন। এই ৩১ জন ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরপত্র এক বছরের মধ্যেও দেখা সম্ভব হল না কেন? তবে কি শিক্ষক ছিল না? আসলে সবই ছিল। ১২ মাসের বেতনও শিক্ষকরা নিয়েছেন, ভাত খেয়েছেন, মাছ, মোরগ, গরু, ছাগল- সবই খেয়েছেন। খাওয়ার ক্ষুধাও হয়েছে, খাবার খেয়েছেনও। শুধু

বেতন নেয়ার আর খাওয়ার ব্যস্ততার জন্য ঐ ৩১ জন ছাত্রের উত্তর পত্রগুলো দেখার সময় পান নাই নাকি অন্য আর কিছু?

দ্বিতীয় খবরটির শিরোনাম ছিল এরকমঃ "৫ মাসে ১৫ হাজার লোক চাকুরি নিয়ে মালয়েশিয়া গেছেন। আরো ৩০ হাজার লোক যাবার অপেক্ষায়"। খবরে প্রকাশ, মালয়েশিয়ায় লোক পাঠাতে মাথাপিছু ব্যয় হওয়ার কথা ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো আদায় করে থাকে মাথাপিছু ৭০ হাজার থেকে সোয়া লাখ টাকা। এ কারণে সরকার জনশক্তি রপ্তানির দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছিল এবং প্রায় চার মাসে মাত্র ২০০ লোক পাঠিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সৃষ্ট জটিলতার কারণে "মাঝি" তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না'– এর মত ঐ দায়িত্বটা আবার সেই রিক্রুটিং এজেন্সির হাতে ছেড়ে দিয়ে আমলারা হাঁফ ছেড়েছেন। আর যখনি ছেড়ে দেয়া অমনি রিক্রুটিং এজেন্সীগুলি ৫ মাসে পাঠিয়েছে ১৫০০০ এবং আরও ৩০ হাজার প্রস্তুত করে রেখেছে।

এখানেও সেই একই প্রশ্ন, ব্যাপারটি কি? আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার আধার ব্যক্তি যেখানে মাসে গড়ে মাত্র ৫০ জন মানুষ বাইরে পাঠায় সেখানে অক্ষম ব্যবসায়ীরা পাঠায় মাসে ৩০০০ জন। অফিস নামক আমলাতন্ত্রের খাঁচায় ঢুকে বসলে উচ্চ শিক্ষিত, সিভিল সার্ভিস পদাধিকারী মানুষগুলোর শক্তি সামর্থ্য কি খাঁচার বাঘের মত লুপ্ত হয়ে যায়? তারা কি খাঁচার বাঘের মত হালুম করা ছাড়া আর কোন কাজ করতে পারে না? এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে তৃতীয় খবরটিতে। খবরটির শিরোনাম ছিল– "জনতার মঞ্চে যোগদানকারী ১৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের শোকজ।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ঃ ৯ মার্চ হতে ৩০ মার্চ পর্যন্ত ক্ষমতার লড়াইরত বিরোধী দলগুলো সরকারের পতন ঘটাবার জন্য যে অসহযোগ আন্দোলন করেছিল তা সফল করার জন্য জনতার মঞ্চ নামে নাট্যমঞ্চের মত একটা মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। যে সরকারের পতনের উদ্দেশ্যে ঐ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল, সেই সরকারের বড় বড় কিছু আমলা নিজ নিজ দফতর ফেলে ঐ জনতার মঞ্চে গিয়ে সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিয়েছে। অনেকটা দ্বি-চারিণী মেয়েদের মত– যারা স্বামীর খেয়ে স্বামীর টাকায় খরিদ করা সাজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে নাগরের কোলে শুয়ে স্বামীর বদনাম করে। স্বামী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেই তারা তাদের নাগরের কাছে চলে যায়। স্বামীর সংসারের কাজকর্মতো দূরের কথা অনেক সময় স্বামী সন্তানের খানাপিনার ব্যবস্থা করার সময়ই তারা পায় না।

দ্বি-চারিণী মেয়েরা যেমন করে নাগরের টানে ভাতারের সংসার এবং ঘরবাড়ী কাজকর্ম ফেলে অভিসারে চলে যায়, সরকারী অফিসের আমলারাও তেমনি সরকার বিরোধী আন্দোলনের টানে অফিসের কাজকর্ম ফেলে জনতার মঞ্চে হাজির হয়েছিল। সারা শহরের মানুষ ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসের গরমে যখন পানি পানি করে হাহাকার করছে, একটু ফ্যানের বাতাসের আশায় বিদ্যুতের আশায় মাতম করছে সরকারী আমলারা তখন মানুষের জীবন মরণ সমস্যাকে উপেক্ষা করে সরকার বিরোধী মঞ্চে গিয়ে ডালের আগায় বসে গোড়া কাটার মত কুড়াল চালিয়েছে।

সুতরাং পাঠক এবার ভেবে দেখুন, ৩১ জন ছাত্রের পরীক্ষা নিতে কেন তিন বছর সময় লাগে আবার সে পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করে ফল প্রকাশ করা কেন এক বছরেও সম্ভব হয় না। আবার যেখানে ক্ষমতাহীন বেসরকারী সংস্থাগুলো মাসে তিন হাজার জনশক্তি রফতানি করে সেখানে ক্ষমতাশালী সরকারী অফিস কেন মাসে ৫০ জন রপ্তানি করে এবং কেনইবা শেষ পর্যন্ত দায়িত্বটা পরের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা হাঁপ ছাড়ে।

পাঠক, এবার নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন কেন এই বান-বর্ষা-বৃষ্টির দেশের শহরবাসীরা পানির অভাবে হাহাকার করে মরে এবং শূন্য কলসীর এবং ঝাড়ু মিছিল নিয়ে বউ ঝিরা রাস্তায় নামে?

দিনমাস বছর করে আমাদের যে জীবনকাল, সেই জীবকালের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমরা সরকার গঠন করি। সরকারকে ট্যাক্স দেই, খাজনা দেই। বিনিময়ে সরকার জনজীবনের নিরাপত্তা বিধান সহ রাস্ত াঘাট, পানি, পয়ঃ বিদ্যুৎ ইত্যাদির নিশ্চয়তাসহ আমাদের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এই দায়িত্ব বহনের জন্য দেশে হাজার, হাজার লক্ষ লক্ষ কর্মকর্তা, কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। এই কর্মকর্তা কর্মচারীরা বেতনের বিনিময়ে সভ্যতার চাকা সচল রাখে।

কিন্তু ঐ কর্মকর্তা কর্মচারীরা যদি বেতনের বাইরে দেশের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য অথবা আমলাতান্ত্রিক অহমিকা বশত যদি ট্যাক্সদাতা জনসাধারণকে নিজের পূজা হিসাবে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেকে জমিদার মনে করে বসেন তখন আর তার পক্ষে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতে পারেনা। তিনি তখন জন সাধারণের ট্যাক্সের টাকায় বেতন খেয়েও নিজেকে জনসাধারণের চেয়ে ভিন্ন মনে করেন, জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার চেয়ে নিজের সুখ সুবিধার প্রতি বেশী যত্নবান হন। নষ্ট দর্শনে সে সব নষ্ট মানুষের নষ্টামিগুলির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

সুতরাং নষ্ট দর্শন পুস্তকটিকে দেশের উন্নয়নকামী সময়ের প্রশাসনিক দক্ষতা ও অদক্ষতার স্বাক্ষর বহনকারী একটি সমাজ দর্পণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

এই পুস্তকে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি মদীনা পাবলিকেসন্স এর পাঠক নন্দিত "সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান" পত্রিকায় 'নষ্ট দর্শন' নামক কলামে এবং জনাব শহীদুল্লাহ পাটোয়ারী সম্পাদিত মাসিক "বাণিজ্য বিচিত্রায়" বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলি প্রবন্ধই সাংস্কৃতিক অনাচার অর্থনৈতিক বিশৃংখলা এবং বিদ্যালয়গুলির সন্ত্রাসী পরিস্থিতি নিয়ে রচিত হয়েছে। এ কারণে প্রবন্ধগুলিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটনার এবং বর্ণনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পুনরাবৃত্তিগুলি বাছাই ও ছাঁটাই করতে গেলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়ে পড়ে বিধায় তা করা সম্ভব হল না।

আশা করি পাঠক সমাজ পুনরাবৃত্তিগুলিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভুল ত্রুটি সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ কৃতজ্ঞতা সহকারে সমাদৃত হবে।

এই পুস্তকখানা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির কর্মকর্তা কর্মচারিদের যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। বিশেষ করে জনাব অধ্যাপক এন, এম, হাবিবুল্লাহর ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং জনাব হাবীব শাহীনের নিরলস পরিশ্রম না হলে এই পুস্তকখানা এত অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকের দরবারে হাজির করা সম্ভব হত না। আমি এজন্য তাঁদের উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। বইটির মুদ্রণ ও অন্যান্য কাজে যারা শ্রম দিয়েছেন এবং জনাব হাবীব শাহীনকে সহায়তা দিয়েছেন আমি তাদের সকলকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রতন কুটির
১৪৬/১ নিউ বেলী রোড
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৮৩৫০০০৪

ইতি
আবদুল মবিন
১লা অগাষ্ট ১৯৯৬ইং

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

নষ্ট দর্শন বইখানা প্রকাশিত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু বই শেষ হলে কি হবে পাঠকের স্পৃহা তো শেষ হয়না। আবার মানুষের নষ্ট ক্রিয়া কর্মও নতুন শাখা প্রশাখায় পল্লবীত হয়ে নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং দেশে নষ্ট কর্মের নতুন ধারা সৃষ্টি করে জনজীবন দূর্বিসহ করে তুলছে।

বিশ্বের এক নম্বর মহামানব হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাবের কাল হতে শুরু করে মক্কা বিজয়ের কাল পর্যন্ত সময়ে বহু দুর্জন বহু পন্থায় তাঁর উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। কেহ তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখে তাঁকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কেহ দুধের সাথে বিষ খাইয়ে, আবার কেহ তাঁকে যাদু টোনা করে মারতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইসলামের সেসব শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শুধু সেই মহামানবের অমর নাম বিশ্বের শতকোটি মানুষের অন্তরে ধমনীর মত প্রতিনিয়ত যিকির হয়ে চলেছে আর আবু লাহাবদেরে অভিশাপ দিয়ে চলেছে।

তবে আবু লাহাবদের রক্তের ধারাতো শেষ হয়নি। তারা এখনও রসূল (সঃ) এর বিরোধিতায় সক্রিয় আছে। আর তাদের প্রতিকূলতায় ইসলামের ঝান্ডা উপরে হতে আরও উপরে উঠছে। ইসলামের প্রসারের প্রয়োজনেই হয়তো আল্লাহ এই প্রতিকূলতা জারী রেখে ইসলামকে ঘুড়ির মত উপর থেকে আরও উপরে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বময় ইসলাম প্রসারের মাধ্যমে তাই প্রমানীত হচ্ছে। কিন্তু তা বুঝার মত শক্তি আবু লাহাবদের নাই। কারণ গতি যার নীচসহ নীচ সে দুর্মতি।

২০০৮ সনের নভেম্বর মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদিচী ও ধুমকেতু নামের শিল্পীগোষ্ঠি নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে মহানবী (সঃ) কে যে নোংরা ভাষায় বিশেষায়ীত করেছে সে ভাষা আমাদের দেশের নোংরা, অসভ্য মানুষেরাই শুধু ব্যবহার করে থাকে এবং তদ্বারা তারা তাদের বাবাকেও সম্বোধন করে থাকে।

কাজেই মর্মাহত হওয়ার কিছু নেই। পাহাড় পর্বতের গায়ে নানা জাতের জন্তু, জানোয়ার, সাপ বিচ্ছু গর্ত খোঁড়ে, বড় বড় গহবর তৈরী করে বাচ্চা ফুটায় তাতে পাহাড়ের কিছু যায় আসেনা। পাহাড় আকাশে হেলান দিয়ে আরামে ঘুমায়। তেমনি মহামানবদের নাম নিয়ে যে যতই খেলা করুকনা কেন তাতে মহামানবদের কিছু যায় আসেনা– তাঁরা চির জাগরুকই থেকে

যান। আর ঐ সাপ বিচ্ছুরা কিছুদিন কিলবিল করে পরে হারিয়ে যায়, আবার আসে আবার হারায় বিষ্ঠার পোকার মত।

বিংশ শতাব্দিতে মাইকেল হার্ট নামক এক ইংরেজ লেখক বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১০০ জন মহামানবের নাম মর্যাদার ক্রমানুসারে সম্পাদন করে "দি হানড্রেড" (ফি-১০০) নামের একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাতে মহানবী (সঃ) এর নাম এক নম্বরে স্থাপন করেন। এতে ইহুদী সম্প্রদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বই খানা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই তার সমস্ত কপি খরিদ করে নিয়ে সাগরে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু যে নাম লক্ষ কোটি মানুষের অন্তরে মুদ্রিত হয়ে আছে তা কি ডোবানো যায়?

এই বাংলাদেশেও ভবেশ রায় নামক এক লেখক "শত মনিষীর কথা" নামে একখানা বই প্রণয়ন করেছেন। তাতে বহু মনিষীর গুরুত্বের ক্রমনির্ণয়ে হের ফের করা হলেও মহানবী (সঃ) এর নাম সবার উপরে এক নম্বরেই রেখেছেন। অথচ লেখক হিন্দু।

সৌদি আরবের জেদ্দা বিমান বন্দর হতে মক্কামুখী রাজপথের উপর এক বিশালাকার তোরণের উপর স্থাপিত হয়েছে কোরআন শরীফের এক বিশালাকার প্রতিকৃতি। তদ্বারা সেদেশে প্রবেশকালে আগন্তুকদের দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির আভাষ দিয়ে দেওয়া হয়। তেমনি সূজলা সুফলা বাংলাদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসাবে বিমান বন্দর ও হাজ্জ ক্যাম্পের প্রবেশ পথে ২০০১-২০০৬ এর বি.এন.পি সরকার আমলে ৫ (পাঁচ) কোটি ব্যয়ে একটি দৃষ্টি নন্দন ফোয়ারা স্থাপিত হয়েছিল। হাজারো মানুষ, লাখো মানুষ ফোয়ারাটি দেখে দেখে তৃপ্ত হত।

কিন্তু কি আশ্চর্য ২০০৭-২০০৮ সনের তত্ত্বাধায়ক সরকারের আমলে কিছু অতি উৎসাহী কর্মকর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ দৃষ্টি-নন্দন ফোয়ারাটি ভেঙ্গে তদস্থানে আবার কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে এক বিশাল লালনমূর্তি তৈরীর কাজ শুরু করা হয়। মূর্তি তৈরীর কাজ মাঝ পথে এলে তৌহিদী জনতার প্রশ্নবানে বন্দর কর্তৃপক্ষের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। ১৬ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে নির্মাণাধীন মূর্তিটি শেষ পর্যন্ত অপসারণ করে নেয়া হয়।

মূর্তি অপসারণের ২/৩ দিন পর টেলিভিশনের খবরে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মুসলমান অধ্যাপক মূর্তি অপসারণের প্রতিবাদ করে যুক্তি দেখিয়ে বলছেন "মূর্তি আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির উপর হামলাকে মেনে নেয়া যায় না।"

যারা বলে মূর্তি আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতি, তাদের আমরা চিনি। তারা আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, গুণীজন এবং তারা মুসলমান ও বটে। কিন্তু তারা মুসলমানের ধর্ম কৃষ্টি সংস্কৃতি কোন কিছুই অনুসরণ করেননা। তারা সাদী সম্বন্ধ করেন মূর্তি পূজকদের সাথে। সেকারণে তাদের ওঠা-বসা-চলা-ফেরা, আদর-আপ্যায়ন হয় মূর্তি পূজকের সাথে। সুতরাং সঙ্গদোষে মূর্তি তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি হতে পারে। তাই বলে আমাদের কোরআন কৃষ্টিতে অভ্যস্ত সন্তানেরা তো তা অনুসরণ করতে পারেনা।

ইসলাম ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন (যার যার ধর্ম তার তার জন্য)। তাই এই বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, পাহাড়ী, বাঙ্গালী পাশাপাশি বাস করে চলেছে কোথাও কোন হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই। সংঘাত শুধু তাদের কারণে, তাদের সাথে এবং তাদের প্ররোচনায়, যাদের কোন ধর্মনিষ্ঠা নেই, ধর্মবোধ নেই। এরা নামাজও পড়েনা পূজাও করেনা বা গীর্জায়ও যায় না। এদের আন্তধর্ম বিয়ে সাদীর কারণে এদের সন্তানেরা হয় সংকর জাতের। ধর্মবোধ না থাকায় এরা ভাঙ্গা বৈঠা, ছেঁড়া পালের নৌকার মত চলতে গিয়ে দিগভ্রান্ত হয়ে ধর্মবোধ সম্পন্নদের কৃষ্টি, সংস্কৃতির উপর, সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি নীতির উপর আছড়ে পড়ে এবং এই আছড়ে পড়াকে তারা সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা আখ্যা দিয়ে দেশে এবং বিদেশে প্রচারণা চালিয়ে কলহ কোন্দলের জন্ম দেয়।

অপরদিকে ঐ ধর্মবোধহীন শিক্ষকদের ছাত্ররা ধর্মহীন জীবন চর্চার ছবক পেয়ে বুমেরাং হয়ে শিক্ষকদেরই নাজেহাল করে থাকে। একারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রায়শই হানাহানিতে লিপ্ত হয়, শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হন, ছাত্রীরা নীপিড়নের শিকার হয়।

ঐ শিক্ষকদের ছাত্রদের কেউ যদি পরিনত বয়সে এসে সামান্যতম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পায়, তারা তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে। তারই প্রমান আমরা পেয়েছি ২০০৭ সনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। সে সময় সরকারের কোন কোন অতি উৎসাহী উপদেষ্টা নারী-দরদি সেজে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যাহেলী যুগের মত কোরআনের বিধান সংশোধনের দাবী উত্থাপনের উদ্বুত্ব প্রকাশ করেছেন। নারী মুক্তির নামে তারা যেন পারলে গর্ভ-যাতনা, প্রসব-যাতনার ভারও এখন থেকে পুরুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে নারীকে ভারমুক্ত করে দিতে চান।

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলে লেখাটি শেষ করছিঃ বেদের যুগে মানব সমাজের সাথে স্বর্গলোকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মানুষের সুখে দুখে দেবতাদের সাহায্য সহায়তা সহজলভ্য ছিল। তখনকার দিনে নারীরা ঘরকন্নার বাইরে আর কোন কাজ করতনা। অফিস আদালত, মাঠ-ঘাট-ময়দান, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সকল কাজই ছিল পুরুষদের জন্য। আর অন্দর মহলের সকল কাজে ছিল নারীর প্রাধান্য। ঘর-কন্না, রান্না-বান্না, সন্তান ধারণ, লালন পালন ইত্যাদি সকল কাজই নারীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং আছে।

যুগের গতিধারায় এক সময় প্রগতিবাদী নারী সমাজ অধিকার সচেতন হয়ে পুরুষের প্রাধান্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। নারীরা একদিন সদলবলে দেবতার সামনে হাজির হয়ে নিবেদন করল, প্রভুঃ তুমি নারী পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সন্তান জন্মের বিধান করেছ। কিন্তু প্রভূ সন্তান গর্ভে ধারণের ও বহনের ভার এবং সন্তান প্রসবের সমস্ত ব্যথা-বেদনা নারীদের উপর ন্যস্ত করেছ। প্রভুঃ আমরা মনে করি, গর্ভভার এবং সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সন্ত ানের বাবারও একটা অংশীদারিত্ব থাকা সমীচিন ছিল। তবে পুরুষদের যেহেতু ঘর-সংসারের বাইরে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। সেহেতু তাদের গর্ভভার দিতে আমরা বলছি না। প্রসব বেদনাটা একটা স্বল্পকালীন ব্যাপার, অল্প সময়ের মধ্যে বেদনা লাঘব হয়। সেহেতু প্রসব বেদনাটা সন্তানের বাবাকে দেওয়ার জন্য আমরা নিবেদন করছি। দেবতা বললেনঃ তথাস্ত।

ঐ আন্দোলনের নেত্রী ঐ সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি সংস্কৃতিবান মহিলা সংগীত চর্চা করেন এবং অধিক রাত পর্যন্ত সংগীত গুরুর কাছে সারেগামা রেওয়াজ করেন। আন্দোলনের দিনও ঘরে এসে তিনি সারেগামা নিয়ে গুরুর ঘরে বসে যান।

পাশের ঘরে কর্মব্যস্ত কর্ত্তার দিকে নেত্রী আড়চোখে আকাচ্ছেন আর ভাবছেন, বাচাধন, এবার মজা টের পাবে- কতধানে কত চাল।

দিনে দিনে নেত্রীর প্রসবের ক্ষণ এসে যায়। আর কর্ত্তা আসন্ন- প্রসবা স্ত্রীর জন্য উদ্বেগাকুল চিত্তে ঘর-বার কচ্ছেন। নেত্রীর সহযোগী বান্ধবীরা কৌতুহল নিয়ে কর্তার চারপাশে ঘুর ঘুর কচ্ছেন আর অপেক্ষা কচ্ছেন কখন কর্ত্তার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু কর্তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে বিনা ব্যথা বেদনায় নেত্রীর সন্তান প্রসব হয়ে গেল। কিন্তু দহলিজে সংগীত গুরু গতরাত হতে ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। সকলে বৈদ্য-বমাজ নিয়ে ছুটাছুটি

করছে, কিন্তু কিছুতে কিছু হচ্ছে না দেখে পরদিন বড় বৈদ্যকে ডেকে আনার সিদ্ধান্ত হয়।

কিন্তু পরদিন নেত্রীর সন্তান প্রসবের সাথে সাথেই সংগীত গুরুর বেদনা লাঘব হয়ে যায়। এতদৃষ্টে নেত্রী এবং তার সহযোগীরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তারাইতো সন্তানের বাবাকে বেদনার ভার দিতে বলেছেন। মহিলাদের স্বামীদেরতো দিতে বলেননি। সুতরাং সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন আবার দেবতার কাছে যাবেন।

তারা সদলবলে আবার দেবতার দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করে বললেন, প্রভূ দশমাস যখন আমরা গর্ভের কষ্টকর বোঝা বইতে পারি, প্রসব বেদনার যাতনাও আমরা বইতে পারব। প্রসব বেদনা ছাড়া সন্তান প্রাপ্তিতে আমরা তৃপ্ত হতে পারছিনা। কারণ বিনা কষ্টে প্রাপ্ত ধনে পাওয়ার আনন্দ অনুভূত হয়না। সুতরাং প্রভূ আমাদের প্রসব বেদনা আমাদেরই থাক। দেবতা বললেনঃ তথাস্তু।

রতন কুটির
১৪৬/১ নিউ বেইলী রোড
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৮৩৫০০০৪

আবদুল মবিন
১৪-০৪-২০০৯

উৎসর্গ

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিমু ঃ

আমার আব্বা মরহুম আলহাজ্জ আবদুল ওয়াহেদ মিয়াকে, আমার আম্মা মরহুমা করপুরুন্নেছা বেগমকে এবং আমার মরহুম ভাই বোনদের সকলকে সহ সকল আত্মীয় স্বজন ও বিশ্বের সকল মোমিন মুসলমানদের ক্ষমা করুন, আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং পূণ্যবানদের সঙ্গী করে বেহেশতে দাখীল করুন– ইয়া আযিযু, ইয়া গাফফারু, ইয়া রাব্বাল আ'আমিন। -আমিন

আবদুল মবিন

সূচীপত্র

অসুর কাহিনী	২৫
শবরী ও ডুম্বিনী	৩২
পুরোহিত ও পাসপোর্ট	৩৮
কি অইল গো নানী	৪৫
আন্টা ঘর	৫৩
বাচাল ভাষণ	৫৯
লাল পাথরের রক্ত	৬৮
কুলাঙ্গারের কুষ্টি নামা	৭৫
ঠ্যালার নাম বাবাজী	৮৩
নাস্তিকের বিয়ের মন্ত্র নাই	৮৭
পুত্তলিকার পুনর্জন্ম	৯১
নাও ভাল পরে বায়	৯৭
দেহ পূঁজী	১০২
এবার ধান ঘুঘু খাবে	১১০
চোলিকা আন্দর	১১৫
শিবের গাজন	১২০
অতি চালাকের গলায় দড়ি	১২৮
ফুল তলার পায়খানা	১৩৪
পঞ্চরস	১৪০
সম্ভ্রম	১৪৭
পর্ণ থেরাপী	১৫৫
গাদ্দার	১৬৩
বিয়ের বয়স	১৭২
বৌয়ের বেতন	১৮৪
সেন্সরসীপ	১৯২
হুমকী	১৯৮
ডাংকী টিচারস মাংকী বয়েজ	২০৪
রাজনীতির চাষ	২১৫
পলিটিক্যাল ওয়াইন	২২৩
লাশ ও শকুন	২৩৫
পেঁয়াজের গন্ধ	২৪৬
ডকটরেট ডিজিজ	২৫৪
বলদ সমাচার	২৬২
রাজনীতির প্লেগ	২৬৮
ভাগ্যলক্ষী চঞ্চলা	২৭৬
পূঁজী ভীরু চন্দনা	২৮৮
স্যাবোটেজ	২৯৯
হরতাল ও শুকনা হাড্ডি	৩০৮
ব্যুরুক্র্যাটিক	৩১৪

নষ্ট দর্শন

অসুর কাহিনী

হিন্দুর পুরান, ভগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হিন্দুর স্বর্গে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তারা, তিলোত্তমা ইত্যাদি নামের বহু বেশ্যা আছে। স্বর্গের দেবতাদের মনোরঞ্জন করাই তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু দেবতারা আশংকা করেন, মর্ত্যের সুর বা অসুরেরা যদি যথেষ্ট সংখ্যায় পূণ্য কর্ম করে স্বর্গে যেতে পারে, তবে তারা স্বর্গে উৎপাত সৃষ্টি করবে এবং তদ্বারা স্বর্গের পরিবেশ নষ্ট করবে। কারণ, তারা নিকৃষ্ট ধরনের দেবতা ও দানব ধরনের মানুষ। সুতরাং দেবতারা ঐ অসুরদেরকে পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য তাদের রক্ষিতা বেশ্যাদেরকে মাঝে মাঝে মর্ত্যে পাঠিয়ে থাকেন।

সে যুগ ছিল হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বেদের যুগ। সে যুগে স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। দেবতাদের পদচারণায় মর্ত্যের মাটি সব সময় মুখরিত থাকত। সুরাসুরদের জন্য ব্যভিচার বা ধর্ষণ পাপযোগ্য অপরাধ হলেও দেবতাদের জন্য গর্হিত ছিল না। সুতরাং স্বর্গের দেবতারা নিজেরা বুদ্ধিজীবির বেশে মর্ত্যে এসে ব্যভিচার করে যেতেন, পুরনারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতেন। তদ্বারা তারা পুরনারীদের ধর্ষিতা হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়ে যেতেন। অপরদিকে স্বর্গের বেশ্যাদেরকে মর্ত্যে পাঠিয়ে মর্ত্যের পুরুষদেরকে ধর্ষণের প্রতি আগ্রহী করে দিয়ে যেতেন। যেহেতু স্বর্গের বেশ্যা সেহেতু তারা হতো সুন্দরী ও বুদ্ধিদীপ্ত। সুতরাং সহজেই তারা পুরুষকে তাদের লালসার শিকারে পরিণত করতে পারত।

অসুর কারা? ভগবত গীতায় অসুরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, অসুরেরা বলে থাকে, এই দুনিয়ায় সত্য বলে কিছু নেই, সবই অসত্য। জগতে ধর্মাধর্ম বলে কিছু নেই। এবং ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাপক হিসেবে ঈশ্বর নামেরও কিছু নেই। বিশ্বের সকল সৃষ্টি কেবলই স্ত্রী-পুরুষের সংযোগজাত ফসল। স্ত্রী-পুরুষের কাম প্রবৃত্তিই এর একমাত্র কারণ। তাছাড়া আর কোন কারণ নেই। অর্থাৎ জগতে শাস্ত্রোক্ত কোন সৃষ্টি পরম্পরা নেই। জগতের সকল পদার্থই মানুষের কামনা তৃপ্ত করার জন্য ছাড়া আর কোন উপযোগ নেই।

উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মর্ত্যের বিকৃতমতি ক্রূরকর্মা ব্যক্তিরা অহিতাচারে প্রবৃত্ত হয়। তারা প্রকৃতপক্ষে জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ অসুরেরা , দর্প, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ, নির্দয়তা, অজ্ঞানতা, ইত্যাদি যে সকল রিপুর বশবর্তি হয়ে দুষ্কর্ম করে থাকে তার মূলে রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ নামক তিনটি রিপু। (গীতা ১৬ অধ্যায়, শ্লেক ৮-৯)।

সুতরাং কাম, ক্রোধ, লোভ তাড়িত এই সব অসুরদেরকে দেবতারা ভয় করেন। কারণ, এরা ঈশ্বরকেই ভয় করে না দেবতা তো দূরের। এই নাস্তিক পাষণ্ডেরা কাউকে ভয় করে না, কারও শাসনকে মানে না বলে, নিজেরা সারা জীবন পাপ করে এবং নাস্তিকতার প্রচারণা দ্বারা জনসাধারণকে পাপকর্মের প্রতি প্ররোচিত করে থাকে।

এদেরই কেহ কেহ বৃদ্ধ বয়সে পৌছে যখন অথর্ব হয়ে সংসারে অনাকাঙ্খিত হয়ে পড়ে এবং দৈব ধরনের নির্যাতন মূলক রোগ-যাতনায় ভুগতে শুরু করে, তখন তারা ধর্ম চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠে। চুপে চুপে জপ-তপ আরাধনা করতে শুরু করে। সারাজীবনের অসৎ পথে অর্জিত অর্থসম্পদ সৎকর্মে ব্যয় করে স্বর্গ প্রাপ্তির চেষ্টা পায়। এই ভন্ড তপস্বীদের স্বর্গ প্রাপ্তির দুরাকাঙ্খাকে নস্যাৎ করার জন্যই দেবতারা স্বর্গের বেশ্যাদেরকে মর্ত্যে পাঠাতেন।

বৃদ্ধ অসুরেরা যদিও জানত যে, ব্যভিচার মহাপাপ এবং ব্যভিচারের কারণে তাদের সকল পূণ্যকর্ম বিফল হয়ে যেতে পারে, তবুও স্বর্গের সুন্দরীদের প্রলোভন ও প্ররোচনা হতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হত। কারণ, তারা স্বর্গের সুন্দরী, তারা যে কোন কঠোর তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা কাব্যে শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেনঃ স্বর্গের দেবতারা যখন জানতে পারলেন যে পৌবাণিক রাজা বিশ্বামিত্র স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছেন তখন তারা এই অসুর রাজার স্বর্গারোহনের আশঙ্কায় সঙ্কিত হয়ে পড়েন। রাজা বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ ও তপস্যা পন্ড করার জন্য তখন দেবতারা মেনকা নাম্নী স্বর্গের এক বেশ্যাকে মর্ত্যে প্রেরণ করেন।

তখন বসন্তকাল। মেনকার আগমনে পুষ্প পল্লব শোভিত বিশ্ব প্রকৃতিতে এক অদ্ভুত পূলক শিহরণের সঞ্চার হয়। তাবৎ পশু-পাখী প্রণয় তাড়িত হয়ে পড়ে। বসন্তের ঐ উন্মাদ প্রণয় তাড়নায় অভিভূত হয়ে কৌশিক কুলের মহর্ষি মেনকার সাথে মিলিত হন। এ মিলনের ফলেই তপোধন কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়।

সন্তান প্রসবের পর পরই মেনকা স্বর্গে প্রত্যাগমন করে। ফলে মাতৃ পরিত্যক্তা হয়ে মর্ত্যের শকুন্তলা মর্ত্যেই পড়ে রইল। তপবনবাসী মহর্ষি কাশ্যপ শকুন্তলাকে কুড়িয়ে নিয়ে আপত্য স্নেহে তপোবনে লালন পালন করেন।

কিন্তু সময় বদলে গেছে। স্বর্গের সুন্দরীদের রূপের যাদু যতই প্রবল হয়েছে, আত্মরক্ষার গরজে মর্ত্যের মানুষের মধ্যে ধর্মের তৃষ্ণা ততই

বেড়েছে। কারণ, মানুষ জন্ম এবং মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে না পেরে নিশ্চিত হয়েছে, যে অজ্ঞাত এবং অদৃশ্য শক্তি মানুষের জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শক্তির হাতে নিশ্চয় মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী একটি অধ্যায়ও আছে এবং সেই অধ্যায়টি নিশ্চয় মহাবিশ্বের আয়ুর মতই সীমাহীন হবে।

সুতরাং মানুষ পরকালীন জীবনের রহস্য উদঘাটন করার জন্য বার বার বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছে। সেই বিজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যে অলৌককতা প্রত্যক্ষ করেছে, তার মধ্যেই ধর্মকে আবিস্কার করেছে। মানুষ দেখেছে আগুনের ধর্ম আছে, পানির ধর্ম আছে, আলো বাতাস চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার ধর্ম আছে। তেমনি মানুষের শরীরেরও ধর্ম আছে। সে যখন উত্তেজিত হয় তখন তার নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয় অর্থাৎ তার রক্তে ক্রোধের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এটা রক্তের ধর্ম।

অমাবশ্যা পূর্ণিমায় মানুষের শরীরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, বাত রোগ, শ্বাস রোগের বৃদ্ধি ঘটে, এটা ধর্মনিষ্ঠ সৌর জগতের সাথে ধর্মনিষ্ঠ মানব শরীরের সহমর্মিতার লক্ষণ মাত্র। এ কারণেই মানুষ অতি প্রাচীন কাল হতে ধর্মের অন্বেষণ করে এসেছে এবং যখনই কেহ মানুষকে কোন নীতির সন্ধান দিয়েছে তখনই সে তাকে ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যতটুকু খাদ্যের অন্বেষণ করেছে, সুখী সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য নীতি নিয়মেরও ততটুকু অন্বেষণ করেছে।

মহাপুরুষদের মুখ নিসৃত নীতি নিয়মের সেসব বিধান কখনও বৈদিক ধর্ম কখনও বৌদ্ধ, কখনও জৈন, খৃষ্টীয় এবং সর্বশেষ ইসলাম ধর্ম নামে মানুষের চিত্ত জয় করেছে।

ইসলাম ধর্ম প্রসারের সাথে সাথে পাপ-পুন্য, ইহকাল-পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের ধারণা সূক্ষ্ম হতে সূক্ষতর হয়েছে। এই সব ধর্মের ধ্যান ধারণার পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, সবার মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য রয়েছে।

ব্যভিচার, মিথ্যাচার, পরের চরিত্র হননের প্ররোচনা দান, পরের অপকার, আত্মিক অধঃপাত করার চেষ্টা ইত্যাদির মত ক্রিয়া-কর্মকে সকল ধর্মই জঘন্য পাপ হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে। দেশের আইনও ঐসব ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যভিচার ও ধর্ষণ ইত্যাদি পাপকর্মগুলোকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে কঠোর আইন তৈরী করেছে।

কিন্তু ধর্মের যতই প্রসার হয়ে থাকুক না কেন, তদ্বারা মর্ত্যের মানুষের আসুরিক প্রবৃত্তি ও মানসিকতা অন্তর্হিত হয়নি। বংশগতির বৈজ্ঞানীক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই আসুরিক প্রবৃত্তির পুনরাবির্ভাব আজও ঘটছে। আজকের সভ্য

সমাজে প্রতিনিয়ত আমরা যে নাস্তিকদেরকে দেখে থাকি এরাই সেই অসুর, দেবতাদের কোপানল কবলিত প্রাচীন অসুরদের নিকৃষ্ট বংশধর।

যুগ বদলেছে, সমাজ বদলেছে, মানুষ বদলেছে কিন্তু ঐ অসুরদের মানসিকতা বদলায়নি। ভগবত গীতায় অসুরদের নাস্তিক্যবাদী হিসেবে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা এখনও আছে এবং সেই স্বর্গের বেশ্যাদের প্ররোচিত ব্যভিচারের নেশাও তেমনি অটুট আছে।

ভগবত গীতায় বর্ণিত অসুরদের মত আধুনিক যুগের অসুরেরাও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পূজা পার্বন ও সৎকর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অপর কিছু আছে যারা চক্ষুলজ্জা ও লোকভয়বশত গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ধর্মের পথে ফিরে আসতে পারে না। এরা তখন তাদের অনুসারীদের কাছে আবদার রেখে যায়, মৃত্যুর পর তাদের মরদেহ যেন মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। কারণ, তাদের বিশ্বাস, জীবনে তারা যত পাপই করে থাকুক না কেন মসজিদের পাশে কবর পেলে আযানের শব্দে তাদের কবর আযাব বন্ধ হয়ে যাবে, মুসল্লিদের দোয়া-কালামের অসিলায় আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

এরা জঘন্যতম ভন্ড ধরনের অসুর। মানুষকে বিপথগামী করাই এদের উদ্দেশ্য। এরা প্রকৃতপক্ষে মেনকা রম্ভা-তারা-তিলোত্তমাদের ছদ্মবেশী পুরুষ সংস্করণ। বিজ্ঞানের এই যুগে স্বর্গের বনিতারা এবং দেবতারা পুরাকালের মত মর্ত্যের মাটিতে কেলি করতে আসতে পারে না। তাই তারা এই বুদ্ধিজীবী ছদ্মবেশের ভেক-ব্যবস্থা করে থাকে। এরা মানুষের বিশ্বাস ভাজন হওয়ার জন্য উঁচুদরের মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। দেবতারা বেশ্যাদের যেমন অপরূপ রূপের অপ্সরা সাজিয়ে দুনিয়াতে পাঠাতেন, ঐ ভন্ডদেরকেও তেমনি নানা গুণে গুনান্বিত করে জ্ঞানীর বা বুদ্ধিজীবীর ছদ্মবেশে পাঠিয়ে থাকেন। এ কারণেই দেখা যায় আমাদের সমাজে যারা নাস্তিক তাদের সবাই বুদ্ধিজীবী। নির্বুদ্ধি অশিক্ষিতরা ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। ধর্ম ভ্রষ্টরা, ধর্মভীরু, পাপ-পূণ্য, ন্যায় অন্যায় ভয়ে ভীত মানুষগুলিকে অহিফেনসেবী নামে বিদ্রুপ করে থাকে।

ঐ বুদ্ধিজীবীরা যাতে বৃদ্ধ বয়সে পৌছে আবার জপ-তপ আরাধনা শুরু করতে না পারে তজ্জন্য দেবতারা তাদের পেছনে কিছু বেশ্যাকেও নিয়োজিত রাখতে বাধ্য হন। আবার কিছু ধর্মনিষ্ঠ মানুষ থাকে, যাদেরকে কোন প্রকারেই পাপ কাজে নামানো যায় না। এই ধর্মনিষ্ঠদেরকে কাবু করার জন্যও বুদ্ধিজীবী সুন্দরী বেশ্যার প্রয়োজন। কারণ, পুরুষ পুরুষকে ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না। আবার পুরুষরা ধর্ষণ করতে পারে বলে ধর্ষণের কারণে পুরুষের জেল-জরিমানার বিধান আছে, যে কারণে পুরুষরা সংযমী হতে বাধ্য

হয়। নারী ধর্ষণ করতে পারে না, তাই নারীর জন্য ঐ ধরনের কোন শাস্তির বিধান নেই, তাই নারীর ভয়েরও কিছু নেই, ডরেরও কিছু নেই।

সুতরাং আধুনিক সমাজে কিছু বুদ্ধিজীবী বেশ্যার আবির্ভাব ঘটেছে। নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐসব বেশ্যারা তাদের রূপের মোড়কে পাপকে মুড়িয়ে নতুন করে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করছে, আল্লাহ-খোদা বলে কিছু নেই, পাপ বলেও কিছু নেই। তাদের মধ্যে যারা বেশী শিক্ষিত ও সুন্দরী, তারা নাস্তিকতার নুপুর বাজিয়ে মানুষকে প্রতিনিয়ত নিজের দিকে আকর্ষণ করে ধর্ষিতা হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করে আসছে।

এরা নৃত্যকলার নামে দেহের টসটসে যৌবন তরঙ্গ মঞ্চে ময়দানে প্রদর্শন করে বেড়ায়। অভিনয়ের নামে চুম্বন, আলিঙ্গণ, মন্থনের কৌশল প্রদর্শন দ্বারা দর্শকদের অন্তরে কামনার তরঙ্গ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপন মডেলিং এর নামে দেহের রূপ-যৌবনকে পুরুষের চোখের সামনে পরতে পরতে মেলে ধরে রূপের পসরা প্রদর্শন করে। সুটিং-আউটিং এর নামে দেহ বিপণন করে দেশ বিদেশের ঘাটে ঘাটে। তবুও তারা আস্তিকের বিশ্বাসের বাধন খুলতে পারছে না।

আস্তিক মানুষ বিজ্ঞান দিয়ে যখন এই মহাবিশ্বের বিশালতায়, অসীমতায়, রহস্যময়তায় এক অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণ অনুভব করে, তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যখন রূপ যৌবনের ক্ষণ-স্থায়ীত্বকে অনুভব করে তখন সে আরও বেশী করে আল্লাহর অস্তিত্বকে সারা মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করে এবং বেশ্যাদের প্ররোচনা হতে আত্মরক্ষা করে।

ব্যভিচার দুনিয়াতে নতুন আসেনি। ব্যভিচারের তীব্রতা দুনিয়াতে যত বেড়েছে মানুষের যাতনাও তত বেড়েছে এবং তদ্বারা মানুষের ধর্মবোধ বেগবান হয়েছে। আজও মানুষের ধর্মবোধ, মানুষের রুচিবোধ এবং শৃঙ্খলাবোধের প্রাধান্যের কারণেই রূপবতী নাস্তিকদের সকল ছলা-কলা, দর্প-দম্ভ পতিতালয়ের চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে। তেমনি অবিশ্বাসীর শূন্য মগজপ্রসুত বক্তব্য বক্তৃতা যত ছড়ায় এবং তা যত বেশী বেশী করে নাস্তিকের ডমরু বাজায় না কেন, আস্তিকের অন্তর তত বেশী করে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এটাই নিয়ম। যেমন বলা হয় মানুষ আদব শিখে বেয়াদবের কাছে। এক্ষেত্রেও তেমনি হচ্ছে।

নাস্তিক ও রূপবতিদের সকল চাতুরি ব্যর্থ হতে দেখে স্বর্গের দেবতারা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এবার তাই তারা নতুন অস্ত্র, সুন্দরী যৌবনবতি কবি, সাহিত্যিক, অভিনেত্রীর ছদ্মাবরণে নিকৃষ্টতম ইতর বেশ্যাদের মর্ত্যে পাঠাতে শুরু করেছেন। ইতর বেশ্যাদের মর্ত্যে দেবতাদের আদিষ্ট প্রধান কাজ হচ্ছে

দুনিয়া হতে ধর্মীয় বিধি বিধানের মুলোৎপাটন করে একের পর এক বুদ্ধিজীবীদেরকে প্ররোচিত করা যাতে তারা ধর্মপথে ফিরে না যেতে পারে। কিন্তু তাতে তাদের নিজেদের যৌন উত্তেজনা বেড়ে যায়। তারা একের পর এক স্বামী বদল করেও তৃপ্ত হতে পারে না। তাই যদৃচ্ছা পুরুষ গমনের পথ প্রশস্ত করার জন্য বিয়ে প্রথার বিরুদ্ধে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে।

হিন্দুর মনু সংহিতায় বিধান আছে, কোন নারী যদি পাঁচের অধিক পুরুষকে দেহদান করে, তবে সে পতিতার দলভূক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এরা বুদ্ধিজীবীর খোলস পরে আসায় প্রকাশ্যে পতিতার দলভূক্ত হতে পারে না। এসব কারণেই হোক অথবা বহু নপুংসক পুরুষ গমন হেতু অতৃপ্ত থাকার কারণেই হোক অথবা ধার্মিক সুপুরুষদের ব্যভিচারে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই হোক, তাদেরই একজন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে নারীরা এবার থেকে পুরুষদের নেকড়ের মত পাকড়াও করবে আর মোরগের মত ধর্ষণ করবে।

সুতরাং কিছুদিন পূর্বে ঐ ধরনের এক নারী তার লেখা এক কলামে পুরুষদেরকে ধরে ধরে ধর্ষণ করিয়ে নেবার জন্য নারী সমাজকে আহবান জানিয়েছেন। এক ধরনের পত্রিকা ঐসব আহবানকে তাদের পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করে টানবাজারের পতিতা পল্লীর দালালদের মত বেশ্যার দালালী করে চলেছে।

তার আহবানে সে বলেছে; "নারী ধর্ষণ করতে শিখুক ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত হোক.. এখন ভাল কথার যুগ নয়, নীতি বাক্যের সময় নয়.. নারী যতদিন ছিড়ে খুঁড়ে পুরুষ না খাবে, নারী যতদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিন্ড হিসেবে ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ না করবে ততদিন নারীর রক্ত-মাংস-মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাবার সংস্কার দূর হবে না।"

ঐ হতভাগিনীর লেখাটি পড়ে বার বার হিন্দুর দেবতা কার্তিকের মা দূর্গা দেবীর কথা আমার মনে পড়ছিল। ছেলে কার্তিক ছিলেন নধরকান্তি, অপূর্ব সুন্দর সুপুরুষ। ছেলের রূপে মুগ্ধ হয়ে ঐ দেবী এক সময় অতিরিক্ত কাম তাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ছেলের সাথে মিলনের জন্য ছেলেকে তিনি বহু খোশামোদ করেছিলেন। পুরুষকে ধর্ষণ করার মত এতটুকু শারীরিক সুবিধা থাকলেও দেবী নিজেই ছেলেকে ধর্ষণ করতেন, খোশামোদ করতেন না। কিন্তু দেবী হয়েও তিনি কোন শারীরিক কৌশল খুঁজে বের করতে পারলেন না। দেবী যা পারেননি, এই মেয়েটি কি করে তা পারবে?

ঐ মেয়েটির রাক্ষুসী বক্তব্য পাঠ করার পর হতে আমি যখনই দু'চোখ বন্ধ করি, তখনই আমার চোখের সামনে হিন্দুদের কালী মুর্তির একটি ছবি ভেসে উঠে- তার এক হাতে কৃপাণ, আর এক হাতে একটা রক্তঝরা নরমুন্ড আর

মুখে এক হাত লম্বা একটা রক্তাক্ত জিহ্বা লক লক করছে। কি বিভৎস সেই দৃশ্য, শরীর শিউরে উঠে। চোখ খুললেই মনে হয় ঐ মেয়েটিও যেন তার যৌনাঙ্গ উচিয়ে রাক্ষুসী মুর্তি ধারণ করে অন্নদামঙ্গলের ভূতের মত দেশে উৎপাত করে চলেছে।

গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এ ধরনের লক্ষণদৃষ্ট হলে তাকে জীন, ভূত বা প্রেতে ধরেছে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং তার চিসিৎকায় ওঝাদের ঝাড়, ফুক, বেত পাতা, সর্ষের তেল ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করতে দেখা যায়। সুন্দরী যৌবনবতীরাই ঐসব জীনভূতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং কবিরাজী মতে অতিরিক্ত কাম তাড়নাকেই ঐ রোগের কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়।

যা হোক, এই রোগটি বাংলাদেশের হাজার বছরের পুরানো রোগ। মঙ্গলকাব্যেও এর উল্লেখ আছে। অন্নদা মঙ্গলকাব্যে বলা হয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে মানসিংহের যুদ্ধকালে ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ব্রাহ্মণ মানসিংহকে সাহায্য করেন। যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় প্রতিদান হিসেবে মানসিংহ ঐ ব্রাহ্মণকে একটি জায়গীর দেওয়ার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রথমে ঐ অনুরোধ রক্ষা করেনিনি। ফলে ব্রাহ্মণ পূজাদ্বারা অন্নপূর্ণা দেবীকে খুশী করলে অন্নপূর্ণা জ্বীন ভূত প্রেত ও পিচাশের বলে বলিয়ান হয়ে রাজ মহলে বেগমদের উপর সওয়ার হয়ে উৎপাত শুরু করলে সম্রাট পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হন। অন্নদা মঙ্গলকাব্যে এই উৎপাতের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

"বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল
ওঝার ধমকে বিবির ইজার ছিড়িল
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত
বিবিরে লইয়া ভূতের খুশী বাড়ে তত।
বিবি ছাড়ি বান্দিরেও যেই ধরিল ভূতে
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে
এমন খবিস কাম না শুনি কোথায়
তাবিজ ছিঁড়িয়া বিবি ওঝারে কিলায়।

অন্নপূর্ণার ঐ উৎপাত ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে আর ঐ মেয়েটির উৎপাত হচ্ছে সভ্যতা ও সভ্যবোধের বিরুদ্ধে।

শবরী ও ডুম্বিনী

মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে বঙ্গদেশে তিন শ্রেণীর মানুষের বসবাস ছিল। উচ্চবর্ণ হিন্দু নিম্নবর্ণ হিন্দু, এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র সমন্বয়ে উচ্চ বর্ণ হিন্দু সমাজ গঠিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা জপ, তপ, হোম নিয়ে ব্যস্ত থাকত, ক্ষত্রিয়রা শাসন এবং বৈশ্য ও শূদ্ররা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু দেশে প্রাচূর্য ছিল বলে বৎসরের বেশীর ভাগ সময় তাদের অলস বসে থাকতে হত। সুতরাং তারা রমন, ভ্রমণ, আহার-বিহারে কালক্ষেপণ করত।

নিম্নবর্ণ হিন্দুর মধ্যে আবার দুটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মানুষেরা অস্পৃশ্য হলেও সমাজ জীবনে তাদের পেশার অপরিহার্যতার কারণে এরা উচ্চবর্ণের কাছাকাছি অবস্থানে বসবাস করত। এরা উচ্চবর্ণের ধর্ম অনুসরণ করত, মন্দিরাদি নির্মাণে এবং পূজা উপচার আহরণে, সরবরাহ সহায়তা করত, কিন্তু উচ্চবর্ণের ধরা ছোঁয়া হতে দূরে থাকত।

নিম্নবর্ণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল অন্ত্যজ শ্রেণী। এরা ছিল ডোম, শবর, চন্ডাল, শুন্ড, কোল ডীল, কাপালিক ইত্যাদি নামে পরিচিত জাতপাতহীন মানুষ। এরা শহর বা গ্রামের মূল বসতির বাইরে টিলায় বা বনাঞ্চলে পর্ণ কুটিরে মানবেতর জীবন যাপন করত। তাদের কোন ধর্ম ছিল না বা আত্মপ্রেমও ছিল না। দেশ বা জাতীয়তার ধারণাও তাদের ছিল না।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা বন্য পশু পাখী শিকার করে এবং বাঁশ-বেতের হস্তশিল্প কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। এদের মেয়েরা নৃত্যপটিয়সী ছিল। তাদের যুবতী মেয়েরা হাতে তৈরী শিল্পপণ্য নিয়ে গ্রামে এসে নেচে গেয়ে সেসব বিক্রি করতো। গ্রামের রমন, ভ্রমণ, আহার-বিহারে অব্যস্ত নিষ্কর্মা, ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্ণ হিন্দুরা ডুম্বিনী শবরীদের নাচে, গানে, রূপে রসে, মুগ্ধ হয়ে জাতপাত ভুলে যেত। সময় বুঝে তারা ডুম্বিনী শবরীদের কুঁড়েঘরের চারপাশে ঘুর ঘুর করত এবং সুযোগ বুঝে তাদের দেহ সম্ভোগ করত। এই ব্যভিচারিতার কারণে কোনদিন তাদের শৌর্য বীর্য, মেধার উন্নতি হতে পারেনি। একারণেই বঙ্গভূমিতে কোনদিন কোন বীর সন্তানের জন্ম হয়নি। একারণেই সেকালের বঙ্গবাসীরা কোন দিনই স্বাধীন জীবনের চিন্তা করতে পারেনি।

যাই হোক। ব্রাহ্মণকে দেহদানে ডুম্বিনী শবরীদের আপত্তির কিছু ছিল না। কারণ অচ্ছুত হয়েও ব্রাহ্মণের স্পর্শ লাভকে তারা বিরাট পাওয়া মনে করত। তারা ছিল দারিদ্র্য পীড়িত অবহেলিত মানুষ। সুতরাং ব্রাহ্মণ সঙ্গমের সাথে সাথে অনুগ্রহ ও অর্থানুকুল্যের যোগটি তাদের জন্য একটি বিবেচ্য বিষয় ছিল। বিশেষ করে শবরী ডুম্বিনীদের কোন সামাজিক মূল্য ছিল না বা সতীত্বের ও সদাচারের জন্য বাহবা ছিল না। যে কারণে গণিকাবৃত্তিও তাদের জীবন চর্চার, অন্তর্ভূক্ত ছিল। আত্মপ্রেম, দেশপ্রেম, ধর্মবোধ ইত্যাদির কোন ধারণা তাদের ছিল না।

বঙ্গে মুসলমান আগমনের পর সমাজে যে পরিবর্তনের ধারা সুচিত হয় সেই ধারায় অন্ত্যজ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাদের অনেকে স্বস্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ধর্ম বদল হলেই রক্তের রঙ বদলায় না। চেষ্টা, কষ্ট ও সহ্যশক্তি দ্বারা অর্থবিত্ত, প্রতিপত্তি লাভ করলেও প্রার্থনা ব্যতীত চারিত্রিক আভিজাত্যতা লাভ করা যায় না। হঠাৎ হঠাৎ করেই বহুদূর পূর্ব পুরুষের বংশদোষও বহুদূর উত্তর–পুরুষের মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে বলে বৈজ্ঞানীকেরা তথ্য আবিস্কার করেছেন। সুতরাং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও কোন ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যে পূর্ব পুরুষের ব্যভিচারী মনোবৃত্তি প্রকাশ পেতে পারে।

আজকাল নাটক-সিনেমায় আমরা যে নৃত্য কৌশল দেখে থাকি, যে অশ্লীল চুম্বন-আলিঙ্গন দেখে থাকি তাকে আসলে সেই প্রাচীন ডুম্বিনী শবরীদের নাচ, গান এবং গণিকাবৃত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রক্তের আধুনিক সংস্করণ বলা চলে। আধুনিক সংস্করণ বলছি, কারণ অশ্লীল ছায়াছবির মাধ্যমে এতদিনে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। নায়িকারা এতদিন লুকিয়ে ছাপিয়ে দেহদান করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এসেছে। কিন্তু এখন সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিকালের ডুম্বিনী শবরীরা নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নামে জরায়ুর স্বাধীনতা এবং বহুগামিতার দাবি উত্থাপন করে সমাজকে এক আদিম উল্লাসে মাতিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

প্রাচীন বঙ্গের ডুম্বিনী শবরীরা ব্যভিচার দ্বারা তৎকালীন ব্রাহ্মণদের নিবীর্য করে রেখেছিল। আধুনিককালের ডুম্বিনী, শরবীদের দ্বারা বাংলাদেশের মানুষকে নিবীর্য করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা মহিলাদের দ্বারা জরায়ুর স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করিয়েছে। কারণ, কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে অবাধ যৌন চর্চার স্বাধীন মনোবৃত্তির প্ররোচনার চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই।

বিশ্বের বড় বড় যুদ্ধে রণচাতুর্য হিসেবে শত্রু শিবিরে মেয়ে গুপ্তচর নিয়োগ করার নিয়ম আছে। সুন্দরী গুপ্তচরেরা রূপের জাল বিস্তার করে শত্রুব্যূহে প্রবেশ করে। তারা দুর্ধর্ষ সেনাধ্যক্ষদের নিজের জরায়ুতে আবদ্ধ রেখে নিজে দেশের সৈন্যদের জয়ের পথ সুগম করে। আমাদের দেশে যারা জরায়ুর স্বাধীনতার কথা বলে তারা যে সেই নারী গুপ্তচরের চাতুর্য অবলম্বন করছে তা এখন পরিষ্কার। এ কারণেই প্রাচীন মনীষীরা দেশাত্মবোধ এবং ধর্মবোধকে এক এবং অভিন্ন করে দেখেছেন।

নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নামে আমাদের বর্তমান সমাজের ধর্মদ্রোহীদের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাদের বেশীর ভাগেরই ব্যভিচারের ইতিহাস আছে। নৈতিক অধঃপতনের কারণে তারা প্রথম নির্লজ্জ হয়েছে পরে ধীরে ধীরে ধর্মদ্রোহী হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশদ্রোহীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজে যত বিশৃঙ্খলা, যত অশান্তি সৃষ্টি হয় তার মূলে রয়েছে; ব্যভিচার আর ব্যভিচারের তাৎক্ষণিক পার্শ্বক্রিয়া হচ্ছে ধর্মদ্রোহিতা এবং দেশদ্রোহিতা। এর প্রত্যেকটি যেকোন জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পতনের পূর্ব লক্ষণ।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বলতে চেয়েছি ভিডিও এর মাধ্যমে আগত অশ্লীল সিনেমা আমাদের প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করছে, আমাদের প্রবৃত্তিকে ব্যভিচারের প্রতি প্ররোচিত করছে। তদ্বারা আমাদের ধর্মবোধ এবং দেশপ্রেম নষ্ট হচ্ছে। ঐসব সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের ন্যাংটা নাচ, গান, যৌনাঙ্গের লাস্যময়তা প্রদর্শন, দৈহিক মিলনের দৃশ্য প্রদর্শন ইত্যাদি আমাদের প্রজন্মের নৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেমের ভিত্তিমূলে আঘাত করছে। তৎকারণে, আমাদের প্রজন্মের শৌর্য্য, বীর্য, মেধা, মননশীলতা, শালীনতাবোধ, মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি সকল সভ্যবোধ ধ্বংস হয়ে প্রজন্মের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সমাজ আজ হরণ-ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় জর্জরিত হয়ে পড়ছে।

ব্যভিচারের মানসিকতা শুধু ব্যক্তির শৌর্য, বীর্য, মেধা মননশীলতাকেই নষ্ট করে না, তদ্বারা একটা জাতির শৌর্য, বীর্য কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন আমাদের দেশের সাংবাদিক শফিকুল কবির। তিনি তার লন্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর ২৫ আগষ্ট, ১৯৮৯ তারিখে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল "টিকাটুলী থেকে পিকাডেলী"। এটি ১৯৮৯ সনের আগস্ট মাসে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন–

"একদিন বিকেলে বিলি ব্রাউন এর সাথে এম্বেংকমেন্ট এ টেমস" নদীর তীর ধরে হাটছিলাম। এখান থেকে টেমসে নৌ বিহারের জন্য স্পীড বোর্ট ভাড়ায় পাওয়া যায়। আমরাও নৌবিহারে যাব কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, দুজন আরব শেখ চারজন তন্বী-তরুণীকে বগল দাবা করে রিভারক্রুজ ঘাটের দিকে টলতে টলতে এগুচ্ছে। তরুণীরা শেখদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকাশ্যেই চুমো খাচ্ছে, বুকের ঘর্ষণে, সেন্টের আমেজ ছড়িয়ে আনসেন্সরড ফিল্মের মত যৌবন প্রদর্শন করছে।

বিলি আমাকে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বলল ঃ কি, দেখছ তো, পেট্রো ডলার? জবাব দিলাম– হ্যাঁ, বুঝতে পাচ্ছি।

বিলি বলল ঃ পেট্রো ডলার শেখ সাহেবদের গলায় যাদের হাত দেখছ, তারা কেউ এদেশের বা ইউরোপীয় কোন দেশের মেয়ে নয়-এরা সবাই ইসরাইল থেকে আগত নটি সুন্দরী। তাদের চারজনের মধ্যে একজনকে আমি চিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের একটি নাইট ক্লাবে সে নাচে। অনেকে তাকে ইসরাইলী গোয়েন্দা বলেও সন্দেহ করে।

৩০ লাখ মানুষের ছোট দেশ ইসরাইল। কিন্তু কি মারণাস্ত্র দিয়ে ছয়টি শক্তিশালী আরব দেশকে কাবু করে রেখেছে এবং গোটা মুসলিম বিশ্বকেই তারা তোয়াক্কা করে না। সেই গোপন সামরিক শক্তিটি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল।

বিলিকে বললাম, ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্টে একটা প্রবাদ আছে, হিন্দুর পয়সা হলে করে বাড়ী আর মুসলমানের পয়সা হলে খুঁজে নারী।

বিলি ব্রাউন আরব শেকদের ক্রিয়া-কান্ড, লক্ষ্য করে বলল, আণবিক বোমার চাইতেও শক্তিশালী একটি নারী দেহ। এমনকি এই যে, তোমার কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ইচ্ছে করলে এখনি তোমাকে, তোমার দেশকে কিংবা একটি মহাদেশকে কাবু করে বুকের ব্রা-এর নীচে, এমনকি ক্ষিপ্ত হলে পায়ের তলায় পিশে ফেরতে পারি।'

হেঁসেলে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়লে গৃহস্থ বিড়াল পোষে। বিড়াল ওঁৎ পেতে থেকে ইঁদুর শিকার করে নিজের উদরপূর্তি করে আর গৃহস্থকে ইঁদুরের উপদ্রব হতে রক্ষা করে। ইসরাইলী দেহপসারিণীরাও তেমনি লন্ডনের হোটেলে হোটেলে ওঁৎ পেতে থেকে আরব শেখ শিকার করে। তদ্বারা তারা একদিকে আরবী শেখদের পকেট লোপাট করে নিজেদের পকেট ভর্তি করে, অপরদিকে শেখদের শৌর্য-বীর্য নষ্ট করে নিজ দেশ ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান করে। এ কারণেই শফিকুল কবিরের বিলি ব্রাউন ইসরাইলী মেয়েদের ব্রা-এর নীচে

শক্তিশালী এ্যাটম বোমা আবিষ্কার করেছেন। এই বোমা প্রতিপক্ষকে জীবনে মারে না বটে, কিন্তু সাপুড়েরা সাপের মাথায় যেমন করে বশীকরণ হাত বুলিয়ে সাপকে বশ মানায়, ইসরাইলী মেয়েরা তেমনি ব্রা-এর ঘর্ষণ দ্বারা আরব বীরদের নিস্তেজ করে পোষ মানিয়ে রাখে। শুধু নিস্তেজ করে রাখাই নয়, ব্রা-এর ঘর্ষণ দ্বারা নীরিহ আরবীকে দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য যৌন মাতালে পরিণত করে তার দ্বারা অসাধ্য সাধন করাতেও দেখা গেছে।

যেমন সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আজিজ ইসলামী বিশ্বের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিভা স্ফুরণের জন্য এবং মুসলমানদের অভিজাত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন। বাদশাহর এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ইহুদীদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। হঠাৎ একদিন বাদশাহর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র তাকে গুলি করে হত্যা করে। তদন্তকালে দেখা যায় ঐ সময় ভ্রাতুষ্পুত্রটি এক ইহুদী তরুণীর প্রেমরসে মত্ত ছিল।

ভারতীয় সিনেমা 'খল নায়িকার' একটি সংলাপে নায়ক তার স্ত্রীর বান্ধবীর উন্নত বুকের দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্লাইজের ভিতরে কি আছে। বান্ধবীটি বলেছিল, ব্লাউজের ভিতরে তবাহি আছে। তবাহির অর্থ ধ্বংস বা এ্যাটম বোমা। এখন দেখুন, ইসরাইলী মেয়েদের ব্রা-এর নীচের এ্যাটম বোমার সাথে ভারতীয় সিনেমার ঐ তবাহি কথাটির কি সুন্দর মিল রয়েছে। ঐ তবাহিই ভিডিও-এর মাধ্যমে আমাদের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

অশ্লীল সিনেমা ভর করে সেই এ্যাটম বোমার আঘাত আসছে আমাদের ধর্ম সংস্কারের উপরত্ত। একদিকে ঐ এ্যাটম বোমার আক্রমণ, অপরদিকে আমাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিরোধ, এই উভয়ের চাপে আমাদের কিশোর-তরুণ-যুব সমাজ এক দারুণ মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে ছটফট করছে। তাদের এই দ্বন্দ্ব সংঘাতক্লিষ্ট বিমূঢ় মুহূর্তে একশ্রেণীর নারী তার স্বাধীন জরায়ুর নৈবেদ্য নিয়ে আমাদের সংস্কার নিষ্ঠ সংসার মঞ্চে হাজির হয়েছে এবং জরায়ুকে ধর্ম সংস্কারের বন্ধনমুক্ত করার জন্য ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করার নিষ্ফল চেষ্টা চালাচ্ছে।

ইসরাইলী মেয়েরা তবু লন্ডনে গিয়ে নিজেদের জরায়ু বিকিয়ে দিয়ে নিজ দেশের শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি নিশ্চিত করছে। কিন্তু আমাদের দেশের জরায়ু নিলাম দানকারী ঐ মেয়েরা নিজ দেশে বসে নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে, নিজ দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাদেরই একজন নিজ দেশ বাংলাদেশকে বলছে, শালা শুয়ারের বাচ্চা বাংলাদেশ, বাংলাদেশীদের বলছে- গাধা ও গরু আর বাংলাদেশের সীমানা-উঠিয়ে দিয়ে পরদেশের সাথে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শান্ত

হবে না বলে সে প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। তার বক্তব্যকে বাক-স্বাধীনতা নাম দিয়ে একশ্রেণীর প্রবৃত্তি প্রবণ মানুষ তাকে সমর্থন করছে। তার পক্ষে শোভাযাত্রা করছে। এর নাম কি বাক স্বাধীনতা? তবে কি ডম্বিনী শবরীদের প্রেতাত্মারা সকলে সদলবলে বাংলাদেশের কাঁধে ভর করেছে?

যারা দেশের সীমানা বিরোধী বক্তব্য প্রচার করে আর যারা তার পক্ষ সমর্থন করে, মিছিল করে, বক্তৃতা করে এরা নতুন কেউ নয়। এরা নবাব সিরাজুদ্দৌলার আমলেও ছিল, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কালেও ছিল। এরা যুগ যুগ ধরে নিজ দেশদ্রোহিতা করে এসেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে যখন এদেশের মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তখনও এরা ইংরেজদের পক্ষে ছিল। আর এদের সহায়তায় ইংরেজ বিরোধীদের ইংরেজরা দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দলে দলে হত্যা করেছে। কারণ দেশদ্রোহী নাম দিয়ে স্বাধীনতাকামীদের দমনের ব্যাপারে ইংরেজের আইন ছিল বড় কড়া। কিন্তু শবরী-ডুম্বিনীদের রক্তের উত্তরাধিকারের কারণে আমাদের আমলে এসে সেই আইনটি স্থবীর হয়ে পড়েছে।

পুরোহিত ও পাসপোর্ট

প্রতি বছরই আমাদের রাজধানী শহর ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে নানা উপলক্ষ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাভাবিক কারণেই ঐসব অনুষ্ঠানে দেশের সাংস্কৃতিক গুণীজনদের সমাবেশই ঘটার কথা। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির কার্যক্রম দেখে প্রতিয়মান হয় ঐসব অনুষ্ঠানের আয়োজকরা এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক কৌলীন্যে বিশ্বাস করেন না। গান ভাল পরে গায়, নাও ভাল পরে বায়' এই গ্রাম্য প্রবাদের মত তাদের কাছে পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি চর্চাই খুব ভাল লাগে।

তাই এদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জৌলুস বাড়াবার জন্য, নীতিবাক্য উপহার দেওয়ার জন্য। সাংস্কৃতিক পথ নির্দেশ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য তারা পশ্চিম বঙ্গ হতে সাংস্কৃতিক পণ্ডিত বা বাবু আমদানী করে থাকেন। এই বাবু আমদানীর ব্যাপারটা অনেকটা পূজা সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যজমান বাড়িতে আনার মত ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন যে হিন্দু তার পূজায় বেদিতে যত দামী মূর্তিই স্থাপন করুক না কেন, পূজা অর্চনার জন্য পূজা বাড়িতে যত সমারোহের ব্যবস্থাই করুক না কেন, নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে পৌরহিত্য না করালে সেই পূজা শুদ্ধ হবে না। উপস্থিত জনদের মধ্যে ব্রাহ্মণের চেয়ে ভাল ধর্মজ্ঞান, শাস্ত্র জ্ঞান এবং মন্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন অন্য অনেকেই হাজির থাকলেও তাদের দিয়ে পূজার কার্য সম্পাদন করানো যাবে না। কারণ পুরোহিতরা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তারা যতটুকু ছুৎমার্গ মেনে চলেন অন্যরা ততটুকু মেনে চলে না।

শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন এমন এক ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণ নিজের জাত গোত্র ছাড়া অন্য কারো সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খানা-পিনা করে না, এবং তার বাড়ীতেও কোন অস্পৃশ্য জাতের মানুষ বা কোন মুসলমানের আসা যাওয়া নেই। অবশ্য কুকুরে দোষ নেই। তারা নিজেরাও কোন অস্পৃশ্য জাত বা মুসলমানের বাড়ীতে যাওয়া আসা করেন না। তাতেই তারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। এদের পূজার যজমান বিস্তৃত থাকে টেকনাফ হতে তেতুলিয়া পর্যন্ত এবং বহুদূর দূরান্ত দেশ বা বিদেশেও। যতদূরই হোক না কেন, সেই গুরুত্বই তাদের আভিজাত্যতার বা কৌলীন্যের পরিচায়ক।

আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির অবস্থাও অনেকটা সেই যজমান বাড়ীর মত-পশ্চিম বঙ্গীয় পুরোহিত না এলে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা সুসম্পন্ন হয় না। তারা আসেন, থাকেন, মেলা-মেশা করেন, খান কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে এখানকার মুসলমানের আতিথ্যের কারণে তাদের জাত যায় না। কারণ, এতে পাওয়ার যোগ আছে, মুরুব্বিয়ানার যোগ আছে, সামাজিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যোগ আছে, পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্রকাশিত পুস্তকাদির জন্য বাংলাদেশে বাজার প্রাপ্তির যোগ আছে। কাজেই এ সময় মুসলমান অস্পৃশ্য নয়।

ভারত বিভাগ পূর্ব যুগে যখন আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ছিলাম, আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ ছিলাম, তখন হতেই আমরা ব্রাহ্মণ ও বাবুদের জাত-গোত্র, পৌরহিত্যের প্রাধান্য ও অধিকার ইত্যাদির সাথে পরিচিত এবং অভ্যস্ত ছিলাম। এখনো আমরা অনেকেই তাদের ভুলিনি। পুরানো অভ্যাস বশত কোন অনুষ্ঠানের কথা মুখে আনতেই তাদের স্মৃতি, তাদের প্রয়োজনীয়তা তাদের গুরুত্ব মনের মুকুরে ভেসে উঠে।

আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানাই। তারা এসে আমাদের বাধিত করেন। যতদিন থাকেন ততদিন আমাদের সংস্কৃতিজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সেই বাপ-দাদার কালের পুরানো অভ্যাস বশতঃ পুরোনো নিয়মে সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, হাত কচলিয়ে আজ্ঞে বাবু, আজ্ঞে বাবু করতে থাকেন। আর বাবু আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত উঁচিয়ে বলেন, বুঝেছি গফুর, এদেশ তো আমাদেরই দেশ, দেশটাতো ভাগ হওয়ার কথা ছিল না, আমাদের সংস্কৃতিক সাদৃশ্যই বলে দেয় আমরা এক, আমরা অভিন্ন। আমাদের এক হতে হবে। গফুর (আজকাল গফুর সাহেব) হাত কচলাতে কচলাতে বলেনঃ

ঠিক, ঠিক, আজ্ঞে বাবু ঠিক। একদম ঠিক। আমাদের অনেকেই তো বলছে, জিন্নাহ সাহেব না হয় একটা ভুল করে দেশটাকে একটুকরা কাগজের মত দুভাগ করেছেই, তাই বলে কি এটাকে জোড়া লাগানো যায় না? কেউ কেউ আরও বলেছে উই শ্যাল ওভারকাম। হ্যা বাবু তাই বলেছে।

বাবু বলেন, গুড, গুড, ভেরী গুড। বুঝতেই পারছ, আমরা বাঙ্গালী হয়েও বাংলাদেশের অনুষ্ঠানে আসতে ভিসা লাগে, পাসপোর্ট লাগে। এমনটি কেন হবে? তার উত্তর তোমাদের কাছেই আছে। এত বড় ধনী দেশ জার্মানী এক হতে পারে, তোমরা এক হতে পার না? তোমরা যুক্ত বাংলার দাবি তোল, দেখবে তোমাদের ভারতের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়ার জন্য আমরা ঠিক ঠিকই এসে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে নেব। কেন, পাকিস্তানের সাথে তোমরা যখন

মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত ছিলে তখন কি আমরা আসিনি? তখন যেমন এসেছিলাম তেমনি এখনও আসব।

গফুর বলে- আজ্ঞে বাবু, আপনারা আপাতত আসা যাওয়া করতে থাকেন। এমন ভাবে আসতে যেতে, আসতে যেতে দেখবেন এক সময় হঠাৎ করেই আপনাদের প্রতি ডাক আসছে।

আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য পশ্চিম বঙ্গিয় বাবু আসার আরও কারণ আছে। যেমনঃ প্রথমত আজ যারা পশ্চিম বঙ্গের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কর্ণধার, যারা সেখানকার প্রতিভাবান কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, তাদের বেশীর ভাগই এই অঞ্চলের সন্তান। দেশ বিভাগ জনিত কারণে তারা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজকরা মনে করেন তারা পশ্চিম বঙ্গে হিজরত করার সময় বুঝিবা এদেশের সাংস্কৃতিক যজমানির সকল শিকর বাকড়সহ তন্ত্রমন্ত্রগুলিও পুটুলি বেঁধে সাথে নিয়ে গেছেন।

ও রকমটি মনে করার মত নজির ইতিহাসে আছে। যেমন দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পাল রাজাদের রাজত্বকাল ছিল। ঐ সময় বৌদ্ধ সহজিয়ারা আধ্যাত্ম চর্চার জন্য পদ্য রচনা করতে শুরু করেন। এই পদ্যের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যের হাটি হাটি পা চলার শুরু হয়েছিল। ঐ সাহিত্যের নামই চর্যাপদ।

দশম শতাব্দির শেষ দিকে কাশ্মীরবাসী সেন রাজারা পাল রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে দেশ দখল করে নেয় এবং বৌদ্ধদের উপর নিপীড়ন চালাতে থাকে। ভীত সন্ত্রস্ত বৌদ্ধ সহজিয়ারা যা কিছু বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার সবটুকু পুটুলি বেঁধে সাথে নিয়ে নেপাল, ভুটান, বার্মা, থাইল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। হাজার বছর পরে ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজ দরবারে গিয়ে ঐ প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধান পান যা আজকের বহুল আলোচিত চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রাচীন স্বাক্ষর।

সুতরাং আমাদের দেশের বহু বুদ্ধিজীবীই মনে করেন হিন্দু বাবুরাও ১৯৪৭ সনে এদেশ ত্যাগ করার সময় এদেশের সংস্কৃতির সকল শিকড় বাকড় পুটুলি বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষার জন্যও এখানে এখন কিছু নেই। কিছু শিখতে হলেও বাবুদের ডেকে আনতে হবে অথবা তাদের কাছে শিকড় তালাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ সেন রাজারা বঙ্গদেশে এসে ব্রাহ্মণদের বিশুদ্ধতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

কাশ্মীর দেশীয় রাজা জয়ন্ত ছিলেন অপুত্রক। তিনি ৯৮৬ সনে পাল রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে বঙ্গদেশ জয় করে আদিশুর মতান্তরে বীরা সেন নামধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। পুত্র লাভের আশায় তিনি পুত্রেষ্ঠ যজ্ঞ করতে মনস্থ করে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্ধান করতে গিয়ে দেখেন এদেশে বৌদ্ধরাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। এতদিন রাজাও ছিল বৌদ্ধ। সুতরাং এদেশের ব্রাহ্মণদের এতদিন বৌদ্ধদের সাহচর্যে বসবাস করতে হওয়ায় সকল ব্রাহ্মণই অশুদ্ধ হয়ে গেছে বলে তিনি নিশ্চিত হলেন। সুতরাং এদেশের কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করলে সেই যজ্ঞ শুদ্ধ হবে না এবং হিতে বিপরীত হতে পারে মনে করে তিনি মহাচিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শুদ্ধাশুদ্ধির ইতিহাস জ্ঞান তার আছে। সুতরাং নিজ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি শাস্ত্র পর্যালোচনা করে আশার আলো উদঘাটিত করেন।

শাস্ত্রে আছে ঘোর কলিকালে কান্য কুবজ ব্যতিত আর সকল দেশই দেব-বিদ্বেষী বৌদ্ধদের দ্বারা অপবিত্র হবে। এতদস্মরণে রাজা আদিশুর কয়েকজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করে বলাহক নামক এক দূতকে কান্যকুবজ রাজা বীর সিংহের নিকট পত্রসহ প্রেরণ করেন।

বীর সিংহ বলাহকের মারফত আদিশূরকে জানালেন যে বঙ্গদেশের মত অপবিত্র দেশে কোন ভদ্র সন্তান গমন করতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করা বৃথা।

রাজা আদিশুর ঐ উত্তর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি সেনাপতি বীর বাহুকে সসৈন্যে কান্যকুবজ অভিযানে পাঠান। কিন্তু যুদ্ধে বীর বাহু নিহত হন। এই সংবাদে রাজা আদিশুর মর্মাহত হয়ে পড়েন।

আদিশুর জানতেন যে কান্যকুবজের রাজা বীর সিংহ গো-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গোমাতা ভক্ত ব্রাহ্মণ। তাই এবার তিনি গরুর গাড়িতে করে সাত শত অস্পৃশ্য, হীন সম্ভব সৈন্যকে অভিযানে প্রেরণ করেন। গরু মারা যাবে ভয়ে রাজা বীর সিংহ যুদ্ধে নিরস্ত হন। তিনি আদিশুরের প্রার্থীত পাঁচ জন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাঠাতে রাজী হয়ে সন্ধী স্থাপন করেন এবং এ সাতশত অস্পৃশ্য হীন সম্ভব সৈন্যকেও মন্ত্রতন্ত্রসহ গোবর খাইয়ে শুদ্ধি করে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিলেন।

আমাদের দেশের কিছু সংস্কৃতিজীবী মনে করেন নবম শতাব্দি পর্যন্ত সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাহচর্যে যেমন করে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা অপবিত্র

হয়ে গিয়েছিল বর্তমান শতকের চল্লিশ দশক হতে ষাটের দশক পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানীদের সাহচর্যে থেকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিও অপবিত্র হয়ে গেছে।

সুতরাং তারা মনে করেন, দুই কারণে এখনও পশ্চিম বঙ্গিয় সংস্কৃতিই একমাত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃতি। প্রথম কারণ, তথাকার সাংস্কৃতিজীবীরা কান্য কুবজের মত স্বজাতিয় পরিমন্ডলে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করেছেন বলে তারা বিশুদ্ধ সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ, বাবুরা পশ্চিম বঙ্গে যাওয়ার সময় সাংস্কৃতিক সকল শিকড় বাকড়ও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে এখন সেদেশেই বিশুদ্ধ সংস্কৃতির চাষ হচ্ছে বলে আমাদের দেশের কিছু সংস্কৃতিজীবী মনে করেন। এ কারণেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের ডাকতে হয়। ডাকতে ডাকতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, এখন না ডাকলেও তারা নিজের যজমান মনে করে, নিজ বাড়ী মনে করে রেবাটের মত নিজ থেকেই চলে আসেন। এই যে যখন তখন নিজে থেকে চলে আসেন চলে যান তারও একটা পূর্ব কথা রয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলে ভাষার স্বাতন্ত্র ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তদ্বারা প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তানী বিতাড়নের উপলক্ষ্যই তৈরি হয়েছিল।

পাকিস্তানীদের বিতাড়নের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গিয় বাবুরা বিমান, বোমা ও কামান নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সেই সাহায্যের বিনিময়ে তারা একাত্তরের ডিসেম্বরে আমাদের অরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট হতে হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্র সস্ত্র গোলা বারুদ, আমাদের গৃহস্থ বাড়ী সমূহ হতে হানাদার বাহিনীর লুট করা শত শত মন সোনা গয়না, সেনানিবাস অঞ্চলের বাড়ী ঘরের লাইট, ফ্যান, আসবাবপত্র বাথরুম ফিটিংস পর্যন্ত ট্রাক বোঝাই করে ভারতে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর বাণিজ্য পাওয়ার নামে আমাদের দেশ হতে হাজার হাজার কোটি টাকা আদায় করে নিচ্ছে।

এখন আমাদের সংস্কৃতি বিশুদ্ধিকরণের পালা শুরু হয়েছে। এই বিশুদ্ধিকরণের জন্য কান্যকুবজ হতে আদিশুরের ব্রাহ্মণ আমদানীর মত আমাদের দেশের সংস্কৃতির গাধা ও গরুরা পশ্চিম বঙ্গ হতে বাবু আমদানী করা প্রয়োজন বলে মনে করে।

সুতরাং বাবুরাও এখন আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে নিজের যজমান বলে মনে করে নিয়েছেন। তাই তারা যখন তখন আসেন, কবিতা পাঠ করেন, সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং শেষে কখনও বাংলা ভাষার কথা বলেন আবার

কখনও অখন্ড ভারতের মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাকে মন্ত্রপূত করে দিয়ে যান।

বাবুরা চলে যান। পেছনে রেখে যান তাদের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী নামের এক দল সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধী। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যেমন পথ চলতে গিয়ে হেলে দুলে অন্যের গায়ে পড়ে, বলতে গিয়ে আবোল তাবোল বকে, এই সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধী বুদ্ধিজীবীরাও সংস্কৃতি চর্চার নামে অন্যের মন মানসিকতাকে আহত করে সংস্কৃতি চর্চার নামে কোন্দল কলহ সৃষ্টি করে। কবিতা উৎসব বা সঙ্গীত সন্ধ্যার নামে কখনও মাদারীর খেলা, গাজী কালুর পটুয়াদের মত পটকীর্তন করেন, আবার কখনও আবদুল জব্বারের বলিখেলা প্রদর্শন করেন।

সুতরাং এই প্রতিবন্ধীরা শিল্পের নামে সঙ্গীতের নামে সাহিত্যের নামে এমন সব দুষ্কর্ম করে থাকেন যা মানুষের সুকুমার বৃত্তি গুলিকে উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, ক্রোধে, দ্বন্দ্বে, ভারাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু তাতে ওদের কিছু যায় আসে না।

ওরা শুধু বাবু সংস্কৃতির রেওয়াজ করে আর প্রার্থনা করে হে প্রভু, আমার কথায়, কবিতায়, ছন্দে, সূরে এমন বুজরুকী ফুটিয়ে দাও যাতে সেটা সাহিত্য বা কাব্য না হলেও বাবুরা আনন্দিত হয়, আর যাতে আমাকে আনন্দ পুরস্কার দিয়ে দেয়।

অর্থাৎ এশিয়া কবিতা উৎসব পালনের জন্য যখন কলিকাতার কবিদের সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখন এই প্রতিবন্ধীরা ব্যক্তিগত পত্র দ্বারা তাদের আসতে নিষেধ করে। সরকারীভাবে যখন এশিয়া কবিতা উৎসব পালিত হয় তখন তারা ভিন্নভাবে কবিতা উৎসব করে এবং সেই উৎসবে ডকটরেট ডিগ্রী ধারী সংস্কৃতিজীবীরা চরুয়া লাঠিয়ালের মত মারা মারি করে। যেমনঃ

১৯৮৯ সালের ১লা এবং ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের পাশের সড়কে একটি জাতিয় কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২ তারিখের সকালের অধিবেশনে সেমিনারের বিষয় ছিল "বাংলাদেশের কবিতায় প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা"। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নাস্তিক অধ্যাপক।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আর এক পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী নাস্তিক অধ্যাপক এবং ঘটনাচক্রে ইনি সভাপতির আসনে আসীন নাস্তিক

অধ্যাপকেরই ভারশিষ্য এবং একাডেমিক শিষ্য। তার প্রবন্ধটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক নাস্তিকতার দোষে দুষ্ট প্রবন্ধটির প্রচন্ড সমালোচনা করেন।

তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ অধ্যাপক আরও কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুমতি চান। কিন্তু সভার বিধি বহির্ভূত হওয়ায় তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে যান এবং কথা বলার চেষ্টা করেন। এ সময় কয়েকজন কবি সাহিত্যিক তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন তিনি ধাক্কা দিয়ে সকলকে সরিয়ে দেন। তার প্রচন্ড ধাক্কায় একজন খ্যাতিমান কবি ধরাশায়ী হয়ে পড়লে সভায় তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। এ সময় কিছু ছাত্র এসে তাদের ক্ষান্ত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে ভয়ে আতঙ্কে আসন ত্যাগ করে চলে যান।

নাস্তিক অধ্যাপকদের ভাব-সন্ত্রাসের পাশাপাশি শারীরিক সন্ত্রাসের ভয়ে সেদিন বিকেলের অধিবেশনে যেমন বহু দর্শক শ্রোতা আসেননি তেমনি বহু আমন্ত্রিত কবিরাও আসেননি। এই ফাঁকে কিছু অকবি দর্শক অনাহুতভাবে তাদের কবিতা পাঠ করে গেছেন।

আসলে শিল্পী সাহিত্যিকগণ যেদিন থেকে নাস্তিকতার পথ ধরেছেন সেদিন থেকে তাদের মধ্যে ঔদ্বত্ত্য এসেছে, সেদিন থেকে কবি, শিল্পী সাতিহ্যিকগণ মানুষের মনে সুর ও ছন্দের ঝংকার তোলার গুণ হারিয়ে হুঙ্কার ছাড়ায় অভ্যস্ত হয়েছেন।

কি অইল গো নানী

সারা বিশ্ব জোড়া নানা বরণ মানুষ, কিন্তু একই ধরণ রক্ত, মাংস, হাড্ডি মজ্জা, একই আকৃতি-প্রকৃতির চোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অথচ কত না পার্থক্য প্রত্যেকের রঙ চেহারা কণ্ঠস্বর ইত্যাদির। তার উপর আবার ধর্ম, ভাষা, আবহাওয়া, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির প্রভাবে ঐ মানুষের মধ্যে জাতি সত্ত্বাবোধের কত না পার্থক্য, কত না ভিন্ন জাতিতে মানুষ বিভক্ত, কত না নামে তারা পরিচিত।

বাউল কবি তাই গেয়েছেনঃ

নানান বরণ গাভীরে, একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখি একই মায়ের পুত।

মানুষের মুখের ভাষায় শরীরের মত কোন মৌলিক উপাদান নেই। ভাষাটা একটা শিক্ষার এবং অভ্যাসের ব্যাপার মাত্র। তবুও জাতি গঠনে ভাষার ভূমিকা কত না গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ধর্ম। বর্তমান বিশ্বের বর্ণবাদ এবং ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতই প্রমাণ করে যে, ধর্মই জাতি সত্ত্বাবোধের প্রধান উপকরণ।

বাংলাদেশে আমরা হিন্দু-মুসলমান একই সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত হয়েও কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে আমরা কত না ভিন্ন। আবার একজন হিন্দীভাষী হিন্দুর সাথে বাংলাভাষী হিন্দুর অভ্যাসে আচরণে আহার বিহারে যেমন মিল, উর্দুভাষী মুসলমানের সাথে বাংলাভাষী মুসলমানের তেমনি কত না মিল। যে মিলের সূত্রে সুদূর পূর্বাঞ্চলের বাংলাভাষী মুসলমান অধ্যুষিত এই ছোট ভূখন্ডের আমরা সুদূর পশ্চিাঞ্চলের উর্দুভাষী মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানের সাথে গাটছড়া বেঁধেছিলাম।

তবুও আবার ভাষার প্রশ্নে ১৯৫২ সনের আন্দোলন দ্বারা আমাদের ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের উপলক্ষ তৈরী হয়েছিল।

আমাদের ঐ ভাষাপ্রীতি দেখে পশ্চিমবঙ্গীয় বাবুরা ভেবেছিলেন, স্রোতের মায়ায় যেমন নদীর এপার ভাঙ্গে ওপার গড়ে, তেমনি আমরাও বুঝি ভাষার মায়ায় পাকিস্তান ভেঙ্গে এসে পশ্চিম বঙ্গ গড়ব। কারণ, তারা প্রাচীন চর্যাপদের ঐ চরণটি ভুলে গিয়েছিলেন, যেখানে এগারো শত বৎসর পূর্বেকার বৌদ্ধ সহজিয়া কবি গেয়েছিলেন, "দুহিল দুধু কি বেন্টে সামাই।" অর্থাৎ দোয়ানো দুধ কি গাভীর বাটে ফেরৎ ঢুকানো যায়? (চর্যা ঃ ৩৩ পদ)।

তবুও ঐ ভাষার ঐক্যের কারণে বাবুরা আমাদের প্রচুর সাহিত্য পত্রিকা পাঠিয়ে আমাদের শিশুদের গয়া-কাশীর মাহাত্ম শুনান, আমাদের যুবকদের নীল ছবির মাধ্যমে নারীদেহের এনাটমী বা দেহতত্ত্ব শিক্ষা দেন, সঙ্গমের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা বৈঠক শিক্ষা দেন এবং সাথে মদ মারিজুয়াণার পয়গাম পাঠান।

ভাষার ঐক্যের দোহাই দিয়ে আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী বাবুদের নিমন্ত্রণ করে আনেন। তারা এলে আমাদের ঐ বুদ্ধিজীবীরা লাইন লাগিয়ে দেখা করেন, দাদা-দাদা করেন, চাটুকারিতা করেন, বাপ-দাদার আমলের সেই পুরানো অভ্যাসের আজ্ঞে বাবু, আজ্ঞে বাবু, ধরনের খোশামোদ করেন।

বাবুরা নিজের দেশে হিন্দী ভাষায় গল্প গীতি, খাওয়া-পরা, উঠা-বসা করলেও এখানে এসে এমন ঠমক দেখান যেন তারাই বাংলা ভাষার মা-বাপ-গুরুজন এবং সেই সুবাদে আমাদেরও।

তারা ইতিহাস জানেন কিন্তু মানেন না বলেই এমনটি ভাবতে পারছেন। কারণ, যে মুসলমান নৃপতিরা বাংলা ভাষাকে চর্যাপদের আঁতুড়ঘর থেকে টেনে তুলে সংস্কৃতির মাথা ডিঙিয়ে জনগণের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই নৃপতিদের সকলেই বর্তমানের এ বাংলাদেশেরই শাসক ছিলেন, এখানে বসেই তারা সংস্কৃতের উপরে বাংলাভাষার স্থান করে দিয়েছিলেন।

মুসলিম শাসকরা তখন যদি সে কাজটি করে না দিতেন তবে কি বঙ্গদেশ আর কি বাংলাদেশ, কোন দেশের মানুষই আজ বাংলা ভাষায় কথা বলত না। বাঙ্গালী বলে দাবি করার কোন সূত্র খুঁজে পেত না। আমাদের সবাইকে আজ সংস্কৃতভাষী বাবু হয়ে থাকতে হত আর চামার-চন্ডাল, হাড়ি ডোম-কৈবর্তরা হত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। কারণ, সংস্কৃত ভাষা শিকার বা সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করার অধিকার তাদের ছিল না। সে কারণে তারা শিক্ষা দীক্ষার সুযোগও পেত না।

সে যাই হোক। বাবুদের আমন্ত্রণ করে ডেকে এনে এত খোশামোদ করেও আমাদের চাটুকার বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার সংস্কৃতির অঙ্গনে দাওয়াত পান না বা মুরুব্বিয়ানা করার সুযোগ পান না। কারণ, এরা যে অস্পৃশ্য মুসলমান।

কবিতা পাঠের কথা বলে যারা কলকাতা যান তারা সেখানে কোন সঙ্গী বা মেজবানের দেখা কখনও পান না সুতরাং এরা গড়ের মাঠে বসে মংপলি (হিন্দি চীনাবাদাম) খান, মাঠের এক কোণে সরে গিয়ে পেচ্ছাব করেন, নিউ

মার্কেটে গিয়ে কন্যার জন্য শ্যাম্পু আর বউ-এর জন্য বেনারসী কিনে ফিরে আসেন আর ভাবেন কি করলে শুদ্ধি হওয়া যায়।

পূর্বেই বলেছি আদিশূরের প্রেরিত সাত শত অস্পৃশ্য হীন সম্ভব সৈন্য কান্যকুবজে পৌছলে কান্যকুবজের রাজা বীরসিংহ তাদের গোবর খাইয়ে মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুক করে বিশুদ্ধ বানিয়েছিলেন।

আমাদের যেসব বুদ্ধিজীবী কবিতা পাঠের কথা বলে ঢাকা-কলকাতা করেন, তাদের মধ্যে আসলে শুদ্ধি লাভের একটা গোপন বাসনা ক্রিয়াশীল আছে। কলকাতা থেকে এসে তারা যখন দুই বাংলা এক করার জন্য দালালী প্রবন্ধ লেখেন তখন বুঝা যায় যে, তারা শুদ্ধির জন্যই ছুটাছুটি করছেন।

তারা যেহেতু পাকিস্তানীদের সাহচর্যে থেকে বিশুদ্ধতা হারিয়েছেন, সেহেতু তারা পশ্চিমবঙ্গের কোন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে আমন্ত্রিত হন না বা পৌরহিত্য করার দুঃসাহসও করেন না। তারা শুধু কবিতা বগলদাবা করে যান এবং সেখানকার মন্ত্র-তন্ত্রের গুণে বিশুদ্ধ হয়ে জাতে উঠার চেষ্টা করেন। বিশুদ্ধতার পরীক্ষায় পাস করতে পারলে তারা পুরস্কৃত হন।

এই তো সেদিন আমাদের দেশের এক মহিলা বিশুদ্ধতার পরীক্ষা পাস দিয়ে কলকাতা হতে দেড় লক্ষ রূপীর আনন্দ পুরস্কার লাভ করে মহানন্দে ফিরে এলেন। তিনি এসেই আবেগে উত্তেজনায় গদগদ হয়ে বলে ফেলেছেন, বাংলাদেশের কবি- সাহিত্যিকদের পশ্চিম বঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের সমান হতে দেড়শ' বছর লাগবে।

তিনি আরও বললেন, "রুচিহীন পরনিন্দা ও নীচতা সব জায়গায় কম-বেশী থাকে। তবে এপার বাংলায় এসব এত বেশী যে, সে তুলনায় পশ্চিম বঙ্গীয়দের আমার কাছে অনেক বেশী ভদ্র, সংযত শিক্ষিত মনে হয়েছে। এটা হবার আরও এক কারণ আছে, ওরা অনেককালের শিক্ষিত আর বাঙ্গালী মুসলমান অল্পকালের শিক্ষিত।" (সাপ্তাহিক কাগজ, ৯-৭-৯২, পৃঃ ১৩)

পাঠক দেখলেন, তো, পশ্চিমবঙ্গীয় শুদ্ধির কি গুণ। শুধু কি শুদ্ধি? শুদ্ধির নামে তাদের মগজে এমন সব ইতরামির বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং এমন সব কলা ও মুলার লোভ দ্বারা তাদের সম্মোহিত করে দেওয়া হয় যে, তারা ফিরে এসে বাপ-দাদার নাম চেহারা সব ভুলে যায়। তাদের কাছে এদেশের সবকিছু নতুন নতুন খাট্টা খোট্টা মনে হয়।

দেশে ফিরে এসে এরা যখন দেখে নামাযের সময় হলে রেডিও-টিভিতে পর্যন্ত আযান হয়, তখন ব্রাহ্মণের গায়ে গো-মাংস লাগলে তার যেমন অবস্থা হয় এদেরও তেমনি অবস্থা হয়। ব্রাহ্মণকে শুদ্ধ হওয়ার জন্য গঙ্গাস্নানে যেতে

হয়, কিন্তু এরা তো ধারে কাছে গঙ্গা পায় না, তাই এরা মনের ঝাল ঝাড়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গঙ্গা টিএসসিতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা সরকারের কাছে রেডিও-টিভির আযান বন্ধের দাবী জানায়- অনেকটা ভারতীয় জনসংঘ কর্তাদের মত। তারাও আযান বন্ধের হুকুম জারি করে, মসজিদ ভাঙ্গার দাবি জানায়। এপারের কিছু 'মুসলমানের' মানসিকতার সাথে ওপারের হিন্দুর মানসিকতার কি সুন্দর মিল।

ভারতীয় জনসংঘের পূর্বাঞ্চল সোস্যাল সার্ভিস সেকশনের কমকর্তা ডিডি আগরওয়াল কোলকাতার ৩২নং টালিগঞ্জ মসজিদের আযানের শব্দে বিরক্ত হয়ে ২২ মে, ১৯৮৮ সনে ঐ মসজিদের ইমাম সাহেবকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিটির হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপঃ

"জনাব! আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের জানিয়েছেন যে, আপনি মসজিদের মিনারে মাইক লাগিয়েছেন এবং বার বার আযান দেওয়ার কাজে এটাকে ব্যবহার করছেন। ফলে, শব্দদূষণ এবং উপদ্রবের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে শান্তিপ্রিয় স্থানীয় লোকদের অসুবিধা হচ্ছে। না পারছে ছাত্ররা তাদের পড়াশুনা করতে আর না পারছে রোগীরা শান্তিপূর্ণ এবং নিরূপদ্রব পরিবেশে দিন যাপন করতে। লেখক ও চাকুরীজীবীদেরও নিজ নিজ কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্ত কাজের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দরকার এবং শব্দদূষণের কারণে সাধারণ মানুষেরও কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

আপনার জানা উচিত যে, কলিকাতা সুবারবান পুলিশ এ্যাক্ট-১৮৬৬ এবং কলিকাতা পুলিশ এ্যাক্ট-১৮৬৬ অনুসারে মাইক ব্যবহারের মত উল্লিখিত দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং ঐ ধরনের অপরাধ ভারতীয় পেনাল কোর্ড অনুসারেও শাস্তিযোগ্য।

আপনি ঐ ধরনের কাজ করার জন্য পুলিশের অনুমতি পাননি। ঐ ধরনের কাজের জন্য পুলিশের অনুমতি কোন কোন সময় পাওয়া যায়, সব সময় নয়।

জনসাধারণের স্বার্থে ঐ উপদ্রব অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। যে কোন সময় মাইক ব্যবহার এবং স্থানীয় শান্তিপ্রিয় লোকদের বিরক্ত করা কোন ধর্মীয় অধিকারের আওতায় পড়ে না। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্রের একটি প্রতিলিপি নিউ আলিপুরের ওসির কাছে পাঠাচ্ছি।

"আপনার বিশ্বস্ত ডিডি আগরওয়াল
জেনারেল সেক্রেটারী ইষ্টার্ন জোন।"

পাঠক, লক্ষ্য করে দেখুন, জঙ্গী হিন্দুদের ঐ পত্রটিতে কোথাও আযানকে খারাপ বলা হয়নি বা আযান বন্ধের দাবি জানানো হয়নি। ওদের পুরো অভিযোগটি হচ্ছে মাইকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের দ্বারা শুদ্ধিকৃত আমাদের এদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা তাদের চেয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে। তাদের কেউ আযান বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে, আবার কেউ বলেছে আযান বড় বিরক্তিকর। আযানকে ভ্রুকুটি করে এদের কেউ কেউ কবিতাও লিখেছেন।

অনেকদিন আগের কথা। ১৯৪৮ ইং আমি তখন চাঁদপুর কলেজের ছাত্র। আমাদের পাশের বাসার ভদ্রলোকের একটা কাজের লোক ছিল। বয়স চব্বিশ/পঁচিশ হবে, নাম হাবিবুর রহমান। কিন্তু অত্যন্ত হাবা-গোবা হওয়ার কারণে সবাই তাকে হাবু বা হাবিব না ডেকে হাবা বলেই ডাকত। উল্টা-পাল্টা কাজ করার কারণে এমন দিন নেই, যেদিন সে অন্ততঃ দু'বার মালিকের মার খায়নি। এ কারণে সে সব সময়ই বিমর্ষ থাকত এবং তার সাহেবকে দেখলে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত বলে মনে হত।

একদিন আমি কলেজ থেকে ফিরছি। বাসার কাছে আসতেই হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে সে আমার পাশে পাশে হাটতে চেষ্টা করছে আর খুশীর সাথে কি যেন বলতে চেষ্টা করছে।

আমি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সে বলল, ভাইয়া, আজকে আমাদের সাহেব না, আমাকে যা আদর করল। আমাকে কান ধরে টেনে কাছে নিয়ে বলল, 'শালার শালা, মন দিয়ে কাজ করিস' এই বলে হাবা তিড়িং বিড়িং করে খুশীর নাচ নাচতে নাচতে অন্যদিকে চলে গেল।

বাবুদের দ্বারা শুদ্ধিকৃত এবং আনন্দ পুরস্কারে পুরস্কৃত এ মহিলার অবস্থাও ঐ হাবার মতই হয়েছে। ঐ মহিলার এই দেশের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। তাই সে দুই বাংলা এক হওয়ার দাবি জানিয়ে বলতে পেরেছে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ না হয় একটা ভুলই করেছে, এক টুকরা কাগজের মত দেশটাকে ছিঁড়ে দু'টুকরা করে ফেলেছে, তাই বলে তাকে জোড়া লাগানো যাবে না কেন?

জিন্না সাহেব যে বঙ্গদেশটাকে দু'ভাগ করেনি, ইতিহাসজ্ঞান বঞ্চিত ঐ মহিলা তা জানে না। ১৯৪৭ সনে মুসলমানদের ঠকানোর জন্যই যে হিন্দুরা বঙ্গদেশ ভাগ করে নিয়েছিল ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। তবে হ্যাঁ, মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী-বাকুরীর ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯০৫ সনে একবার বঙ্গদেশকে ভাগ করিয়ে নিয়েছিল। চাকুরী-বাকুরী,

ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানেরা উন্নত হয়ে যাবে দেখে হিন্দুরা ঐ বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়েছিল। হিন্দুরা তখন জান দিতেও প্রস্তুত ছিল তবুও তারা তাদের বঙ্গমাতাকে দ্বিখন্ডিত হতে দিবে না বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল। সে সময়কার রাজনীতিতে, কুটনীতিতে, সাহিত্যে, সঙ্গিতে কাব্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এ সময়ই রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" তদ্বারা ইংরেজ সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন- বঙ্গদেশ অবিভাজ্য। সুতরাং ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়েছিলেন। যে হিন্দুরা তখন বঙ্গভঙ্গ রদ করতে এত আন্দোলন করেছিল তারাই ১৯৪৭ সনে বঙ্গভঙ্গ করেছিল। আর যে গান গেয়ে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করে মুসলমানদের ঠকিয়েছিল সেই গানই আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় মুসলমানদের মনে চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্যের যে খানিকটা আশার আলো দেখা দিয়েছিল, রদ হওয়ায় তা অন্তর্হিত হয়ে গেল।- দুঃখ-বেদনায় যখন মুসলমানরা মুহ্যমান, তখন হিন্দুরা–মুসলমানদের বিদ্রুপ-ব্যঙ্গ করার জন্য কাব্য রচনা করেছে, ছড়া রচনা করে পত্রিকায় ছাপিয়েছে। যেমন–

"হায়, কি অইল গো নানী,
লাট বাহাদুর আশা দিছিল
কৈরা মেহেরবানী
দারগগিরি চাকরি দিব
বিলাতি মেম শাদী দিব
এহন দেহি হায় নসিবের
সানকি ধোয়া পানি।"

সে সময় মুসলমানরা বঙ্গদেশকে ভেঙ্গেছে, হিন্দুরা জোড়া লাগিয়েছে। এখন হিন্দুরা ভেঙ্গেছে মুসলমানদের জোড়া লাগাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশ যুক্ত হবে না কখনও, বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করতে হলে পশ্চিমবঙ্গকেই বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তারা হিন্দী হয়ে গেল বলে।

যারা কলকাতা হতে বাবু এনে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির পৌরহিত্য করান তারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশীদের মধ্যে ভারতপ্রীতি গড়ে তুলে পরিণামে ভারতভুক্তির ধীর-ক্রিয় মানসিকতা সৃষ্টিরই প্রয়াস পাচ্ছে।

ঐসব আহম্মকেরা জানে না যে, ভারতীয়রা বাংলাদেশটি চাইতে পারে, সুযোগ পেলে নিতেও পারে, কিন্তু বাংলাদেশীদের না। ঐ ইতরেরা শুনে না

যে কট্টর এবং জঙ্গী হিন্দু সংগঠন শিবসেনার নেতা বাল ঠক্কর বলছে। "আমরা অনেক সহ্য করেছি, এবার মুসলমানদের একটা শিক্ষা দিতে চাই। তারা এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইলে যেতে দিন। তারা যদি না যেতে চায় তবে লাথি মেরে বের করে দিন।"

সুতরাং যারা দুই বাংলা এক হওয়ার কথা বলে, যারা ভারতভুক্তির খায়েশ পোষণ করে তাদের লাথি মেরে ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে দেখুন- একটা লং কিক খেয়ে কি করে আবার ফুটবলের মত এপারের মাঠে এসে পড়ে। অবশ্য তাতেও তাদের শিক্ষা হবে না। কারণ, ইতর মানুষেরা বংশ পরম্পরায় লাথি ঝাঁটা খেয়ে এমনিভাবে অভ্যস্ত হয়ে থাকে যে, লাথি-ঝাটা না খেলে এদের পেটের ভাত হজম হয় না।

আর ঐ যে মহিলা বাংলাদেশের ভারতভুক্তির জন্য নানা যুক্তি দিয়ে চলেছেন, তাকে গলাধাক্কা দিয়ে ঐ বাংলায় ঠেলে দিয়ে দেখতে পারেন, দেখবেন বেশী দূর যেতে পারবে না। সীমান্ত পার হওয়ামাত্র ভারতীয় ব্রাহ্মণ সেনা দ্বারা নারীত্ব-সতীত্ব হারিয়ে, ধর্ষিতা হয়ে, গর্ভধারণ করে কিক ব্যাক হয়ে আসবে। শেষে এক সময় এদেশের মাটিতে ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রসব করে এদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়ে নিজ মতবাদের সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। ব্রাহ্মণসংখ্যা বৃদ্ধির এ পদ্ধতি আদিশূরের আমলেই প্রচলিত হয়েছিল।

যেমন পূর্বেই বলেছি যে, আদিশূর কান্যকুবজ হতে মাত্র পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। এরাই ছিলেন বাংলাদেশের একমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ। এদের কাছে কন্যার বিয়ে দিয়ে সন্তান উৎপাদন দ্বারা কৌলীণ্য লাভের জন্য এদেশের হিন্দু সমাজে তখন সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এক একজন কূলীন ব্রাহ্মণ, শতদ্বার গ্রহণ করেও তার নিস্তার ছিলো না।

বেচারা ব্রাহ্মণকে একহাতে যখন যম টানছে, তখনও অন্যহাত কন্যার বাবা টানছে তার মেয়েটিকে বিয়ে করে কুলে তোলার জন্য। ব্রাহ্মণেরাও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। তারা বাড়তি আয় ও নিত্য নতুন তরুণী ভার্যার লোভে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভ্রমরের মত ঘুরে ঘুরে গুণগুণ করে নিজ পরিচয় ব্যক্ত করতেন। অমনি কন্যার পিতারা লাইন লাগাতেন– বিয়েও হয়ে যেত।

বাসরশয্যার ফুলের গন্ধ শুকাতে না শুকাতেই ব্রাহ্মণটি আবার নতুন ফুলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন। এমনি করে ব্রাহ্মণেরা বছরের পর বছর একদিকে স্ত্রী গ্রহণ করতে এবং অপরদিকে স্ত্রী ফেলে যেতে লাগলেন। এসব

স্ত্রীরা জীবনে হয়তো দ্বিতীয়বারের মতো আর কোনদিনই স্বামীটির দেখা পেতেন না।

তাতেও তাদের কোন খেদ ছিল না। কারণ, একটি মেয়ের জীবন ও যৌবনের মূল্যে, স্বামীবঞ্চনার মূল্যে একটি কূলীন সন্তান লাভ দ্বারা একটি বংশের জাতে উঠতে পারা বা কুলীন হতে পারাকে তারা বড় পাওয়া মনে করত।

আমাদের দেশের যারা পশ্চিমবঙ্গীয় বাবু এনে শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠান করেন তারা কি মনে করেন ঐসব বাবুরা আমাদের দেড়শ বছরের পথ দেড় বছরে এগিয়ে দিয়ে যাবে? এক বাবু একবার বলেছেন, তিনি নাকি এদেশের মেয়েদের টানেই বার বার আসেন।

তবে কি ঐ যে কিছু মহিলা, যারা বাবুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কৌলীণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা কি চান বাবুরা এদেশে এসে কুলীন সংস্কৃতিবিদের বংশ বিস্তার করার চেষ্টা করুক? অথবা এ কারণেই কি আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেই বাবুদের কাছে বোন বা কন্যার বিয়ে দিয়েছেন? এই উদ্দেশ্যেই কি এদেশের কোন কোন বুদ্ধিজীবী যুবতী মহিলা ঘন ঘন একা, একা কলিকাতা আসা-যাওয়া করেন? এইডস মহামারীতে আক্রান্ত ভারত ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এলে দেশের মোহমুগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা কিছুদিনের জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করতে ভয় পান।

আন্টা ঘর

ঢাকার পুরান শহরে বর্তমানে যে বাহাদুর শাহ পার্ক, প্রাচীন কালে তার নাম ছিল আন্টাঘর ময়দান। এক সময় এটি আর্মেনীয়দের ফুর্তি করার জায়গা ছিল, পরে ইংরেজরা ফাঁসী ময়দান হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর্মেনীয়রা এখানে বাঘ নিয়ে খেলেছে, ইংরেজরা এখানে মানুষের মাথা নিয়ে খেলেছে। এখনও সেই ময়দান আছে, এখনও তাতে নানা খেলা হয়, কিন্তু সে ভিন্ন ধরনের ভিন্ন মনের, ভিন্ন মানসিকতার খেলা। পাঠকের সুবিধার জন্য একটু খুলেই বলছি।

বৃটিশ আমলের পূর্বে আন্টাঘর ময়দানটি আর্মেনীয়দের বিলিয়ার্ড খেলার ক্লাবঘর ছিল। আর্মেনীয়দের বেশীর ভাগ মানুষ বসবাস করত আর্মানীটোলায়, আর খেলতে আসত আন্টাঘরে। এটি ছিল একটি ছায়া ঢাকা আম বাগান। তার নীচে ছিল একটি ছোট ঘর। এ ঘরটিতে তারা বিলিয়ার্ড খেলত।

বাংলার মানুষ জীবনে কোনদিন বিলিয়ার্ড খেলা দেখেনি। তারা দলে দলে এ খেলা দেখতে এসে দেখতে পেত বেশ বড় একটা টেবিলের উপর একটা আন্ডা রেখে সাহেবরা একটা লম্বা লাঠি দিয়ে তাকে খোচা দিচ্ছে। অমনি আন্ডাটা টেবিলের এমাথা হতে সে মাথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিন্তু ভাঙ্গছে না। সেকালে ঢাকার হিন্দু-মুসলিম সবাই ডিমকে আন্ডা বলত এবং সাধারণ মানুষেরা বলত আন্টা। সুতরাং সাধারণ মানুষের ভাষায় ঐ ক্লাব ঘরটিরও নাম হয়ে যায় আন্টাঘর।

আর্মেনীয়দের এ ক্লাব ঘরের ময়দানটিতে ইংরেজরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী সিপাহীদের এবং যেসব বাড়িতে সিপাহীরা আশ্রয় নিয়েছিল সেসব বাড়ীওয়ালাদের ধরে এনে এখানকার আম গাছে ফাঁসী দিয়ে মানুষকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত লাশ ঝুলিয়ে রাখত, যাতে বাঙ্গালীরা আর কোনদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস না পায়।

১৮৫৮ সালের ৫ই নভেম্বর (মতান্তরে ১লা নভেম্বর) এ আন্টাঘর ময়দানে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের হাজার চারেক গণ্যমান্য বাবু ও মিয়া সাহেবরা তাতে উপস্থিত ছিলেন। বন্দুকের আওয়াজ ও তোপধ্বনির মাধ্যমে ঐ সুধী সমাজের সামনে ইংরেজী ভাষায় এক ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ঐ ঘোষণার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের মহারানী কর্তৃক কোম্পানীর নিকট হতে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করা হয়। সেদিন হতে ঐ আন্টাঘর

ময়দানের নামকরণ হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক। কারণ, ইংল্যান্ডের তখনকার মহারানীর নাম ছিল ভিক্টোরিয়া। পাকিস্তান আমলে চারপাশের রাস্তা বাড়ানোর জন্য পার্কটিকে ছোট করে সেই ঐতিহাসিক আমগাছগুলো কেটে ফেলা হয় আর দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাটের নামে পার্কটির নামকরণ করা হয় বাহাদুরশাহ পার্ক নামে।

একই স্থানের যেমন তিনটি নাম, তেমনি অবয়বে, প্রকৃতিতে ক্রিয়াকর্মে এবং তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় যেখানে বাঙ্গালীর ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে, এখন সেখানে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী মানুষের ভাগ্য গণনা করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ ভোজবাজি দেখায়, কেউ চীনাবাদাম বিক্রি করে, আবার মাঝে মধ্যে চিন্তা-চেতনাকে নাড়া দেওয়ার মত কিছু ঘটনাও ঘটে।

সেদিন শীর্ণকায় এক পাগলের আবির্ভাব ঘটেছিল ওখানে। তার পরনে ধুতি, গায়ে হাটু পর্যন্ত লম্বা একটা অষ্টাদশ শতকী জীর্ণশীর্ণ সার্ট, হাতে একটা শঙ্খ। পার্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শঙ্খটিতে কয়েকবার ফুঁ দিল। তারপর আকাশের দিকে দু'হাত মেলে ধরে বিড়বিড় করে যেন দেবতাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করল। ভাবখানা এমন যেন, এ পার্কটি তার বনেদি ঐতিহ্য হারিয়ে রিক্ত হয়ে পড়েছে। এখন দেবতাদের কাছে সে হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক চিক করছিল। অনেকক্ষণ পর শ্রান্ত-ক্লান্ত ও নিরাশ হয়েই যেন সে হাত নামিয়ে স্লথ গতিতে পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আসলে পাগলটি কি চাইছিল? সে কি চাইছিল যে, আবার আর্মেনীয়রা এখানে এসে বিলিয়ার্ড খেলুক অথবা ইংরেজরা আবার এখানে বাঙ্গালীদের ফাঁসী দিক? অথবা রানী ভিক্টোরিয়া আবার শাসনভার গ্রহণ করুক? শিল্পকলা একাডেমীতে যারা অনুষ্ঠান করে তাদের সাথে বাহাদুরশাহ পার্কের ঐ পাগলের কোন নীতিগত পার্থক্য নেই। একমাত্র পার্থক্য এই যে, ঐ পাগলটি বাহাদুরশাহ পার্কে শঙ্খ বাজিয়ে পাগলামি করেছে আর এরা শিল্পকলা একাডেমীতে মঙ্গল প্রদীপ আর কাসর ঘন্টা বাজিয়ে পাগলামি করে।

মঙ্গল প্রদীপওয়ালারা নাকি বাংলার আদি এবং অকৃত্রিম সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চায়, সংস্কৃতির শিকড় বাকড় উদ্ধার করতে চায়। কারণ, সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠালগ্নে আদিশুর যেমন মনে করেছিলেন ১৫০০ বছর বৌদ্ধদের সহবাসে থাকায় এ দেশের সকল ব্রাহ্মণের জাতি ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, স্যার উইলিয়াম ক্যারী যেমন মনে করেছিলেন, মুসলমানী ভাষার

সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষার জাতি-ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এরাও তেমনি মনে করে ১২০০ সন হতে শুরু করে সাত শত বছর মুসলমানের সহবাসে থাকার কারণে এদেশের সংস্কৃতিরও জাতি-ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা সংস্কার করার প্রয়াস হিসাবেই তারা কাসর ঘন্টা আর মঙ্গল প্রদীপের প্রচলন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যাতে কাসর ঘন্টা আর দেবদাসীদের কলকাকলীতে সকল গৃহস্ত বাড়ীর মন্দিরগুলো আবার মুখরিত হয়ে উঠে।

একথা সবারই জানা আছে যে, কাসর ঘন্টা এবং মঙ্গল প্রদীপ এ উভয়টিই দেব মন্দিরে ব্যবহার্য সাংস্কৃতিক উপচার। তার প্রত্যেকাটির পেছনেই এমন সব দেব কাহিনী রয়েছে, যা যথেষ্টভাবে অশ্লীল এবং লজ্জাজনক হলেও বেদ ও পুরানে এসব কাহিনী আছে এবং হিন্দুর উৎসব পর্বগুলো তারই ভিত্তিতে আচরিত হয়ে থাকে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোক অত্যন্ত ঘৃণ্য জীব। মনু সংহিতার ৯ম অধ্যায় ১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে– "স্ত্রীরা পুরুষের সৌন্দর্য বিচার করে না, যুবক কি বৃদ্ধ তাও দেখে না। সুরূপ হোক বা কুরূপ হোক, পুরুষ পেলেই তার সাথে সম্ভোগের জন্য লালায়িত হয়।"

আবার স্কন্ধ পুরানের নাগর খন্ডে ৬০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে "নারী জাতির অধরে পীযুষ এবং হৃদয়ে হলাহল পূর্ণ। সুতরাং তাদের অধর আস্বাদন করা এবং হৃদয় পীড়ন করা কর্তব্য।"

উক্ত ধর্মীয় বিধানের কারণেই কুমারী হিন্দু মেয়েদের মন্দিরের সেবাদাসী বা দেবদাসী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে এবং তারা শেষ পর্যন্ত সেবায়েৎ, মোহন্ত, পুরোহিতদের লালসার বস্তুতে পরিণত হয়। সতীদাহ প্রথানুযায়ী বিধবা স্ত্রীকে যখন স্বামীর চিতায় তোলা হয়, তখন তার মর্মন্তুদ আর্তচিৎকার যাতে বাইরে শুনা না যায়, তজ্জন্য জোরে জোরে বাদ্য বাজানো হয়। ঠিক তেমনি মন্দিরের কুমারী সেবাদাসীদের উপর সেবায়েৎরা বলাৎকার করার সময় যাতে ঐ মেয়েটির আর্তনাদ বাইরে শুনা না যায়, তজ্জন্য মন্দিরে জোরে জোরে কাসর ঘন্টা বাজানো হত। এখনও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এ সেবাদাসী বা দেবদাসী প্রথা প্রচলিত আছে এবং মন্দিরের কাসর ঘন্টা পূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বৈদিক সংস্কৃতিতে ঐ ধরনের যৌন নিষ্ঠুরতার এবং অশ্লীলতার বহু ইতিহাস রয়েছে।

শিব পুরাণ, মার্কন্ডেয় পুরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা দুর্গার সাথে সঙ্গমকালে শিব এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাতে

দুর্গার প্রাণনাশের উপক্রম হয়। দুর্গা তখন মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভুত হয়ে নিজ হস্তস্থিত সুদর্শন চক্রধারা আঘাত করলে উভয়ের সংযুক্ত যৌনাঙ্গ কেটে আসে। ঐ সংযুক্ত যৌনাঙ্গের মিলিত সংস্করণের নাম বানলিঙ্গ বা শিবলিঙ্ক যা হিন্দু সমাজের একটি প্রধান পূজ্য বস্তু এবং ঐ শিবলিঙ্গের পূজার জন্য বহু বড় বড় শিব মন্দির গড়ে উঠেছে। মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে কাসর ঘন্টা বাজিয়ে হিন্দু সমাজ মহা সমারোহে ঐ শিবলিঙ্গ পূজা করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণশ্বরে শিবের যৌন সঙ্গমের অবস্থান প্রদর্শনের জন্য পর পর বারোটি মন্দির রয়েছে। ঐ মন্দির গুলিতে সঙ্গমকালীন সময়ের বার রকমের প্রমত্তাবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে প্রতিদিন হাজার হাজার মহিলা দর্শনার্থীর সমাগম হয়। সেখানে পুরুষ খুবই কম যেতে দেখেছি।

রাধা কৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরানে বর্ণিত আছে ব্রহ্মা বলছেন, "হে বৎস। আমার আজ্ঞানুসারে আমার নিয়োজিত কার্য করিতে উদযুক্ত হও। জগদ্বিধাতা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধা কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে দেবী রাধিকা সহাস্যবদনে সকটাক্ষ নেত্রে কৃষ্ণের রদনমন্ডল বারংবার দর্শন করতঃ লজ্জায় মুখ আচ্ছাদন করিলেন। অত্যন্ত কামবানে পীড়িত হওয়াতে রাধিকার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তখন তিনি ভক্তিপূর্বক কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ তাহার শয়নাগারে গমন করিয়া কস্তুরী কুঙ্কুম মিশ্রিত চন্দন ও অগুরুর পঙ্ক কৃষ্ণের বক্ষে বিলেপন করিলেন এবং স্বয়ং কপালে তিলক ধারণ করিলেন।

তৎপর কৃষ্ণ রাধিকার কর ধারণ করিয়া স্ত্রীয় বক্ষে স্থাপন করতঃ চতুর্বিধ চুম্বনপূর্বক তাহার বস্ত্র শিথিল করিলেন। হে সুমে। রতিযুদ্ধে ক্ষুদ্র ঘন্টিকা সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইল, চুম্বনে ওষ্ঠরাগ, আলিঙ্গণে চিত্রিত পত্রাবলী, শৃঙ্গারে কবরী ও সিন্দুর তিলক এবং বিপরীত বিহারে অলঙ্কাঙ্গুর প্রভৃতি দূরীভূত হইল। রাধিকার সরসঙ্গম বশে সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তিনি মুর্ছিতা প্রায় হইলেন। তার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিল না। কামশাস্ত্র পারদর্শি কৃষ্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা রাধিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করতঃ অষ্টবিধ শৃঙ্গার করিলেন, পূনর্বার সেই বক্রলোচনা রাধিকাকে আকর্ষণ করিয়া হস্ত ও নখ দ্বারা সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন, (মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস পৃঃ ১১৪।)

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় এবং সারা রাতভর যৌন নিপীড়নের কারণে প্রভাতকাল দেখা গেল রাধিকার পরিহিত বস্ত্র এত বেশী রক্তরঞ্জিত হয়ে পড়েছে যে, লোকলজ্জায় রাধিকা ঘরের বাইরে আসতে

পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন দোল পূজার ঘোষণা দিয়ে হোলি খেলার আদেশ দেন। সবাই সবাইকে রঙ দ্বারা রঞ্জিত করতে শুরু করে। তাতে রাধিকার বস্ত্রের রক্তের দাগ রঙের আড়ালে ঢেকে যায়। আজও হিন্দু সমাজ কাসর ঘন্টা বাজিয়ে দোল পূজা করে থাকে এবং রঙ দ্বারা সেই হোলি খেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠে।

শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু রাধিকার সাথেই যৌনলীলা করেছেন তা নয়। একদিন শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলসী দেবীকে দেখে তিনি কামোত্তেজিত হয়ে পড়েন। দেবী তখন যৌন ক্রিয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না বা কৃষ্ণ তাকে শৃঙ্গারের ভাষা বা ভাব নিবেদন করেননি। সুতরাং নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায়ই কৃষ্ণ তুলসী দেবীর উপর যৌন আক্রমণ করে বসেন। ধর্ষিতা হয়ে তুলসী দেবী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিলে তিনি গোলাকার পাথরে পরিণত হয়ে যান। শালিগ্রাম নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়ে যায় শালগ্রাম শিলা।

কৃষ্ণ পাথরে পরিণত হয়েছে দেখে তুলসী দেবী দেবতাদের ভয়ে ভীতি হয়ে নিজেকে তুলসী গাছে রূপান্তরিত করে ঐ পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। পরে দেবতাগণ সব ঘটনা জানতে পেরে আদেশ করেন যে, প্রত্যহ পূজার সময় এই শিলার বুকে এবং পিঠে তুলসী পাতা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবানের পূজা সিদ্ধ হবে না। (স্কন্ধ পুরান নাগর খন্ড, দেবী ভগবত নবম স্কন্ধ)।

সুতরাং আজও হিন্দু সমাজ সান্ধ্য পূজার সময় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা করতে গিয়ে চন্দনের সাহায্যে শিলাটির উপরে ও নীচে তুলসী পাতা সংযুক্ত করে থাকেন এবং প্রদীপটি সেখানে রেখে আসেন। এমনি করে হিন্দু সমাজ যৌন মানসিকতাকে নিজেদের অন্তরে চির জাগ্রত করে রাখার ব্যবস্থা করেছে।

নির্দিষ্ট মন্দির ছাড়া হিন্দুর কোন পূজাই সম্পন্ন হয় না। শিব মন্দির, কালী মন্দির, চন্ডির মন্দির ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা হয়ে থাকে এবং এ কারণে কাসর ঘন্টা আর মঙ্গল প্রদীপও ঐসব পূজা মন্দিরেরই সংশ্লিষ্ট উপচার। এই প্রেক্ষিতে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে ঐ পূজার উপচার কি করে ব্যবহৃত হতে পারে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শিল্পকলা একাডেমী তো কোন মন্দির নয়। এখানে কোনকালেই কোন দেবতার আগমন ঘটেনি বা এখানে কান্যকুবজীয় কোন কুলীন ব্রাহ্মণ

পুরোহিতেরও নিয়োগ নেই বা নিবাস নেই। তবুও যারা ব্রাহ্মণ না হয়েও শিল্পকলা একাডেমীতে পূজার উপচার সহযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরে অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।

তারা চায় শিল্পের নামে, অভিনয়ের নামে, সংস্কৃতির নামে আবার সেই রাধা কৃষ্ণের লীলা খেলার পাশবিক প্রবৃত্তি পুনরুজ্জীবিত হোক, তাই শিল্পকলা একাডেমীতে কাসর ঘন্টা বাজিয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করা হয়, বাংলা একাডেমীর বই মেলায় নারী নিপীড়ন দ্বারা বৃন্দাবনী রাশলীলার অনুশীলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'র‍্যাগ ডে' উপলক্ষে হোলির রঙ ছিটিয়ে বৃন্দাবনী কায়দায় মেয়েদের উপর বলাৎকার করা হয় এবং লীলা খেলা করা হয়।

এদের জানা উচিত যে, মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিঘ্ন ও নিরূপদ্রব করার জন্যই ১৯৪৭ সালে এই দেশটির জন্ম হয়েছিল এবং ১৯৭১ সনে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুদের দেবীর যৌন ঘটনাভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চার জন্য এ দেশের শিল্পকলা একাডেমী বা টিএসসি প্রতিষ্ঠা করেনি। যেমন এক কালের আন্টাঘর ময়দান, পরবর্তীকালের ভিক্টোরিয়া পার্ক আর কোনদিন ঐ সব নাম ধারণ করবে না। সেই পার্কটিকে চিরদিনের জন্যই বাহাদুর শাহ পার্ক করে দেওয়া হয়েছে। এই নামেই এই পার্ক বেঁচে থাকবে।

বাচাল ভাষণ

(সাম্প্রদায়িকতা)

আজকাল ভারতে যে ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়, পাকিস্তান আমলেও তেমনটি হত। ভারতের ঐ দাঙ্গার জবাবে অনতিবিলম্বে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানেও প্রতিশোধমূলক দাঙ্গা সংগঠিত হত। তখন পাকিস্তান দিত ভারতের দোষ আর ভারত দিত পাকিস্তানের দোষ। এই প্রতিশোধমূলকতার ভয়ে ভারতের দাঙ্গা তখন কিছুটা হলেও কম ছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে আর কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়নি বা কোন হিন্দুহত্যা হয়নি। কিন্তু তার জন্য ভারতের মুসলমান হত্যা বন্ধ হয়নি, বরঞ্চ বেড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতের উগ্রপন্থী হিন্দুরা তাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে প্রতিনিয়ত মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের রক্তে গোসল করায়। কারণ তারা জানে ঐ দাঙ্গার জবাবে শান্তিপ্রিয় ইসলাম ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশীরা হিন্দুহত্যা করবে না। আর পাকিস্তানে হত্যা করার মত হিন্দু নেই। এই দুই কারণেই ভারতেয় দাঙ্গাগুলো বেশী হচ্ছে।

সুতরাং ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য, জায়েয করার জন্য ভারতীয় উগ্রপন্থীরা স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানোর উদ্দেশ্যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় এই দালালদের উদ্দেশ্য দুটি। প্রথম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে তারা হিন্দুদের জন্য মৌখিক দরদ প্রদর্শন করে তদ্বারা তাদের নিজ রাজনৈতিক দলের জন্য ভারতীয়দের নৈতিক এবং আর্থিক সাহায্য লাভ করবেন। দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনের সময় দেশের এক কোটি হিন্দুর ভোট প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য ঐ মানুষগুলো জঘন্য সব কল্পকাহিনী তৈরী করতে চেষ্টা করে থাকে। এমনকি সম্পত্তির দখল নিয়ে মারামারি করে কোন হিন্দু মারা গেলে তাকেও সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে চেষ্টা করে। যদিও এ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠন করা ভারতীয়দের জন্য অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। একদিকে সেদেশের দাঙ্গাগুলোকে যুক্তিসিদ্ধ করা অপরদিকে বাংলাদেশের সাথে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির কোন একটি ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য একটা বড় দাঙ্গা প্রয়োজন। বিশেষ করে চুক্তিটির মেয়াদ শেষ

হয়ে আসছে বলে এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করে।

সুতরাং ভারতীয় উগ্রপন্থীরা বাংলাদেশের একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী মানুষকে ভাড়াটিয়া বক্তা হিসাবে, লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে উস্কানিমূলক বক্তৃতা, উস্কানিমূলক গল্প-প্রবন্ধ লিখিয়ে জনসাধারণকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই দাঙ্গার ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করে। আবার কেউ কেউ বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নানা উদ্ভট কাল্পনিক ঘটনা ম্যানুফেকচার করে গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনা করে থাকে। তারা ভারতের পাটনা শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাহিনীকে রঙ চড়িয়ে বাংলাদেশের পাবনা শহরের দাঙ্গা নাম দিয়ে এমন রসালো গল্প রচনা করে যেন পাটনা শহরটি বাংলাদেশেরই অংশ।

ভারতীয় উগ্রবাদীরা ঐসব রচনাকে নিজেদের ফরমায়েশ মত এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করিয়ে নেয় যা পড়লে মনে হবে যেন ভারতে কোন দাঙ্গাই হয় না। যত দাঙ্গা সব বাংলাদেশে সংঘটিত হচ্ছে, বাংলাদেশীরা প্রতিনিয়ত হিন্দু হত্যা করছে এবং হিন্দুর রক্তে গোসল করছে। তদ্দারা তারা বুঝাতে চায় বাংলাদেশে হিন্দুহত্যার কারণেই ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ হচ্ছে।

ভাড়াটিয়া ঐ বর্বর জ্ঞানপাপীদের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক পুস্তকগুলো ভারতীয় প্রকাশকেরা ছাপিয়ে রক্তপিপাসু দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। তাদের দেখানো হয় যে, স্বয়ং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা(?) স্বীকার করছে তাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে। সুতরাং ভারতে মুসলমান হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেওয়া কোন অযৌক্তিক কাজ হতে পারে না।

ঐ ইন্ধন সরবরাহের জন্য বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী নামক ঐ প্রাণীগুলোকে ভারতীয় দাঙ্গাবাজরা যথেষ্ট পারিশ্রমিক, পারিতোষিক ও পুরস্কার দিয়ে পোষা কুকুরের মত বশ মানিয়ে নেয়।

যেমন নব্বই দশকের বি.এন.পি সরকার আমলে দেশে এক শ্রেণীর বেকার সংস্কৃতি কর্মীর উদ্ভব হয়েছিল। তারা রুটি রুজির প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিল। কিন্তু দেশে কোন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি না থাকায় তাদের বেকরত্ব প্রকট হয়ে উঠে।

সুতরাং তারা সাম্প্রদায়িকতার অভিনয়ের প্রতি মনোযোগী হয়। তারা পুকুরের মাছ চুরি, ক্ষেতের আইল কাটা নিয়ে মারামারিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

আখ্যা দিয়ে তার সংবাদ ভারতে ফেরি করে অর্থসংস্থান করত। এমনকি সেসব সংবাদ ইউরোপ আমেরিকায়ও ফেরি করে আসার জন্য বিমান ভাড়া, হোটেল ভাড়া, গন্তব্যে তাদের রাহা খরচ এবং অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিশ্বভ্রমণ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের জন্য তাদের অর্থ সংস্থান হয়ে যেত এবং এখনও হয়। কিন্তু কি করে হয় এবং কি উদ্দেশ্যে হয়। 'বুঝই সুজন যে জান সন্ধান।'

নব্বই দশকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে এরা নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকলেও ২০০১ সালে বি.এন.পি ক্ষমতায় আসার পর এরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। এবার তারা মুভি ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে যশোহর, সাতক্ষীরা সীমান্ত অঞ্চলের দরিদ্র হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ছুটে যায়। সেখানে তারা পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ঘর, লাকড়ীর ঘর, খড়ের গাদা ইত্যাদিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, ভাড়াটে লোকজন দ্বারা দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিনয় করিয়ে ভিডিও ক্যামেরায় তার ছবি ধারণ করে বিদেশে চালান করত।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রামান্য ছবি নাম দিয়ে সীমান্তের ওপারে তা ফেরি করে বেড়াত এবং হট কেকের মত তা বিকাত। কতদিন ধরে ঐ বাণিজ্য চলেছে তা আমাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিমগ্নরা তার খবর রাখেননি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঐ ক্যাসেট নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে তাদেরই একজন সীমান্ত রক্ষীদের হাতে এ মালসহ ধরা পড়ে যায়। এই সংবাদ তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু দুষ্কর্ম যাদের পেশা ও নেশা তাদের চোখে লজ্জা শরম কম থাকে। পত্রিকায় দুষ্কর্মের সংবাদ প্রকাশিত হওয়া আর এসব পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ঘটনা তাদের কাছে ইঁদুর বিড়াল খেলা। যেমন ০৯/০২/০৮ তারিখের পত্রিকার খবরে প্রকাশ "ডিবি পুলিশ ৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত থেকে পরদিন শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সময়ে অভিযান চালিয়ে ব্যাংক কামলার (ব্যাংকের কাস্টমারদের টাকার থলে কেটে যারা টাকা চুরি করে) দলনেতা আবদুর রব (৫০) ওরফে রবা সাহেব ওরফে আঙ্গুল কাটা রবাসহ তার ৪ সহযোগীকে পীর ইয়েমানী মার্কেটের সামনে থেকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে রবা জানায়, গত ৩২ বৎসর যাবত সে এই কাজ করে আসছে। ইতিপূর্বে সে ৪০ বার গ্রেফতার হয়েছিল"। এ যেন ইঁদুর বিড়াল খেলা। ধর আর ছাড়, আবার ধর একটু খেলে আবার ছাড়।

তেমনি সীমান্তে যখন ধরা পড়ার ঘটনা ঐ সাহিত্যিক সাংবাদিক সংস্কৃতিকর্মী নামধারী ব্যক্তিটিকেও তার কর্মকান্ড থেকে নিবৃত করতে

পারেনি। তিনি "মৌলবাদের উত্থান এবং সাম্প্রতিক বাংলাদেশ" নাম দিয়ে একখানা বই লিখে তার সাথে ইংরেজী অনুবাদ বগলদাবা করে ইউরোপ সফরে বের হন। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি বহুদেশে তিনি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার হৃদয় বিদারক ঘটনার সংবাদ এবং ছবি ফেরি করেন। লন্ডনে তিনি একটি প্রতিরোধ কমিটিও গঠন করেন এবং ঐ পুস্তকখানা ফেরি করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পৌছান। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে, তিনি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব না হলেও তার আন্তর্জাতিক ভ্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা এবং বিমানের মূল্য টিকেটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় ফ্রান্স, জার্মানী, লন্ডন, আমেরিকার সর্বত্র তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা, হোটেল বুকিং যানবাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং ঐসব রাষ্ট্রের হোমরা চোমরাদের সাথে তার দেখা সাক্ষাত ও দেন দরবারের বিস্তারিত ব্যবস্থা করে রাখা থাকে। এ যেন এক রাজকীয় ব্যাপার। কিন্তু এই ব্যয়বহুল ব্যবস্থা কারা করে থাকে, কি উদ্দেশ্যে করে থাকে এবং কেন? তার নিজের তো কানাকড়িও বহন করার মত অবস্থা নয়।

২০০৫ সনের ৫ই নভেম্বর নিউইয়র্ক সিটির এ.টি.এন মিলনায়নে এক সভার আয়োজনে করা হয় সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী ঐ ভদ্রলোকের জন্য। ঐ সভার নাতিদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'ঠিকানার' ১১ নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যায়। তার প্রথম এবং প্রধান অংশটি ছিল নিম্নরূপঃ

"বাংলাদেশ তালেবানী রাষ্ট্র হওয়ার পূর্বেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সোচ্চার হওয়া উচিত। এছাড়া বাংলাদেশের ইসলামী জঙ্গিরাও বৃটেন ও মার্কিন সহায় সম্পদের উপর হামলার হুমকী দিয়েছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই ওদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।" এ মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের লেখক– সাংবাদিক – সংস্কৃতিকর্মী ঐ ব্যক্তিটি।

৫ নভেম্বর '২০০৫ সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে এ.টি.এন. বাংলার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত' মৌলবাদের উত্থান ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন ঐ সাংবাদিক সাহিত্যিক- সংস্কৃতিকর্মীটি।

এসময় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় কমিটি প্রকাশিত 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন' নামক একটি স্মরণীয়কারও মোড়ক উন্মোচিত করা হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত এই স্মরণীকার বেশ কিছু কপি আমেরিকান কবি, সাহিত্যিক, মানবাধিকার কর্মীরাও প্রতিটি ১০০ ডলার মূল্যে ক্রয় করেছেন।"

বাংলাদেশে এরকম বহু ভন্ড সংস্কৃতিজীবী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিজীবী, মানবাধিকার কর্মী নামের ধান্ধাবাজ ধুরন্ধর মানুষ আছে যারা মাছ চুরির ঝগড়া, বা জমি দখলের লাঠালাঠিকেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আখ্যা দিয়ে কাগজে খবর ছাপিয়ে ওপারে সংবাদ ফেরি করে অর্থোপার্জন করে থাকে। তাতে যে ওপারের সংখ্যালঘুদের (মুসলমান) জান-মাল বিপন্ন হয়ে থাকে, তা তারা বুঝে না। তারা শুধু বুঝে কত আয় হল তার হিসাব। এ যে খুন খারাবি করে ডাকাতি করার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।

শিশুদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে স্কুলমুখী করা হয়। মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার দিয়ে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী করা হয়। তেমনি পুরস্কারের লোভে আমাদের দেশের ঐসব বুদ্ধিজীবী ভারতীয় স্টাইলের সাম্প্রদায়িকতার প্রতি দারুন ভাবে আকৃষ্ট।

ঐ বুদ্ধিজীবীরা শুধু বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাল্পনিক সংবাদ ম্যানুফেকচার করেই ক্ষান্ত নয়, ঢাকার পত্রিকায় যাতে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকাময় সংবাদ ছাপা না হয় তার প্রতিও তারা পোষা কুকুরের মত পাহারা দেয়। বাংলাদেশে হিন্দুর গরু মরলেও ভারতে সাম্প্রদায়িক হত্যার খবর যাবে, সেখানে এক হাজার মুসলমান নিহত হলেও যেন বাংলাদেশে একটিরও খবর না আসে।

যেমন ১২ ডিসেম্বর, '৯২ তারিখের ইনকিলাবে ছাপা হয়েছিল ভারতীয় "পুলিশ মুসলমানদের ঘর থেকে টেনে এনে গুলি করে হত্যা করে।" ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮/৫/৯৩ তারিখের সংখ্যায় বলেছে এটা নাকি ইসলামী লেবাসের খবর; প্ররোচনামূলক খবর, রাজাকার পত্রিকার খবর।

অথচ ৬/৮/৯৩ তারিখের পত্রিকায় ভয়েস অব আমেরিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে "ভোয়া জানায় ভারতীয় জনতার মানবাধিকার কমিশনের এক রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বোম্বাই এর দাঙ্গায় পুলিশ প্রায় এক হাজার মুসলমানকে গুলী করে হত্যা করে। শুধু তাই নয়। ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে "বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতা থাকে।" এ রিপোর্টটি এ মাসের গোড়ার দিকে দিল্লী প্রশাসনের কাছে পেশ করা হয়েছে বলে '৯৩ সালের ১৪ আগস্টের পত্র পত্রিকায় প্রকাশ।

তবে কি ভয়েস অব আমেরিকা, ভারতীয় মানবাধিকার কমিশন, বিচার বিভাগীয় কমিশন এরা সবাই ইসলামী লেবাস পরেছে? এরা সবাই রাজাকার হয়ে গেছে?

জনতা যখন চোর চোর বলে চোরকে ধাওয়া করে তখন দক্ষ চোর জটলার মধ্যে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে চোর চোর চিৎকার দিয়ে গৃহকর্তার দিকে আঙ্গুল উচিয়ে ধরে। ধাওয়াকারীরা তখন চোর চোর বলে-গৃহকর্তার পেছনেই ছুটে।

১৯৭১ সালের পাকিস্তানের ভাড়াটে রাজাকাররা কাজ করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য। এখনকার ভারতের ভাড়াটে বাংলাদেশী রাজাকাররা কাজ করছে স্বাধীনতা ও স্বাধীন সত্তা নস্যাৎ করার জন্য। আর দক্ষ চোরের মত ভারতের ভাড়াটেরা অতীতের দিকে আঙ্গুল উচিয়ে চিৎকার দিচ্ছে চোর চোর শব্দে। চিৎকার দিতে দিতে যখন গলা শুকিয়ে আসে তখন পানি পান করার জন্য কলকাতা গমন করে। সেখানে তো তাদের জন্য আঃ বাঃ ফ্রি ব্যবস্থা আছেই।

প্রত্যেকটি ভারত ভ্রমণের শেষে ঐ প্রাণীগুলো ঢাকায় এসে আবার হিন্দুর গরু মারা যাওয়ার খবর, হিন্দুর উপর অত্যাচারের নুতন কিছু গল্প, ইসলাম বিরোধী কিছু বক্তৃতা, মুসলিম বিরোধী কিছু বিবৃতি দিয়ে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে সারমেয় শাবকের মত লেজ নাড়াতে থাকে-কখন ভারত ভ্রমণের পরবর্তী দাওয়াতটি আসবে, কখন কিছু পুরস্কারের ঘোষনা হবে।

ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক বর্বরদের ভারত সোহাগী প্রচারণার কারণে আজ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য ভারত ভ্রমণ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের কোন হিন্দুকে দেখলে ভারতীয়রা জিজ্ঞেস করে- কি দাদা, কি হালে আছ?

যদি বলে ভাল আছি, তবে অমনি তারা ভ্রু কুঁচকে বলে-বল কি? তোমার দেশের মুসলমানেরা নিজেরাই স্বীকার করছে তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত শেষ করে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ ভাল আছ! কি? মুসলমানের কাছে বোন বিয়ে দাও নিতো?

আর যদি মুসলমান হয় তবে জিজ্ঞেস করে-কিরে দাদা, কটা হিন্দু মারলে; কটা মন্দির ভাঙ্গলে, কটা হিন্দু মেয়ের ইজ্জত লুটলে। ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নবানের সম্মুখীন হয়ে ভ্রমণকারীদের শুধু বিব্রতই নয় বরং জীবনের ভয়ে শঙ্কিত হতে হয়। মুসলমানটি ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেনা, কিরে দাদা, শুধু আজকের দিনে, শুধু কাশ্মীরে ক'ডজন মুসলমান মারলে আর ক'ডজন মেয়ের ইজ্জত লুটলে?

অমনটি না-ইবা হবে কেন? এইতো গত ১০ জুলাই টি.এস.সি. মন্ডপে ডকটরেট পাওয়া এক মুর্খ পণ্ডিত বক্তৃতা দিলেন– "হিন্দুরা আমাদের দেশ

স্বাধীন করে দিয়েছে, বাংলাদেশের উপর তাদের একটা হক আছে অথচ আমরা কেবল হিন্দু মারতে চাই। অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা আছে।"

আর এক মহিলা লেখিকা হিন্দু নির্যাতন এবং নিধনের বানোয়াট ঘটনা রটনা করে কিছু বই রচনা করেছে। তার কোনটি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা থেকে, আর বিক্রি হচ্ছে কলকাতায়। আবার কোনটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতায় বিক্রি হচ্ছে ঢাকা এবং কলকাতায়।

এসব বইতে বাংলাদেশের হিন্দুদের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার জঘন্য মিথ্যাচার আছে। যেমন চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দুদের বঞ্চনার সুদীর্ঘ হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। তাতে সচিবালয় থেকে শুরু করে ব্যাংক, ইন্সুরেন্স স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পুলিশ, সেনাবাহিনী ইত্যাদি সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যার কড়া গন্ডা হিসাব এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন বাংলাদেশের অফিস-আদালতগুলো তার নখদর্পনে এবং সে যেন একটি সাম্প্রদায়িক ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল হিসাব কম্প্যুটার। মাথায় কার কতটি চুল আছে তার হিসাব বলা যেমন সোজা, ঐ লেখিকার হিসাবও তেমনি সোজা। দৃষ্টান্ত, হিসাবে সে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংকে নাকি হিন্দু পরিচালক কেউ নেই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের যাত্রাই শুরু হয়েছিল দুজন ডিপুটি গভর্ণরের একজন হিন্দু নিয়ে।

আমার সামনে এই মুহুর্তে ১৯৯১ সনের বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসারদের নামের তালিকাটি আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে চারজন নির্বাহী পরিচালকের (পরিচালকেরও উপরে) একজন হিন্দু রয়েছে, অর্থাৎ ২৫%। তদুপরি পরিদর্শন বিভাগ, ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, শিল্প ঋণ বিভাগ ইত্যাদির পরিচালক (জি.এম.) সবাই হিন্দু। তাছাড়া অসংখ্য অতিরিক্ত পরিচালক (ডি.জি.এম.) যুগ্ম পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক রয়েছে হিন্দু। শুনেছি ১৯৯৩ সন পর্যন্ত ঐ সংখ্যা নাকি তারও অনেক বেড়েছে।

ঐ নামের তালিকাটির ১৯৫ পৃষ্ঠায় এলফেবেটিক তালিকা শুরু হয়েছে। 'অ' আদ্যাক্ষর দিয়ে যেসব অফিসারের নাম, সেসব অফিসারের সংখ্যা ১৮ (আঠার) জন। এই আঠার জনের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই-সবাই হিন্দু। পাঠক এবার আমাদের দেশের ঐ বর্বর লেখক ও বক্তাগুলির চরিত্র সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন। সাথে সাথে যে সরকারের নাকের ডগা দিয়ে এমন সরকার-বিরোধী মিথ্যাচার সম্বলিত বই বাজারজাত করা হয় সেই সরকারের কর্মদক্ষতা সম্পর্কেও ভাবতে হয়।

আমাদের জানা মতে ঐ লেখক, লেখিকা ও বক্তাদের সবাই নাস্তিক। তারা ধর্ম মানে না। আর যারা ধর্ম-কর্ম মানেনা, তাদের কাছে সম্প্রদায় বলে কিছু থাকতে পারে না।

সুতরাং যারা ধর্মকর্ম মানেনা তাদের সত্য ও মিথ্যা বলে কোন কিছু নেই। চোর, বদমায়েস, ব্যভিচারীরা যেমন তাদের অপরাধ গোপন করার জন্য হাজারো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। আমাদের উল্লিখিত মিথ্যাচারীরাও তেমনি মিথ্যার বেসাতি করে থাকে। ছোট সতীনরাই সাধারণত স্বামীর কাছে মিথ্যা দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে এ ধরনের সোহাগী কান্না কেঁদে স্বামীকে ক্ষিপ্ত করে বড় সতীনকে মার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে।

বাংলাদেশের খুনী, বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা এবং বর্ণনাগুলো ছোট সতীনের সোহাগী কান্নার মতই শুনায়। তাদের বইতে বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর খুন, বলাৎকার, শোষণ, নিপীড়ন, অপমান, গণহত্যা ইত্যাদির বহু বানোয়াট বর্ণনা রয়েছে, চাকুরীর ক্ষেত্রে যেমন মিথ্যা বর্ণনা রয়েছে ঠিক তেমনি। কিন্তু এই সোহাগী কান্না কার কাছে এবং কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে? ছোট সতীন বড় সতীনকে মার খাওয়াবার জন্য স্বামীর কাছে সোহাগী কান্না কাঁদে, এরা কাঁদে কার কাছে এবং কেন? ভারতের খুনীরা উল্লিখিত বই এর এসব অংশগুলো ফটোকপি করে হাতে হাতে দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের মধ্যে পরিবেশন করে দাঙ্গার উস্কানী দিয়ে চলেছে। নিত্য দাঙ্গার স্বীকার মুসলমানরা এতদৃষ্টে ভয়ে শঙ্কায় প্রতি মূহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

মনুষ্যত্ববোধ বর্জিত যেসব বুদ্ধিজীবীর বক্তৃতা এবং একটি বাচাল মেয়ের লেখা যে ভাষা ও যে বর্ণনা ভারতের কোটি মুসলমানের জান-মাল-ইজ্জতের উপর হুমকী সৃষ্টি করেছে সেসব বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিজীবীতো দূরের কথা মানুষ বলতেও ঘৃনাবোধ হয়।

তাদের বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য ভারতীয় মুসলমানদের বুকে বুলেটের মত বিঁধে, এদের পুস্তকের প্রতিটি ছত্র দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের অন্তরে মুসলমান হত্যার জন্য বারুদ তৈরী করে। সামান্য প্ররোচনা পেলেই এই বারুদ নিরীহ মুসলমানদের উপর বোমার আকারে ফেটে পড়ে।

যে খুন করে আর যে খুন করায়, দন্ড বিধিতে এই উভয়ের জন্য একই শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। একজন খুনের আসামী অপরজন হুকুমের আসামী।

শুধু খুন নয়। খুন সংগঠিত হতে পারে এমন সব উস্কানিমুলক বক্তৃতা-বিবৃতি যারা দেয় তাদেরও হুকুমের আসামীর মত বিচার করার বিধান আছে।

অষ্টাদশ শতকের মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী খুনীও ছিলেন না সাম্প্রদায়িকও ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতার জন্য তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। ঐ ফতোয়া প্রচারের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং বিচার করা হয়। বিচারে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের হুমুক দিয়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬১ সনে সেখানেই তার জীবনাবসান ঘটে।

ছোট সতীনের সোহাগী কান্নার মত যারা ইনিয়ে বিনিয়ে দেশের জন্য আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে তারা আসলে ভারতের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানী দিয়ে চলেছে। সুতরাং একদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্তের জন্য অপরদিকে ভারতের নরহত্যার প্ররোচনার জন্য এদের বিচার হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

লাল পাথরের রক্ত

২৭শে নভেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে আমি এবং বন্ধু আলী নেওয়াজ ভারতের আগ্রা শহরের 'আগ্রা হোটেলে' অবস্থান করছিলাম। সারাদিন মুসলিম শাসনের অমর স্বাক্ষর লাল কেল্লা আর তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করে হোটেলে ফিরে এসে মুসলিম সম্রাটদের শাসন, সৌর্য বীর্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শিল্পপ্রীতি, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির পর্যালোচনা করছিলাম, আর সাথে সাথে পরদিন ঐতিহাসিক জয়পুর ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

আগ্রায় আমি উঠেছিলাম এফ, এম, কারিয়াপ্পা রোডে অবস্থিত 'আগ্রা হোটেলে'। হোটেলটি তাজমহলের খুবই নিকটে। দুপুর বেলা হোটেলের মালিক মিঃ দীপক দত্তকে বলে গিয়েছিলাম যেন আমাদের জন্য পরদিন জয়পুর যাওয়ার বাস টিকেট করে রাখেন। আগ্রা হতে জয়পুর ২৫৫ কিলোমিটারের পথ, বাস ভাড়া ৪৫ রূপী। বাসগুলি এয়ারকন্ডিশনড এবং অত্যন্ত আরামদায়ক।

সন্ধ্যা বেলায় আমাকে হোটেল কাউন্টারে দেখেই ম্যানেজার মহাবীর প্রসাদ মুখটি মলিন করে ফেললেন। ভদ্রলোক ভাল বাংলা বলতে পারেন এবং আমাকে খুবই খাতির করেন। খাতির করার একটা বড় কারণ ছিল। হোটেল মালিক মিঃ দীপক দত্ত বাংলাদেশের ভাগ্যকুলের মানুষ। ৭/৮ বছর বয়সে ১৯৫২ সালে বাবা-মা'র সাথে ভারতে চলে যান। প্রথম দিনেই দত্তবাবুর সাথে পরিচয় হয় এবং তিনি আমার সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার জন্য ম্যানেজার মহাবীর প্রসাদকে বলে রেখেছিলেন।

মহাবীর প্রসাদ কাউন্টারের অপর প্রান্ত থেকে ধীর পদক্ষেপে আমার কাছে এসে কানের কাছে মুখ এনে বিব্রত কণ্ঠে বললেনঃ বাবু আপনাকে আগামী দিন জয়পুরে যেতে বারণ করে গেছেন। একটু অপ্রতিভ স্বরে বললঃ জয়পুরে দাঙ্গা হচ্ছে, গত তিনদিন থেকে সেখানে কারফিউ চলেছে; আজও সারাদিন কারফিউ ছিল। কালকে কি হয় বলা যায় না তো তাই। আমি বাংলাদেশ হতে আসা একজন মুসলমানের সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথাটা বলতে তার জিহ্বা বার বার জড়িয়ে আসছিল। কারণ আমি যে বাবুর বন্ধু মানুষ।

চিন্তিত মনে নিজের রুমে এসে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। গত ক'দিন ধরেই দক্ষিণ ভারতের কোথাও না কোথাও দাঙ্গা হচ্ছে। জেনেশুনেই আমি এই অঞ্চলে এসেছি। কিন্তু জয়পুরের দাঙ্গা কত ভয়াবহ হলে একটানা কারফিউ থাকতে পারে তা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়ি।

এককালে যে মুসলমানরা ভারতকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছিল এবং মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজও যে মুসলমানের কীর্তি একনজর চোখে দেখার জন্য দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর, শিক্রি, আজমীর ইত্যাদি স্থানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ দেশী-বিদেশী পর্যটকের ভীড় লেগে থাকে, যে আজমীরে মুসলমানের পীরকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনতার ঢল নামে, যে মুসলমানদের কীর্তি প্রদর্শন করে ভারতের কোষাগার ফুলে ফেঁপে উঠছে, সেই মুসলমানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিন্দুর এই আক্রোশের হেতুটা কি, ভাবতে ভাবতে রাতটা কেটে যায়।

ছোটকালে গ্রামের মাঠে গোরবে পোকা দেখেছিলাম। এক চাকা নরম মাটিকে সে মাথা দিয়ে যখন ধাক্কিয়ে নিতে চেষ্টা করত তখন চাকাটা মার্বেলের মত গোল হয়ে যেত। অসমতল পথে ঠেলে নিতে গেলে মাটির ঐ চাকাটা বার বার গড়িয়ে গোবরে পোকাটার মাথার উপর ফিরে পড়ত। শেষ পর্যন্ত উভয়ে অনেকদুর নীচে পড়ে গেলে পোকাটা সেই চাকাটিকে আবার ঠেলতে শুরু করত। ঐ চাকাটিকে আমরা ভুমন্ডল বলতাম আর গোবরে পোকাটার ঐ ভূমন্ডল ধাক্কাবার চেষ্টাকে গোবরে মানসিকতা বলতাম।

সারা বিশ্বে একশত পঞ্চাশ কোটি মুসলমান আছে। তন্মধ্যে ভারতে মাত্র বিশ কোটি মুসলমানের বাস। যুদ্ধাংদেহী সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা ঐ গোবরে পোকার ব্রহ্মান্ড ঠেলে সরাবার চেষ্টার মতই মুসলমানাদের ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে। তাদের দেশে মুসলমানদের সংখ্যালঘু পেয়ে তারা ভাবছে যেন সারা বিশ্বটাকেই হটিয়ে দেবে। গত সাত শত বৎসর যাবৎ হিন্দুরা এই গোবরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম বার বার তাদের ওপর চেপে বসছে।

১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৪১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়েও রাজা গণেশ ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনরুত্থানের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের পুত্র সাইফউদ্দীন হামযা শাহকে হত্যা করিয়ে সিংহাসন দখল করেন। সিংহাসনে বসেই মসজিদ, মাদ্রাসা ধ্বংস করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য গণেশ যখন চরম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তখন গোবরে পোকার মাটির ঢেলা নিজের মাথায় পড়ার মত রাজা গণেশের নিজের ছেলে যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ পিতাকে হত্যা করেন এবং জালালুদ্দিন নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। সেতো ছয় শত বছর পূর্বের কথা।

হিন্দুরা গোবরে মানসিকতার কারণে সে ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করে না। বুঝতে চেষ্টা করে না তখন সারা ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা কত ছিল আর এখন কত এবং এদের কেহই আরব দেশ থেকে আসেনি। তারা হিসেব করে

না এদেশের কত লক্ষ যদু জালালুদ্দিন হয়েছে, কত অমানুষ মানুষ হয়েছে– যাদের মামার বাড়ী, বাবার বাড়ী সবই এই দেশে। একারণেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়েও তখন ভারত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। তাদের মধ্যে গোবরে মানসিকতা ছিল না বলেই তারা হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেনি। বরঞ্চ মুসলমানরা বিদ্বেষহীন চিত্তে হিন্দু উজির, নাযির, সামন্ত, সেনাপতিদের আপত্য সাহচর্যে ও সহযোগীতায় শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

ভারতের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন উচ্চবর্ণ হিন্দুরা প্রায়শই বলে থাকে– মুসলমানরা আরবের অধিবাসী, তাদের আরবে ফিরে যেতে হবে। যদি তাই হয় তবে উচ্চবর্ণ হিন্দুদেরই সবার আগে ভারত ছাড়তে হবে। কারণ উচ্চবর্ণ হিন্দুরা আর্য বংশোদ্ভুত এবং এরা এসেছিল ইরান হতে। ভারতের আদি অধিবাসীদের এরা অনার্য এবং অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত করায় ভারতীয়দের সাথে তারা কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি। তারা নিজেদের মধ্যে শাদি-সম্বন্ধ সীমিত রাখায় বিশুদ্ধ অভারতীয়ই রয়ে গেছে।

আট থেকে দশ হাজার বৎসর পূর্বে ইরান দেশে জরদাশত বা জরথুষ্ট নামে এক মাহপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। ঐ সময়কার বাদশাহ গাশতাছপের পূর্ব পর্যন্ত ইরানের অধিবাসীরা জড় পূজারী ছিল। জরদাশত জড় পূজার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। তিনি যে নতুন ধর্মমতের বাণী প্রচার করলেন, তা ছিল ইসলাম ধর্মমতের অনুরূপ। তার সারমর্ম ছিল 'আহুরা মাজদা' বা জ্ঞানময় আল্লাহ হচ্ছেন আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক। সুতরাং তাকেই উপাসনা করতে হবে।

জরদাশতের অনুসারীদের সাথে জড় পূজারীদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। দাঙ্গায় জড় পূজারীদের পরাজয় ঘটে। তারা তাদের মূর্তি, বিগ্রহ এবং সাম্পদায়িক মানসিকতা নিয়ে ইরানের বাইরে চলে যায়। তাদের সর্ব বৃহৎ দলটি ভারতে চলে আসে। এরাই ভারতীয় আর্য, উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়। আর যারা ইরানে থেকে গেল তারা জরদাশতের ধর্ম গ্রহণ করেই থাকল।

এই আর্যরা ভারতবর্ষে এসে ধর্মের নামে নিজেরা ব্রাহ্মণ সেজে স্থানীয়দের অস্পৃশ্য অন্ত্যজ নাম দিয়ে ঘৃণার চোখে দেখেছে, তাদের উপর অত্যাচার করেছে এবং আজও করছে। এই তো এই ১৯৯৩ সনের গোড়ার দিকের ঘটনা। মহিশুর জিলার বদনওয়ালী গ্রামে জরাজীর্ণ সিদ্বেশরী মন্দিরটি উচ্চ বর্ণ হিন্দু এবং নিম্নবর্ণ হিন্দুরা মিলে সংস্কার করেছিল। মন্দিরটির সংস্কার কাজ হয়ে গেলে নিম্নবর্ণ হিন্দুরা শ্রমের প্রতিদান হিসেবেই হোক বা স্বধর্মী

প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দের আবদারেই হোক মন্দিরটিতে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু প্রবেশাধিকার তো দূরের কথা, শুধু এই কারণে ১৯৯৩ এর ২৫ শে মার্চ তারিখে উচ্চ বর্ণ হিন্দুরা অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে তিনজন নিম্নবর্ণ হিন্দু মারা যায় এবং আরও বহু আহত হয়। (মুসলিম জাহান ২৬/৫/৯৩)।

উত্তর প্রদেশের একটি হরিজন মেয়ে একটি উচ্চবর্ণ হিন্দু ছেলেকে ভালবেসেছিল। এর জন্য অপরাধ হল হরিজন মেয়েটির এবং তার বাবা-মা-ভাই-বোনের। সুতরাং উচ্চবর্ণ ছেলের অভিভাবকরা মেয়েটির মা-বাবা ভাইবোন সকলকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে ১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে। (ইনকিলাব ১৫/৪/৯১) উচ্চবর্ণ হিন্দুরা নিজেদের ভারতীয়দের হতে এতটুকু স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

মুসলমানরা কিন্তু এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা করে এদেশে আসেনি বা তা করতেও আসেনি। এরা যুদ্ধ করে ভারত জয় করেছে। এদের ধর্ম মানুষের মন জয় করেছে। মুসলমানের কোন বর্ণ গৌরব না থাকায় দলে দলে এদেশের নিম্নবর্ণ মানুষ যারা ভারতের আদিবাসী এবং যারা আর্য হিন্দুদের কাছে ঘৃণীত তারাই প্রথমে মুসলমান হয়েছে। ধর্মান্তরিত পুরুষরা মুসলিম কন্যা বিয়ে করেছে এবং মেয়েরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানকে বিয়ে করেছে।

একারণেই বলেছি মুসলমানদের বাবার দেশ, মামার দেশ উভয়ই ভারতবর্ষে, সুতরাং মুসলমানরা খাঁটি ভারতীয়, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খাঁটি ইরানী। যদি আজ কাউকে ধর্ম, জাত-গোত্রের কারণে ভারত ছেড়ে যেতে হয় তবে উচ্চবর্ণ হিন্দুদেরকেই যেতে হবে- হ্যাঁ তাদের ইরান দেশের আর্যভূমিতেই চলে যেতে হবে। নিম্নবর্ণ হিন্দুর পূর্বপুরুষের ভিটা এই ভারতবর্ষ, মুসলমানদের পৈতৃক, ভিটা, মাতুলের সম্পত্তি এই ভারতবর্ষ। উচ্চবর্ণ হিন্দুর জন্য ভারতবর্ষে বসবাস করার কোন উত্তরাধিকার সূত্র নেই। তাদের উত্তরাধিকার সূত্র হিসেবে ইরানীরা এখনও আর্য নামটি ব্যবহার করে চলেছে।

কিন্তু ইরানে যেতে হলেও তাদের প্রথমেই মুসলমান হতে হবে। কারণ ইরানের আর্যরা সবাই বহু পূর্বেই মুসলমান হয়ে গেছে, সেখানে এখন আর কোন জড় পূজারীর অস্তিত্ব নেই।

যাই হোক, পরদিন ২৮ শে নভেম্বর সংবাদ পাওয়া গেল জয়পুরের কারফিউ অব্যহত রয়েছে। রাত ৯টায় দীপক বাবু সংবাদ নিয়ে জানলেন পরদিন ২৯ তারিখে ভোর ৬টা থেকে জয়পুরের কারফিউ তুলে নেওয়া হচ্ছে।

অমনি তিনি আমাদের জন্য রাজস্থান পরিবহনের দুখানা টিকেট সংগ্রহ করে এনে হাতে দিয়ে বললেনঃ আগামীদিন আবার কারফিউ দিবে কিনা, দিলে কখন থেকে দিবে সেই খবরটি নিতে পারলাম না। ভোর সাড়ে ৬টায় বাস ছেড়ে দুপুর একটার মধ্যেই জয়পুর পৌছে যাবেন। সেখানে যে কারও কাছে কারফিউর খবর জিজ্ঞাস করে যদি অসুবিধা দেখেন তবে সঙ্গে সঙ্গে আজমীরের বাসে উঠে যাবেন। ওখান থেকে ঘন্টায় ঘন্টায় আজমীরের বাস ছাড়ে। দীপক বাবু সকালে আমাদের বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা করে দিয়ে রাত দশটায় আবার ভারত ভ্রমণে যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে বিদায় নিলেন।

২৯ শে নভেম্বর দুপুর ১২-৪৫ মিনিটে জয়পুর পৌছে সকলেরই চোখে মুখে একটা উৎকন্ঠার ভার লক্ষ্য করি। জিজ্ঞেস করে জানলাম বিকাল তিনটা থেকে আবার কারফিউ শুরু হচ্ছে। এমন সময় দেখি আজমীরের স্ট্যান্ডে একটি বাস এসে থামল। বেলা ১-৩০ মিনিটে আজমীরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে।

আগ্রার দীপক বাবু জয়পুরের যে হোটেলের ঠিকানা দিয়ে একখানা পরিচিতি পত্র দিয়েছিলেন তা পকেটেই পড়ে থাকল। আমরা দু'বন্ধু আজমীররর বাসে চেপে বসলাম এবং বিকেল ৩-৪৫ মিনিটে আজমীর পৌছলাম।

ভারতের দাঙ্গা উল্কার মত দূর হতে দূরান্তরে ছুটে যায় আর দাবানলের মত ছড়ায়। কখন আবার কোথায় আটকা পড়ব ভয়ে আমার বন্ধু আলী নেওয়াজ আজমীরেও একদিনের বেশী থাকতে রাজি হল না। আজমীর শরীফ মুসলমানের জন্য নিরাপদ জায়গা হলেও ফিরে যাওয়ার পথ তো দাঙ্গার কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে তাই ছিল ভয়ের কারণ।

পহেলা ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে সকাল সাড়ে সাতটায় আহমেদাবাদ এক্সপ্রেসে করে দিল্লী রওয়ানা দেই। আমাদের কম্পার্টমেন্টে আমি আর বন্ধু নেওয়াজ ছাড়া আর কোন যাত্রী নেই। সকাল নয়টায় ফুলেরা জংশন পৌছলে চারজন ছাত্রী উঠে আমাদের সামনের বেঞ্চে বসে। কথায় বুঝলাম তারা জয়পুরের কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। চারজন মহিলা একসাথে বসলে সাধারণত কথার বিষয় থাকে- সাহেব কি খেতে ভালবাসেন, কোন অফিসে চাকুরী করেন, কত বেতন পান, সন্তান কত দুষ্ট হয়েছে ইত্যাদি। চার কিশোরী এক সাথে হলে সাধারণতঃ আজকাল সিনেমার কথা, কোন ম্যাগাজিনের কথা, পিকনিকের অভিজ্ঞতা; আর ছাত্রী হলে পড়ালেখা, পরীক্ষা,

রেজাল্ট, নবীন অধ্যাপকের রূপ আর প্রবীণ অধ্যাপকের গুণের কথার গুঞ্জন হয়। কিন্তু এই চারজন ছাত্রীর প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জয়পুরের যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে আমরা উৎকণ্ঠিত সেই দাঙ্গাই তাদের প্রসঙ্গ। তারা যা বলাবলি করছিল তার সারমর্শ হচ্ছেঃ কি দোষ করছিল ঐ সামান্য কটা মুসলমান? ওরা সংখ্যায় যেমন সামান্য কর্মেও গুরুত্বহীন। ফেরিওয়ালা, ক্ষেতমজুর, কারুশিল্পী এই তো ওদের পেশা। এদের মেরে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এমন কি উন্নতি হল? বরঞ্চ বিশ্বজোড়া ছিঃ ছিক্কার কুড়াতে হচ্ছে এবং ছিঃ ছিক্কারের ইতিহাস তো লিপিবদ্ধ হয়েই গেল।

গোল মুখ, কৃষকায়, সুন্দরী মেয়েটি একক্ষণ একটা অজানা আবেগ চেপে বাইরে তাকিয়ে ছিল। এবার সে ছল ছল চোখ ফিরিয়ে বললঃ দেখ, আমার বাসার পাশেই থাকে মিনহাজুদ্দিন নামের একটা লোক– হাসিসুশী গরীব বেচারা। কখনও তরকারী ফেরি করে, কখনও দিনমজুরী। সেদিন তাকে, তার বউকে এবং বড় ছেলেকে মেরে ফেলা হল। এখন ছ'বছরের একটা ছেলে আর তিন বছরে একটা মেয়ে বেঁচে আছে। দুনিয়াতে তাদের আর কেউ নেই। সেদিন কারফিউ ছাড়লে আমার মা ওদের কিছু খানা পাঠালে ঐ লোকগুলি বারণ করে গেল যেন খানা দেওয়া না হয়। তবু মা রাত্রি বেলা কারফিউর ভেতর দেওয়াল ডিঙিয়ে কিছু খানা দেন– কারণ বাচ্চা দু'টি খালি ঘরে বসে বসে ক্ষুধায় কাঁদছিল।

ট্রেনটি তখনও থেমে আছে। আমাদের কামরার পাশ দিয়ে একটি ছেলে যাচ্ছিল। একটি মেয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত ইশারা করতেই ছেলেটি এসে বন্ধু নেওয়াজের পাশে বসে পড়ল। বুঝা গেল ছেলেটি ওদের সহপাঠি। অন্য মেয়েগুলি তখনও দাঙ্গার কথা বলছে।

মেয়েদের কথার রেশ ধরে ছেলেটি বলঃ আরে ভাইয়া হামারা ওপর অর্ডার হুয়া কি হামকো তিন মোচলমান মারনা হোগা, লেকেন হামারা মহল্লেমে একই মোচলমান হ্যায়। ওভি ইতনা গরীব বেচারা, বেকসুর আদমি কি উসকো মারনেকা কোই বাতই নেহি হোতা। আভি বাতাও হাম ক্যায়া কর ছেকতা।

কৃষকায় সেই সুন্দরী মেয়েটির চোখের কোণে এক ফোঁটা অশ্রু জ্বলজ্বল করছিল। সে এবার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললঃ এক কাজ কর ভাইয়া, যারা তোমাকে তিন মোচলমান মারার হুকুম দিয়েছে তাদের থেকে দু'জন এনে তিনজন পুরা কর। ওরা মুসলমানদের মেরে তাদের ঘরবাড়ী, সহায়

সম্পদ লুট করতে পারে, দখল করতে পারে কিন্তু তাদের হায়াত তো দখল করতে পারে না? অন্য মেয়েগুলি সবাই খিল খিল করে হেসে উঠল।

সুন্দরী মেয়েটি বলে চলল, আসলে যারা মুসলমান মারার নেশায় মেতে উঠেছে এদের কারুরই দৈহিক এবং নৈতিক ক্ষতি ছাড়া আর কোন লাভ হচ্ছে না। এদেরে দস্যুতার নেশায় পেয়ে বসেছে। মুসলমান মেরে মুসলমানদের সম্পত্তি দখল করার মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে এদের মধ্যে দস্যুবৃত্তিক মানসিকতা গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতে আমরা কেউ এদের হাত থেকে নিস্তার পাবনা। কিছু অর্থব 'রাজনৈতিক নেতা একটা জাতির মানসিকতাকে দস্যুবৃত্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তদ্বারা জাঠ-মারাঠা বর্গীদের দস্যুতার ঘৃণ্য ইতিহাসের মত এদের নামও যে মানুষ হত্যাকারী হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে এরা তা বুঝতে পারছে না।

কুলাঙ্গারের কুষ্টিনামা

আরবীতে একটা প্রাচীন মনীষীবাক্য হচ্ছে, "কুল্লু শাইয়িন ইয়ারজিউ ইলা আছলিহী।" অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুই তার মূলের দিকে ফিরে যেতে চায়। যেমন সমুদ্রের পানি বাষ্পয়িত হয়ে মেঘের আকারে আকাশে উড়ে যায়। সেই মেঘ বহু দূর-দূরান্তের স্থলভাগে গিয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। সেই বৃষ্টির পানি মাটির কোল বেয়ে, খাল-বিল, নদী-নালা বেয়ে আবার সাগরে এসে মিলে যায়। আবার বাষ্পায়িত হয়ে মেঘের আকারে উড়ে যায়, আবার বৃষ্টির পানি হয়ে ফিরে আসে। ঠিক যেন বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের স্বামীর বাড়ী হতে বাপের বাড়ী যাওয়া আসার মত। এটাই মূলের প্রতি আকর্ষণ।

মূলের প্রতি এই আকর্ষণ মানুষের মাঝেও সমভাবে বিদ্যমান- যাকে আমরা বলি রক্তের টান বা নাড়ীর টান। যেমন মুসলিম বিদ্বেষী সংগঠন 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের' সভায় মাওলানা, বিচারপতি, এ্যাডভোকেট, অধ্যাপক ইত্যাদি যেসব মুসলমান বুদ্ধিজীবী আসন পেতে বসেন তারাও আসলে একটা মূলের টানেই সেখানে বসেন এবং স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম বিরোধী বক্তব্যে অংশগ্রহণ করেন।

মূলের টান ঃ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদটি কোন স্বদেশ প্রেমিক সংগঠন নয় বা নিজ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণকারী সংগঠনও নয়। তারা চায় বাংলাদেশে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হোক এবং তাতে তাদের নিজ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ মারা যাক। তাহলে তারা বঙ্গভূমির ছদ্মাবরণে ভারতীয় আগ্রাসনের একটা পথ বের করে নেবে। সুতরাং তারা নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ হত্যার জন্য কিছু মুসলমান সঙ্গী নিয়ে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। আর এই প্ররোচনার মূলে রয়েছে ৫১/১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা হতে ঋষী বঙ্কিম সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষে স্বামী আনন্দ ভারতী সমীরণ নামের এক ব্যক্তির স্বাক্ষরসম্বলিত একটি লিফলেট।

"ঐ লিফলেটটিতে বলা হয়েছে- (১) বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর ব্যাপকভাবে অত্যাচার করার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে প্ররোচিত করতে হবে। (২) এ লক্ষ্যে কিছু অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে হবে যাতে ব্যাপক হিন্দু নিধন হয়। (৩) সর্বাগ্রে বাংলাদেশী হিন্দুদের স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনে সহায়তা করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সুবর্ণ সুযোগ।"

এই সুবর্ণ সুযোগটির সদ্ব্যবহারের জন্য এদেশে সংগঠিত হয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষেদ, যার প্রথম উদ্দেশ্য এদেশে হিন্দু হত্যার প্ররোচনা সৃষ্টি করা। এই পরিষদের নেতাটি বঙ্গভূমির টার্গেটল্যান্ড দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি কলকাতার ৫১/১ কলেজ স্ট্রীটের খুঁটির জোরে এদেশে বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। যেমনঃ

(১) ২লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ তারিখে খুলনার শহীদ হাদিস পার্কের জনসভায় তিনি বলেছেন, কোন সাহসে সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেছে।

(২) ১১ ই জুন, ১৯৯১ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভায় বলেছেন, আপনারা (মুসলমানরা) এদেশ ছেড়ে পাকিস্তান অথবা মধ্যপ্রাচ্য চলে যান।

(৩) ৭ই জুলাই ১৯৯১ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সভায় বলেছেন, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমকে আমরা নিন্দা করি, এগুলো যারা রক্ষা করে তাদের আমরা ঘৃণা করি।

(৪) ২২ শে জুলাই ১৯৯৩ তারিখে পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সম্মেলনে বলেছেন, আমাদের একটি ছেলেকেও গ্রেফতার করা হলে বাংলাদেশের কবর রচনা করব।

(৫) ৪ঠা ডিসেম্বর '৯২ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটের সভায় তাদের মুসলমান সদস্য একজন বিচারপতি বলেছেন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা একটি অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক কাজ।

ঐক্য পরিষদের নেতাটি স্বজাতির জন্য রক্তের টানে, নাড়ীর টানে এবং স্বজাতির সম্প্রসারণের জন্য সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু একজন মাওলানা, একজন মুসলমান বিচারপতি এবং আরও কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবী কি করে সংখ্যালঘু হলেন এবং কিসের টানে হিন্দু–বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদে সামিল হলেন? শুধু সামিল হওয়াই নয় তারা ঐক্য পরিষদের নেতার সাথে একই সুরে কথা বলেন। যেমন ডঃ আহমদ শরীফ।

মামার জন্য ভাগিনার যেমন দরদ, ডঃ আহমদ শরীফের বক্তৃতার তেমনি দরদ দেখা যায়। গত ২৭শে এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে টিভি রুমে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় তিনি যা বলেছেন তার সাথে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতার বক্তব্যের এতটুকুও পার্থক্য নেই। তিনি বলেছেনঃ

(১) হিন্দুকে দুর্বল পায় বলেই মুসলমানরা তাকে ধমকায়, তার পুকুরের মাছ তুলে নিয়ে যায়।

(২) মানুষ যেমন সাপের বিরুদ্ধে লড়ে, তেমনি একটা কিছু ঘটলেই সব মুসলমান হিন্দুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

(৩) খবরদার (হিন্দুরা) নিজ ভিটে মাটি ত্যাগ করবেন না। মনে রাখবেন মানুষ শক্তের ভক্ত নরমের যম।

(৪) অনেকে হীনমন্যতার কারণে ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দিচ্ছে না, ট্রানজিট সুবিধা দিচ্ছে না।

রক্তের টান ঃ এই সব মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা আসলেই সংখ্যালঘু। কারণ ১২ কোটি মানুষের এই দেশে তাদের মত মানুষের সংখ্যা বার শতও নয়। সে হিসাবে তাদের কোন সংগঠন করার মত জনবল নেই। এরা হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, খৃষ্টানও নয়। এদের প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই নেই। কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। যে বিশ্বাসের অনুসারীদের দিক নির্দেশনা দেয়ার মত লিখিত বা মৌখিক কোন বিধান নেই তাদের কোন নীতি বা নৈতিকতা থাকতে পারে না। কিন্তু তাদের মূল তো একটা আছে। সেই মূলের টানেই তারা ঐক্য পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

ভারত বিভাগের পর এই বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসছিল না। কারণ মূল ছিড়ে আসতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। কলকাতায় যখন 'তারা না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায় পড়ল তখন তারা ঢাকায় আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মূল ছিন্ন হওয়ায় 'তুষের আগুন' তাদের সর্ব মুহূর্তে যাতনা দিতে থাকে। বঙ্গভূমিওয়ালাদের প্রদত্ত সুবর্ণ সুযোগ তাদের অন্তরে 'তুষের আগুন' নির্বাপণের ক্ষীণ আশার সঞ্চার করে। ঐ ক্ষীণ আশাটাকে বড় করার জন্যই আজ তারা মুসলমান হয়েও হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের ছত্রছায়ায় বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে চলেছে।

সাগরের প্রতি পানির টান যেমন সৃষ্টির আদি হতেই আছে, মানুষের বেলায় ও হাজার বছর পূর্বে গত হয়ে যাওয়া পূর্ব পুরুষের অভ্যাস আচরণের প্রতি বর্তমান কালে মানুষের মধ্যে আকর্ষন জাগ্রত হতে পারে। এবার ঐ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মূল কোথায় তা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। তার পূর্বে মূলের প্রতি মানুষের টানের একটা ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক আলেক্স হালি।

আলেক্স হালি পৃথিবী বিখ্যাত পুস্তক 'দি রুটস' এর লেখক। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা প্রায় তিনশত বছর পূর্বে আফ্রিকায় মানুষ শিকারে যেত। পথে প্রান্তরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচরণকারী মানুষদের তারা পশু শিকার করার মত শিকার করে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে পশুর মত জাহাজ বোঝাই করে আমেরিকায় নিয়ে এসে দাস হিসাবে ব্যবহার করত।

ঐ কৃষ্ণাঙ্গরা আর কোনদিন দেশে ফিরে যেতে পারেনি। তাদের স্বজনেরা জানত তাদের ছেলেমেয়েদের ছেলে ধরায় নিয়ে গেছে। তারাই এখন আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক। বংশবৃদ্ধি হয়ে নাগরিক অধিকার লাভ করে তারা এখন আমেরিকান সমাজের উল্লেখ যোগ্য অংশ।

আমেরিকার সমাজে বসবাস করে আমেরিকান খাদ্যে, পোশাকে, অভ্যাসে, চাল-চলনে অভ্যস্ত হলেও তাদের আচার আচরণে, মন-মানসিকতায় এখনও সেই অজানা অচেনা আফ্রিকার চিত্র প্রতিফলিত হয়। মূলের প্রতি এই মোহের কারণে আলেক্স হালি মাত্র কয়েক বছর পূর্বে নিজ পূর্বপুরুষের সন্ধানে আফ্রিকা গিয়েছিলেন।

কিন্তু আফ্রিকায় হালির পূর্ব পুরুষদের কে-ই বা তাকে চিনবে আর তিনিই বা কাকে চিনবেন? কিন্তু বংশপরিচয়ের সূত্র, খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হলেও হালি যেমন নিজ রঙ, চেহারা, শারীরিক গঠন দ্বারা নিজের আফ্রিকান সত্ত্বা উপলব্ধি করেন তেমনি আফ্রিকার নিজ গ্রামে হাজির হলে গ্রামবাসীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছে। হালির পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-অভ্যাস আমেরিকান হওয়া সত্ত্বেও শরীর মন ও মানসিকতার কারণে গ্রামবাসীরা তাকে স্বজাতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। এটা মূলের টান। আলেক্স হালির এই নাড়ীর টান এবং এই আফ্রিকা গমনের মধ্যে রয়েছে সেই 'কুল্লু শাইয়্যিন ইয়ারজিউ ইলা আছলীহ' প্রবাদের প্রতিফলন।

হালির মূলের টানের প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের বিপথগামী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের যারা স্বজাতি ও স্বধর্মের বিরোধিতা করেন, যারা নাস্তিকতার রোগাক্রান্ত, যারা যৌন স্বাধীনতার নেশাগ্রস্ত তাদের ঐ মানসকিতার প্রেক্ষিতে তাদের মূল অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

মুসলমানের পূর্বপুরুষ ঃ আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার অধিবাসীরা বর্বর জীবন যাপন করত। এরা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়, টিলায়, গুহা-গহবর তৈরী করে বসবাস করত। ঝোপে-জঙ্গলে, খালে-বিলে, পশু-পাখী, মাছ, কচ্ছপ শিকার করে আগুনে ঝলসিয়ে খেত। দেশ, জাতি, ধর্মকর্ম বিয়ে সাদীর বা নীতি নৈতিকতার কোন ধারণা তাদের ছিলনা। আর্যরা এদের বলত বয়াংশী, রাক্ষস, পিশাচ, অসুর ইত্যাদি।

আর্যদের আগমনের পর আর্যদের দেখাদেখি এদের জীবন যাত্রার ধারণা বদলাতে থাকে। কিন্তু আর্যরা তাদের লোকালয়ে আসতে দেয়না। আর্যদের নিজ প্রয়োজনে এদের একটি অংশকে বাছাই করে ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার হিসাবে গ্রামে বসতী করতে দেয়। বাকীরা গ্রামের বাইরে অচ্যুত অস্পৃশ্য হিসাবে কুড়ে ঘর তৈরী করে থাকত। এরাই হল হাড়ি, ডোম

কৈবর্ত। ভিন্ন প্রবন্ধে পূর্বেই বলেছি বাবুদের জাত নষ্ট হবে ভয়ে এরা বাবুদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে না এলেও এদের মেয়েরা ডালা, কুলা, চাঙ্গারী তৈরী করে বাবুদের বাড়ী এসে নেচে গেয়ে সে সব বিক্রি করত। এর মধ্যে সুন্দরী যৌবনবতী মেয়েদের দেখে বাবুরা লোভ সামলাতে পারতেন না। অস্পৃশ্যতা ভুলে গিয়ে তারা রাতের আঁধারে তাদের কুটিরে গিয়ে তাদের দেহ সম্ভোগ করতেন। এদের গর্ভজাত সন্তানেরা বয়সকালে কর্মসম্বল করে সমাজের নানা স্তরে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত।

এই বয়াংশীদের নিজেদের কোন ধর্ম ছিল না। কিন্তু আর্যদের ধর্ম চর্চা দেখে, বর্ণাঢ্য ধর্মীয় উৎসব-পর্বের চাকচিক্য দেখে তাদের অন্তরে ধর্মতৃষ্ণা জাগরিত হত। কিন্তু বয়াংশীদের জন্যে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কোন বিধান ছিল না। কারণ তাদের বেদ এর বাণী উচ্চারণ করা বা বেদ পাঠ করা অস্পৃশ্য বয়াংশীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং বয়াংশীরা হিন্দুর ধর্মে দীক্ষিত না হয়েও শ্রমিক হিসাবে শ্রোতা হিসাবে বা দর্শক হিসাবে হিন্দুর উৎসব পর্বাদিতে অংশ গ্রহণ করতে করতে অবলীলাক্রমে নিজেদের হিন্দু বলে মনে করতে থাকে। (আমাদের বর্তমান সমাজে মেথর ধাঙ্গড় সম্প্রদায়কে এর নিকটতম দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যায়)। এই মনে করার একটা বিশেষ কারণ আছে। সেই কারণটা হচ্ছে নীচু জাতের হিন্দুরা বাবুদের হাজারো নির্যাতন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, প্রহসন সয়েও বাবুদের অনুগত কাজের মানুষ হিসাবে বাবুদের নিতান্ত আপনজন মনে করতে থাকে। কালে এরাই নিম্নবর্ণ হিন্দু হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

ব্রাহ্মণগণ এই নিম্নবর্ণ হিন্দুর মানবাধিকারের দাবীকে অবদমিত রাখার জন্য তাদের হিন্দু নামে পরিচিত রাখার জন্য এবং তাদের ধর্মতৃষ্ণাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের বুঝিয়েছিল যে, যেহেতু ব্রহ্মাই তাদের সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তারা হিন্দু। কিন্তু যেহেতু ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মাণ, হাত হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে, বৈশ্য এবং পদ হতে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছে সেহেতু ব্রাহ্মণরা শ্রদ্ধেয় ধর্মপুরুষ, ক্ষত্রিয়রা শাসক, বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্য করবে আর শূদ্ররা তাদের সবার সেবা করে যাবে। সুতরাং নিম্নবর্ণ হিন্দুরা তাদের সকল লাঞ্ছনা, গঞ্জনা দুর্দশাকে ধর্মীয় বিধান, নিয়তির বিধান হিসাবে মেনে নিয়ে নিজেদের বাবুদের সেবায় নিয়োজিত রাখে।

এদেশে মুসলমান আগমনের সাথে সাথে ঐ নিগৃহিত নীচু জাতের হিন্দুর মনে জীবনবোধ ও ধর্মবোধ আন্দোলিত হয়ে উঠে। সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য এরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ওদিকে যুদ্ধোপলক্ষে যেসব মুসলমান এদেশে এসেছিল তারা সবাই সাথে করে বউ নিয়ে আসেনি।

সুতরাং তারা ধর্মান্তরিত হাড়ি, ডোম, কৈবর্তদের মেয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। কালের স্রোতে এই ধর্মান্তরিতেরা মুসলমান সমাজের সাথে একাকার হয়ে যায়। যারা ধর্মান্তরিত হয়নি তারা ধর্মান্তরিতদের মামা-চাচা হিসাবে হিন্দু হিসাবেই রয়ে গেল।

ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বেশীর ভাগই ইসলামনিষ্ঠ হয়ে উঁচুদরের মুসলমান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের কিছুসংখ্যক ছিল যারা সেই চাচা মামাদের মমত্ব ভুলতে পারেনি। পূর্ব-পুরুষদের পূজা পার্বন, উৎসব ইত্যাদির আকর্ষণ ভুলতে পারেনি। এরা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় নিয়ে মুসলমান সমাজে থেকেও ইসলাম বিরোধী আচরণ করত। এদেরই বংশধরেরা তাদের পূর্ব-পুরুষ হাড়ি, ডোম, কৈবর্তদের বংশগত বাবু-ভক্তি, বাবু প্রীতি, ধর্মহীনতা ও ব্যভিচারের ধারাকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বয়ে এনেছে। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও রয়েছে।

বংশগতি ঃ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মনোবিজ্ঞানী গ্রেগর জোহন মেন্ডেল মানুষের বংশগতির একটি সূত্র আবিস্কার করেন। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার পর তিনি দেখেছেন, পিতা ও মাতা দু'জনের মধ্যে যদি এমন দুটি গুণ থাকে যার একটি শক্তিশালী এবং অপরটি দুর্বল, তবে তাদের বংশে তৃতীয় পুরুষে অর্থাৎ পৌত্রে সেই দুটি গুণের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা হবে ৩:১। অর্থাৎ মাতা-পিতার মধ্যে একজন যদি ধার্মিক হয় অপরজন যদি অধার্মিক হয় এবং ধার্মিকের গুণটি যদি নিষ্ঠা দ্বারা শক্তিমান হয় তবে ঐ মাতা-পিতার চারটি সন্তানের মধ্যে তিনটি ধার্মিক এবং একটি অধার্মিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

আবার মনোবিজ্ঞানী গ্যালটনের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, মানুষ যেসব দোষগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেসব দোষগুণ শুধু মাতা-পিতা হতেই লাভ করে না। সেসব দোষগুণ পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী এবং তারও উর্ধ্বতন পুরুষ হতেও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে।

গ্যালটনের মতে মানুষ তার চরিত্রের দোষগুণের অর্ধেক লাভ করে পিতা-মাতা হতে, এক-চতুর্থাংশ পায় পিতামহ বা পিতামহী হতে, এক-অষ্টামাংশ পায় প্রপিতামহ বা প্রপিতামহী হতে এবং বাকীটাও ঐ হারে আরও উর্ধ্বতন পুরুষ হতে পেয়ে থাকে।

এয়োদশ শতক হতে শুরু করে যত হাড়ি, ডোম কৈবর্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান। কিন্তু মেন্ডেল ও গ্যালটনের বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসারে এসব মুসলমানদের মধ্যে সেই হাড়ি, ডোম, কৈবর্তের দোষগুণ আসতেই পারে। সুতরাং যেসব ডোম্বিনীরা সেকালে নেচে গেয়ে বাবুদের মনোরঞ্জন শেষে দেহদান করত, ধর্মান্তরিত সেসব ডোম্বিনীদের বর্তমান উত্তর পুরুষেও সেই মানসিকতার আবির্ভাব ঘটা স্বাভাবিক।

আজ আমাদের সমাজে যারা স্বজাতি ও স্বধর্ম বিরোধী বক্তৃতা প্রচার করে বাবুদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করছে তার মধ্যেও সেই 'কুল্লু শাইয়িন ইয়ারজিউ ইলা আছলীহ' প্রতিধ্বনিত হয়। গ্যালটনের সূত্রমতে মানুষ তার দোষগুণের এক অষ্টমাংশ মাত্র সুদূর পূর্ব-পুরুষ হতে পেয়ে থাকে বলেই দেশে জাতিদ্রোহী মানুষের সংখ্যা কম- যা বার কোটি মানুষের এই দেশের বার শতও নয়।

আমাদের সমাজে যারা যৌন স্বাধীনতা বা জরায়ুর স্বাধীনতার প্রচারণা চালাচ্ছে তারা যে মূলের টানে ঐ প্রচরণা চালাচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার সেই মূলটা কোথায় তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

বৈষ্ণবদের পূজিত দেবতা শ্রী চৈতন্যকে হিন্দু সম্প্রদায় কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করে। একারণে শ্রী চৈতন্যের মৃত্যুর পর ভক্তগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণ-চৈতন্য জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব নেড়া-নেড়িগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুকরণে যৌনলীলায় মত্ত হয়ে পড়ে। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ ঐ বামাচারীদের সম্পর্কে লিখেছেন– নির্বিচার যৌনসঙ্গমের জন্য একদল নর-নারী ভৈরব চক্র নামে একটি চক্রে মিলিত হত।

বামাচারীরা যখন ভৈরব চক্রের মিলিত হত তখন ব্রাহ্মণ চন্ডালে কোন ভেদাভেদ থাকত না। একদল নর-নারী একটি নির্জন স্থানে একত্রিত হয়ে একটি চক্র তৈরী করে উপেবেশন করত। এই কামুক দলের পুরুষরা একজন নারীকে বেছে নিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তার পূজা করত। অনুরূপভাবে মেয়েরাও একজন পুরুষকে বেছে নিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তার পূজা করত। পূজা শেষে সকলে মিলে উদ্দাম মদ্যপান করত। মদ্যপানের পর মদমত্ত সকল নর-নারী তাদের পরিধানের বস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাকে যার ইচ্ছা তার সাথে এবং যতজনের সঙ্গে সম্ভব ততজনের সঙ্গে অবাধ যৌনসঙ্গমে মেতে উঠত। যৌনসঙ্গী যদি মাতা, ভগ্নী বা কন্যাও হত তাতেও কোন আপত্তি ছিল না।

স্বামীজী তান্ত্রিকদের অপর সম্প্রদায় চোলমার্গীদের সম্পর্কে লিখেছেন তারা একটি গুপ্তস্থানে সকল স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকা, মাতা-কন্যা, ভগ্নি পুত্রবধুসহ একত্রিত হত। সেখানে তারা মদ ও মাংস ভোজন শেষে একজন নারীকে উলঙ্গ করে তার গুপ্ত অঙ্গের পূজা করত। উপর্যুপরি মদ্যপান করে যখন তারা উন্মত্ত হয়ে উঠত, তখন সকল স্ত্রীলোক তাদের বক্ষবস্ত্র বা কাঁচুলি খুলে একটি বড় গামলায় রাখত। মদমত্ত পুরুষেরা ঐ গামলা হতে একেকজন একটি করে কাঁচুলি উঠিয়ে নিত। ঐ কাঁচুলিটি যে স্ত্রীলোকের হত সেই স্ত্রীলোকটি মাতা হোক, ভগ্নি হোক, কন্যা হোক, বা পুত্রবধু হোক সে সময়ে

সে ঐ পুরুষটির যৌনসঙ্গী হয়ে যেত। সারা রাত তারা সেখানে কুকর্ম করত। সকালে একটু অন্ধকার থাকতে তারা ঐ স্থানত্যাগ করত এবং যে যার মাতা, ভগ্নি, কন্যা, পুত্রবধু ইত্যাদি যা ছিল ঘরে ফিরে তাই-ই হয়ে যেত। এটাই ছিল তাদের সামাজিক রীতি। এটাকে তারা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করত।

এসব কাহিনী খুব বেশী পুরানো কাহিনী নয়। পঞ্চদশ শতকে এসব ঘটনা ঘটতো। ঐ সময় এদেশে দলে দলে পীর, ফকির, দরবেশগণ আসতে থাকেন। বহু চোলমার্গী এবং তান্ত্রিক ঐ অনাচার ত্যাগ করে সে সময়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী মেন্ডেল এবং গ্যালটনের বংশগতির সূত্র অনুসারে ঐ তান্ত্রিক এবং চোলমার্গীদের উত্তর-পুরুষ মুসলমানদের মধ্যে ঐ ব্যভিচারের মানসিকতা উত্তরাধিকার সূত্রে আসতেই পারে। আর এসেই যাদি ব্যভিচারে পরিবেশ পেয়ে যায় তবে সেই পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার মানসিকতাটা মূলের টানে প্রচণ্ড মূর্তিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আজ যারা যৌন স্বাধীনতা, জরায়ুর স্বাধীনতা দাবী করছে তারা অবশ্যই ঐ চোলমার্গীর বংশদোষপ্রাপ্ত মুসলমান। সেই মূলের টানেই তারা জরায়ুর স্বাধীনতা দাবী করছে। এই দাবীটা জনপ্রিয় করতে পারলেই আবার সেই ভৈরবী চক্র অনুষ্ঠান হবে। কারন 'কুল্লু শাইয়িন ইয়ারজিউ ইলা আছলিহী'।

স্বজাতীয়তাবোধক এবং স্বধর্মী শিক্ষা দ্বারা মানুষের রক্তদোষ, বংশদোষ, রিপুর দোষ ইত্যাদি পরিশোধনের ব্যবস্থা সকল সমাজেই আছে। এই শিক্ষার প্রয়োজনেই বিশ্বে মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, চতুস্পাঠি, গীর্জা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনে ঐ শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক। কারণ ধর্মান্তরিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান এর সমন্বয়ে এদেশের মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছে।

সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে ঐসব মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের পরিত্যাজ্য বংশদোষ মুসলমান সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু আমাদের সরকারের উদাসীনতার কারণে সেরকম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হয়নি। একারণে আজ ধর্মদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মাকান্ডসহ যৌন স্বাধীনতা এবং যৌন অনাচারের প্রকাশ্য দাবী উঠছে। আর যারা সে দাবী করছে তাদের পূর্ব-পুরুষ যে চোলমার্গী বা তান্ত্রিক ছিল তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঠ্যালার নাম বাবাজী

ঠ্যালার নাম বাবাজী' এটি একটি গ্রাম্য প্রবাদ যা আহাম্মক মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়। অপরাধ অস্বীকারকারী চোর, বাটপার, খুনীর উপর সত্য উদঘাটনের জন্য যে যন্ত্রণাদায়ক চাপ সৃষ্টি করা হয় সেটাই ঠ্যালা। অর্থাৎ অপরাধী অপরাধ স্বীকার না করলে চাবুক মেরে যখন স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় তখন তাকে বলা হয়, 'ঠ্যালার নাম বাবাজী।

আজকাল প্রতিবছর পহেলা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে টেলিভিশনে এবং পত্রপত্রিকায় বিশেষ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়ে থাকে। একটি বিজ্ঞাপন হচ্ছে ঃ "এইডস একটি মারাত্মক রোগ। এর কোন চিকিৎসা বা প্রতিষেধক টিকা নেই। এইডস মুক্ত থাকতে হলে আপনি কি করবেন? ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন। মনে রাখবেন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলাই এইডস থেকে বাঁচার সব চেয়ে সহজ পথ।" এইডস এর ঠ্যালায় শেষ পর্যন্ত টেলিভিশনও মৌলবাদী হয়ে গেছে বলে মনে হয়। ধর্মের কথা থাকলে যে টেলিভিশন বিজ্ঞাপন পর্যন্ত গ্রহণ করত না এখন সেই টেলিভিশনই ধর্ম মেনে চলতে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে অর্থাৎ সেই বাবাজী ডাক শুরু করেছে।

এই সেই টেলিভিশন, যে টেলিভিশন ১৯৯১ সালের মাহে রমযান উপলক্ষে আল বারাকা ব্যাংক কর্তৃক আনিত একটি বিজ্ঞাপন প্রচারে অসম্মতি জানিয়েছিল। কারণ বিজ্ঞাপনটিতে 'খোশ আমদেদ, রমযানুল মোবারক' এই ক্যাপসনটি ছিল। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রক বিজ্ঞাপনটি ফেরৎ দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন এ ধরনের কথাসহ বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। কেন যাবে না জানতে চাইলে বলেছিলেন নিষেধ আছে। অর্থাৎ ঐ ধর্মীয় বাক্যগুলোতে তারা মৌলবাদের গন্ধ আবিষ্কার করেছিলেন। ভূতের মুখে রাম নামের মত আজ কাল তারাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য জনসাধারণকে খোশামোদ করছে।

ঐ ক'দিন এখানে সেখানে বহু আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে বহু আস্তিক, নাস্তিক, আধা নাস্কিত বক্তারা যোগদান করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। তাদের সবাই জনসাধারণের অবগতির জন্য জানিয়েছেন ব্যভিচার এবং অবাধ যৌনাচার দ্বারাই এইডস রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে। এইডস রোগীর সাথে উঠা-বসা, খানা-পিনা করলেও এইডস রোগ হবে না। কিন্তু

যেই মাত্র তার সাথে যৌন সঙ্গম করা হবে বা তার রক্ত শরীরে গ্রহণ করা হবে অমনি তাকে এইডস এর শিকার হতে হবে। সুতরাং তাদের সবার উপদেশ হচ্ছে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন, তাহলে আর এইডস হবে না। অর্থাৎ ধর্মে ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং ব্যভিচার করবেন না। এজন্যই বলেছিলাম 'ঠ্যালার নাম বাবাজী'।

কিন্তু ব্যভিচার বন্ধ হলে জরায়ুর স্বাধীনতা দাবী করে যে সব মেয়েরা সাহিত্য লিখছে, আন্দোলন করছে, মিছিল করছে মিটিং করছে আবার তার সমর্থনে যারা রাস্তায় মিছিল করছে, তাদের কি হাল হবে? তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিজ্ঞাপনও হয়েছে যেমনঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অধিনে রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীর দেয়ালে, একটি বড় পোষ্টার সাটা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল "এইডস একটি সংক্রামক রোগ। এইডস যক্ষ্মা বা ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক। এর কোন চিকিৎসা বা টিকা নেই। জীবনের সুন্দর গুণাবলি দ্বারা এইডস প্রতিহত করুন।" এখানে ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলা হয়নি। রেডিও বাংলাদেশ হতেও ঐ একই কথা বলা হয়েছে, সেখানেও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কথা বলা হয়নি।

কিন্তু জীবনের সুন্দর গুণাবলী কি? যে ব্যক্তি জরায়ুর স্বাধীনতার দাবী নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং ঐ ধরনের সাহিত্য লিখে বিখ্যাত পুরস্কারও পায় সে কি সুন্দর গুণাবলির অধিকারী নয়? নইলে সে পুরস্কৃত হবে কেন? তবে কি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যভিচার বহাল রেখেই এইডস হতে মুক্তি পাওয়ার কথা প্রচার করেছেন অথবা ভিতরে ভিতরে এইডস এর পথ পরিষ্কার করছেন? তারা কি বিশ্বাস করেন না যে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ধর্মের চেয়ে শক্তিশালী আর কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। শক্তিশালী আর কোন অনুশাসন নেই।

দেশে অপরাধ দমনের জন্য দন্ডবিধিতে শাস্তির বিধান আছে। রোগ প্রতিরোধের জন্য যেমন টিকার ব্যবস্থা আছে, ধর্মের হাতেও তেমনি অপরাধ প্রতিরোধক কঠোর অনুশাসন আছে। সেই অনুশাসন লংঘন করলে দন্ডবিধির বিধানের চেয়েও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। মানুষের ব্যক্তি জীবনে নানা রোগ-ব্যাধি, সমাজ জীবনে প্রাকৃতিতে দুর্যোগই সেই শাস্তি।

দন্ডবিধির আইন প্রয়োগের জন্য পুলিশ আছে, পুলিশের হাতে লাঠি আছে, বন্দুক আছে, হাত কড়া আছে। কিন্তু ধর্মের হাতে ওসব কিছু নেই। ধর্মের হাতে যা আছে তা আরও ভয়ংকর অস্ত্র, সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে ধর্মীয় বিধান লংঘনকারীকে কেউ দারোগা পুলিশের মত তেড়ে আসে না। আণবিক অস্ত্রের তেজস্ক্রীয়তা যেমন করে মানুষের জীবনী শক্তিকে অতি সঙ্গোপনে কুরে

কুরে খায় এবং রোগ-ব্যাধির জন্ম দেয় ধর্মের অস্ত্রও তেমনি করে ধর্মীয় বিধান লংঘনকারীর জীবনী শক্তি কুরে কুরে খায় এবং চরম অবস্থায় আণবিক অস্ত্রের মত বিস্ফোরিত হয়ে একের পাপে বহুকে ভোগায়। এইডস রোগটি তেমনি এক এটোমিক শাস্তির বিস্ফোরণ।

মানুষের তৈরী আইন ভঙ্গ করে অপরাধী পুলিশের হাতে ধরা নাও পড়তে পারে। সে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আরাম আয়েশে কাল যাপন করতে পারে। ভাল মানুষ সেজে পুলিশের সামনে দিয়েই চলাফেরা করতে পারে, পুলিশ তাকে নাও চিনতে পারে। কিন্তু ধর্মের আইন ভঙ্গকারীরা চির চিহ্নিত হয়ে যায়। আল্লাহর শাস্তি আণবিক তেজস্ক্রিয়তার মত অপরাধীকে কুরে কুরে খেতে থাকে।

মানুষের তৈরী দন্ডবিধিতে যেসব আদেশ নিষেধ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই আল্লাহর আইনের অংশবিশেষ। আল্লাহ বলে দিয়েছেন, রূপ, রস, গন্ধে ভরা সুন্দর এই বসুন্ধরাকে ভাব, কান্তি, বিলাস রসে ভরপুর করে দেওয়া হয়েছে। সে সবের ভোগ উপভোগের দ্বারা জীবনকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে নেওয়া যেতে পারে, অথবা অপরিমিত, অসংযত ভোগ বিলাস দ্বারা জীবনকে দুর্বিসহ করে দেওয়া যেতে পারে। ভোগ বিলাসের পরিমাপ মানুষের রুচি ও বিবেকের অধীন।

অপরিমিত ভোগ বিলাসে প্রথমে সিফিলিস গনোরিয়ার মত আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি আসে, মানুষের কাছে ধিক্কারের বিষয় হয়, পরে সমাজে অপযশ লাভ হয়। তারপরও যদি ভোগের পরিমিতি না আসে তবে তার জন্য আল্লাহর শাস্তির টাইমবম পাতা আছে। পাপের তাপে তা উত্তপ্ত হয়ে বিস্ফোরণোমুখ হয়ে উঠে। পাপের উত্তাপ যখন আল্লাহর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে তখনই শাস্তির ঐ টাইমবমটি বিস্ফোরিত হয়। সেই বিস্ফোরণে বহু সাধুকে, বহু নিরপরাধিকেও জ্বলে পুড়ে মরতে হয়। 'একের পাপে দশে ভোগে' কথাটির উৎপত্তি এখান হতেই এবং এইডসই সেই টাইমবম। সিফিলিস, গনোরিয়া, ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি বহু ছোট ছোট শাস্তির শেষে এইডস রোগ এসেছে। এতেও যদি মানুষ সৎপথে ফিরে না আসে তবে এই ঠ্যালা, ঠ্যালা নয় আরও ঠ্যালা আছে।

কতিপয় অসতের অসদাচারের কারণে বৃহত্তর সমাজের নিরপরাধ মানুষকে যাতে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়, তার জন্যই সাধু লোকেরা মানুষকে সৎপথে চলার নসিহত করে। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী।

ভোরের আযান চোরের চুরি ব্যাহত করে, বেশ্যার বেশ্যাবৃত্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। তাই চোর এবং বেশ্যাদের কাছে ভোরের আযান বড় বিরক্তিকর এবং মোয়াজ্জেন তাদের শত্রু।

ঠিক তেমনি অসতেরাও নসিহতকারীদের বিরক্তিকর মনে করে এবং মৌলবাদী নামে আখ্যায়িত করে মনের ঝাল মিটায়। বর্তমান সময়ে অসৎ মানুষেরা একটা মারাত্মক মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছে, তা হচ্ছে মৌলবাদ বেশী মারাত্মক না এইডস বেশী মারাত্মক। একারণেই বোধ হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রচারিত পোষ্টারে ধর্মের কথা না বলে জীবনের সুন্দর গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে।

নদীর তীরে বসে ঢেউকে যত গালাগালই করা হোকনা কেন তদ্বারা ঢেউ এর গতি ভঙ্গও হয় না বা ছন্দ পতনও হয়না। বরঞ্চ যে গালাগাল করে তার মুখের ভাষা খারাপ হয়, মানসিকতা নষ্ট হয়, আবেগ উত্তেজনা দ্বারা তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আয়ু ক্ষয় হয় এবং এক সময় সে মরেও যায়, কিন্তু ঢেউ মরে না বা নষ্টও হয় না। লক্ষ বছর পূর্বে তার যেমন ছন্দ, তাল, গতি ছিল আজও তাই আছে।

ধর্মও সেই ঢেউএর মত শাশ্বত। যুগ যুগ ধরে চোর বেশ্যা ও ব্যভিচারিরা ধর্মকে ভ্রুকুটি করেছে, ধর্মের বিরুদ্ধে কটাক্ষ কটুক্তি করেছে, ধর্মনিষ্ঠকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে উত্যক্ত করেছে, মৌলবাদী নামে গালাগাল করেছে। কিন্তু তাতে ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি বা ধর্মের গতি বিঘ্নিত হয়নি। বরঞ্চ তারা নিজেরাই সামান্য কদিন মাত্র বিষ্ঠার কিড়ার মত কিল বিল করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। তাদের কেউ বার্দ্ধক্য জ্বরায় মরেছে, কেউ অপঘাতে, মহামারীতে আবার কেউ এইডস এর মত দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে মরেছে। কিন্তু ঢেউয়ের যেমন বার্দ্ধক্য নেই, জ্বরা নেই, মৃত্যু নেই, তেমনি ধর্মেরও বার্দ্ধক্য নেই, জ্বরা নেই, মহামারী নেই, মৃত্যু নেই।

ধর্ম চিরন্তন। ধর্ম মানুষের বিপদের বন্ধু। বিপদে পড়লে গোঁড়া নাস্তিকের মুখ হতেও আল্লাহর নাম বেরিয়ে পড়ে। রোগে, ব্যাধিতে, দুঃখ যাতনায় পাষন্ড ধর্মদ্রোহীর মুখ দিয়েও অবচেতন অবস্থায় আল্লাহর নাম বেরিয়ে আসে, সচেতন অবস্থায় মসজিদে মাযারে শিরণী মানত করে। আজ এইডস রোগের আতঙ্কও মানুষকে ধর্মের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে, আরও অনেক বেশী করে। তাই আজ নাস্তিকও ধর্মীয় অনুশাসনের মুখাপেক্ষী হচ্ছে এরই নাম 'ঠ্যালা'।

নাস্তিকের বিয়ের মন্ত্র নেই

শাস্ত্রজ্ঞরা, বলেছেন, "বুদ্ধিমান মানুষ শাস্ত্রলোচনার বিবাদে কাল যাপন করেন, আর মুর্খরা নিন্দ্রা ও কলহে কালক্ষেপন করে।"

কাল যাপন করা এবং কালক্ষেপন করা এ কথা দুটির মধ্যে একটা দার্শনিক পার্থক্য রয়েছে। মানুষ কাল যাপন করে দু'রকমঃ

প্রথমটি হচ্ছেঃ সম্পদে– প্রাচুর্যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আয়েশে কাল যাপন করা। এই কাল যাপন করা ব্যক্তির জন্য তৃপ্তিদায়ক ও সুখকর।

দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ ভাবের আদান-প্রদান ও চর্চার দ্বারা কাল যাপন করা। এই কাল যাপন সমাজ, জাতি ও সভ্যতার জন্য সুফলদায়ক।

আবার কালক্ষেপনও হয় দু'প্রকারের ঃ

প্রথম প্রকার কালক্ষেপণ হচ্ছে, রোগ–শোক, দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন ইত্যাদি বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে যে দিনাতিপাত তা হচ্ছে ব্যক্তিগত কালক্ষেপন যা ব্যক্তির জন্য দুঃখদায়ক।

দ্বিতীয় প্রকার কালক্ষেপন হচ্ছে, যাদ্বারা সমাজ জীবনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কলহ কোন্দল, পাপ ও অজ্ঞানতার চর্চা দ্বারা সমষ্টির জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করা হয় যা সমাজ ও সভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক।

যারা কালযাপন করেন তাদের সুখ মানে আমাদের সবার সুখ। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও আমরা সুখী। যারা ব্যক্তিগত দুঃখ-দৈন্য ও রোগ-শোক ইত্যাদির মধ্যে কালক্ষেপন করেন তাদের জন্য দুঃখবোধ করি, সমবেদনা অনুভব করি এবং কামনা করি আত্মিক সাধনা, সদভ্যাস ও সদাচারের চর্চা দ্বারা তারা তাদের দুঃখ-দৈন্য অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন।

কিন্তু যারা অজ্ঞানতার চর্চা দ্বারা সামাজিক কলহ-কোন্দল সৃষ্টি করে কালক্ষেপন করেন তাদের জন্য করুনা হয়। কারণ তারা বেশী লেখাপড়া করেছেন, নানা ধর্মের নানা শাস্ত্র পাঠ করেছেন, কিন্তু প্রতিভার দৈন্যতার কারণে কোন ধর্মেরই সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। একারণে এদের উচ্চশিক্ষা জ্ঞানের শানে শাণিত হয়নি, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা লাভ করেও এরা জ্ঞানী হতে পারেনি। আর জ্ঞানের অভাবে তারা আগুন-পানি, আলো-বাতাস, চন্দ্র-সুর্য, গ্রহ-তারা ইত্যাদি সব কিছুর নিয়মানুবর্তিত যে ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মানুষও যে পৃথিবীর সব কিছুর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী তা বুঝবার মত

চিন্তাশক্তি তাদের হয়নি। সুতরাং ঐ অজ্ঞানতার কারণে এরা নাস্তিকতার চর্চা দ্বারা কালক্ষেপন করে। খাদ্য সংস্থান করতে গিয়ে যেমন কৃষিকাজ আবিস্কৃত হয়েছিল তেমনি ধর্ম চর্চা করতে গিয়েই আদি মানুষের মধ্যে জ্ঞান চর্চার উন্মোষ ঘটে ছিল। ধর্ম তত্ত্ব হতে ধীরে ধীরে দর্শনতত্ত্ব বিকশিত হয়েছিল। আজও মানুষ ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই জ্ঞান চর্চা করে। সুতরাং যারা ধর্ম মানে না তারা অজ্ঞানতার চর্চা দ্বারা কালক্ষেপণ করে।

নাস্তিক্যবাদীরা বলে থাকে, "১২ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কিছু লোক নাস্তিক। এরা নামায-রোযা করে না, হজ্ব করে না। কিন্তু এরা কোন অপরাধও করে না। শুধু কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করে মাত্র। এরা এক লক্ষাংশেরও কম কিম্বা তারও অর্ধেক। এতে ধর্মের ক্ষতিটা কি?"

নাস্তিকেরা অজ্ঞান বলেই বুঝতে পারে না, আমাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ হাজার ছাত্রের মধ্যে সন্ত্রাসীর সংখ্যা হয়তো ত্রিশজন। কিন্তু এই ক'জনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কত প্রতিভাধর ছাত্র প্রাণ হারাচ্ছে, কত প্রতিভা বিপথগামী হচ্ছে, জ্ঞান চর্চা বন্ধ হয়ে অস্ত্র চর্চা হচ্ছে, শিক্ষক নাজেহাল হচ্ছে, চার বছরের পড়া আট বছরেও শেষ হচ্ছে না।

তারা বুঝতে পারে না যে, সমাজে খুনী, বদমাস, চোর, ডাকাত এর সংখ্যাও কোটিতে গুটিক মাত্র। কিন্তু এই গুটিকই সমাজকে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত রাখে, মানুষের রাতের ঘুম হারাম করে দেয়। এদের জন্য সরকারকে লাখ লাখ পুলিশ, আনসার, সৈনিক পুষতে হয়।

যে ব্যক্তি সরকারের পাওনা ট্যাক্স খাজনা দেয় না, সে হাজার ভাল কাজ এবং সমাজসেবা করলেও সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। যদি কেউ বলে যে সে চুরিও করে না তাই খাজনা-ট্যাক্সও দিবে না তবে তার মত বড় আহাম্মক আর কে আছে। সে চোরের চেয়ে অধম। কারণ চোর একজনের ক্ষতি করে কিন্তু সে একটা সমাজের, একটা রাষ্ট্রের ক্ষতি করে। তেমনি যে ধর্ম মানে না সে হাজার ভাল কাজ করলেও সে অমানুষ। সে সমাজের কোন মঙ্গলই করতে পারে না, তার কোন কথাই ভাল কথা হতে পারে না। কারণ যে মানুষ প্রার্থনার ভাষা আয়ত্ত করেনি তার মধ্যে সুবুদ্ধি থাকতে পারে না। এ কারণে মনীষীরা বলেছেন, যে কোন প্রকার ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের পরামর্শ নেয়া অনুচিত। কারণ অবিশ্বাসীরা প্রার্থনা করে না। তাদের পরামর্শ সমাজে বিশৃঙ্খলা ও কলহ কোন্দল সৃষ্টি করে, মানুষের

রিপুকে উত্তেজিত করে। কারণ তারা প্রার্থনা করে না বলে তাদের মধ্যে সংযম, সহিষ্ণুতা ও বিনয়ের অভ্যাস থাকে না।

নাস্তিকেরা আসলে কুকর্মাসক্ত। পৃথিবীতে যত ভাল কথা আছে, তা আছে ধর্মের মধ্যে। ধর্মবিরোধী হওয়ায় সে সব ভাল কাজ ও কথার অনুশীলন নাস্তিকতার মধ্যে থাকতে পারে না। তাদের অবস্থা কুকুরের মত। ফুল এবং বিষ্ঠা পাশাপাশি রেখে দিলে যেমন ফুলের প্রতি কুকুর ভ্রুক্ষেপ না করে বিষ্ঠাই মহানন্দে ভোগ করবে। নাস্তিকেরাও তেমনি সব সময় ধর্মের কথা, শৃঙ্খলার কথাকে বাদ দিয়ে কুকথা, কুকর্ম নিয়ে তর্ক সৃষ্টি করে।

চোর যেমন সাধুকে ঘৃণা করে, ডাকাত যেমন চৌকিদারকে ঘৃণা করে, দুর্জন যেমন জ্ঞানীকে বিদ্রুপ করে, বেয়াদব যেমন শ্রদ্ধাস্পদকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, ধর্মজ্ঞানহীন অজ্ঞান মুর্খরাও তেমনি শাস্ত্রবাক্য সম্পর্কে তর্ক ও কলহ-কোন্দল সৃষ্টি করে কালক্ষেপন করে। এবং ধার্মীকদের মৌলবাদী নামে বিদ্রুপ করে।

এই নষ্ট কথকেরা তিনটি কর্মকে কালক্ষেপণের অবলম্বন হিসাবে মনে করে- তথা-রমন, ভ্রমণ, ভক্ষণ অর্থাৎ কাম চর্চা কর, বেড়াও আর খাও। এ ভোগ উপভোগকে অব্যাহত রাখার জন্যই এরা বিবাহ বহির্ভুত যৌন ক্রিয়ার জন্য ওকালতি করে আসছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে, যার ফলে সমাজের শালীনতাবোধে ধস নেমেছে।

ইতিমধ্যেই এক শ্রেণীর-শিক্ষিতা মহিলাকে তারা যৌন বিকারের শিকারে পরিণত করে তাদের দ্বারা বেশ্যাবৃত্তিক সাহিত্যের ব্যবসা চালাতে শুরু করেছে যা মানুষের প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করছে মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

চোর পুলিশকে ভয় করে, কিন্তু যে পুলিশ একবার চোরের মালে ভাগ বসিয়েছে, সেই পুলিশকে চোর আর কখনও ভয় করে না। নারীরা স্বভাবগতভাবেই পর পুরুষকে ভয় করে। কিন্তু যে নারী একবার মাত্র পর পুরুষের অঙ্কশায়ীনী হয়েছে, সে দুনিয়ার আর কোন পুরুষকেই পুরুষ মনে করে না। এমনকি কথায় কাজেও তাদের শালীন অশালীন জ্ঞান থাকে না। এজন্যই কথায় বলা হয় বেশ্যাদের শালীনতা নেই, মুর্খদের বিবেচনা নেই।

সাহিত্যিক বেশ্যাবৃত্তিও তেমনি। একবার শালীনতার বাঁধ ভেঙ্গে দিতে পারলে হু হু করে ব্যবসায়িক সাফল্য আসতে থাকে। ব্যবসায়িক সাফল্য দৃষ্টে এরা এদের বিদ্যাবুদ্ধির সবটুকুই এই কর্মে নিয়োগ করে ঠিক যেমন করে একজন বেশ্যা আর্থিক সাফল্যের জন্য তার সর্বশরীর নিয়োগ করে।

সাতিহ্যিক বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা একজন লেখিকার জীবিকা নির্বাহ হলেও একজন মাত্র লেখিকার সাহিত্য দ্বারা একজন প্রকাশকের ব্যবসা চলতে পারে না। সুতরাং তারা ঐ ধরনের লেখিকার দল ভারি করার চেষ্টা চালাতে গিয়ে ধর্ম-ভীতি, শালীনতা-ভীতি ইত্যাদিতে আঘাত হানতে শুরু করে। অর্থাৎ নিজেরা যে বিষ খেয়েছে সেই বিষ অন্যকেও খাইয়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়। আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও অশ্লীল তর্ক, আরও অশ্লীল সাহিত্য, আরও ব্যবসা।

সুতরাং তাদের সাহিত্য ও বক্তব্য পাঠক ও শ্রোতাসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবান্তর তর্কে সমাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কলহ-কোন্দলের সূত্রপাত হয়। মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলি আহত হয়, সৃজনশীলতা, কর্ম-কুশলতা, উৎপাদন তৎপরতা ব্যাহত হয়; মেধা, সময় ও উদ্দীপনার অপচয় হয়।

তাই মহাকবি কালিদাস তার দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা গ্রন্থে বলেছেন, "সাধারণ বিষ শুধু পানকারিকেই বিনাশ করে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বিষ (অর্থাৎ কামতাড়িতের বিষ) পুত্র পৌত্রকেও বিনাশ করে।"

বিশ্বের সর্বত্র সকল ধর্মের সকল জাতির মধ্যেই নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক সিদ্ধ করার জন্য ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট শপথ বাক্য পাঠ করার বিধান আছে। সকল ধর্মশাস্ত্রেই তার জন্য নির্দিষ্ট বাক্য আছে। ভিন্ন সমাজের অধিবাসী, ভিন্ন বংশোদ্ভুত প্রায় অচেনা দুটি নর-নারী বিবাহ বন্ধন অজানা ভবিষ্যতের পথে যে যাত্রা শুরু করে, সেই যাত্রাটিকে অদৃশ্য আল্লাহ, খোদা, গড, ঈশ্বর বা ভগবানের ইচ্ছা হিসেবে গণ্য করা হয়। ঐ নৈসর্গিক ইচ্ছাটির পূর্ণতার জন্যই শাস্ত্রীয় বাক্য পাঠ দ্বারা বিয়েটিকে শাস্ত্রসিদ্ধ করা হয়। কারণ ভবিষ্যতের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। এ কারণেই ভবিষ্যতের মালিকের বাক্য দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন করা হয় এবং তাঁর হাতে দম্পতির ভাল মন্দকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নাস্তিকদের আল্লাহ, খোদা, গড, ভগবান, ঈশ্বর বলে কিছু নেই এবং তাদের শাস্ত্রও নেই। সুতরাং তাদের বিয়ের মন্ত্র বা শপথ বাক্যও নেই।

একারণেই নাস্তিকেরা পশু-পাখীর মত মুক্ত যৌন চর্চার ওকালতি করে থাকে। অর্থাৎ তারা ব্রাহ্মণ্য বিষের প্রয়োগ দ্বারা পুত্র-পৌত্র নির্বিশেষে প্রজন্মকে ধ্বংসের পথে তাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

পুত্তলিকার পুনর্জন্ম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে সত্তরের দশকে অপরাজিত বাংলা নামে তিন মূর্তির যে ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছিল সেই মূর্তিটি নাকি এখন কথা বলতে শুরু করেছে বা তাকে দিয়ে কথা বলানো হয়েছে। এক একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে নাকি বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখিয়েছে তরুণরা ঐ মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর মূর্তিটি জলদ-গম্ভীর স্বরে ফিল্মি কায়দায় তাদের ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। অথচ ঐ মূর্তিটি রড ও সিমেন্টের তৈরী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মারক মাত্র।

অনুষ্ঠানটি নিজ চোখে দেখার মত দুর্ভাগ্য আমার হয়নি, তবে শুনেছি। কোন কোন পত্রিকায় এ নিয়ে কিছু লেখা লেখিও হয়েছে।

ঘটনাটি যদি সত্যি হয় তবে বলতে হবে, গত ত্রিশ বছর যাবত রাজনীতির দৌরাত্ম্যে বিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদের পিছু যাত্রা শুরু হয়েছে। হাজার বছর পূর্বে দেশে যে অজ্ঞানতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল, ঘোর অমানিশা রূপে সেই অন্ধকারই আবার ঘনিয়ে আসছে। এবং তার লক্ষণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথমটি– শিক্ষকতা পেশায় নাস্তিকদের আগমনের মাধ্যমে। শিক্ষকরা ধর্মে বিশ্বাস করে না বলে ছাত্ররা শিক্ষকদের পবিত্রতায় ও বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করে না এবং তার ফলশ্রুতিতে শিক্ষকতা ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন, প্রহৃত হন। অর্থাৎ অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে ছাত্ররা অজ্ঞান থেকে যাচ্ছে এবং অশ্রদ্ধা ও অজ্ঞানতার কারণে তার শিক্ষকদের প্রহার করে। মূর্তির কাছ হতে পথ নির্দেশ গ্রহণের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে অজ্ঞানতার আবেশ আমাদের বহুদূর অতীতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচীনকালের মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে পশ্চাদপদ ছিল বলে তারা মূর্তির শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস করত। যে কোন কাজে শুভ-অশুভ নির্দিষ্ট করার জন্য মূর্তির সামনে সটান দাড়িয়ে আদেশ নিষেধ শুনার অপেক্ষা করত। মূর্তি ও নাকি কখনও ভাষায় কখনও আভাষে ইঙ্গিতে নির্দেশ প্রদান করত। দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম ধর্ম আরবের মূর্তি-পূজারী জনসাধারণের সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়দের সে ভুল মুসলিম আগমনের পূর্ব-পর্যন্ত ভাঙ্গেনি এবং আজও ভাঙ্গেনি।

১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে জানতে পারেন যে সোমনাথের মন্দিরে অবস্থিত বিগ্রহটি কথা বলে, মানুষের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়, ভাল মন্দ নির্দেশ দেয়। তিনি আরও জানতে পারেন ঐ মূর্তিকে জাগ্রত দেবতা মনে করে জনসাধারণ ঐ মন্দিরে যথেষ্ট সোনা-দানা, মণি-মুক্তার অর্ঘ্য প্রদান করে থাকে। যুগ যুগ ধরে প্রাপ্ত অর্ঘ্যের সঞ্চিত সম্পদে মন্দিরটি উপচে পড়ছে। সুতরাং সম্পদ এবং চমক উভয় আকর্ষণেই সুলতান মাহমুদ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন।

মন্দিরটি জয় করে সুলতান প্রথমেই অদ্ভুত শক্তিধর মূর্তিটির কাছে যান। কিন্তু ততক্ষণে মূর্তির কথা বন্ধ হয়ে গেছে, আভাষ ইঙ্গিত বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি মূর্তিটি নানাভাবে পরীক্ষা করে কোন অলৌকিকত্বের সন্ধান না পেয়ে তা ভেঙ্গে দেখেন মূর্তিটির পেছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে একটি মানুষের বসার জায়গা আছে বা তখনও ভীত-বিমূঢ় অবস্থায় একটি মানুষ ভেতরে বসা ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন কি করে এতদিন অজ্ঞ মুর্খ পূজারীরা সেবায়েতদের দ্বারা বা মন্দিরের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতারিত হয়ে এসেছে।

সোমনাথ অভিযান শেষ করে সুলতান জানতে পারেন যে থানেশ্বরের চক্রস্বামীর মন্দিরেও তেমনি একটি জাগ্রত দেবতার বিগ্রহ অলৌকিকভাবে শূন্যে ঝুলে আছে। তার অবস্থান বড় চিত্তাকর্ষক। কোন অবলম্বন ছাড়াই মূর্তিটি শূন্যে ঝুলে আছে। এই অলৌকিকত্ব দৃষ্টে পূজারীরা নিজেদের সর্বস্ব দান করে দেবতাকে খুশী করার চেষ্টা করে থাকে। এতদশ্রবণে সুলতান মাহমুদ চক্রস্বামীর মন্দির আক্রমণের জন্য থানেশ্বরে ছুটে যান।

চক্রস্বামীর মন্দির জয় করে সুলতান মূর্তিটির ঝুলন্ত অবস্থান দেখে প্রথমে বিস্মিত হন। মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন মুর্তিটি লৌহ নির্মিত। তার উপরে একটি পরিপাটি মূল্যবান চাদোয়া ঝুলানো রয়েছে। চাদোয়াটি খুলে তিনি দেখতে পান সেখানে কয়েকটি শক্তিশালী চুম্বক রয়েছে। মূর্তির ওজনের সাথে চুম্বনের আকর্ষণ শক্তিকে এমনভাবে সমন্বিত করে দেয়া হয়েছে যাতে মূর্তিটি উপরেও উঠে না যায় নীচেও পড়ে না যায়।

সুলতান মাহমুদ মূর্তিটি ধ্বংস করে পূজারীদের বহু যুগের নির্বুদ্ধিতার অবসান ঘটান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের অত বড় বড় মন্দিরগুলোতে অবস্থিত কোন মূর্তিই আর কথা বলে না, ইশারা ইঙ্গিতও করে না। এমনি করে যুগে যুগে তিলে তিলে মানুষের জ্ঞানের দুয়ার খুলেছে। হিন্দুরা পিতৃপুরুষের কালে অভ্যাসবশত যদিও আজও মূর্তিপূজা করে, সুখে দুখে মূর্তির কাছে আনত হয়ে ফরিয়াদ করে কিন্তু মূর্তি তাদের সাথে কথা বলবে বা আশ্বাসের বাণী শুনাবে এমনটি তারা আর কখনও আশা করে না। এরপরও

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পথনির্দেশের জন্য মূর্তির মুখাপেক্ষী করা হচ্ছে? এবং মূর্তিকে দিয়ে কথা বলানো হচ্ছে?

প্রাচীন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা না হয় জনসাধারণকে মন্দিরে প্রতি আকৃষ্ট করে নিজ প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য মূর্তির মধ্যে অলৌকিকত্ব সৃষ্টি করে রাখত, কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন মূর্তির মধ্যে অলৌকিকত্ব সৃষ্টি করতে চায় কি জন্য? তারা কি চান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাচর্চার পরিবেশ যখন নষ্টই হয়ে গেছে তখন ছাত্ররা বরঞ্চ সেই আদিম অজ্ঞানতার যুগেই ফিরে যাক? অথবা তারা কি মনে করেন মূর্তিপূজা শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবী সরস্বতী এসে বিদ্যাচর্চার পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে যাবেন? অথবা তারা কি চান মূর্তি পূজা শুরু করে দিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের হিন্দুর সাথে একাকার করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একদেহে লীন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন?

প্রাচীন কাহিনী হতে জানা যায় শয়তান মানুষকে এমনি এক পদ্ধতিতেই মূর্তিপূজার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

কথিত আছে হযরত আদম (আঃ)-এর মাহলাইল নামে একত তস্য নাতি ছিলেন। তিনি রূপে এবং গুণে অতুলণীয় ছিলেন। বিশেষ করে তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ন ছিলেন। বহু দূরদূরান্ত হতে মানুষ নযর নিয়াজ নিয়ে তাকে দেখতে, তার কাছ থেকে ধর্মীয় উপদেশ নিতে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসত।

মাহলাইলের অনেক সন্তান ছিল এবং সন্তানগুলো ছিল নিষ্কর্মা। তাদের পিতার কাছে আসা নযর নিয়াজই ছিল তাদের ভরণ পোষণের উৎস। এক সময় মাহলাইল মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সংবাদ না জানার কারণে তাঁর মৃত্যুর পরও দুরদূরান্তের মানুষ নযর নিয়াজ নিয়ে আসত। কিন্তু তাদের মুখে পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে দর্শণার্থীরা নযর নিয়াজ নিয়ে ফিরে যেত। এ দিকে তারা অনাহারে ক্ষুৎপিপাসায় দারুণ কষ্টে দিন যাপন করতে থাকে।

মাহলাইলের সন্তানদের দারুণ কষ্টের দিনে শয়তান এসে তাদের পরামর্শ দিল তারা যেন পিতার মৃত্যুর সংবাদ কাউকে না বলে। বরঞ্চ পিতার একটি মূর্তি বানিয়ে যেন ঘরে রেখে দেয় এবং দর্শনার্থীদের দূর থেকে পিতাকে দেখিয়ে নযর নিয়াজগুলি ভোগ করে। ছেলেরা শয়তানের সাহায্যে মূর্তি বানিয়ে নিল। দর্শনার্থীরা দূর থেকে মূর্তিকে সালাম জানিয়ে নযর নিয়াজ দিয়ে যেতে লাগল। ছেলেরা মূর্তির সেবায়েত হয়ে দুধ কলা খেয়ে পরামানন্দে দিন কাটাতে লাগল। এমনি করে শয়তান মানুষকে চাতুরি, প্রতারণা, মিথ্যা ও মূর্তি এই চারটি পাপের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

বাংলাদেশ টেলিভিশনও কি বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনি শয়তানী প্রক্রিয়া শুরু করেছে? এই প্রক্রিয়া যদি সফল হয় তবে হয়তো একদিন দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ তিন মূর্তির বেদীতে পুরোহিত বসে গেছে। দুধ, কলা, পুষ্পার্ঘে বেদীমূল সয়লাব হতে শুরু করেছে। হয়ত দেখা যাবে বর্ষ-বরণ, নবীন বরণ, শিক্ষা-সমাপণী উৎসব, ছাত্র সংসদের নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচন বিজয় উৎসব, হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি উপলক্ষে ঐ বেদীমূলে অনুগ্রহ প্রার্থীদের ভীড় লেগে গেছে এবং দেখা যাবে দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠ হতে মূর্তি-ভক্তরা বেরিয়ে এসে সমাজে মূর্তি প্রতিষ্ঠার কারিগরি শুরু করেছে। তারই কিছু আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিমান বন্দরের সদর দরজায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা চেষ্টার মধ্যে।

গত শতাব্দির প্রথম দিকেও বিশ্বে বিমান যাতায়াত ছিলনা। বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল নৌ যাত্রা। নৌবন্দর দিয়ে মানুষের গমনাগমন হত বলে নৌবন্দরকে বলা হত "গেইট অব দি কান্ট্রি" যেমন বোম্বে ছিল গেইট অব ইন্ডিয়া। বন্দরে নেমেই যাতে মানুষ দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির আভাষ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হত। ভারতে মূর্তি, বাংলাদেশে মসজিদ, প্রাচ্যদেশে বৌদ্ধমূর্তি, পাশ্চাত্য দেশে ক্রুশ ইত্যাদি, ইত্যাদি। জেদ্দা হতে মক্কার পথে এক বিশাল তোরনের উপর এক বিরাটাকার প্রতিকী কোরআন স্থাপিত হয়েছে দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির আভাষ হিসাবে।

প্রকৃতিশোভিত বাংলাদেশের ঢাকা বিমান বন্দর গেইটে মাত্র অল্প কয়েক বছর পূর্বে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়েছিল। ২০০৮ সালের কোনও এক সময় একটি ভ্রমবিলাশীচক্র সেই ৫ কোটি টাকা মূল্যের ফোয়ারাটি ভেঙ্গে তৎস্থলে ভাস্কর্য নাম দিয়ে একজন বাউল শিল্পীর বিরাটাকার মূর্তি স্থাপনের কাজ শুরু করে, যেন এটা বাউলের দেশ।

১৬ আক্টোবর, ২০০৮ তারিখে শেষ পর্যন্ত আধানির্মিত মূর্তিটি অপসারিত হয়। কিন্তু তার ২/৩ দিন পর টিভি পর্দায় দেখা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ক্ষোভের সাথে বলছেন– "ভাস্কর্য আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতি" তারা আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গুণীজন। তারা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির এমন অপব্যাখ্যা করেন বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভ্রান্তপথে চালিত হয়ে কলহ-কোন্দলে লিপ্ত হয়, তাদের হাতে শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হয়, ছাত্রীরা নিপীড়নের শিকার হয়।

ঐ গুণীজন শিক্ষকদেরে আমরা চিনি। তারা মুসলমান বটে, কিন্তু মুসলমানের কৃষ্টি সংস্কৃতি অনুসরণ করেন না। তারা সাদী সম্বন্ধ করেন মূর্তি পূজক সম্প্রদায়ের সাথে, তাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আদর-আপ্যায়ন

এবং সামাজিকতা হয় মূর্তি পূজকের সাথে। সুতরাং তাদের মগজে মূর্তি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি একাকার হয়ে আছে। এদের কারণেই ডঃ হুমায়ুন আজাদ কর্তৃক গৃহীত এক সাক্ষাতকারে জনাব শওকত ওসমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছিলেন "ডক্টর আজাদ, কিছু মনে করোনা, ওখান থেকে ডিজিজ তৈরী হয় ডক্টর না। ওখান থেকে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, বৈদ্য নয়। যে যত উচ্চপদস্থ বৈদ্য, সে ততো দূরারোগ্য ব্যাধি।" (সাপ্তাহিক রোববার ২১শে এপ্রিল, ১৯৮৫)

ইসলাম ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় "লাকুম লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন।" (যার যার ধর্ম তার তার জন্য) তাই বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে চলেছে, মুসলমানদের সাথে অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। সংঘাত শুধু তাদের সাথে। তাদের কারণে এবং তাদের প্ররোচনায় যাদের কোন ধর্মনিষ্ঠা নেই, কোন ধর্ম নেই।

তাদের অবস্থাটা অনেকটা ভাঙ্গা বৈঠা, ছেঁড়া পালে চালিত তরণীর মত। যা চলতে গিয়ে দিগভ্রান্ত হয়ে ধর্মনিষ্ঠদের সুশৃঙ্খল কাতারের উপর, দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির উপর আছড়ে পড়ে। তাতে যে কলহ-কোন্দল সৃষ্টি হয় তাকে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আখ্যা দিয়ে দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, আর দেশের ভাবমূর্তিতে কলহ লেপন করে এবং তাকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আখ্যা দিয়ে দেশ বিদেশে প্রচার করে বেড়ায়।

হাজার বছর পূর্বে সুলতান মাহমুদ, মূর্তি যে কথা বলে সে ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার পর মূর্তিপূজারীরা তাদের ধর্মের মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সাতশত বছর পূর্বে যেখানে এদেশে মুসলমান অধিবাসী ছিল না, সেখানে আজ এই উপমহাদেশের ১১০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৪০/৫০ কোটিই মুসলমান।

এমনকি উনিশ শতকেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন হিন্দুবাদী মূর্তি পূজা ও শ্রীগীতার বাণী পর্যালোচনা করতে গিয়ে মূর্তি বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে তাহা যে প্রতীমায় অর্পন করিতে হইবে এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন যেখানে দিবে সেখানেই তিনি পাইবেন।"

আসলে হিন্দুর শ্রীগীতার কোথাও মূর্তিপূজার কথা বলা হয়নি। বরঞ্চ মূর্তিপূজাকে প্রকারান্তরে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'আমিই সর্বযজ্ঞে ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু তারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলে সংসারে পতিত হয়, (শ্রীগীতা ৯ম অধ্যায় শ্লোক ২৪)।

অর্থাৎ ঈশ্বরকে যেভাবেই ভজনা করবে ঈশ্বর তা পাবেন এবং তার প্রতিফল দিবেন। যারা বহু দেবতার মূর্তি বানিয়ে পূজা করে তাদের সম্পর্কে

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "অন্য দেবতা ভক্তেরা আমার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, তারা মনে করে সেই দেবতাই ঈশ্বর। এই অজ্ঞানতা বশতই তাদের সদগতি হয় না। তারা সংসারে পতিত হয়। কেননা অন্য দেবতারা মোক্ষ দিতে জানে না।"

উল্লেখ্যযোগ্য যে, শ্রীগীতার ভাস্য অনুযায়ী ঈশ্বর একজনই। বহু দেবতার নামে পূজা করলেও সকল পূজা ঈশ্বরেই নিবেদিত হয়। শ্রীগীতায় তাই স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে "অন্যান্য দেবতার পূজাও পরোক্ষ ঈশ্বরে পূজা। কিন্তু দেবতা ভাবনা করলে ঈশ্বরলাভ হয় না।" (শ্রীগীতা ৯ম অধ্যায়ঃ ২৩ শ্লোকের সারাংশ)।

অর্থাৎ অন্য যে কোন দেবতাকে মনে মনে কল্পনা করে পূজা করলেও তা ঈশ্বরের পূজা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যখনই কোন দেবতার মূর্তি তৈরী করে পূজাটির ভাবনা, চিন্তা, চেতনা ঐ দেবতার প্রতি নির্দিষ্ট হয় তখন আর ঈশ্বরের কথা মনে আসার সুযোগ পেতে পারে না। সুতরাং ঐ পূজা দ্বারা ঈশ্বরলাভ হয় না।

শ্রীগীতার ৯ম অধ্যায়ে ২৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

"হে কৌন্তেয় তুমি যা কিছু কর, যা কিছু ভজনা কর, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর তৎসমস্তই আমাকে অর্পন করবে।"

এখানে ব্যাপারটা পরিষ্কার যে মূর্তি বলে ঈশ্বরের কোন প্রতিনিধি নেই। মানুষ সংসারে যা কিছু কাজ কবে তার সবটুকু ঈশ্বরের নামে করবে আর ঐ সব কাজ মূর্তির পায়ের কাছে বসে করা হয় না। যা কিছু খাবে ঈশ্বরের নামে খাবে এবং কেউ মূর্তির পায়ের কাছে বসেও খায় না মূর্তির মুখ দিয়েও খায় না। দান করার সময় দান গ্রহীতাকে মূর্তির কাছে নিয়ে দান করা হয় না, বরঞ্চ ঈশ্বরের নামে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই দান করা হয়। সুতরাং কোন সৎকর্মের জন্যই কোন দেবতার মূর্তির কাছে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়নি। সব কিছুই ঈশ্বরের নামে করার কথা বলা হয়েছে। কারণ অদৃশ্য শক্তি ঈশ্বর নিরাকার, একজন।

যাই হোক। যেখানে পৌত্তলিকদের নিজেদের ধর্মশাস্ত্রই মূর্তি স্বীকার করে না, যেখানে সুলতান মাহমুদ মূর্তি ও মূর্তির অলৌকিকত্ব সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাস নিরসন করে দিয়ে গেছেন এবং কোটি কোটি মানুষ পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিয়েছে সেখানে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত মুক্তি যুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যটিকে বিগ্রহ হিসেবে গণ্য করে, তার মুখে ভাষা প্রয়োগ করে বাচালতারই পরিচয় দিয়েছে।

নাও ভাল পরে বায়

ইতর প্রকৃতির মানুষ শিক্ষিত হলে তার মেধাকে ইতরামি কাজেই ব্যবহার করে।

মাঝে মাঝে এক ধরনের কুলাঙ্গার শিক্ষিতের সন্ধান পাওয়া যায় গরীবের ঘরে যার জন্ম, শিক্ষায় সম্পদে উন্নত হওয়ার পর সে তার বাবা মায়ের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। কিছু আছে যারা শহরে নিজের সুসজ্জিত বাসা বাড়িতে বেমানান হবে ভয়ে বাবা মাকে নিজের কাছে আনে না। আবার কিছু আছে শহরের বাড়িতে আনলেও বাবা মাকে গৃহবন্দীর মত করে রাখে– আত্মীয় বন্ধুর সামনে আসতে দেয় না।

তেমনি আমাদের সমাজে কিছু উচ্চশিক্ষিত কুলাঙ্গারের আবির্ভাব ঘটেছে যারা নিজ জাতি– ধর্মের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে এবং নিজ সংস্কার সংস্কৃতিকে বিকৃত করে, বিদ্রুপ করে মজা উপভোগ করে। এরা এক ধরনের পরশ্রীকাতর মানুষ। এরা যেমন নিজের ছেলে পর করে দেয়, পরের ছেলে কোলে পেয়ে, তেমনি এদের কাছে নিজের সব ভালকে খারাপ লাগে আর পরের সব খারাপকেও ভাল লাগে।

ঐ পরশ্রীকাতরদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-পুরুষদের বেলায় অন্য সকল স্ত্রীলোককেই সুন্দরী মনে হয়, কেবল নিজের স্ত্রীকে মনে হয় জঘন্য ধরনের কুৎসিত। আর মেয়েদের বেলায় অন্য সব পুরুষকেই সুন্দর-সুপুরুষ মনে হয়, শুধু নিজের স্বামীকে মনে হয় কুৎসিত কদাকার। এ কারণে মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়– "নারীরা একজনের সঙ্গে কথা বলে, বিলাস সহকারে অন্যজনকে নিরীক্ষণ করে, আর অন্তরে আর এক ব্যক্তিকে চিন্তা করে।"

নারীর কথাটা এখানে একটু বেশীই এল। তার কারণ নারী আর পুরুষের মধ্যে একটি আদান প্রদানের সম্পর্ক আছে। পুরুষ প্রদান করে, নারী গ্রহণ করে। প্রদান করতে হলে নিজের আয় এবং সঞ্চয় হতেই প্রদান করতে হবে। এ কারণে প্রদান করার অর্থই খরচ করা। কিন্তু সকল মানুষই যে কোন খরচ করতে একটু হিসাব করবে, একটু কম খরচ করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু নারী গ্রহণ করে। এ কারণে সে যতটুকু পারে তার সবটুকুই তার লাভ। সুতরাং সে একটু বেশী বেশী পেতে চাইবে এটাই তার জন্য স্বাভাবিক। একটু ঠোটের হাসি খরচ করে সে যেমন অনেক আদায় করে নিতে পারে তেমনি একটু শাড়ী গহনার লোভ দেখিয়ে তাকেও অন্যে সহজে জয় করে নিতে পারে। ঐ যে পরশ্রীকাতর নারীর কথা বললাম, যাদের কাছে নিজের স্বামী ছাড়া আর সব পুরুষকেই সুন্দর মনে হয়, তাদের মধ্যে এমন

বহু আছে যারা স্বামীর পর স্বামী বলদিয়েও খায়েশ মিটাতে পারেনা। মনে হয় যেন আসল পাওয়াটা এখনও পাওয়া যায়নি।

এমনই একজন নারী ঢাকায় আছে যে শেষ পর্যন্ত বলে দিয়েছে 'বাংলাদেশে তার উপযুক্ত কোন পুরুষ নেই'। কিন্তু একজন পুরুষ ছাড়া কোন নারীর পক্ষেই জীবন যাপন সম্ভব নয়। সুতরাং দেশে যখন তার উপযুক্ত পুরুষ নেই তখন বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। অথবা নিজে বিদেশে রপ্তানি হতে হবে।

বেওয়ারীশ নারীর গার্জেনের অভাব হয় না। নানা ছল-ছুতায় সদর ঘাটের টাউট বাটপারেরা বেওয়ারীশ নারীর গার্জেন হয়ে সতিত্ব নারীত্ব হরণ করে কেটে পড়ে। কিভাবে যে কি হয়ে যায় অবলা নারী বুঝতেও পারে না। সেতো পাবে শুনলেই খুশী। একদিকে সুপুরুষের সঙ্গলাভ অপরদিকে অর্থলাভ এই দুই লোভে সে ইচ্ছে করেও বেওয়ারীশ হয় এবং মাঝে মধ্যেই পত্রিকার খবর হয়।

এইতো ঢাকায় এক কোটিপতি ব্যবসায়ী ১৯৯৩ জুন মাসে পত্রিকার সংবাদে শিরোনামে এল। তার অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে। তা থাকগে। অমন অর্থ প্রতিপত্তি এবং তার চেয়ে বেশী আরও বহুর আছে। কিন্তু তার আরও একটি কিছু আছে যা বহুর নেই। তা হচ্ছে নারীর মেদ ও মাংসের প্রতি তার দুর্বার লোভ। পুরুষের পৌরুষের প্রতি নারীর যেমন দুর্বার লোভ আছে, নারীর মেদ মাংসের প্রতিও তেমনি পুরুষের লোভ আছে। কিন্তু সভ্যতার খাতিরে শালীনতার খাতিরে, সামাজিক শৃঙ্খলার খাতিরে সকল নারী পুরুষকেই ধর্মের নামে ঐ লোভটিকে কঠোরভাবে সম্বরন করে রাখতে হয়। কিন্তু ঐ লোকটি এসব কোন নিয়ম নীতিরই ধার ধারে না। দেশ বিদেশের বহু মহিলা এমনকি অনূঢ়া মেয়েরাও এই কোটি পতিটির প্রতি চমৎকৃতা। তার টাকার চমকে চমৎকৃতা হয়ে এবং তার চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মেয়ের অগোচরে মা এবং মায়ের অগোচরে মেয়ে তার প্রতি দুবাহু বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯৩ সনে ঢাকার এক কিশোরী তার পিতার বয়সী এই কোটিপতিটির দেওয়া চাইনিজ ডিসের একটা মুরগী, শুধুমাত্র একটি মুরগীর রোষ্ট খেয়েই প্রবল আবেগে তার গলায় ঝুলে পড়ে।

সাপ্তাহিক পূর্ণিমার সাংবাদিক যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনাদের প্রেমকে কি লাভ এ্যাট ফাষ্ট সাইট বলা যায়?

মেয়েটি বলেছিলঃ ব্যাপারটা কিছুটা সেরকমই বলতে পারেন। লন্ডনের এক রেস্তোরায় আমরা খেতে গিয়েছিলাম। সে সেখানে বসে আমার প্রিয় মুরগীর একটি চাইনিজ ডিশের অর্ডার দেয় এবং আমার অজান্তে এ খাবার বাড়ীতে নিয়ে যাবারও ব্যবস্থা করে দেয়। সে খাবার আমি পরে কয়েকদিন

ধরে খেয়েছিলাম। ব্যস! তখন থেকেই তাকে ভাল লেগে গেল। আমাদের দু'জনার দেখা এবং ভাললাগার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল খুব কম। (পূর্ণিমা ১৬/৬/৯৩)

শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের সুদূর অঞ্চলের স্বামীদ্রোহী অভিনেত্রীরাও ঐ লোকটির রুচির প্রতি দারুণ ভাবে আকৃষ্ট। স্বামীর পর স্বামী বদল করে অতৃপ্ত কামনা বাসনা নিয়ে ভারতের সুপার স্টার রেখা, দেবশ্রী, মুনমুন সেনের মত অভিনেত্রীরাও তার কাছে ছুটে এসেছে অতি সঙ্গোপনে, আবার চলেও গেছে সঙ্গোপনে। আসলে শিল্প সংস্কৃতি রাজ্যে বিচরণকারী যে সব মেয়েরা নিতি নিতি স্বামী বদলায় তারা বিশ্বের যে প্রান্তেই টাকাওয়ালা আর চিতা বাঘের মত থাবাওয়ালা পুরুষ থাকুক না কেন, তার খবর ঠিকই রাখে এবং নিজ নিজ স্বামীদের পেছনে ফেলে ঐ পুরুষদের পেছনে ছোটে। সে হোক ঢাকায় কিম্বা ভারতে অথবা আরবে। রেখা দেবশ্রীরা যেমন আরব রাজ্য চষে বেড়ায় তেমনি জাহারাখানি নামের ইরানী সুন্দরীও ছুটে এসেছে বাংলাদেশের কোটিপতির কাছে।

এদের কেউ কিন্তু ঐ লোকটিকে বিয়ে করতে আসেনি। কারণ বিয়ে করলেই বাসি হয়ে যায়, আকর্ষণ কমে যায় বলে ঐ মেয়েগুলির তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। ভ্রমরেরমত বন্ধনহীনভাবে ফুলের পর ফুলের বুক উজাড় করে নতুন নতুন স্বাদের মধু খাওয়ার লোভ হচ্ছে একটা আদিম কামনা। একটি ফুলের মধু আহরিত হয়ে গেলেই সেটি বাসি হয়ে যায়। ঐ মেয়েগুলি স্বামীকেও তেমনি মনে করে। স্বামী হিসাবে যাকে ভাল লাগে না পর পুরুষ হিসাবে সেই হয় প্রাণ পুরুষ। সুতরাং তারা পুরুষ চায়, টাকা চায়, বিয়ে চায় না। তারা স্বামী বিদ্বেষী হলে কি হবে পুরুষ বিদ্বেষী নয়।

ঢাকার যে মেয়ের কথা উপরে বললাম, যে মেয়ে বলেছে বাংলাদেশে তার উপযুক্ত কোন পুরুষ নেই। সে ভারতীয় অভিনেত্রীদের ঢাকা অভিসারের বদলা নিচ্ছে। কলকাতার লোকেরা তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। যে প্লেনে তার কলকাতা যাওয়ার কথা যদি কোন কারণে সেই প্লেনে যেতে ব্যর্থ হয় তবে এয়ারপোর্টে অপেক্ষমান বয়ফ্রেন্ডদের বুকে শেল বিঁধে, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

পাঠক, মনে করুণ মাস খানেক আগে বিয়ে করে দু'দিন মাত্র বউ এর সঙ্গে কাটিয়ে কর্মস্থলে চলে এসেছেন। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে আপনার বউ আসার কথা। আজ আপনি নিশ্চয়ই অফিসের কাজে মন বসাতে পারেননি। তাড়াতাড়ি বাসায় এসেছেন। আজ নতুন বউ নিয়ে সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রবেশ করবেন। সারা অন্তর জুড়ে একটা রোমান্স দুরু দুরু করছে।

বিছানা বালিশ পরিপাটি করেছেন। হোটেল থেকে কাচ্চি বিরিয়ানী, কলা, কমলা, কোল্ড ড্রিং, মুসলিম মিষ্টান্ন ভান্ডারের দই ইত্যাদি সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে জামায় সেন্ট মেখে স্টেশনে গিয়ে দেখেন ট্রেন এসেছে কিন্তু বউ? না! বউ আসেনি। এখন বলনুতো তখন মনে কেমন কষ্টটা লাগে? আমার তো বিশ্বাস বউটা মরে গেছে শুনলেও এত কষ্ট লাগত না। আপনি চিন্তিত হয়েও নিশ্চিত থাকেন, এই ভেবে যে, কোন কারণে আজ আসতে পারেনি, কিন্তু কাল হোক পরশু হোক সে আসবেই, কলেমা পড়া বউতো।

ক'মাস পূর্বে কলকাতা প্রেমিক ঐ মেয়েটির কলকাতা যাবার কথা ছিল। তার বয়ফ্রেন্ড তার জন্য আঃ বাঃ ফ্রি ব্যবস্থা করে বিমান বন্দরে এসে দেখে বিমান এসেছে, কিন্তু সে আসেনি। পাসপোর্টের প্রতারণা ধরা পড়ায় ঢাকা ইমিগ্রেশন তাকে আটকে দিয়েছে। এ কারণে মেয়েটির বয়ফ্রেন্ডরা কলকাতা বিমান বন্দরে ঢাকার বিরুদ্ধে অগ্নিশর্মা হয়ে বিমান বন্দর সোরগরম করে তুলেছিল। কিন্তু অগ্নিশর্মা হলেও তারা নিশ্চিত যে ঐ মেয়েকে আসতেই হবে এবং বেশী দেরীতে নয়। একজন বিয়ে করা বউকে যত তাড়াতাড়ি আসতে হয় তাকে তার চেয়েও বেশী তাড়াতাড়ি আসতে হবে, কারণ বিয়ে করা বউটি জানে যে, তার স্বামীর বন্ধন মন্ত্রের শপথ দ্বারা বন্দী, দেরী হলেও ছিন্ন হবে না। আর ঐ মেয়েটি জানে যে, বয়ফ্রেন্ডের কোন বন্ধন নেই, খোশামোদ দিয়ে সম্পর্ক জিইয়ে রাখতে হয়। গৌন গমনে এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বয়ফ্রেন্ডরা নিশ্চিত যে মেয়েটি অতি শীঘ্রই এসে যাবে। কারণ, নগদ নারায়ন দ্বারা তার মগজকে যেভাবে ধোলাই করে দেওয়া হয়েছে সেই ধোলাইর পর কোন প্রগতিবাদীর পক্ষে দূরে থাকতে পারার কথা নয়। যেমন তার মগজের প্রথম ধোলাইতে তাকে শিখানো হয়েছে ইসলাম ধর্ম খারাপ ধর্ম এবং মুসলমানরা খারাপ মানুষ।

দ্বিতীয় ধোলাইতে শিখানো হয়েছে বাংলাদেশটা বেহায়া, বদমাশ, বর্বর মুসলমানের দেশ।

তৃতীয় ধোলাইতে শিখানো হয়েছে বাংলাদেশের মুসলমান পুরুষরা নপুংসক, খারাপ মানুষ। মেয়েদের জন্য ঘর সংসারের অযোগ্য।

ইত্যাদি শিক্ষার পর বাংলাদেশের প্রগতিবাসীরা বাংলাদেশকে নিজেদের জন্য বসবাসযোগ্য মনে করতে পারে না। প্রগতিবাদীদের মনমত জীবন যাপনের জন্য হয় তাদের ভারতে আসতে হবে নয়তো তাদের বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। সেই লক্ষ্যে তারা কাজ করছেও।

মেয়েটি তার 'লজ্জা' নামক বইতে দেখিয়েছে পারভিন নামে মেয়েটির মুসলমানের সাথে বিয়ে হয়েছিল বলে ডিভোর্স হয়ে গেছে। হিন্দুর সাথে বিয়ে হলে ডিভোর্স হত না। সুতরাং তা সাহিত্যে সে মুসলমান মেয়েদের প্রকারান্ত

রে আহবান জানিয়েছে, মুসলমান ছেলেদের যেন বিয়ে না করে। সবাই যেন হিন্দু ছেলেদের বিয়ে করে। মনে হয় এ কারণেই সে নিজে সকল মুসলমান স্বামী পরিত্যাগ করে হিন্দু পুরুষের খোঁজে কলকাতা আসা যাওয়া করছে।

তার ঐ পুস্তকটির নায়ক হিন্দুর ছেলে সুরঞ্জনকে দিয়ে মুসলমান মেয়ে শামীমাকে তছনছ করে ধর্ষণ করিয়ে সে মজা অনুভব করেছে। ধর্ষণের কাজ ও কথাকে সে খুব পছন্দ করে এবং এ সম্পর্কে সে বেশী বেশী বলেও। পুরুষদের এ ব্যাপারে নিস্পৃহ ও নির্বাক দেখে সে নিজেই পুরুষদের ধরে ধরে ধর্ষণ করবে, এই অভিপ্রায় সে আরও পূর্বেই ব্যক্ত করেছে। এখন সে আবিষ্কার করেছে যে হিন্দু ছেলেরা তছনছ করে ধর্ষণ করতে পারে। সুতরাং হিন্দু ছেলেদের কাছে গেলে মেয়েদের আর কষ্ট করতে হবে না, বিনা কষ্টেই মনোস্কামনা পূর্ণ হবে বলে সে মনে করে।

আগের দিনে বাবুদের বাগান বাড়িতে আসর জমানোর জন্য বাইজী ভাড়া করা হত। শিল্প সাহিত্যের এই অগ্রগতির যুগে এখন আর বাইজী নামের বাইজী পাওয়াও যায় না আর ভাড়াও করা লাগে না।

আকজাল সংস্কৃতি চর্চার নামে বাইজী নাচের গণতন্ত্রায়ন হয়েছে। বাবুদের বাগান বাড়ীর চৌহদ্দি পার হয়ে বাইজী নাচ এখন সংস্কৃতি চর্চার নামে বিনোদনের নামে মঞ্চে আসন লাভ করেছে আর রিহার্সালের নামে ঘরে তার চর্চা হচ্ছে।

আগের দিনে বাইজী নাচের নেশা দ্বারা মত্তকরে এক জমিদারের জমিদারী অন্য জমিদার গ্রাস করে নিত। আর এই কৃতকার্যতার জন্য বাইজীকে সন্তোষজনক পুরষ্কার দেয়া হত।

আজকাল সাহিত্যিক বাইজীদের সাহিত্য পুরস্করের নামে বিদেশে পারিতোষিক দেওয়া হয়। ঐ পারিতোষিকের মোহে সাহিত্যিক বাইজীরা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার জন্য অসির বদলে মসি যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

আমাদের উল্লেখিত মেয়েটি ও সেই বাইজী পারিতোষিক পেয়েছে। সুতরাং সে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মসি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যতদিন ঐ উদ্দেশ্য সাধিত না হবে ততদিন সে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে আসা যাওয়া করতে থাকবে। খাবে গাইবে আর যুব সমাজের মগজ ধোলাই করবে। তাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না। কারণ, সে ভাল করেই জানে, বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশের আইন বড় ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষ।

দেহ পুঁজী

১৯৯৪ সনের ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উদযাপিত হয়ে গেল। ৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার প্রথমদিন ৪ঠা মার্চ শুক্রবার সকালে ঢাকা শহরে এক বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। হাজার হাজার মহিলা পিতৃদ্রোহী এবং স্বামীদ্রোহী শ্লোগান সম্বলিত ফেষ্টুন ব্যানার বহন করে ঐ মিছিলকে বর্ণাঢ্য করে তোলে।

শ্লোগানগুলোকে পিতৃদ্রোহী এবং স্বামীদ্রোহী বলছি এজন্য যে তার কোনটিই পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। সবগুলি শ্লোগানের মর্ম হচ্ছে পিতার ইচ্ছামত পিতার দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তির সাথে বিয়ে হবে কেন? স্বামীর একার হয়ে থাকতে হবে কেন? জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে স্বামী, গুরুজন বা পরিবারের সদস্যদের পরামর্শমত চলতে হবে কেন ইত্যাদি।

প্রধান শ্লোগান ছিল– শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার। একটা কথা সোজাসুজি, নিজের শরীর নিজেই বুঝি। আমার দেহ আমার মন, কথায় কেন অন্যজন। আমার শরীর আমার না, এই কথা আর মানি না, ইত্যাদি। শ্লোগানগুলোর একমাত্র অর্থ পুরুষ চাই, মনে প্রাণে পুরুষ চাই কিন্তু বাবার সিদ্ধান্তে নয়, ভাইয়ের ইচ্ছায় নয়– শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছায়, যেখানে ইচ্ছা সেখানে, যাকে ইচ্ছা তাকে শরীর দেব- এই সিদ্ধান্ত একান্তই নিজের সিদ্ধান্ত হতে হবে।

৮ই মার্চ মঙ্গলবার সকাল বেলায় নিউ বেইলী রোডস্থ জাতীয় মহিলা সংস্থার অফিসে দলে দলে বস্তিবাসী মেয়েরা জড়ো হয়। সকাল ৯টার দিকে এই মেয়েরা বিচিত্রসব শ্লোগান সম্বলিত বহু ফেষ্টুন ব্যানার হাতে নিয়ে নারী দিবস উদযাপন কমিটি পরিচালিত মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে এসব মেয়েরা দল ছুটের মত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মহিলা সংস্থার অফিসে ফিরে এসে ফেষ্টুন ব্যানার রেখে দিয়ে ফিরে যেতে থাকে। হঠাৎ অষ্টাদশী / বিংশতি বর্ষিয়া কটি মেয়ে শাড়ী খুলে ফেলে দিয়ে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ গায়ে রেখে চিৎকার দিয়ে নাচতে নাচতে শ্লোগান দিতে থাকে। 'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার। একটা কথা সোজা সুজি নিজের শরীর নিজেই বুঝি'। এই দৃশ্য দেখে পথচারীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। সবার চোখে মুখে প্রশ্ন, এরা কারা, এরা কোথা হতে এল, এরা কি চাচ্ছে।

মেয়েগুলো বস্তিবাসী দরিদ্র মেয়ে। মহিলা সংস্থায় কয়েক মাসের স্বাবলম্বনের প্রশিক্ষণ নেয়। প্রতিদানে মাসে ৩০ কেজি গম পায়। বস্তি জীবনে তাদের শরীরই তাদের শত্রু। কৈশোর হতেই তারা দেখে এসেছে সন্ধ্যা

হতেই একদিকে যেমন আঁধার ঘিরে আসে অপরদিকে মাস্তানদের হাতে কড়কড়ে টাকা চক চক করে উঠে। টাকার তাদের প্রয়োজন অনেক। টেলিভিশন, হিন্দী সিনেমা, তাদের সারা দেহ মনে অনেক সাধ আহলাদের প্ররোচনা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের টাকা নেই। তারা জানে শরীরটা বিছিয়ে দিলেই অনেক টাকা আসে। কিন্তু হায় তার শরীর যে তার নয়। শরীরের সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারে না। শিয়রে বাবা ঘুমায়, পাশে শুয়ে মা গায়ে হাত দিয়ে রাখে। চারদিকে পাড়া প্রতিবেশী চোখ পাকিয়ে আছে। তাই নিজের শরীরটিকে রেখে ঢেকে বেঁধে চলতে হয়। কিন্তু ৪ঠা মার্চ আর ৮ই মার্চের মিছিল সমাবেশের মধ্যে সে সকল বন্ধন উদাম করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে এসেছে। সমাবেশ শেষে মেয়েগুলি বুঝতে পেরেছে অতি শীঘ্রই তারা নিজের শরীরের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করতে পারবে এবং শরীর পুঁজি করে উপার্জনের একটা উপায় হয়ে যাবে। সেদিন ঐ আনন্দেই মেয়েগুলি আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। ঐ ধরনের উদাম উদ্দামতা লক্ষ্য করা যায় ম্যানিলা, ব্যাংকক, হংকং ইত্যাদি শহরে।

ম্যানিলা এবং ব্যাংকক শহরে যে কোন ভ্রমণকারীর পকেটে ডলার আছে জানতে পারলে মেয়েরা দলে দলে তার পিছু নেয়। এমন কি মা মেয়ে মিলে শিকার ধরার প্রতিযোগিতা করে। ব্যাংকক ও ম্যানিলা শহরের মেয়েরা বেশীর ভাগই নিজ শরীর এবং নিজ সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে। বিশ্বের বহু দেশের পর্যটকদের জন্য ব্যাংকক ম্যানিলার মেয়েদের শরীরের স্বাধীনতার ব্যাপারটা একটি বাড়তি আকর্ষণ বটে।

প্রতি বছর মে মাসে ম্যানিলায় মে ফেয়ার নামে মাসব্যাপী একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেখানটায় একটু প্রশস্ত আইল্যান্ড আছে সে সব জায়গায় ছোট ছোট মঞ্চ তৈরী করে দলে দলে মিনি স্কার্ট পরা মেয়েরা নাচের তালে তালে শরীরের বাঁক ভাজ প্রদর্শন করে থাকে। শহরের সেঞ্চুরীর পার্কের যেখানটায় হোটেল শেরাটন, হোটেল এ্যাডমিরাল ইত্যাদি অবস্থিত সে সব এলাকায় সন্ধ্যার পর কোন ভদ্রলোক নিরাপদে চলাচল করতে পারে না। নিরাপদ মানে টাকা পয়সা ছিনতাই হওয়া নয় বটে, কিন্তু এক রকম হাত ধরে টানাটানি করার মত সর্বসমক্ষে মেয়েরা এবং তাদের দালালরা টানাটানি করে মানুষটিকেই ছিনতাই করতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকানদের সান্নিধ্যে এসে ম্যানিলার মেয়েরা শরীরের স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্তের স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। এখন জাপানীরা দলে দলে ম্যানিলায় কাম সফরে আসে। আশির দশকে ফিলিপিনো মহিলা সংস্থা জাপানীদের কাম সফরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে ম্যানিলার রাস্তায়

রাস্তায় মিছিল করেছিল। এসব সংবাদ আমাদের দেশের পত্র পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল।

ঐ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার ম্যানিলার সকল ম্যাসেজ পারলার, বার ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু শরীরের স্বাধীনতার নেশাগ্রস্ত মেয়েদের এবং তাদের পূঁজি করে সেখানে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের প্রতিরোধের মুখে সরকারী সিদ্ধান্ত মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

২৯ শে মার্চ ১৯৮৮ তারিখের বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল "পর্যটন শহর ম্যানিলার হংকী টংকী সেলুন, ডিসকো ইত্যাদিসহ নাইট ক্লাবগুলি বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঐসব প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার মেয়ে ন্যাংটা হয়ে ম্যানিলার রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করার হুমকী দিয়েছে।

একজন নর্তকী সাংবাদিকদের কাছে বলেছে, "আমরা কোন প্ল্যাকার্ড বা ব্যানার বহন করবো না। আমরা আমাদের উলঙ্গ শরীরেই আমাদের দাবী লিখে নেব"। বার মালিক সমিতির প্রধান ফ্রালিক্স এসপীরিটো জানান, "তিনি আশা করেন ফিলিপাইনের রাজধানীতে অন্ততঃ ৬০,০০০ মেয়ে ঐ উলঙ্গ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। পুলিশ প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলফ্রেডো লিম জানান", ব্যভিচার এবং অপরাধী চক্রের আড্ডাখানা হওয়ার কারণেই সরকার ঐ নৈতিকতাবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলো তালাবন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

আমি মনে করি গত ৪ঠা মার্চ ঢাকার রাস্তায় যে মিছিল এবং রমনার বটমূলে শরীরের স্বাধীনতাকামী মেয়েরা শারীরিক যে কসরৎ প্রদর্শন করেছে এবং আন্দোলনের যে নীলনকশা রচনা করেছে তার সাথে ম্যানিলার শরীরের স্বাধীনতা ভোগকারী মেয়েদের ঐ উলঙ্গ মিছিলের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে ম্যানিলার সভ্য সমাজ শরীরের স্বাধীনতাভোগকারী মেয়েদের অপকর্ম দ্বারা সামাজিক পরিবেশে যে কলুষ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঐ স্বাধীনতার অবসান কামনা করছে, আর আমাদের দেশের অনাস্বাদিত মদিরার নেশাগ্রস্ত মেয়েরা সে কাজটি মাত্র শুরু করতে চাচ্ছে। তারা এখনও বুঝতে পারছে না আন্দোলন দ্বারা তাদের কোন স্বাধীনতার মদিরা পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ব্যাংকক শহরের ১৪৫ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে পাত্তায়া নামে একটি পর্যটন শহর আছে। ঐ শহরে কদাচ কোন স্বামী সন্তান কেন্দ্রিক মেয়ে খুজে পাওয়া যাবে। সেখানকার মেয়েরা স্বামীর ঘর, পিতার খরবদারী পছন্দ করে

না, তারা নিজ শরীরের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করে। দূর-দূরান্ত অঞ্চল হতে আগত ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মেয়েরা সেখানে গিজ গিজ করে। সুলেখক, কলামিষ্ট আবদুল বারী সাহেবের একটি প্রবন্ধের সামান্য উদ্ধৃতি হতে ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝা যাবে। তিনি একসময় নৌ কর্মকর্তা ছিলেন।

তিনি লিখেছেন ঃ "দু'সপ্তাহ পর আমরা কোশিচাং বন্দরে পৌছলাম। কোশিচাং থাইল্যান্ডের এনজয়মেন্টের জন্য সুপরিচিত স্থান পাত্তায়া সংলগ্ন একটি বন্দর। সেখানে পৌছতে না পৌছতেই দেহপশারিণী মেয়েতে জাহাজ ভরে গেল। জাহাজ উঠেই তারা এর কেবিনে ওর কেবিনে হানা দিতে লাগল। আমি ইঞ্জিন রুম থেকে এসে যেমনি কেবিনে ঢুকেছি অমনি আমার পেছনে পেছনে চার পাঁচজন মেয়ে ঢুকে পড়ল। একেকজনের ফিগার একেক রকম। তার মধ্যে দু'জনের ফিগার চোখে লাগার মত।

বলল ঃ চীফ! কি রকম মেয়ে চাই তোমার? আমাদের সার্ভিস গ্যারান্টিড, একজন মেয়ে বলল।

বললাম ঃ আমি এখন খুব ব্যস্ত। তোমরা যাও প্লিজ, বলে আমি ওদের চলে যেতে অনুরোধ করলাম।

একজন হেসে প্রশ্ন করল ঃ কেন, আমাদের পছন্দ হয় না?

বললাম ঃ পছন্দ হবে না কেন, তোমরা সত্যিই সুন্দরী। কিন্তু আমার কাউকে প্রয়োজন নেই, তোমরা চলে যাও। এভাবে ধমকের সুরে কথা বলাটা ওদের বোধ হয় পছন্দ হয়নি। তাই তাদের একজন হাতের বুড়া আঙ্গুল খাড়া করে আমাকে দেখিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল ঃ কেন, তোমার কি এটা নেই?" (যায় যায় দিন-১৮ জানুয়ারী, ১৯৯৪)।

৪ঠা মার্চ তারিখের বিশ্ব নারী দিবসের সমাবেশে আর একটি শ্লোগান এক শ্রেণীর মহিলার মুখে খুব জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তা হচ্ছে 'আমরা নারী পুরুষের ভিন্নতা মানি না'। ভাবটা এমন যেন নারী দেহের নমনীয়তা, কমনীয়তা দুর্বলতা ইত্যাদি শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পুরুষরাই দায়ী। ভাবটা এমন যেন পূজারীরা যেমন পূজা উপভোগ করার জন্য মন মত করে সরস্বতী, দূর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদির মনোহর মূর্তি তৈরি করে, পুরুষরাও যেন তেমনি নিজেদের ভোগের জন্য নারীকে শারীরিক নানা বাঁক, ভাজ, মেদ, নিতম্ব ইত্যাদি দ্বারা, সৌন্দর্য ভারাক্রান্ত করে তৈরি করেছে।

সব কিছু দেখে শুনে মনে হয়েছে যেন এক শ্রেণীর নারী অনতিবিলম্বে তার শরীরের সকল বাঁক, ভাজ, যোনী, জরায়ু ছেটে কেটে ফেলে দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেন কামারে লোহা পিটানোর মত নিজে শরীরটাকে

হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে ইস্পাত কঠিন করে নেবে এবং ব্যক্তিত্ব ফুটানোর জন্য এখন থেকে যেন মুখে দাড়ি গোফের চাষাবাদ শুরু করবে।

কিন্তু ঐ পুরুষ বিরোধী মনোভাবটি এক শ্রেণীর মহিলার মধ্যে এল কোথা হতে? বিশ্বের আদি হতে শুরু করে কোনদিনই তো কোন নারীর মধ্যে পুরুষ বিরোধী এমন মনোভাব ছিল না। যদি থাকত তবে বহু পূর্বেই মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেই এক শ্রেণীর মহিলা পুরুষ বিরোধী হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন?

গত তিন চার বছর যাবত এক মহিলা পুরুষ বিদ্বেষী সাহিত্য রচনা করে আসছে। যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মিছিলের হুজুগের মত আর এক শ্রেণীর মহিলা না বুঝেই তার সাহিত্যের বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসছে। ১৯৯৩ সনের বাংলা একাডেমীর বই মেলায় তার লেখা বই সর্বাধিক খদ্দেরও আকর্ষণ করেছে। বই মেলায় পদার্পন করলে পাগল দেখার মত বা কোন আজব প্রাণী দেখার মত তাকেও এক নজর দেখার জন্য তার চলার পথে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। তদ্বারা কেউ কেউ তার পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাবের জনপ্রিয়তা লাভ হচ্ছে বললেও আমি মনে করি তা একটা ডাহা নির্বুদ্ধিতা।

যেসব মেয়েদের মধ্যে পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাব জন্মে তারা কারা এবং কি অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা পুরুষ বিদ্বেষী হয় তা জানতে হবে।

এ সম্পর্কে বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক সাদাত হোসেন মান্টো তার "গল্প লেখক ও অশ্লীলতা" গ্রন্থে একটা বিষদ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

"পুরুষের সাথে নিত্য নৈমিত্তিক মেলামেশা ও যৌন সম্ভোগের ফলে পুরুষের প্রতি পতিতাদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং পুরুষকে তারা পশুর সমতুল্য মনে করতে থাকে। তার মানে এই নয় যে তাদের হৃদয় প্রেমপ্রীতি শূন্য। তাদের হৃদয়ে প্রেম প্রীতি থাকা সত্ত্বেও তারা জানে খদ্দেররা মুহূর্তের আনন্দের জন্য তাদের কাছে আসে, হৃদয়ের আদান প্রদান করতে আসে না। বরঞ্চ তাদের অনেকেই হৃদয়হীন মানুষ। কারণ তাদের কেউ কেউ স্ত্রী-সন্তানাদি ঘরে রেখেও পতিতার কাছে আসে। তারপর আবার খদ্দেরদের প্রত্যেককে হৃদয়দান করতে গেলে যে দেহের ব্যবসা অচল হয়ে পড়বে, এ কারণেই পতিতারা সকল খদ্দেরকে দেহদান করে বটে, কিন্তু কোন খদ্দেরকেই হৃদয় দান করে না।"

পুরুষ বিদ্বেষী সাহিত্য রচনা করে যে মহিলা আমাদের সমাজে ঝড় তুলেছে বলে উপরে উল্লেখ করেছি এবং যার মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী দিবসের অনুষ্ঠানমালায়, সেই মহিলার ক্ষেত্রে সাদাত হোসেন মান্টোর উক্ত বিশ্লেষণ হুবহু মিলে গেছে।

এই মহিলাটি নিজেই বলেছেন, তিনি ১৪ বছর বয়স হতে প্রেম পত্র লিখতে শুরু করেন। এম,বি,বি,এস চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী থাকা অবস্থায় বাবা মাকে বুড়া আঙ্গুল দেখিয়ে ঢাকার এক কবিকে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়। তারপর আবারো তার কোর্ট ম্যারিজ হয় আর এক পত্রিকা সম্পাদকের সাথে ১৯৮৯ সনে। দু'মাসের মাথায় আবারও ডিভোর্স। এমনি করে বর বদলের কারণেই বোধ হয় তার মধ্যে পতিতার মত পুরুষ বিদ্বেষ, নিত্য নতুনের খায়েশ আর জ্বরায়ুর স্বাধীনতার খায়েশ পল্লবিত হয়ে উঠে। তিনি নিজেই বলেছেন– "আমার দ্বিতীয় বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর আর এক পুরুষের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯৯১ সালে আমরা দু'মাসের জন্য সহবাস করি। তারপর আমরা আলাদা পথে যার যার মত চলে যাই। আমি এখন আর বিয়েতে বিশ্বাস করি না, আমি আর কোনদিন বিয়ে করব না। তবে এমন কারও সঙ্গে যদি দেখা হয় যার সঙ্গে বাস করতে আমার মন চায় তবে তা করবো।" অর্থাৎ তিনি পুরুষ সঙ্গ মনে প্রাণে কামনা করেন কিন্তু স্বামী চান না। কারণ বিয়ের মাধ্যমে একজন স্বামী নির্দিষ্ট হয়ে গেলে বহু পুরুষ ভোগের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তিনি স্বামী বিদ্বেষী, কিন্তু পুরুষ বিদ্বেষী নন।

মান্টো আরও একটা কথা বলেছেন– তা হচ্ছে "খানদানী বা বনেদী পতিতাদের কাছে প্রেম ভালবাসা অচল। এদের কাছে প্রেম প্রীতি ভালবাসার চেয়ে টাকাই অধিক মূল্যবান।" এ ধরনের পতিতাদের কাছে টাকা এবং টাকার জন্য দেহই হয়ে থাকে প্রধান পুঁজি। এ কারণে তারা কখনও বিয়ে করার কথা চিন্তা করে না এবং স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য বিয়ে বিরোধী প্রচারণা চালায়।

প্রথমোক্ত বক্তব্যে মান্টো বলেছেন ঃ পতিতাদের হৃদয় প্রেম প্রীতি শূন্য নয়। আর এখানে বলেছেন ঃ বনেদি পতিতাদের কাছে প্রেম ভালবাসা অচল, তাদের কাছে টাকাই অধিক মূল্যবান। অর্থাৎ তিনি পতিতাদের দুটি শ্রেণীভেদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

ঐ দুটির প্রথমটি হচ্ছে গ্রহের ফেরে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে আসা মেয়েরা বা দারিদ্র্য বশতঃ অর্থোপর্জনের জন্য দেহ ব্যবসায় পদার্পনকারি মেয়েরা। দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে শরীরের স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা সচেতন বিলাসপ্রিয় মেয়েরা।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর মেয়েরা মনের মত মানুষ পেলে বিয়ে সাদী করে ঘর সংসার করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। এরা বিপাকে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে আসার কারণে এরা নৈতিক শৃঙ্খলা এবং ধর্ম কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারায় না। এ

কারণেই দেখা যায় পতিতারা তাদের ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তি টানিয়ে রাখে এবং সকাল সন্ধ্যায় সাষ্ঠাঙ্গ মূর্তিকে প্রণাম করে। এদের কাছে হৃদয়ের মূল্য আছে বলেই তারা সংসার চায়, ধর্ম মানে। একারণেই দেখা যায়, তারা দেহদান করে কোটিপতির ছেলেকে কিন্তু হৃদয় দেয় কুলি কামিনকে। এরও কারণ তাদের ধর্মবোধ এবং স্বামীত্ব মূল্যায়ন ক্ষমতা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা অর্থাৎ বনেদী পতিতারা এত বেশী দেহ সর্বস্ব যে তারা অর্থ এবং বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু জানে না। তাদের প্রাবৃত্তিক তাড়নার কারণে তারা স্বামী, সংসার এবং ধর্ম ইত্যাদি সব কিছুকেই প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করে। আমাদের পূর্বোল্লিখিত সাহিত্যিক মহিলার লেখা পড়লে এই শ্রেণীর বিপথগামী মহিলার উদাহরণ পাওয়া যাবে।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অন্যত্র। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি সমাজের উচু স্ত রের নামী দামী কিছু মহিলা অভিজাত এলাকায় বাড়ী ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যবসা করে। আবার কেউ কেউ রাতটা স্বামীর বিছানায় কাটায় আর দিবসটা হোটেলে হোটেলে বান্ধবের বিছানায় কাটায়। এরাই হঠাৎ করে পুলিশী হামলার শিকার হয়। এদের নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ সৃষ্টি হলে এরা বড় অসহায় অবস্থার শিকার হয়। এই অসহায়ত্ব ঘুচানোর একমাত্র উপায় দল ভারি করা। সুতরাং নিজেদের দল ভারি করার জন্যই তারা এত শ্লোগান, এত উদ্যোগ আয়োজন, এত মিছিল, এত সমাবেশ দ্বারা সরলা অবলাদের বিপথগামী করার চেষ্টা চালায়।

বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্য করে যারা পিতৃদ্রোহী এবং স্বামীদ্রোহী শ্লোগান লিখে নারীর শরীরের স্বাধীনতা দাবি করে অবুঝ নারীকে দিয়ে শ্লোগান করিয়েছে তারাও ঐ স্বামীদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী সাহিত্যিকের অনুসারী এবং তাদের কেউই পুরুষ বিদ্বেষী নয়। তবে তারা কি? সেই বিচারের ভার পাঠকের উপরই রইল।

আমি মনে করি শ্লোগানসর্বস্ব ঐ প্রগতির ধ্বজাধারীরা এক শ্রেণীর মানুষ নারী পাচারকারীও বটে। এরা আমাদের গ্রামীণ সমাজে আশাহত, অশিক্ষিত, অপরিণামদর্শী মেয়েদের শরীরের স্বাধীনতা, সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা ইত্যাদির মরীচিকা দেখিয়ে ঘর পালানোর পথ প্রশস্ত করছে। তাদের প্ররোচনায় গাঁয়ের ফুলবানু আর গোলবানুরা চাকুরী করে, স্বাবলম্বী হয়ে নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করার দুঃস্বপ্ন বুকে নিয়ে ঢাকার সদরঘাটে পৌছেই দালালদের খপ্পরে পড়ে যায়।

কোমলমতি দুর্বলা নারী দালালদের কারসাজি বুঝতে পারে না। সম্মানের চাকুরী, বিবিয়ানার চাকুরী, অনেক বেতনে চাকুরীর লোভ দেখিয়ে দালালরা

তাদের নিয়ে গলির পর গলি পার হয়ে এক ভাঙ্গা বাড়ী সামনে পৌঁছে তার জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। ধর্ষিতা হওয়ার পর বা পতিতালয়ে বিক্রি হওয়ার প্রাক্কালে যখন সে সম্বিৎ ফিরে পায় তখন সারা শরীরের শক্তি প্রয়োগ করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। বড় বড় আপাদের স্বাধীনতার বাণী শুনে যখন তার অন্তর আবেগে উচ্ছাসে টগবগ করে উঠেছিল তখনতো সে বুঝতে পারেনি যে সে এত দুর্বল, এত শক্তিহীন।

যখন সে প্রগতিবাদী আপাদের গাল ভরা বুলি শুনে শহরে পাড়ি দিয়েছিল তখন সে ভেবেছিল সদরঘাটে পৌঁছতেই দেখবে প্রগতিবাদী আপারা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্য দল বেধে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ঘাটে নামতেই তাকে নিয়ে চাকুরীর টেবিলে বসিয়ে দিবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে আপারা একদিকে দালালদের জন্য নারীদেহের ব্যবসায়ের পথ প্রশস্ত করছে, অপরদিকে নিজেরাও কাজের মেয়ের নাম করে নারী দেহের ব্যবসা চালাচ্ছে। আপারা আসলে দালালের দালাল। এই দালালী ব্যবসা প্রসারের জন্যই তারা নারী সমাজকে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরে ধর্মদ্রোহী করে তোলার চেষ্টা করছে।

মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে শরীর যার সিদ্ধান্ত তার কথাটি ইসলাম ধর্ম সমর্থিত কথা। শরিয়ত অনুযায়ী বিয়ের ব্যাপারে মেয়ে তার হবু দাম্পত্য সহচরকে দেখে পছন্দানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার বিধান আছে। তারপরও বিয়ের মসলিশে মেয়েটির সম্মতি সর্বাগ্রে নিতে হবে। অর্থাৎ মেয়েটিকে সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়নের একটি সুযোগ দেয়া হয়। এ সময় যদি সে বিয়ে কবুল না করে তবে বিয়ের সকল আয়োজন এখানেই শেষ। দাম্পত্য সহচর নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেয়ার এই স্বাধীনতা অনুধাবণযোগ্য।

সিদ্ধান্ত নেয়ার এই স্বাধীনতাটি যতক্ষণ পর্যন্ত দাম্পত্য সহচর অর্থাৎ স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এর সততা, যথার্থতা ও সভ্যবোধ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু সিদ্ধান্তটি যদি দাম্পত্য বিরোধী হয় বা স্বামী বিরোধী হয় অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি যদি জ্বরায়ুর স্বাধীনতা ভোগে উদ্দেশ্যে হয়, তবে তদ্বারা সভ্যতার কবরই রচনা হবে এবং তা পশুতুল্য হবে। কারণ পশুর দাম্পত্য জীবন নাই, পশুর সভ্যতা বোধ নাই এবং পশুরা জ্বরায়ুর অপরিমিত স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। আর মানুষের মধ্যে জ্বরায়ুর স্বাধীনতার অর্থ পতিতার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটা।

এবার ধান ঘুঘু খাবে

মানুষের মানসিক ভারসাম্যহীনতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, জঘন্য নোংরা মানুষও মনে করে সে অত্যন্ত ভাল মানুষ। একারণেই পাগলকে পাগল বললে সে ক্ষেপে যায়। আর ভাল বললে সে আরও বেশী বেশী পাগলামী করে, আরও নোংরা কথা বলে, আরও নোংরা কাজ করে। তার নোংরা কাজ দেখে ও নোংরা কথা শুনে মানুষ যখন হাসে তখন সে বাহবা অনুভব করে এবং আরও বেশী বেশী পাগলামী করতে থাকে। পাগলামীর ফাঁকে ফাঁকে সে দর্শকদের দিকে তাকায়, যখন দেখে দর্শকরা তখনও হাসছে, তখন উৎসাহিত হয়ে সে পরিধানের কাপড়-খানা খুলে ফেলে দিয়ে সবার দিকে তাকায় আর হাসে। মানুষের হাসি আর হাততালি দেখে সে মনে করে সে একজন অতি বড় সংস্কৃতিবিদ এবং একজন বড় নেতা হয়ে গেছে। টোকাইরা সহ যত মানুষ হাততালি দিচ্ছে বা তার পেছনে ছুটছে তারা সবাই তার ভক্ত অনুরক্ত। সে মনে করে দেশের মানুষ সবাই মুখ্যসুখ্য পাগল, সেই একমাত্র বুদ্ধিমান।

অনেক সময়ই পাগলের পাগলামী উপভোগ্য মনে হয়। তার কারণ পাগলামীর মধ্যে সব সময়ই কিছুনা কিছু নতুনত্ব থেকে যায় সবটুকুই ব্যতিক্রমধর্মী। পীড়াদায়ক বা অশ্লীল হতে পারে ভয়ে বড়রা তার থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু ছোটদের কাছে ব্যতিক্রমধর্মী আচার আচরণ দেখতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। একারণে টোকাইরা তার পিছু নেয়, সাধারণ পথচারীরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। একারণেই টোকাইরা দলে ভারি হয়ে পাগলকে আরও ক্ষিপ্ত করে যাতে পাগলটার কাপড় খুলে ফেলা যায়। আর যদি মেয়ে পাগল হয় তবে দর্শকরাও যেন পাগল হয়ে যায় তাকে ক্ষিপ্ত করার জন্য যাতে তাকে ন্যাংটা করা যায়।

দলবদ্ধ টোকাইদের ধাওয়া দৌরাত্ম্য যখন সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করে যায় তখন পাগলকে সৎ মানুষের আশ্রয়ে ছুটে যেতে দেখা যায়। ঠিক যেমন করে অসৎ ধর্মদ্রোহীরা শেষ বয়সে মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর হয়ে আল্লাহ আল্লাহ ডেকে স্বস্তি ও শান্তির চেষ্টা করে এবং মসজিদের পাশে কবর কামনা করে।

রাস্তার পাগলের ক্রিয়াকর্ম টোকাইসহ উপস্থিত কতিপয়ের হাসির উদ্রেক করে মাত্র। কারো অন্তর তদদ্বারা আন্দোলিত হয়না। কিন্তু আমাদের দেশে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক পাগলের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা পাগলামী করে কাগজে, কলমে শিল্পে সাহিত্যে। তাদের পাগলামী সংস্কার-সংস্কৃতির ধারাকে বিভ্রান্ত করে, অন্তরকে পীড়িত করে। টোকাইরা যেমন রাস্তার পাগলের

পাগলামী উপভোগ করার জন্য কখনও পাগলকে ক্ষিপ্ত করে; কখনও উৎসাহিত করে তেমনি শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক মতলব-বাজ টোকাই আছে। এরা বুদ্ধিবৃত্তিক পাগলদের ক্ষিপ্ত করে, উৎসাহিত করে, একটি বিশেষ মতবাদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে মজা উপভোগ করার জন্য। বুদ্ধিবৃত্তিক পাগলটা যখন ন্যাংটা হওয়ার মত ধর্মদ্রোহী বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার করতে থাকে তখন মতলববাজ টোকাইরা হাততালি দিতে থাকে আরও মজা করার জন্য।

মানুষের জীবনের এমন কিছু কথা থাকে, এমন কিছু কাজ থাকে যা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত গোপন, যা প্রকাশ্যে কেউ কোনদিনও বলেনা। যেমন দাম্পত্য যৌনতা। একটা পাগল বহু অশ্লীল কথা বলতে পারে কিন্তু ঐ কথাটা কখনও বলে না। কারণ পাগলেরও একটা নৈতিক দিক আছে, একটা লজ্জাবোধ আছে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক পাগলদের তাও নেই। পান্ডিত্যের অহমিকা বশতঃ এরা লজ্জা-শরম ধর্মাধর্ম বলে কোন নীতি নৈতিকতারই তোয়াক্কা করে না।

বুদ্ধিবৃত্তিক পাগলেরা দেশের সংস্কার সংস্কৃতিকে নিজেদের জমিদারী হিসাবে গণ্য করে। সেই পাগল যদি মহিলা হয় আর যদি পোড় খাওয়া হয় তো কথাই নেই। সে নীতি নৈতিকতা সৌজন্য শালীনতার সীমারেখা অতিক্রম করে ন্যাংটা হয়ে নাচতে শুরু করে এবং মনে করে সে সকল সংস্কার সংস্কৃতিকে নিজ ইচ্ছা মত পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

এমনি এক পাগলীর আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের দেশের সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চে। সে তার একটা বইতে লিখেছে "মকছুদুল মোমেনীন" নামে একটা বই আছে। বইটি আমাদের অশিক্ষিত মুর্খ ও বর্বর মুসলমানদের অতি প্রিয় একটি বই। বইটি এ অবধি সম্ভবত কয়েক লাখ কপি ছাপা হয়েছে। "মুসলমান হিসাবে জন্ম নেবার প্রমাণ হিসাবে খৎনা করা এবং ঘরে একটি মকছুদুল মোমেনিন রাখা অবশ্য কর্তব্য বলে অধিকাংশ মুসলমানই মনে করে।"

ঐ পাগলীর কথানুযায়ী বইটি মুসলমানদের অতি প্রিয়। লাখ লাখ কপি ছাপা হয়েছে অর্থাৎ কোটি কোটি মানুষে পড়ে, মুসলমানিত্বের প্রমাণ হিসাবে খৎনা করা এবং একখানা মকছুদুল মোমেনীন ঘরে রাখাকে মানুষ অত্যাবশ্যকীয় মনে করে।

যদি প্রতি বছর এক কোটি লোকেও বইটি পড়ে তবে গত ষাট-সত্তর বছর পর্যন্ত ষাট-সত্তর কোটি মানুষ তা পড়ে আসছে। আর ঐ পাগলীর ভাষ্যমতে এরা সবাই অশিক্ষিত, মূর্খ ও বর্বর মানুষ?

এই বইটির প্রতি তার আক্রোশের কারণ, এতে পুরুষের শক্তি সামর্থ্য তথা পৌরুষের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারী দুর্বল। অথচ মানব বংশ আবাদে ক্ষেত্র যে জ্বরায়ু সেই জ্বরায়ু রয়েছে নারীর গোপনে। এই জ্বরায়ুটি যত শক্তিশালী হবে প্রজন্মও তত শক্তিশালী হবে। সুতরাং ঐ বইটিতে জ্বরায়ুর শক্তি সংরক্ষণের জন্য সৎ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শস্য ফলানোর জন্য চাষী যখন শস্য ক্ষেত্রে চাষ-মই দেয় তখন শস্য ক্ষেত্রের মাটি বিদ্রোহ করেনা। সেই শক্তি যদি মাটিকে দেওয়া হত তবে শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেত। তেমনি মানববংশ আবাদ অব্যাহত রাখার জন্য এবং সভ্যতা সচল রাখার জন্য নারীকে দুর্বল করা হয়েছে। "মকছুদুল মোমেনীন" বইটিতে একারণে পুরুষের প্রাধান্য ও আল্লাহর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে নারীকে সৎ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাত্র, আর এই পরামর্শের বিরুদ্ধেই ঐ মহিলার যত ক্ষোভ। ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সে দেশের শত কোটি মুসলমানকে অশিক্ষিত, মূর্খ, বর্বর নামে ভ্রুকুটি করছে। আর তার সকল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে পুরুষ সমাজ এবং এটাই মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। ফ্রয়েড বলেছেনঃ "মানসিক অসঙ্গতির কারণ হলো অতৃপ্ত যৌন কামনা। অবদমিত যৌণ কামনা বিভিন্নভাবে মানসিক বিশৃঙ্খলা ঘটায়ে উন্মাদ রোগের সূচনা করতে পারে।"

ঐ মেয়েটিকেও তেমনি ধরনের উন্মাদ মনে করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশেষ করে সে নিজেই এক নপুংসকের দ্বারা নিপীড়িত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছে। "নুপুংসকটি তাকে শৃংগার দ্বারা সাংঘাতিক ভাবে উত্তেজিত ও উত্তপ্ত করেছে। তৃষ্ণায় যখন তার লোমকূপ পর্যন্ত জেগে উঠেছে, পুরুষটির গা গতর ভেঙ্গেচুরে সে যখন এক নদী পানি চেয়ে কাতরিয়েছে তখন নপুংসকটা বেঘোরে ঘুমিয়েছে।" এ ধরনে অতৃপ্ত এবং অবদমিত যৌন কামনাকেই ফ্রয়েড উন্মাদ রোগের কারণ হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন।

এ ধরনের উন্মাদ রোগী মেয়েদের মধ্যেই বেশী। আমেরিকায় নপুংসকের সংখ্যা বেশী। প্রায় শতকরা ষাটজন পুরুষ মানুষ নাকি পুরুষত্ব হীনতায় ভোগে। একারণে সেদেশে উন্মাদ রোগীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। একজন দার্শনিকের হিসেব মতে সেদেশে গত একশত বছরে যেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৬৭১ জন, সেখানে, উন্মাদ রোগীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৩৩২৮ জন ('পিস অব সোল' বাই ফুলটন জে.সীন. পৃষ্ঠা ৬৬)

আমাদের দেশেও ঐ ধরনের উন্মাদ রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে এবং তা মেয়েদের মধ্যেই বেশী। গ্রামদেশের এইসব উন্মাদ রোগীদের হিসেব নিলে

দেখা যাবে এরা সকলেই যৌবনবতী। এদের সবারই যৌন উত্তেজক গল্প করার, সিনেমা ভিসিআর এর যৌন উত্তেজক ছবি দেখার বা স্কুল কলেজের ছেলে-বন্ধুর দ্বারা প্রতারণার ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু গ্রাম দেশে এদের উন্মাদ বলা হয় না। এদের জীনে বা ভূতে ধরেছে বলে মনে করা হয় এবং ওঝাদের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়।

ওঝারা চিকিৎসা করতে এসে প্রথমেই মেয়েটাকে প্রচন্ডভাবে মারধোর করে। ওঝার শারীরিক নির্যাতনের ফলে রোগিনী মারা যাওয়ার বহু খবর পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়। নির্যাতনের সাথে সাথে রোগীনিকে কোরআন, বেত পাতা এই চোখে সর্ষের তেল প্রয়োগের ভয় দেখানো হয়। আসলে উপবাস বা রোজা দ্বারা যেমন যৌন আবেগ অবদমিত হয় ভয়-ভীতি নির্যাতন দ্বারাও তেমনি রোগিনীর যৌন উত্তেজনা অবদমনেরই চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত রোগিনীর বিয়ে হয়ে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগটির উপশম ঘটে। আজকাল এধরনের উন্মাদ রোগির সংখ্যা শহরেও যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির কারণও যৌন ছবি। ঘনবসতিপূর্ণ শহরে মেয়েদের এই অসুখ গোপন রাখার জন্য সবাই গোপনে গোপনে পীর ফকিরদের স্মরণাপন্ন হচ্ছেন। বরং আজকাল মনো-চিকিৎসকের চেয়ে পীর ফকিরদের দরবারেই ভীড় হয় বেশী এবং পীর সাহেবেরা তাবিজের সাথে সাথে ত্বরিৎ বিয়ের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

আমাদের ঐ লেখিকার দশাও তাই বা তারও চেয়ে বেশী। কারণ সে স্বীকার করেছে, সে বহু যৌন প্রতারণার স্বীকার হয়েছে। যেমন তারই কথায় "কে বলে মেয়েরা পারেনা একা বেঁচে থাকতে একা দাঁড়াতে, আমার সর্বস্ব লুটে নিয়ে আমাকে নিঃস্ব করে যখন প্রতারক পুরুষেরা যে যার মত পালিয়ে গেছে, কই আমি তো ধুলো ঝেড়ে ঠিক দাঁড়িয়েছে। আমি এই যে হাঁটছি দৌড়াচ্ছি, সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠছি নামছি, আমার তো কই কোন কষ্ট নেই।"

সুতরাং প্রতারক পুরুষেরা অর্থাৎ অনেক পুরুষে তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে গেছে। এই অনেক পুরুষের বাহুলগ্না হতে গিয়েই সে নিজের যৌন সম্পদকে বিপর্যস্ত করেছে। আর সেই বিপর্যয়ই তার মানসিকতাকে বিপর্যস্ত করেছে, উত্তেজিত করেছে, তাকে উন্মাদ করেছে। কিন্তু অত পুরুষের বাহুলগ্না সে হতে গেল কেন? "মকছুদুল মোমেনীন"-এর নিয়ম-কানুন উপদেশ মেনে চললে এই পুরুষেরা কিছুতেই তার সর্বস্ব লুটে নেওয়ার সুযোগ পেত না। কিন্তু সে তা করেনি বলেই সে সর্বস্ব হারিয়েছে। আজ তার কোন সুহৃদ নেই, স্বামী নেই কোন আশ্রয় নেই। তাই তাকে এখন একটু সুখের জন্য একটু শান্তির জন্য দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

সংসারে যেখানে কোন কুকুর বিড়াল পর্যন্ত নিঃসঙ্গ থাকে না, হায়! সেখানে ঐ মেয়েটি কত নিঃসঙ্গ, কত অসহায়। ঐ যে সে হাঁটছে তা কারও কাজে নয়, ঐ যে দৌড়াচ্ছে তা মনের সুখের জন্য নয়, ঐ যে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছে, নীচে নামছে তাও কোন আহলাদে নয়। আসলে এ এক হৃদয় বিদারক বিলাপ। সে কারও জন্য নয়, তার জন্য কেউ নয়। ঠিক পাগলদের যা হয়ে থাকে।

পাগল নিয়ে দর্শকরা টোকাইরা যতই মাতামাতি করুকনা কেন কেউ কাছে যেতে সাহস করেনা– কি জানি কি করে বসে। ঐ লেখিকার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বহুজন তাকে নিয়ে মাতামাতি করেছে ঠিক, তাকে উস্কানীও দিচ্ছে কিন্তু সহচর হয়ে তার কাছে ঘেঁষতে সাহস করছেনা। অথচ তার সঙ্গ চাই, সযত্ন জীবন চর্চার জন্য সন্তান চাই, স্বামী চাই, সংসার চাই। কিন্তু হায়! তার তো কিছুই নাই।

সুতরাং সে প্রস্তাব করেছে নারীরা যেমন পতিতালয়ে পসার খুলে বসে পুরুষদেরও তেমনি পতিতালয় খুলে বসতে হবে। সে নারী সমাজকে আহবান জানিয়েছে নারীরা যেন পুরুষকে ধর্ষণ করতে শিখে, পুরুষকে ছিঁড়ে খুড়ে খেতে শিখে, তাহলেই পুরুষের প্রাধান্যকে নস্যাৎ করা যাবে।

তার ভক্ত অনুরক্তদের বাহবা দেখে উৎসাহের বাণী শুনে সে মনে করছে সে যা চাইছে অতি শীঘ্রই তা ঘটতে যাচ্ছে এবং সেই দিনটা খুব বেশী দূরে নয়।

১৫ জুন ৯৩ তারিখে ঐ সুরেই সে– "কতবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাবে ধান" শিরোনামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বুঝাতে চেয়েছে পুরুষের দিন শেষ হয়ে এসেছে। সে বোধ হয় এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে যাচ্ছে যাতে মেয়েদের ক্ষেতে ছেলেদের আর চাষাবাদ করতে এবং শস্য ফলাতে দেওয়া হবে না। মেয়েরাই ছেলেদের গর্ভে সন্তান প্রজনন করবে আর ছেলেরা গর্ভ ধারণ করবে, সন্তান প্রসব করবে, সন্তানকে স্তন্যদান করবে। এতদিন ঘুঘু ধান খেয়েছে– এখন ধান ঘুঘু খাবে।

কি জানি, উন্মাদের নৌকা পাহাড় বাইলেও বাইতে পারে। কারণ উন্মাদের কাজ হাতে হয় না। পায়ে হয় না, পেশীতেও হয় না– উন্মাদের কাজ হয় কল্পনায়, কথায়। আর ঐ পাগলীর নোংরা কাজ ও কথার প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক টোকাইদের বাহবা দেখে সে নিজেকে এমন এক যাদুকরী শক্তির অধিকারিনী মনে করছে, যে শক্তিবলে সে দুনিয়ার সব নিয়ম কানুন ওলট পালট করে দিতে পারবে বলে মনে করে।

চোলিকা আন্দর

টেড বান্ডি নামক আমেরিকার এক ব্যক্তি বারো বছর বয়সের এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণ শেষে হত্যা করে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে হত্যা মামলা দায়ের করে। ফ্লোরিডার একটি আদালতে তার বিচার হয় এবং তাকে মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রদান করে।

১৯৭৮ সনের ২৪ শে জানুয়ারী বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে টেড বান্ডির মৃত্যু দন্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে এক জবানবন্দীতে সে জানায়, ঐ একটি মেয়েই নয়, সে অন্ততঃ ২৩ জন মহিলার শ্লীলতাহানি করেছে এবং তাদের সবাইকেই সে হত্যা করেছে।

মৃত্যু দন্ডাদেশ পাওয়ার পর কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে টেড বান্ডি আত্মসমালোচনা করেছে, নিজের বিপথগমন এবং এই পরিণতির কারণ নিজেই উদঘাটন করার চেষ্টা করেছে।

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে টেড বান্ডি বলেছে, অশ্লীল সাহিত্য এবং অশ্লীল ছবিই তার বিপথগমনের একমাত্র কারণ। অশ্লীল সাহিত্য পাঠ করে তার ধারণা হয়েছিল, পুরুষের যদৃচ্ছা ভোগ এবং পীড়নের জন্যই নারী দেহের সৃষ্টি। একারণেই হাজারো নিপীড়ন সহ্য করেও নারী তাঁর ভোগের পেয়ালা তুলে ধরে পুরুষের কামনার কাছে। একারণে পুরুষ কাম নিষ্ঠুর জেনেও নারী তার রূপের চমক বিকিয়ে বেড়ায় নৃত্যে, অভিনয়ে, বিজ্ঞাপনে।

অশ্লীল ছবি দেখতে গিয়ে তার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। ছবির ন্যাংটা দৃশ্যগুলি প্রতনিয়ত টেড বান্ডিকে কামতাড়িত করতে থাকে। এক সময় তার ভেতরের পশুত্বটা প্রচন্ডভাবে ক্ষুধার্ত এবং নৃশংশ হয়ে উঠে। সে নারী হরণ এবং ধর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু একটি নারীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার ধর্ষণ তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। সে নারীকে কখনও সামান্য প্রলোভনে কখনও বিনা প্রলোভনে যত সহজে হাতের মুঠোয় পেয়েছে, তত সহজে ভোগ করে হত্যা করেছে।

অশ্লীল সাহিত্য ও অশ্লীল ছবির দৃশ্য মানুষের রিপুকে কত সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত করতে পারে এবং কত বড় বড় অপরাধের দিকে ঠেলে নিতে পারে সে কথাটিই টেড বান্ডি বলে গেছেন। প্রবৃত্তি সম্পর্কিত ছোট ছোট হাসি তামাশাই ধীরে ধীরে নৃশংস অন্যায় এবং পাপের আকার ধারণ

করে। এই কারণেই কোরআন এবং হাদিসে মানুষকে অশ্লীলতা হতে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অশ্লীল ছবি ও সাহিত্য শুধু অপরাধ এবং পাপেরই জন্ম দেয়না। তদ্দারা মানুষের নৈতিক চরিত্র যেমন ধ্বংস হয় তেমনি ধ্বংস হয় মানুষের ধর্মবোধ, সৌন্দর্যবোধ, সৌর্য, বীর্য এবং মেধা। এই ধ্বংস প্রক্রিয়াটি পরোক্ষে সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে মদমত্তের মত মানুষ বুঝতেই পারল না কি করে কখন তার নিয়তি বদলে গেল।

পূর্বে জাপানে কারও সাথে কারও শত্রুতা থাকলে তাকে উপহার স্বরূপ একটি পুরানো মোটর গাড়ী উপহার দেওয়া হত। যাতে করে ঐ মোটর গাড়ীটি মেরামত করতে গিয়ে দিনের পর দিন অর্থ নষ্ট হয়ে লোকটি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে একের সাথে অপরের শিল্প সাহিত্যের আদান-প্রদান করা একটি অতি সাধারণ সভ্য নিয়ম। আজকাল বহু দেশ আছে যারা বিদ্বেষবশত জাপানীদের গাড়ী উপহারের মত অপর দেশে অশ্লীল সাহিত্য ও সিনেমা উপহার পাঠিয়ে দেশটিকে হীনবীর্য, নিরূৎসাহী ও পরনির্ভরশীল করে রাখার চেষ্টা করে থাকে। আমাদের বাংলাদেশ তার এক নম্বর দৃষ্টান্ত।

পত্রিকার খবরে প্রকাশ, আমাদের যুব সমাজের নৈতিকতা ধ্বংসের চক্রান্ত হিসাবে ভারতীয় বাঙালী যুবক যুবতীদের দিয়ে তৈরী প্রচুর সংখ্যক নীল ছবি আমাদের দেশে আসছে। সীমান্ত অঞ্চলের জেলাগুলিতে এসব ছবির রমরমা ব্যবসা চলছে। যেসব ছবি উর্দু বা হিন্দি ভাষায় তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশী অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সেগুলিকে নির্বাক করে পাঠানো হয়। কারণ এসব ছবিগুলির সংলাপের কোনই গুরুত্ব নেই, দৃশ্যই মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই সব দৃশ্যের প্রদর্শনী দ্বারা প্রচুর অর্থপার্জন করে থাকে। সীমান্ত অঞ্চলের অর্থলোভী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা এসব পর্ণছবি চোরাপথে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসছে। তারা হাটে বাজারেও গ্রামে-গঞ্জের ক্লাব ঘরে, সমিতির ঘরে, বৈঠকখানা ঘরে, সিনেমা হলের মত বিজ্ঞাপন দিয়ে ভিসি আর এর মাধ্যমে উচ্চমুল্যে প্রদর্শন করছে। এসব ছবির দৃশ্য দেখে আমাদের দেশের কিশোর, কিশোরী, যুবক, যুবতীরা নৈতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। দেশে নতুন নতুন টেড বান্ডি তৈরী হচ্ছে। হরণ, ধর্ষণ এবং খুনে সারা দেশ জর্জরিত হয়ে পড়ছে।

সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সীমান্ত অঞ্চলের সমাজ। সীমান্ত অঞ্চলে একদিকে পর্ণ ছবি, চোরা কারবার, তার উপর নেশা দ্রব্য ইত্যাদি সবকিছুর প্রভাবে সীমান্তবাসীরা যেন সভ্য সমাজ হতে বহু দূরে অসভ্য, আদিম বর্বর যুগে ফিরে গেছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাহতা খুললেই যশোর, বেনাপোল, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলের বহু হরণ, ধর্ষণ, খুনের ঘটনা চোখে পড়ে। তাছাড়া আবার আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে প্রচুর। সেসব আত্মহত্যার কারণও যৌনতা সম্পর্কিত বা প্রেমঘটিত। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একমাত্র যশোর জেলার ১৯৯১ সনের জানুয়ারী হতে মে মাস পর্যন্ত পাঁচ মাস সময় ২০০ জন আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায়। তন্মধ্যে ১৭২ জন মারা যায়। (দৈনিক ইনকিলাব ৬/৭/৯১)

ঐসব ঘটনার সংবাদ পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু খুব কম ঘটনাই পুলিশের নজরে আসে। বেশীর ভাগই পারিবারিক মানসম্মানের ভয়ে বা পুলিশের হয়রানির ভয়ে ধামাচাপা দেওয়া হয় বা গোপন করা হয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা সমাজের উপর সিনেমার প্রভাব বেশী হওয়ার কারণেই যে কোন সিনেমা তৈরী হয়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পূর্বে বিশ্বের সকল দেশেই সেন্সরশীপের ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক। অশ্লীল ছবি যাতে সামাজিক, নৈতিক বিপর্যয় ঘটাতে না পারে তা-ই সেন্সরের উদ্দেশ্য।

ভারত সরকারও সকল সিনেমা সেন্সর করে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে যারা ভারতীয় সিনেমাগুলি সেন্সর হওয়ার পূর্বেই চোরাপথে ভিডিও করে নিয়ে আসে। বিশেষ করে যেসব ছবিতে ন্যাংটা নর-নারীর আদিম ক্রিয়াকর্মের দৃশ্য আছে এবং যেসব ছবি এদেশের কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীদের প্রচন্ড যৌন সুড়সুড়ি দিতে পারে সেসব ছবির প্রতিই অসাধু ব্যবসায়ীদের নযর বেশী। শেষপর্যন্ত হয় তো দেখা যায়, ছবিটি ভারতে প্রদর্শনের ছাড়পত্র পায়নি, অথবা বিশেষ বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে । কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের দেশে ছবিটি সবাই দেখে ফেলেছে। যেমন চিত্র তারকা সোনাম অভিনীতি বিজয় নামক একটি ছবি।

বিজয় ছবিটিতে অভিনেত্রী সোনাম-এর ন্যাংটা হয়ে গোসল করার একটি দৃশ্য আছে। ছবিটির যেখানে নায়িকার ন্যাংটা গোসলের দৃশ্য আছে ভারতীয় সেন্সর ঐ অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনে অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু আমাদের দেশের সেন্সরের নাকের ডগায় বসে ভিডিও ব্যবসায়ীরা ছবিটির ঐ ন্যাংটা গোসলের দৃশ্য দেশের ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছে। তারা সেন্সর হওয়ার পূর্বেই ছবিটির ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে এসেছিল।

১৯৯৩ সনে আমাদের দেশের ভিডিও দোকানগুলিতে দু'টি ছবির আবির্ভাব ঘটেছে। একটি 'খল নায়ক' অপরটি 'খল নায়িকা'। ছবি দুটি ৬ই আগস্ট ১৯৯৩ তারিখে ভারতের প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি পেয়েছে। সাথে সাথে ভিডিও ভর করে আমাদের দেশেও এসে গেছে।

ঐ ছবি দুটি নিয়ে ভারতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। কারন, ছবি দুটিতে এমন কিছু নাচ এবং গানের দৃশ্য আছে যাতে মেয়েদের ন্যাংটা করে দেওয়া হয়েছে।

খল নায়ক ছবিটিতে নায়িকা ওড়না দ্বারা মুখ ঢেকে দইয়ের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে সহশিল্পী পরিবৃত হয়ে নেচে নেচে একটি গান গাইতে থাকে। শিল্পীদের সবার পরনে আঞ্চলিক পোশাক সংক্ষিপ্ত চোলি বা ব্লাউজ এবং ঘাগরা। গানের কলিতে নায়ক জিজ্ঞেস করছে?

-"চোলিকে পিছে ক্যায়া হায়, চোলিকে পিছে'। নায়িকা বলছে 'চোলিকে পিছে মেরা দিল হ্যায়, এদিল মাইনে দেগি মেরা ইয়ারকো' অর্থাৎ ব্লাউজের নীচে আমার দিল আছে, এ দিল আমি আমার সখাকে দিব।

আসলে ব্লাউজের নীচে কি আছে তা জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ ঐ নর্তকীদের শরীরে ব্লাউজের নামে যে সামান্য একটু কাঁচুলী আছে তা তাদের লাস্যময় উন্নত পয়োধরটি আবৃত করার জন্য এবং ধারণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের উন্নত পয়োধর এমনিতেই প্রায় সবটুকু দৃশ্যমান তদুপরি নাচের তালে তালে কাঁচুলী উপচে তার সবটুকু বাইরে বেরিয়ে আসছে। তবু কেন ঐ জিজ্ঞাসা? আসলে ঐ জিজ্ঞাসাটা জিজ্ঞাসা নয়, ওটা দর্শকদের প্রতি যৌন কাতুকুতু সৃষ্টির একটা অপপ্রয়াস মাত্র।

খল নায়িকা সিনেমাটিতে দেখানো হয়েছে, নায়কের স্ত্রীর বান্ধবী এসেছে বেড়াতে। নায়ক স্ত্রীর বান্ধবীর বুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'আচঁলকা আন্দর ক্যায় হায়, আচঁলকা আন্দর? বান্ধবী বলছে, 'আচল কা আন্দর চোলি হায় চোলি। নায়ক আবার প্রশ্ন করছে 'চোলিকা আন্দর কেয়া হ্যায় বাতাও, বাতাও। বান্ধবী বলছে 'চোলিকা আন্দর, তবাহি হ্যায়, তবাহি'। তবাহি শব্দের অর্থ বিপর্যয় বা ধ্বংস যাকে বলা যায় এ্যাটম বোমা।

ব্লাউজের নীচে কি আছে, এই জিজ্ঞাসা এবং নাছের ছন্দে, তালে, লয়ে ব্লাউজের নীচে গোপন জিনিসটির সস্তা প্রদর্শনীর দৃশ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতের নারীবাদী সংস্থা 'সুবিধা সেন্টার' ঐ নাচ এবং গানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দিয়েছে। তারা অভিযোগ করেছে, গানগুলিতে নারীদেহের সৌন্দর্যকে পথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে গানটির কথা ও সুর

যেমন কদর্য, নায়িকারাও তেমনি কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গিতে নেচে নেচে গানটি গেয়েছে।

ছবি দুটির নাচ-গানের ভঙ্গি ও ভাষা নিয়ে যখন ভারতের শালীনপন্থি মানুষেরা তুলকালাম করছে এবং ছবিগুলির প্রদর্শন যোগ্যতা আদালতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তখন আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহকারে ঘরে ঘরে সে সব ছবি উপভোগ করেছি। আর আমাদের সেন্সর বিভাগ দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বুড়া আঙ্গুল মুখে দিয়ে চুষছেন। কারণ, বাংলাদেশের যে সেন্সর আইন আছে তাতে নাকি সিনেমা হলে প্রদর্শনযোগ্য সিনেমাই সেন্সর করার বিধান আছে। ভিডিও সেন্সর করার বিধান নেই। সুতরাং সেন্সর বোর্ড শুধু আমাদের দেশে তৈরী হওয়া সিনেমা এবং বিদেশ হতে যেসব সিনেমা সেন্সর হয়ে আসে সেগুলিই সেন্সর করেন। ভারত হতে সেন্সর হওয়ার পূর্বেই ভিডিও ভর করে যেসব অশ্লীল সিনেমা আসে এবং যেসব পূর্ণ ছবি আসে সেগুলি তারা সেন্সর করেন না। কারণ ভিডিও সেন্সর করার বিধান আইনে নেই।

শিবের গাজন

একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাংলা একাডেমীর উৎসবে প্রতিবছর বহু নষ্ট ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। তার একটি মর্মান্তিক নষ্ট চিত্র মানুষের বিবেকের সামনে তুলে ধরেছেন নষ্ট কলাম নামে এক লেখিকা।

তিনি লিখেছেন ঃ "একুশে ফেব্রুয়ারীর বিকেলে বাংলা একাডেমীর গেটে প্রতিবছর খুব নীরবে ঘটে যাচ্ছে অশ্লীল সব ঘটনা। গেটে ভিড়ের মধ্যে মূলত যারা ভিড় তৈরী করে, মনে হয় তারা ঢুকছে কিংবা বেরোচ্ছে। আসলে তারা ঢুকছেও না একাডেমী থেকে বেরও হচ্ছে না। কেবল গেটের কাছে ভিড় পাকায়। হঠাৎ ধাক্কায় গায়ে গড়িয়ে পড়ে সকলে, আবার উঠে দাঁড়ায়। ভিড়ে চাপে ও তাপে এক একজন মথিত হতে হতে যদি ছিটকে বেরোতে পারে তবে সে যাত্রা সে বাঁচল। কিন্তু বাঁচেনা ঐ মেয়ে মানুষেরা। কিছু ছেলেরা, ওরা দিনে দিনে সংখ্যায় বাড়ছে, এই ভিড় সৃষ্টির পেছনে ওদের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। ভিড়ের মধ্যে কোন মেয়ে পড়লে, আমার বলতে বাধে না যে, সেই মেয়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসে অসংখ্য হাত এবং মেয়ের স্তন, তলপেট, উরু ও নিতম্বে যে থাবা পড়ে, তা তাকে শারীরিকভাবে তো অসুস্থ করেই, মানসিকভাবেও আর সুস্থ রাখে না।

শরীরে শাড়ী নেই, ব্লাউজ ছেঁড়া। এই অবস্থায় সেদিন ভিড় থেকে বেরিয়েছে একটি একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে। এই মাত্র ধর্ষিতা হয়ে অবিন্যস্ত পায়ে হেঁটে আসার নারীর মত তাকে মনে হয়। দেখে আমুল শিহরিত হই... এমন মেয়ে নেই, যে মেয়ে ভিড় পার হয়ে মেলায় ঢুকেছে অথচ তার নারী অঙ্গে কারও অসৎ থাবা পড়েনি–

লোকে বলে- মেয়েদের শরীর হচ্ছে বারো চুম্বকের হাতিয়ার। বয়স যত বাড়তে থাকে তাদের শরীরের চুম্বকত্বও তত বাড়তে থাকে এবং তার কণ্ঠস্বরে, এমনকি তার মানসিকতায়ও চুম্বকত্বের বলয় তৈরী হয়। সুতরাং যার শরীরের চুম্বকত্ব যত প্রবল হয় এবং তা যদি দৃশ্যমান হয়, তবে তার বিপরীত লিঙ্গকে তত প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে থাকে। এই আকর্ষণ করা এবং আকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সৃষ্টির এক অমোঘ রহস্য নিহিত রয়েছে।

আসলে একুশে ফেব্রুয়ারীর দুর্ঘটনাগুলি নাস্তিকদের প্ররোচিত অসদাচার এবং চুম্বকত্বের অপব্যবহার মাত্র। কারণ যে ধর্মের কঠোর অনুশসান ঐ চুম্বকত্বকে শাসন করে, ধর্মীয় বিধি নিষেধের লাগাম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে, নাস্তি

কেরা সেই ধর্মকে মানে না বলেই তা আজ লাগামছাড়া ঘোড়ার মত স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছে। হরিণের দেহেও অমন চুম্বকত্ব আছে। ঐ চুম্বকত্বের কারণে হরিণ সবার শত্রু। বাঘ তাকে ঘাড় মটকে খাবার জন্য, মানুষ তাকে শিকার করে, তার শিং, চামড়া, গোস্ত আহরণের জন্য একপায়ে খাড়া।

হরিণ তার শরীরের কারণেই যে সবার শত্রু এ কথা সে ভাল করেই জানে। সে আরও জানে সে যে দুর্বল, রুখে দাঁড়াবার বা আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি যে তার নেই, এ কথা হরিণ ভাল করেই জানে। সে আরও জানে যে, তার বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে নিজ শরীরকে শিকারীদের সৃষ্টির আড়ালে বনানীর ঝোপে ঝাড়ে ঢেকে রাখা, ঠিক যেমন করে একজন নারী পর্দা দ্বারা তার শরীরের আকর্ষণকে ঢেকে রাখে।

আল্লাহ বিশ্ব সৃষ্টি করে তার শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত রাখার জন্য শাসক, শাসিত, শোষক, শোষিত, খাদ্য, খাদক ইত্যাদিকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন একের দুঃখের বিনিময়ে অন্যে সুখী হয়, একের শ্রমে অন্যের ফল লাভ হয়, একের মৃত্যুর বিনিময়ে অপরে বাঁচে, একের ব্যয়ের বিনিময়ে অপরের আয় হয়। চন্দ্র-সুর্য, আলো-বাতাসের গতিবিধি যেমন কেউ পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন করতে পারে না, ঐসব নিয়মেরও কোন পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না।

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পুরুষকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে বাইরের বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার মত উপযুক্ত শক্তি, সাহস, অস্থি-মজ্জা ও শক্ত পেশী দিয়েছেন। আর নারীকে কোমল পেশী, গর্ভাধারণ, দুগ্ধাধার, কিন্নরকণ্ঠ, আকর্ষণীয় লাবণ্য ইত্যাদি দিয়েছেন, যা পুরুষকে শান্তির জন্য, ক্লান্তি নিরসনের জন্য, সন্তান প্রজননের জন্য চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে।

নারীর শরীরে যেমন পুরুষের জন্য আকর্ষণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, পুরুষের শরীরেও তেমনি নারীকে আকর্ষণ করার মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। পার্থক্য হচ্ছে নারীর সেই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অঙ্গগুলি কোমল, উদ্ধত কর্মক্ষমতার জন্য প্রতিবন্ধক এবং যৌন অনুভূতি সম্পন্ন, সুতরাং অবশ্য গোপনীয়। একারণে নারী অঙ্গের বেশীর ভাগই যৌন অঙ্গভুক্ত।

পক্ষান্তরে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শক্তি-সাহস, সবলতা বা কাঠিন্য। নারী সেই শক্তির পূজারী। আজকাল বাজারে প্যান্থার নামে একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিজ্ঞাপন যত্রতত্র দেখা যায়। তাতে একটি চিতা বাঘের ছবি এমনভাবে ফোটানো হয়েছে যেন তার মদমত্ত পদক্ষেপের

সাথে একটা মদাসক্ত কামাতুর চাহনি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুরুষের ব্যাঘ্রবং আচরণের প্রতি নারীর অনুরাগকেই ঐ ছবিতে শিল্পচাতুর্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার প্রতি নারী সমাজকে প্রলোভিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই রয়েছে সোহাগের ইঙ্গিত ও উপাদান। আর পুরুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই রয়েছে শাসনের এবং সোহাগী নিপীড়ন আকর্ষণের উপাদান।

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতিবছরই ফাগুন হাওয়ার পুলক নিয়ে আসে। প্রতিবছরই মেলা প্রাঙ্গনের প্রবেশদ্বারে কিছু বিকৃত রুচির যুবকেরা ভিড় বেঁধে একটা কিছু গোপন উদ্দেশ্যে জটলা পাকায়। আর নারীদেহই হচ্ছে সেই ঈঙ্গিত বস্তু, যার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ স্ত্রীলোক গোপনীয় বস্তু, যখন সে পর্দায় বের হয়, শয়তান তাকে পুরুষের চোখে মনোমুগ্ধকর করে দেয়।

সুতরাং যখনই কোন সংক্ষিপ্ত শাড়ী-ব্লাউজ পরা মেয়ে প্রবেশদ্বার অতিক্রম করতে যায়, অমনি ছেলেদের ভিড়ে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। ছেলেরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার সবাই পড়ে যায়। আর তাদের শরীরের নীচে মেয়েটি পিষ্ট হতে থাকে। তার যে স্তন এতক্ষণ দৃশ্যমান ছিল সেই স্তনটি এবং পেটসহ গোপন সকল অঙ্গে দশ-বিশটা চন্ড হাতের নিপীড়ন চলতে থাকে।

এক সময় মেয়েটি যখন বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তখন দেখা যায়। তার সযত্নরচিত খোঁপা ও বেণীর বাঁধন খুলে চুলগুলি গুদামের পাটের মত অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে, ঠোটের লিপষ্টিক ছেলেদের গালে মুছে রয়েছে, গালের রোজপাউডার লেপ্টে গিয়ে গালটির অবস্থা পচা আপেলের মত হয়ে গেছে, ব্লাউজের বোতামগুলো সব ছিঁড়ে গেছে। ব্রেসিয়ারটা হাওয়ায় ভেসে ভিড়ের এক পাশে গিয়ে পড়েছে। কখনও কখনও বুক ষ্টলের পাশের গাছে ব্রেসিয়ার ঝুলতে দেখা গেছে।

একুশের মেলার পূর্ব অভিজ্ঞতা যেসব মহিলার নেই, তারা ভিড় হতে বেরিয়ে শাড়ীর ছিন্ন আঁচল দিয়ে মুখ ও মাথা ঢেকে একাডেমীর বটমূলে বসে কাঁদে। আর যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এবং যারা নারী প্রগতির প্রবক্তা, তারা ভিড় থেকে বেরিয়ে স্মিত হাসি মুখে নিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে কেউ ব্রেসিয়ারের হুক আবার কেউ ব্লাউজের বোতাম টিপতে টিপতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়, যেন-না, কিছুই হয়নি। এমনটি তো গতবারও হয়েছিল, এমনটি তো হতেই পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক।

যৌন পাপের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে পঞ্চভারের চর্চা, যাকে যৌনকর্মের শৃঙ্গার বলা হয়ে থাকে। পঞ্চভারের অর্থ হচ্ছে- রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ ইত্যাদি উপভোগ করা। পরনারীর সাথে হলে ধর্মীয় বিধানমতে একাজটি একটি বড় পাপ এবং সর্বজন ধিকৃত কাজ। এ কারণে যথেষ্ট প্ররোচিত হয়েও রাস্তাঘাটে কেউ কখনও ঐ স্পর্শ সুখটি যদিও উপভোগ করতে সাহস করে না কিন্তু রূপ, শব্দ, গন্ধ এই তিনটির উপভোগ হয়ে থাকে। তদ্বারা ভয় ও লজ্জা কেটে যায়, প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, হরণ ও ধর্ষণের পথ প্রশস্ত হয়।

পুরুষ হোক বা নারী হোক, ঐ পাপের অভিজ্ঞতা দ্বারা শরীর ও মন পাশবিক আবেশে আবিষ্ট হয়ে অজ্ঞানতার প্রসার ঘটতে থাকে। এই অজ্ঞানতা হতেই নাস্তিকতার জন্ম হয়। এই অজ্ঞানতার কারণে একুশের বাংলা একাডেমীতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এই অজ্ঞানতার কারণে গতবার যে নারী যে কারণে লাঞ্ছিত হয়েছে, সে সম্পর্কে চিন্তা না করে এবারও সেই একইভাবে যায় এবং একইভাবে নিপীড়ন সুখ অনুভব করে। অথচ ধর্ম এই সুখটিরই বিরোধিতা করে। এদের সম্পর্কেই হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ভগবদ গীতায় বলা হয়েছেঃ "হে কৌন্তেয় (অর্জুন), জ্ঞানীদিগের নিত্য শত্রু এই দুষ্পুরণীয় অগ্নিতুল্য কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি-ইহারা কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থল বলিয়া কথিত হয়। কাম ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানকে আছন্ন করিয়া জীবকে মুগ্ধ করে রাখে।" (অধ্যায় ঃ ৩ শ্লোক ঃ ৩৯-৪০) অর্থাৎ, কাম-প্রবৃত্তি জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষ তদ্বারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু একুশের মেলায় এক শ্রেণীর নারী সব সময়ই নিরাপদ থাকেন। তারা হচ্ছেন ওড়না-বোরকা পরা আপারা ও খালাম্মারা। ওড়না বা বোরকার ভিতর হাত ঢুকিয়ে কারও গুপ্ত অঙ্গ স্পর্শ করার বা কারও গলার হার ছিনতাই করার দুঃসাহস আজ পর্যন্ত কোন দুরাত্মার হয়নি।

এমন কি যেখানে এক ভরি আধা ভরি সোনার গহনা গায়ে পরে রাস্তায় নামলে মা-বোনকে ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ হারাতে হয়, সেখানে ওড়না বোরকা পরা মহিলারা একসের বা আধা সের ওজনের সোনার গহনা শরীরে নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেও নিরাপদে ঘারে ফিরে আসছেন। বরঞ্চ পথে কোন অসুবিধায় পড়লে চোর-বদমায়েরাও তাঁদের আপা, খালাম্মা সম্বোধন করে সসম্মানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এই শ্রদ্ধা, এই সাহায্য, এই নিরাপত্তার মূলে রয়েছে ঐ আপা ও খালাম্মাদের ওড়না ও বোরকা, যাকে শুধু পর্দাই বলা যায় না। বরঞ্চ তা হচ্ছে

নারীর আভিজাত্য ও শ্রদ্ধাস্মপদতার বৈশিষ্ট্যের প্রতীক এবং আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য সুরক্ষিত দুর্গ। রাস্তাঘাটে এই পোশাক তাকে বুলেট প্রুফ গাড়ীর মত রক্ষা করে।

দরিদ্র শ্রেণীর যারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করে তারা ওড়না বোরকার চিন্তা করে না। যৌবনের স্বল্প সময়টা পার হয়ে এলে তাদের অনাহারক্লীষ্ট রুক্ষ শরীর আর কাউকে আকর্ষণ করে না বা তাতে ঢাকবার মত আর কিছু থাকে না। কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে উচ্চবিত্তের নারীরা চিরযৌবনার মত। এ কারণে এই শ্রেণী এবং মধ্যবিত্তের যাদের মধ্যে সামান্য শালীনতাবোধ এবং সাধারণ ভালমন্দ জ্ঞান আছে তারাই ওড়না-বোরকার প্রধান খদ্দের।

অথচ নষ্ট কলামের ঐ অর্বাচীণ লেখিকা লিখেছেন– "যে অশিক্ষিত মেয়েরা কাপড়ের ওপর কাপড় চাপিয়ে নিজেকে জড় বুদ্ধি, স্থূলদর্শিতা ও অনুর্বর মস্তিষ্ক ঢেকে রাখে, ধর্ম তাকে কুৎসিৎ বানিয়েছে, তাই ধর্ম তাকে ঢেকেছে।"

ঐ কথাটি বলার পূর্বে সে কি নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখেছে তার শরীরটা কতটুকু আকর্ষণীয়, তার শরীরে কয় প্রস্থ বস্ত্র আছে এবং কেন আছে? তার শরীরের সাথে দরিদ্র নারীর শরীর এবং পুরুষ শরীরের এত পার্থক্য কেন? সে কি জানে না, যে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই জন্ম এক ফোঁটা অপবিত্র পানি হতে। অথচ জন্মের পর এই মানুষটিই সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী এবং সে পোশাক পরে আরও সুন্দর সাজে সজ্জিত হওয়ার চেষ্টা করে।

ঐ লেখিকার লেখা পড়ে মনে হয় না যে, এই গ্রহে তার জন্ম হয়েছে। মনে হয় অন্য কোন দিগম্বর মানুষের গ্রহ হতে তার আগমন ঘটেছে এবং এই গ্রহের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সে যেন তাজ্জব বনে গেছে। সে এতই বোকা যে, এই গ্রহের মানুষের ধ্যান-ধারণার সাথে নিজেকে খাপ না খাইয়ে নিজের ধ্যান-ধারণার সাথে বিশ্ববাসীকে খাপ খাওয়াতে সচেষ্ট হয়েছে।

এদের মত মেয়েরাই রূপ ও রসের ছলনা দ্বারা এক শ্রেণীর যুবককে অসৎ কর্মের প্রতি প্ররোচিত করছে এবং বাংলা একাডেমিসহ সারাদেশে নারীদের নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকারে পরিণত করছে। কিন্তু তাতেও তারা পরিতৃপ্ত হতে না পেরে এবার ছেলেদের শাড়ী পরিয়ে নিজেরাই ছেলেদের উপর চড়াও হওয়ার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছে।

তাই ঐ লেখিকা লিখেছেঃ "সৌন্দর্য শুধু নারীর শরীরেই নয়, পুরুষের শরীরেও সৌন্দর্য থাকে। বেশভূষা নারীর চেয়ে পুরুষের কম নয়। তবে শরীর আবৃত করার দায় নারীর একার কেন? পুরুষের বেশভূষা ও সৌন্দর্যের প্রতিও নারীর দৃষ্টি যায়। শারীরবিজ্ঞান মতে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি পুরুষ ও নারীর আকর্ষণ সমান। নিজেকে আড়াল করা তবে পুরুষের জন্যও বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।"

কিছু দুশ্চরিত্র মানুষের সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যারা মেয়েদের পোশাক পরে মেয়ে মহলে প্রবেশ করে দুষ্কর্ম করার চেষ্টা করে। কিন্তু ধরা পড়লে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তাতে ঐ লেখিকার মত মহিলাদের বিফল মনোরথ হতে হয়। তাই সে ছেলেদের দ্বারা নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

উপরে একুশের মেলার যেসব ঘটনাকে আমি অবাঞ্ছিত গণ্য করেছি, বহু মেয়ে আছে যাদের কাছে তা বাঞ্ছিত এবং তারা ঐসব ঘটনাকে বাৎসরিক এ্যাডভেঞ্চার মনে করে। ছেলেদের শাড়ী পরিয়ে একুশের মেলায় বাংলা একাডেমীর প্রবেশদ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখলে ঐসব মেয়েদের এ্যাডভেঞ্চার আরও উপভোগ্য হবে তো বটেই।

কারণ বানরকে কাপড় পরালেও বানর যেমন বাঁদরামিই করে, বাঘকে শাড়ী পরালেও তেমনি বাঘের হিংস্রতা থাকবেই। বরঞ্চ বাঘের আরও সুবিধা হবে। মানুষের পোশাকে মানুষের সমাজে প্রবেশ করে সে আরও বেশী বেশী করে মানুষ খাওয়ার সুযোগ পাবে। তেমনি ছেলেরা শাড়ী পরলেই তাদের পৌরুষ ও শক্তি অন্তর্হিত হয়ে যাবে না, আর মেয়েরা পুরুষের পোশাক পরলেই তার শরীরে ও মনে পুরুষের শক্তি বা পৌরুষের সঞ্চার হবে না, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, নমনীয়তা, কমনীয়তা, শারীরিক গঠন, মাতৃত্ববোধ, গর্ভধারণের তাড়না, নিপীড়ন তৃষ্ণা ইত্যাদি অন্তর্হিত হতে পারে না।

যে সদভ্যাস ও সৎ অভিজ্ঞতায় মানুষের জ্ঞান বাড়ে, অন্তদৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, ভুল পথ ও মন্দ পথ সম্পর্কে জ্ঞান হয়, সেই সৎ অভিজ্ঞতা এখনও ঐ লেখিকার হয়নি। তাই তার মনে অমন উদ্ভট, অবান্তর, অশোভন ও অসৎ কল্পনা স্থান পায়।

ধরা হোক, এবার বাংলা একাডেমীর একুশের মেলায় সব ছেলেরা শাড়ী ব্লাউজ ওড়না পরে এল। মেয়েরা সব গেঞ্জি, সার্ট এবং সর্ট পরে এসে মেলার প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেরা যেমন বার বার ঘরির দিকে তাকায়, মেয়েরাও তেমনি তাকাচ্ছে-ছেলেরা-ঘড়িতে দেখছে সময়, মেয়েরা করে অন্য

হিসাব। তাদের কারও হয়তো শিশু সন্তান ঘরে রয়েছে আর এদিকে তার স্তনে দুধের ব্যথা শুরু হয়েছে। কারও হয়তো ঘর খালি। কারণ, স্বামী অফিসে রয়েছেন, কেউ হয়তো রজঃশীলা হওয়ায় পেটে ব্যথা হচ্ছে, কারও হয়তো পেটে বাচ্চা, তাই বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, কেউ হয়তো অনূঢ়া। সন্ধ্যা হয়ে গেলে ভূতের ভয় করে ইত্যাদি।

পাঠক এবার মনে মনে দৃশ্যটা একটু কল্পনা করুন। দুর্বলা মেয়েরা সব প্রবেশদ্বারে ভিড় করে আছে যেমনটি ছেলেরা করে থাকে। কোন ছেলে ঢুকতে গেলেই গোল পাকিয়ে মেয়েরা ছেলেটির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু ওমা সেকি! ছেলেটি শাড়ী-ব্লাউজের নীচে হাত দিয়ে দেখে, এ যে ফাল্গুনের পাতাঝরা গাছের মত নিরেট দেহ। ভিক্ষুকের ঘরে চোর ঢুকলে যেমন তার শূন্য হাঁড়িতে কিছুই খুঁজে পায় না, তেমনি মেয়েরাও ছেলেটির শরীরে হাত দিয়ে নিপীড়ন করার জন্য কিছুই পেল না। পূজার বেদীর সিঁড়ির মত বিস্তৃত তার বক্ষস্থলে, রোলারের মত সবল বাহু। অন্যদিকে ছেলেটি ঐ মেয়েটিকে যেন সোহাগভরে কোলে তুলে নিয়ে শরীরটা চেখে দেখছে লুটে নিচ্ছে নারীর দেহ বল্লবীর পরতে পরতে রক্ষিত গোপন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ।

এই উল্টা কর্মের নিষ্ফলতা ও বিপর্যয় সম্পর্কে যারা চিন্তা করে, তারা সৃষ্টির রহস্য চিন্তা করে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ে। একই মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নারী ও পুরুষ ভেদে, জ্ঞানী ও অজ্ঞান ভেদে মানুষের কর্মের সামর্থ্য ও কর্মপদ্ধতির পার্থক্যের মধ্যে নিহিত বিস্ময়কর রাগ-অনুরাগ ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, সুখভোগ উপলব্ধি করে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মানুষেরা গেয়ে উঠে- "ফাবিআইয়্যে আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান"- তবে তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন দানকে অস্বীকার করবে?'

আমাদের উল্লিখিত লেখিকার বুদ্ধিমতী মাতাও সৃষ্টি রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে কোরআনের ঐ আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু লেখিকাটি তার মাকে ঐ কারণে বিদ্রুপ করে লিখেছে– কারা যেন আমার মাকে বুঝিয়েছেন যে, ধর্মেকর্মে মন দিলে হবে অপার শান্তিলাভ। মা একটি ভুল বিশ্বাসে গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, শেষ রাতে হেলতে-দুলতে সুর করে পড়েন– 'ফাবিআইয়্যে আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান'।

তার মাকে কারা যেন শিখিয়েছে, সে জানে না। ইতর প্রকৃতির মানুষ এমন অনেক কিছুই জানে না। কারণ, প্রবৃত্তি যাদের প্ররোচিত, উত্তেজনায় যাদের রক্ত টগবগ করে, যাদের নাড়ীর গতি একশতে উঠে যায় তাদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার মানসিকতা তৈরী হতে পারে না। তাই তার জন্মদাত্রী মাকে, মায়ের

নিষ্ঠাকে মায়ের আবাল্য পালিত বিশ্বাসকে এবং শেষ পর্যন্ত স্রষ্টাকে বিদ্রুপ করতে, ভ্রুকুটি করতে এতটুকুও বাধে না। এই ভঙ্গুর শরীরটায় যতদিন রূপ-রসভরা যৌবন থাকে, ততদিন আহাম্মক মানুষেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তারা বুঝে না যে, ঐ রস একটা দাহ্য পদার্থ, সামান্য স্ফুলিঙ্গই তাকে জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম, অথবা একটা স্ফুলিঙ্গ, সামান্য পানিতেই যা নিভে যেতে পারে।

আসলে শেষ রাতে মায়ের সুর করা দোয়া– কালাম তার কাছে খারাপ লাগারই কথা। কারণ, সান্ধ্য অভিসার সেরে তার ঘরে ফিরে আসতে এমনিতেই বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েও ঘুম আসছিল না। সান্ধ্য অভিসারের মধুময় আবেশগুলি মনের মুকুরে জটলা করছিল। আগামীকাল কোথায় কার সাথে সময় কাটাবে কাকে বুঝাবে যে, আল্লাহ খোদা নামে কিছু নেই, পাপপূণ্য বলেও কিছু নেই এবং বলে বেড়াবে "দুনিয়াকা মজা লে লো দুনিয়া তুমহারা হায়"।

শেষ রাতের দিকে যা-ই বা একটু তন্দ্রা আসি আসি করছিল, অমনি একদিকে বাইরে 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম', অপরদিকে ঘরে মায়ের চাপা স্বরের গুঞ্জন- 'ফাবিআইয়্যে আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান'– সে তো তার কাছে ভাল লাগার কথা নয়! তাকে তো একটু ভাল করে ঘুমাতে হবে, নইলে যে, চেহারার লাবণ্য থাকবে না, আকর্ষণীয়তা নষ্ট হয়ে অপকর্মের পূঁজি নষ্ট হয়ে যাবে।

অতিচালাকের গলায় দড়ি

মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন হচ্ছে প্রবাহমান নদীর প্রমত্ত ধারার মত। নদী সাগরের টানে উদ্দাম গতিতে বইতে গিয়ে হাজার হাজার পুরোনো হাট ঘাট মাঠ, অনুন্নত রুচির ঘরবাড়ী ইমারত, মসজিদ-মন্দির ভেঙ্গে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে নিয়ে যায়। অপর তীরে চর নামের নতুন ভূমি জাগিয়ে দেয়, মানুষ নতুন করে আবার ঐ চরে বসতি স্থাপন করে গাছ-গাছালির মীরাস তৈরী করে, নতুন করে ঘর দোর তৈরী করে। সে সব ঘর দোর আকারে আয়তনে আবাসিক সুযোগ সুবিধায়, বেশ বিন্যাসে যুগোপযোগী ও উন্নত রুচির হয়ে থাকে। মানুষ নতুন বাড়ী কখনও পুরানো ধাঁচে তৈরী করে না।

পূর্বে যেখানে প্রাচীন ধাচের প্রাসাদ ছিল সেখানে হয়তো আধুনিক রুচির কুঁড়েঘর তৈরী হয়। আবার যেখানে জীর্ণ কুঁড়েঘর ছিল সেখানে হয়তো অনুপম প্রাসাদ তৈরী হয় বা যেখানে এককালে ময়দান ছিল সেখানে মসজিদ তৈরী হয়। এ পরিবর্তনের ধারাকে একজন শিল্পীর ছবি আঁকার সাথে তুলনা করা যায়। যেমনটি আঁকতে চেয়েছিলেন তেমনি না হলে মুছে ফেলে আবার নতুন করে আঁকার মত। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও তেমনি ভাঙ্গা-গড়ার ধারায় এগিয়ে চলেছে। আর এই ভাঙ্গা গড়ার হাতিয়ার হচ্ছে মানুষের ধর্ম বোধ।

উপরে সংস্কৃতিকে প্রবাহমান নদীর প্রমত্ত ধারার সাথে তুলনা করেছি। তার মধ্যে প্রবাহমান নদীটি হচ্ছে মানুষের সীমাহীন আশা-আকাঙ্খা। জীবনের ভোগ্য উপভোগ্য প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর উপর সে তার অধিকার বিস্ত ার করতে চায়, কোন কিছু হতে সে বঞ্চিত হতে চায় না। তাই সে সামনের দিকে ছুটে চলে নদীরই মত।

কিন্তু নদীর বুকে প্রবাহমান পানির ধর্ম আছে। সেই ধর্ম পানির গতি-প্রকৃতি ও প্রবাহকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেহেতু পানিই নদীর অস্তিত্বের কারণ, সেহেতু পানির ইচ্ছামত চলা ছাড়া নদীর গত্যন্তর নেই। নিজ খায়েশ মিটানোর জন্য নদী ইচ্ছা করলেই পানির ধর্ম-নির্দিষ্ট ধারাকে অতিক্রম করতে পারে না।

নদীর ইচ্ছামত চলতে গিয়ে পানি যদি ধর্মদ্রোহী হয়ে পড়ে, যদি সে তার স্বভাব ধর্ম মেনে না চলে, তবে সাগর, মহাসাগর, নদী-নালা, খাল-বিলের পানির ভারসাম্য থাকবে না। ভূগর্ভস্থ পানি বলে কিছু থাকবে না। শহর-বন্দর, মাঠ-ঘাটের পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে বিশ্ব সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

একারণেই আল্লাহ পানির জন্য ধর্ম অলংঘনীয় করে দিয়েছেন। তাকে ইচ্ছামত চলার বা অন্য কারও হুকুম মেনে চলার শক্তি বা চিন্তার স্বাধীনতা দেননি। প্রকৃতপক্ষে পানির এই স্বাধীনতাহীনতার মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

মানুষের জন্যও ধর্ম রয়েছে। পানির ধর্ম যেমন নদীর গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, মানুষের ধর্মও তেমনি তার অন্তরের দূর্দান্ত আশা-আকাঙ্খা ও পশুত্বটাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নদী যেমন এক পাড় ভেঙ্গে অপর পাড় গড়ে, মানুষ যেমন পুরানো বাড়ী ভেঙ্গে নতুন এবং উন্নত নীতি নিয়ম সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উদ্ভাবন করে। আর যিনি যত বেশী করে তা করতে পারেন, তিনি তত বেশী অভিজাত মানুষ। যিনি ধর্ম মানেন না, তিনি কখনই তার অন্তরের পশুত্বটাকে দমন করতে পারেন না এবং সমাজের জন্য কোন উন্নত নিয়ম নীতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি দিয়ে যেতে পারেন না। এ কারণে যারা ধর্মবিমুখ বা ধর্মদ্রোহী বর্বর মানুষ, তারা সব সময়ই অসভ্যতা করে বেড়ায়।

মানুষের চিন্তাশক্তি, চলার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা তার আভিজাত্যের জন্য এক জটিল পরীক্ষাস্বরূপ। কারণ, পানি ধর্মদ্রোহী হলে সে নিজে ধ্বংস হবে না, ধ্বংস হবে মানব সভ্যতা। কিন্তু মানুষ ধর্মদ্রোহী হলে সভ্যতাও ধ্বংস হবে, সে নিজেও ধ্বংস হবে।

প্রখর মেধার মানুষেরা ঐ যুক্তিটি অনুধাবন করার শক্তি রাখেন বলে তারা ধর্মনিষ্ঠ আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে সাংস্কৃতিক নমনীয়তা পালন করে চলেন। এক শ্রেণীর মেধাহীন উচ্চ শিক্ষিতগণ ঐ কথাটি অনুধাবন করতে পারেন না বলে কর্তব্যস্ত জনসাধারণকে অন্তঃ সারশূন্য ঢোলের মত সরব তর্ক দ্বারা বিরক্ত করেন।

বিশ্বের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে যত উৎসব পর্ব প্রচলিত আছে, তার প্রতিটি স্ব-স্ব ধর্মীয় বিধি বিধান, উপাখ্যান ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এবং তদ্বারা মানুষ ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়েছে।

মুসলমানের যতগুলো উৎসব বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই একেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বটে। হিন্দু সম্প্রদায় বারো মাসে যে তেরো পার্বণ পালন করে থাকে, তারও প্রত্যেকটি তাদের ধর্মীয় উপাখ্যান ভিত্তিক অনুষ্ঠান।

শুধু উৎসব পর্বই নয়, কবিতা সম্মেলন, সঙ্গীতানুষ্ঠান, সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদি যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতিটিতে যে আরম্ভ সঙ্গীত হয়, তাকে প্রকৃতপক্ষে বন্দনা সঙ্গীত বলা হয়, যার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ধর্মীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা মাত্র।

আজকাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে যে কাঁসর ঘন্টা বাজানো হয়, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো হয়, তাও ধর্মীয় আচার। এই ধর্মীয় আচারটি যদিও একটি ধর্মের পরিত্যক্ত আচার, তবুও সাংস্কৃতিক মৌলবাদীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐ আচারটির পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা চালিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় উপমা হিসাবে যে 'প্রমত্ত ধারাটির' কথা বলেছি, সেই ধারাটি হচ্ছে মানুষের সংস্কৃতি-সচেতন হৃদয়ের উপর তার প্রবৃত্তির প্রভাব। নদীর প্রমত্ত জলস্রোত যেমন করে প্রবাহমান নদীর গতিকে যদৃচ্ছা পরিচালিত করে থাকে, মানুষের প্রবৃত্তিও তেমনি সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতিকে পরিচালিত করে থাকে। নদীর কুল ভাঙ্গার মতো সংস্কৃতিরও ভাঙ্গন হয়। আমাদের সমাজে সম্প্রতিককালে যে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা চলেছে, তার মধ্যে সংস্কৃতির কুল ভাঙ্গা ও চর গড়ার উদাহরণ রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে দিয়ে গিয়েছে। নানা দেশের সংস্কৃতির বিজাতীয় প্রমত্ত ধারা আমাদের সংস্কৃতির কুল ভেঙ্গে তাতে নতুন আচারের চর জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। প্রগতির নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির মোহমুগ্ধ ধর্মদ্রোহীরা সে চর দখলের চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা ঐ চরে যৌন সংস্কৃতির আবাদ করে আমাদের সমাজকে ধর্মাধর্মবোধহীন সাংস্কৃতিক বেশ্যাবৃত্তির দিকে তাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে।

অর্থাৎ, আমাদের সংস্কৃতির চর দখলের জন্য যে দু'টি দল তৎপর রয়েছে, তার একটি ধর্মনিষ্ঠ দল, অপরটি ধর্মদ্রোহী দল। এ দু'টি দলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ধর্মনিষ্ঠদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা মেধাবী, বিনয়ী, স্বল্পভাষী, অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। অধর্মের আশংকায় তারা কম কথা বলেন। এ কারণে তাদের প্রচার কম। ভরা পাত্রের যেমন শব্দ কম, এদের অবস্থাও তেমনি।

ধর্মদ্রোহী সম্পর্কে পূর্বেই যেমন বলেছি, একশ্রেণীর মেধাহীন উচ্চশিক্ষিত মানুষই ধর্মদ্রোহী হয়ে থাকে। বুদ্ধিজীবী-সমাজে পদচারণার সুযোগ পেয়ে এরা চোরের মায়ের মত বড় গলায় কথা বলে, তাই তাদের প্রচারণাও হয় বেশী। এদের আচরণকে বেশ্যাদের ভন্ডামির সাথে তুলনা করা যায়।

বেশ্যারা দিনের বেলায় পথে বেরিয়ে এমন চোট-পাট, ঠাট-বাট দেখায়, যেন সে একজন অত্যন্ত সতী-সাধ্বী নারী, মানুষের কু-দৃষ্টির ভয়ে প্রচন্ডভাবে ভীত। আসলে এটাই তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং নিজের দাম বাড়াবার টেকনিক।

ধর্মদ্রোহী বুদ্ধিজীবীরা ঠিক ঐ রকম আচরণই করে থাকে। যেমন- এক সুন্দরী যুবতী মহিলা কিছুদিন পূর্বে পত্রিকার পাতায় ঘোষণা দিয়েছে– "এই

শহরে একটি সামান্য পুরুষও নেই যাকে আমি হৃদয়ের শেকড়-বাকড় উপড়ে দিয়ে বলতে পারি, ভালোবাসি। ---- আমাকে ভালোবাসার দুঃসাহস যেন কোন কাপুরুষের না হয়।" কতজন পুরুষ পরখ করলে এমন কথা বলা যায়? এই নারীই আবার এক নপুংসকের নিষ্ফল শৃংগার পীড়িত হওয়ার এক বেদনাদায়ক করুণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে– যা একটু পরে বলছি। যা পড়লে তিনটি জিনিস পরিস্কার হবে- (এক) এদের বেশ্যাবৃত্তিক টেকনিক, দ্বারা তারা উঁচুদরের বুদ্ধিজীবী সেজে রাতের খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (দুই) ব্যবসাবৃত্তিক টেকনিক যদ্বারা পূর্ণ সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে। (তিন) সংস্কৃতির চর দখল প্রচেষ্টা যদ্বারা পর্ণ সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার করা হয়, মানুষকে নাস্তি কতার প্রতি প্রলুদ্ধ করা হয়। ধর্মনিষ্ঠদের স্বল্পভাষী আভিজাত্যের সুযোগে জনসাধারণকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দিয়ে প্রগতির নামে নাস্তিক্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতির চর দখল করার ব্যবস্থা করা হয়।

পর্ণ সাহিত্য মানুষের প্রবৃত্তিকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করে, নিম্নের আলোচনায় তা বুঝা যাবে।

(ক) পর্ণগ্রাফী– বর্তমানে পর্ণ পত্রিকা, পর্ণ সিনেমা, পর্ণ ছবি আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী ভাঙ্গন সৃষ্টি করে চলেছে। যুবসমাজ ঐসব উপকরণের প্রধান খদ্দের। তাতে যে যৌন উত্তাপ আছে, সেই যৌন উত্তাপ হজম করার মত শক্তি দেবতারই নেই, মানুষ তো অতি ক্ষুদ্র। যেমনঃ

স্কন্ধ পুরাণের নাগর খন্ডের ৭৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে– "প্রজাপতি দক্ষের একশত পাঁচটি কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সতীর বিয়ে হয়েছিল মহাদেবের সাথে। ব্রহ্মা–বিষ্ণুসহ সকল দেবতাই এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষের অনুরোধে ব্রহ্মাকে এই বিয়ের পৌরহিত্যের ভার নিতে হয়।

বিবাহানুষ্ঠানকালে বেদীতে উপবিষ্টা ঘোমটা ঢাকা সতীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই চতুরানন অর্থাৎ, চার মুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা উপস্থিত সকলের অজ্ঞাতে সতীর সর্বশরীর দর্শন করে কামতাড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু ঘোমটার কারণে সতীর মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কৌশলে সতীর মুখ দেখার জন্য ব্রহ্মা তখন যজ্ঞকুন্ডে কাঁচা কাঠ নিক্ষেপ করেন। ফলে প্রচন্ড ধোঁয়া চারিদিকে ছেয়ে যায় এবং বেদীতে উপবিষ্ট সকলের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এই সুযোগে ব্রহ্মা ঘোমটা সরিয়ে সতীর মুখ দর্শন করেন।

এমনিতেই সতীর সর্বাঙ্গ দর্শন করে ব্রহ্মা কামাতুর হয়ে পড়েছিলেন এখন মুখ দর্শন করে তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ঐ বেদীর উপরই ব্রহ্মার বীর্য স্খালিত হয়ে পড়ে। কেউ দেখে ফেলবে ভয়ে ব্রহ্মা সেই বীর্যকে

বালি চাপা দিয়ে ফেলেন। পরে ঐ বীর্য হতে ৮৮ হাজার মুনির জন্ম হয়, যাদের বলা হয় বালখিল্য মুনি।

এটা যদি হয় ব্রহ্মার অবস্থা তবে পত্র-পত্রিকায়, সিনেমায় উলঙ্গ নারী দেহের কামাতুর ছবি, অঙ্গভঙ্গি, শৃঙ্গারের গল্প, দৃশ্য এবং রাস্তাঘাটে উদাম নারী দেহের পেলব দৃশ্য দেখে সাধারণ যুবসমাজের কি অবস্থা হতে পারে। এ কারণেই নারী হরণ ও ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি হচ্ছে, একারণেই যুবসমাজে যৌন রোগের প্রকোপ বাড়ছে।

উপরে এক নপুংসক পুরুষের নিষ্ফল শৃংগার-পীড়িত যে যুবতী নারীর কথা উল্লেখ করেছি, সেই পর্ণ ব্যবসায়ী নারী আরও লিখেছে, "প্রতিরাতে আমার বিছানায় এসে শোয় এক নপুংসক পুরুষ। চোখে, ঠোঁটে, চিবুকে চঞ্চল চুমো খেতে খেতে আমাকে উত্তপ্ত করে তোলে। তৃষ্ণায় আমার লোমকূপ জেগে উঠে, এক সমুদ্র জল চায়, কাতরায়। আমার অর্ধেক শরীর তখন সেই পুরুষের গা গতর ভেঙ্গে চুরে একনদী জল চায় কাতায়।-- আমাকে আগুন করে, আমাকে উত্তপ্ত করে নপুংসকটা বেঘোরে ঘুমায়।"

কিন্তু হে নারী ঐ নপুংসকটা তোমাকে অমন ছিড়ে খুঁড়ে উপভোগ করে অমন উত্তপ্ত করে তৃষ্ণার্ত করে কেটে পড়ল তুমি কিছুই করতে পারলে না? পুরুষের প্রতি ঈর্ষাকাতর তুমি তোমার শরীরটা তাকে দিলেই বা কেন আর এই উত্তাপ, এই উত্তেজনা এই আগুন ঝরা পিপাসা বুকে নিয়ে কাতরালেই বা কেন? এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ তো কাতরায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সে তো নারীকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়, ধর্ষণ করে।

তুমি না নারীকে আহবান জানিয়েছো তারা যেন পুরুষদের ধরে ধরে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়, যেন ধর্ষণ করে। তবে তুমিই কেন সেদিন এক সাগর পানির তৃষ্ণা বুকে নিয়ে এত কাতরালে, এত কাঁদলে? তুমি কেন ঐ নপুংসকটাকে ধর্ষণ করতে পারলে না? কেন ছিঁড়ে খুঁড়ে খাওয়ার শক্তি তোমার হল না। তোমার অত তেজ কোথায় গেল?

অত কাতরানির পর, অত ব্যর্থতায় আগুনে জ্বলে নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ, পুরুষের প্রাধান্যের রহস্য কোথায়? আর তুমি নারী, পুরুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা শক্তি সামর্থের কাছে অসহায় কেন। আর পৌরুষের হাত হতে তোমাকে রক্ষার জন্যই যে ধর্ম পুরুষের উপর মোহরানার বোঝা চাপিয়েছে। আশা করি এবার তার কারণ বুঝতে পেরেছ।

লেখিকার ঐ লেখা পড়লে ব্রহ্মারই বীর্য স্খলন হওয়ার কথা, সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলব। এ ধরনের অশ্লীল কথা দিয়ে ঐ মহিলা পর্ণ সাহিত্য রচনা করে পুরস্কৃত হয়। যুবসমাজে ঐসব পুস্তক হট কেকের মত

বিকায় বলে শুনেছি। কারণ এটা পর্ণ সাহিত্য, নারীবাদের নামে নারীর দেহবল্লরীর প্রতিটি ভাঁজ এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি লোলুপ পুরুষের মনশ্চক্ষুর সামনে তুলে ধরা হয়।

মদ খেলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় জেনেশুনেও একশ্রেণীর মানুষ যেমন মদ খায়, তেমনি ঐসব যৌন সাহিত্য পাঠ করলে বীর্য নষ্ট হয়, পৌরুষ নষ্ট হয় এবং নপুংসক হতে হয়, বংশ নষ্ট হয়। তা জেনেও একশ্রেণীর মানুষ ঐ সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আর এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ঐ মেয়ে সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করে পর্ণ সাহিত্যকেই শুধু উৎসাহিত করছে না, তার ধর্মদ্রোহিতাকেও উৎসাহিত করে চলেছে, তার লাম্পটের প্রতি প্রলুব্ধ করছে।

(খ) ফ্যাশন শো তেমনি আর একটি পর্ণ অনুষ্ঠান, যাতে পোশাক প্রদর্শনের নামে নারী দেহকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা ব্রহ্মার সামনে করা হলে আবার হয়তো ৮৮ লক্ষ বালখিল্য মুনির জনম হত। প্রবৃত্তি প্রবল মেয়ে ছাড়া আর আরও পক্ষে ফ্যাশন শোর নামে অমন দেহ প্রদর্শন সম্ভব হতে পারে না।

আর এক ধরনের পুরুষ আছে, যারা পূর্বজন্মে বাইজী উপভোগ করত, এখন আর বাইজী পায় না, তাই ফ্যাশন শোর নামে নারীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ উপভোগ করে নিজেকে চরিতার্থ মনে করে। আসলে এমনি করে তারা ঐ সাহিত্য, ঐ উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি দ্বারা মানুষের রিপুকে উত্তেজিত করে দিচ্ছে, মানুষের সংস্কৃতিকে কামতাড়িত করে দিচ্ছে, মানুষের সততা ও নারীর সতীত্বের মূল্যে তারা সাংস্কৃতির ব্যবসা চালাচ্ছে।

নারীবাদের নামে যে কাম সাহিত্য মানুষের মন-মগজকে বিভ্রান্ত করছে, ফ্যাশন শোর নামে যে কাম-প্রদর্শনী মানুষের রিপুকে উত্তেজিত করে সমাজ, সংস্কৃতির সুকোমল বৃত্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু ধর্মই হচ্ছে ঐ নারীবাদীদের এবং কামতাড়িতদের পরম শত্রু। কারণ, ধর্মীয় বিধান মেনে চলতে গেলে ঐসব নারীবাদীদের কামচর্চা এবং কাম-সাহিত্যের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে বলে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত।

একারণেই মুষ্টিমেয় কিছু কাম সাহিত্যিক, পর্ণ ব্যবসায়ী সততার প্রবক্তাদের মৌলবাদী নামে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে দেশবাসীর বিশ্বাস ও পৌরুষের মুল্যে নিজেদের ব্যবসা অব্যাহত রাখার প্রয়াস পাচ্ছে এবং সংস্কৃতির চর দখলের জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

কুলভাংগা নদীর প্রমত্ততার মত নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতির প্রমত্ততা আমাদের সংস্কৃতির কুল-কৌলীন্য দুই-ই ভেঙ্গেছে। ধর্মের বীজ ও সামগ্রী ছাড়া ঐ চরে সফল আবাদ করা এবং আবাস গড়া অসম্ভব।

ফুল তলার পায়খানা

দেশের মানুষের মধ্যে চিরদিন এমন একটা ধর্মীয় আবেগ কাজ করে আসছিল যে আবেগবশে ধার্মীকেরা মানুষের সুবিধার জন্য, মানুষের চলাচলের জন্য নিজের পয়সায় রাস্তা তৈরী করে দিতেন, পুল তৈরী করে দিতেন, রাস্তার উপর নানা ছায়াদার ফুল ও ফলের গাছ রোপন করে দিয়ে পূণ্য সঞ্চয় করতেন।

ধর্মীয় আবেগে আজও মানুষ গরীবের ছেলে মেয়ের বিয়েতে অর্থ সাহায্য করেন, দাম্পত্য কলহ দেখা দিলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও কলহ মিটমাট করে দেন। এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলাকেও ধর্ম অনুমোদন দিয়ে রেখেছে।

'কিন্তু আজকাল সমাজে একশ্রেণীর ধর্মদ্রোহী মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের প্ররোচনায় মানুষের সেই ধর্মীয় আবেগে ভাটা পড়েছে। ধর্মদ্রোহী মানসিকতার কারণে বিত্তশালীরা নিজের টাকা ব্যাংকে রেখে রাস্তা তৈরীর জন্য ও গাছ লাগানোর জন্য সরকারকে অর্থবরাদ্দ করতে বাধ্য করে। সরকার গাছ লাগিয়ে দিলে ধর্মদ্রোহীরা সে গাছের নীচে মানুষের আশ্রয়ের জায়গায় ফুলতলায় পায়খানা করে।

শুধু তাই নয়। এই ধর্মদ্রোহীরা অধিকার, স্বাধিকার এবং স্বাবলম্বিতার নামে মানুষের দাম্পত্য সুখকেও বিঘ্নিত করে চলেছে। তদ্বারা তারা মানুষের নৈতিকতাবোধ, শ্রদ্ধা বোধ, দায়িত্ব বোধ ইত্যাদি সকল বোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যারা প্রাতর্ভ্রমণ করেন তারা প্রায়শই দেখে থাকেন রাস্তার উপর কারা যেন পায়খানা পেশাব করে রাখে। সকালের আধো আলো আধো অন্ধকারে বিশুদ্ধ বায়ু বিলাসী প্রাতর্ভ্রমণকারীরা কখনও সেই পায়খানা মাড়িয়ে আবার কখনও তাতে আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গে বিষ্ঠার বিষাক্ত গন্ধ ছড়িয়ে বাড়ী ফিরে যেতে যেতে চিন্তা চেতনায় প্রশ্নবানে জর্জরিত হন মানুষ কত প্রকার ও কি কি।

রমনা পার্কে সারি সারি বকুল ফুলের গাছ। ভোর বেলায় গাছের নীচে ফুল কুড়ানোর অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। বৃদ্ধ যুবা, পুরুষ, মহিলা, তরুণ, তরুণী সবাই ফুল কুড়ায়। দরিদ্র মহিলা ছেলে, মেয়ে, টোকাইরা ফুল কুড়িয়ে কেউ সেখানে বসেই মালা গাঁথে আর কেউ বাড়ী নিয়ে যায় মালা গাথার জন্য। টোকাইরা সারাদিন এই মালা বিক্রি করবে ফুটপাতে, সিগনাল বাতির সামনে

সাহেব-বিবি সাহেবদের কাছে। এর দ্বারাই তারা অন্ন সংস্থান করে– এটাই তাদের পেশা।

এহেন ফুল তলায়ও পুষ্প প্রেমিক এবং মালা ব্যবসায়ীদের প্রায়শই দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কারা যেন জনসমাগমের পূর্বে ফুলতলায় পায়খানা পেশাব করে যায়।

ফল গাছ, ফুল গাছ এবং যে সকল ছায়াদার গাছের নীচে মানুষ বিশ্রাম নেয় সেসব গাছের নীচে পায়খানা পেশাব করা ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

ধর্মবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ এই দুটির একটি বোধও যাদের মধ্যে আছে তারা অমন ফুলতলায় পায়খানা পেশাব করতে পারে না। কিন্তু ধর্মদ্রোহী দূর্জনদের প্ররোচনায় ঐ দুষ্কর্মও সাধিত হতে পারছে।

ভাগ্যিস ঐসব দূর্জনদের সংখ্যা এখনও কমের মধ্যে আছে। যেদিন এদের সংখ্যা ভারি হবে সেদিন তারা দিনের বেলায় সর্ব-সমক্ষেই ঐ দুষ্কর্ম করবে। ধর্মদ্রোহীরা যেভাবে মানুষের ধর্মবোধ ও নৈতিকতাবোধকে আঘাত করে চলেছে তাতে অমন দিন আসা অসম্ভব কিছু নয়।

ঐ অসম্ভবটিকে সম্ভব করার জন্য একশ্রেণীর ধর্মদ্রোহী দূর্জন তাদের তৎপরতা শুরু করেছে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনেও। সাহিত্য সংস্কৃতির মুখোশ পরে ঐসব ধর্মদ্রোহী দূর্জনেরা থাবার বিস্তার করছে আমাদের দাম্পত্য কলকাকলি মুখরিত সংসার কাননেও।

বলছিলাম মানুষের দাম্পত্য কলকাকলিতে মুখরিত পারিবারিক ফুল তলার কথা। দাম্পত্য কলগুঞ্জনে মুখরিত পরিবারগুলি বকুলতলার চেয়ে কোন অংশে কমতো নয়ই বরঞ্চ বহুলাংশে বেশী। কারণ এই ফুল তলা জীবন্ত ফুল তলা।

বকুলতলার ফুলগুলি গন্ধ বিলায় গন্ধ নেয়না, কোন রস- রসিকতা করেনা, শব্দ করেনা। কিন্তু দাম্পত্য ফুলতলায় গন্ধতো আছেই তার সাথে আছে রূপ, রস শব্দ ও স্পর্শ সুখ। এখানে নর ও নারী পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য, মধুর ভাষণ উপভোগ করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা, আবেগ অনুযোগ ও স্পর্শ সুখ দ্বারা জীবনকে সজীব করে রাখে।

কিছু দূর্জন অধিকারের নামে স্বাধিকারের নামে, সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমে এহেন দাম্পত্য ফুলতলায়ও পায়খানা করতে শুরু করেছে। বকুল তলায় পায়খানাকারীরা পায়খানা করে মল দ্বারা এবং দূর্গন্ধ ছাড়ায় স্বল্প পরিসরে। কিন্তু দাম্পত্য ফুলতলায় পায়খানাকারীরা পায়খানা করে মুখ দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা

এবং কাগজ কলম দ্বারা। তারা দুর্গন্ধ ছড়ায় দেশময় ছড়িয়ে থাকা মানুষের দাম্পত্য কুঞ্জে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। ঐ কর্মটি যারা করে তারা একশ্রেণীর ধর্মদ্রোহী মানুষ নামধারী শয়তান। এদের না আছে ধর্ম বোধঃ, না আছে সৌন্দর্যবোধ, না আছে শৃংখলাবোধ। এদের কোন মানুষের প্রতি বা কোন নীতি নিয়মের প্রতিই শ্রদ্ধাবোধ নেই।

মানুষের দাম্পত্য সুখের চাবিকাঠি হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের নামে একজন নর ও একজন নারী পরস্পর পরস্পরের প্রতি আনুগত্য এবং সুখদুঃখের অংশীদারিত্বের শপথ নিয়ে সংসার জীবনে পদার্পণ করে। ধর্মের ভয়ে মানুষ সহজে দাম্পত্য বিশ্বাসঘাতকতা করে না। উভয়ে নিজ নিজ আবেগকে, ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কাটছাট করে হলেও দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত করে।

ধর্মদ্রোহী শ্রেণীটির কাছে এটা অসহ্য। তাদের প্রশ্ন ধর্মের নামে বিয়ে হবে কেন, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসবে কেন, স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে শ্রদ্ধা করবে কেন, স্বামীর সোহাগ নেবে কেন ইত্যাদি। সুতরাং নারীকে স্বামীর রাহুমুক্ত করতে হবে বিধায় ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে। এমনি এক ধর্মদ্রোহী দূর্জন লেখিকার দুর্গন্ধ রচনাকারী একটি বই পড়তে গিয়ে তাজ্জব হতে হল। তিনি লিখেছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত অনেক মেয়েকে দেখেছেন যারা স্বামীকে বলেন আমার সাহেব, আমার কর্তা। স্বামীদের হুকুম ছাড়া এদের জীবনে কিছু কার্যকর হয় না। এরা ঘরে রন্ধনপ্রণালীর বই রাখে এবং স্বামীকে খুশী করার জন্য ভাল ভাল রান্না করে খাওয়ায়। বাইরে যাবার সময় স্বামী নিজে তার রুমাল, টাই, মোজা, কাফলিং নিজেরাই খুজে নিলে তারা বড় রাগ করেন। স্ত্রী আশা করেন তিনি এগুলো স্বামীকে খুঁজে দেবেন এবং তদ্বারা স্বামীকে তার উপর নির্ভরশীল করে রাখবেন, স্বামী যেন প্রতিপদে তার উপর নির্ভরশীল থাকেন।

স্বামীদের প্রতি স্ত্রীদের এই সোহাগ এই অনুরাগ দেখে লেখিকার বড় গাত্রদাহ হয়েছে। তিনি দেখেছেন অনেক চিকিৎসক মেয়েও নিজের চাকুরী বাকুরী ছেড়ে বিদেশে চাকুরীরত স্বামীর কাছে চলে যায়। সেখানে গিয়ে স্বামী যখন দিব্যি চাকুরী করেন, মেয়েটি তখন রান্নাঘরে বসে পিঁয়াজ কাটেন কিম্বা ফিরনী রান্না করেন। এতেও তার অন্তর্দাহ হয়েছে।

শুধু তাই নয়, স্বামী কেন তার স্ত্রীকে ভালবাসে এতেও তার গাজ্বালা ধরেছে। তিনি লিখেছেন কোন কোন মেয়ে আছে যারা আহলাদ করে বলে আমার স্বামী চাকুরী করা পছন্দ করেন না, তাই চাকুরী করিনা। অর্থাৎ স্বামী

আহলাদ করে স্ত্রীকে খাটা খাটুনী করতে দেন না। কোন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই আহলাদ দেখে ঐ লেখিকার গাজ্বালা হয় কেন? এ এক তাজ্জব ব্যাপার।

স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসলে ঐ লেখিকার গাজ্বালা হয়, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসলে তাতেও তার গাজ্বালা হয়। এ কেমন জ্বালা, কেন এ জ্বালা? তিনি কিন্তু জানেন না স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-প্রীতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম তন্তু দ্বারা রচিত হয় মানুষের দাম্পত্য সংসার। তিনি তো বিশ্ব বর্হিভূত কোন গ্রহ হতে আবির্ভূত হন নি যে তা জানবেন না বা বুঝবেন না।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসাকে তিনি ঘৃণা করেন। তদ্বারা তার পুরুষ বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসাকেও তিনি ঘৃণা করেছেন। তদ্বারা তার নিজের অন্তরে সুপ্ত জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এত দৃষ্টে মনে হয় কোন পুরুষকে আনাড়ির মত রূঢ় ভালবাসা দেখাতে গিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। অথবা কোন পুরুষের ভালবাসার অমর্যাদা করে প্রত্যাহৃত হয়েছেন, তদ্বারা একুল ওকুল দুকুলকে বিষাক্ত করে এখন তিনি অকুল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

তিনি যদি দাম্পত্য জীবন যাপন করতেন তবে বুঝতেন কি বিচিত্র সে জীবন কবির ভাষায়ঃ

যে করেছে কোনদিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভুধর শোভা বিচিত্র কেমন।

তিনি এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারের কথা লিখেছেন যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনই উচ্চশিক্ষিত। তাদের প্রাসাদনুপম বাড়ী। অত্যাধুনিক বসার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর দামী বিদেশী জিনিস পত্রে সাজানো। দামী বাসন পত্র, সোফা, খাটপালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, শোকেস, ডেকোরেশন পিস, পারফিউম, মেকআপ বক্স, টিভি, ভিসিআর ইত্যাদির সাথে মাত্র একখানা বই। বইটির নাম আধুনিক রন্ধন প্রণালী। তিনি লিখেছেন ভাবতেই আমার দম আটকে আসে-সারাদিন রান্নার তদারকি সেরে দুপুরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে এই একটি মাত্র বই তাকে পড়তে হবে তা ঐ রান্না সংক্রান্ত। পিঁয়াজের পর আলু নাকি আলুর পর পিঁয়াজ উচ্চশিক্ষিতা একজন মহিলার ঘরে রন্ধন প্রণালীর বই থাকবে, উচ্চশিক্ষিতা একজন মহিলা স্বামীর ভাত খাবেন, ঘর কন্না করবেন নিজে রোজগার করবেন না, স্বাবলম্বী হবেন না এযেন এক তাজ্জব ব্যাপার যা ঐ লেখিকা ভাবতেই পারেন না।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটি হচ্ছে–

ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন। দুই ভদ্রলোক ভোরের ট্রেনের অপেক্ষায় সন্ধ্যা হতে প্লাটফরমে বসে আছেন। তার মধ্যে একজন ধুমপায়ী অপরজন অধুমপায়ী। ধুমপায়ী ব্যক্তি একটার পর একটা দামী সিগারেট ফুকছেন। তিনি যখনই একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেন তখনই অধুমপায়ী ব্যক্তি তার দিকে বিস্ফরিত দৃষ্টি মেলে ধরেন।

এমনি করে রাত কেটে যায়। ভোর বেলায় যখন ট্রেনের আর বেশী দেরী নেই তখন অধুমপায়ী ভদ্রলোক ধুমপায়ীর কাছে এসে বললেনঃ জনাব কিছু মনে করবেন না, আপনি কত বৎসর যাবত এই হারে ধুমপান করছেন?

ধুমপায়ী ভদ্রলোক বললেনঃ ধরুন বছর ত্রিশেক হবে। কিন্তু কেন বলুনতো? অধুমপায়ী ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন আপনি গত সন্ধ্যা হতে এ পর্যন্ত যতগুলি সিগারেট পোড়ালেন সে হিসেবে গত ত্রিশ বৎসরে যত টাকার সিগারেট পান করেছেন, ধুমপান না করলে ঐ টাকায় আপনি ঐ বাড়ীখানার মত একখানা বাড়ী তৈরী করতে পারতেন বলেই হাত উচিয়ে দুরের একটা বাড়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন।

ধুমপায়ী ভদ্রলোক অধুমপায়ীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ ঐ বাড়ীটা কার আপনি জানেন?

অধুমপায়ী ঃ নাঃ তা জানি না। তবে বাড়ী তৈরীর প্লান করছি কিনা তাই হিসেবটা জানি।

ধূমপায়ীঃ ওঃ তবে জেনে রাখুন ঐ বাড়ীটার মালিক আমি, ভাড়া দিয়ে রেখেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতি মাসে-বলেই তিনি হন হন করে গিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

আসলে যে ধান ঘাটতে পারে সে যে খোপাও বাঁধতে পারে। এই রহস্যটি ঐ লেখিকার জানা নেই। তিনি কলম উচিয়ে যে বিলাসবহুল বাড়িটি আমাদের দেখালেন, যে সাজ-সজ্জা দেখালেন তার সবটুকুই ঐ রন্ধনপ্রণালী বই খানার অবদান, যে বই খানাকে তিনি ভ্রুকুটি করেছেন।

স্বামীটি যখন শহরের প্রান্ত হতে প্রান্তে ছুটে শেষে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরেছেন, স্ত্রীটি তখন স্বামীর প্রোটিন, ক্যালোরী হিসেব করে পুষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। পরদিনের পরিশ্রমের জন্য শারীরিক মানসিকভাবে তাকে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। স্বামী দুহাতে অর্থ এনেছেন, স্ত্রী ইচ্ছামত ঘর সাজিয়েছেন। তাতে এ বাড়ীটা সুখে-সোহাগে সম্পদে ঝলমলিয়ে উঠতে পেরেছে।

আসলে ঐ লেখিকা বিদ্যার্জন করেছেন জ্ঞানার্জন করেননি। এ কারণে রন্ধন প্রণালী বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। আর এই অনুধাবন

করতে না পারায়, ঐ বইটিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তার নিজের কি হাল হয়েছে তাতো তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন?

কোনও পুরুষ আমাকে ঘর দেয়নি। দশটা-পঁচটা চাকুরী করে আমি যে ঘরে এসে ঢুকি সে ঘর আমার ঘর। কোনও প্রতারক পুরুষের কাছে সংসারের অপেক্ষায় আমি বসে থাকিনি। কে বলে মেয়েরা পারেনা একা বেচে থাকতে, একা দাঁড়াতে? আমার সর্বস্ব লুটে নিয়ে আমাকে নিঃস্ব করে যখন প্রতারক পুরুষের যে যার মত পালিয়ে গেছে, কৈ আমি তো ধুলো ঝেড়ে ঠিক দাঁড়িয়েছি। আমি যে এই হাটছি, দৌড়াচ্ছি, সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠছি, আমার তো কই কোনও কষ্ট নেই।

এ যেন 'শীত পাই, গীত গাই এর মত। শিশুরা আছাড় খেয়ে কাঁদতে গিয়ে যখন দেখে চারদিকে অনেক মানুষ তখন হাসতে হাসতে বলে, 'না কিছু হয়নি, ব্যাথা পাইনি।' এও তেমনি।

শ্রমিকেরা যেমন দাবী আদায়ের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে চাকুরীচ্যুত হয় তিনিও তেমনি আচরণ করতে গিয়ে স্বামীচ্যুত হয়েছেন। আবার অতি চালাকের গলায় দড়ির মত প্রতারক পুরুষের সাথে বাঁদরামী করতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। সুতরাং এখন তিনি পুরুষ বিদ্বেষী হয়েছেন। তিনি মনে করেন নিজে যা খেতে পারেন নি আর কাউকে তা খেতে দিবেন না। আর তাই মানুষের দাম্পত্য জীবন ধ্বংস করার জন্য নারীকে অধিকার স্বাধিকারের ছবক দিচ্ছেন, ধর্মবোধ নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করতে চাচ্ছেন।

আসলে যাদের বিদ্যা আছে জ্ঞান নেই, ঘর আছে সংসার নেই, রুজী আছে স্বস্তি নেই, যৌবন আছে স্বামী নেই, জঠর আছে সন্তান নেই, তাদের হারাবার কিছুই নেই, তারা সর্বশূন্য। এ কারণে অন্যের ক্ষতি করতে তাদের ভয় নেই। সুতরাং তারা অন্যের দাম্পত্য সুখে বিষ্ঠা ছড়াতে চেষ্টা করবে এবং অন্যের দাম্পত্য কুঞ্জে পায়খানা করার চেষ্টা করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

পঞ্চ রস

গ্রাম দেশে মেয়েদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলে কোন কোন মেয়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বলে থাকে-আমি কি ঘরের বেড়া ভেঙে বাইরে পড়ছি যে আমাকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে?

গাঁও-গেরামের এ ধরনের কথাবার্তা এবং এ ধরনের ব্যঙ্গবাক্য যেমন উপভোগ্য তেমনি অর্থ বহ হয়ে থাকে।

বেড়া ভাঙ্গার ব্যঙ্গ বাক্য দিয়ে হয়তো সে বুঝাতে চেয়েছে- আমি কি গায়ে গতরে এমনই বড় হয়ে গেছি যে আমার শরীর ঘরে সামাই হচ্ছে না, বেড়া ভেঙ্গে শরীরটা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথবা আমি কি বেড়া ভেঙ্গে কারও হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছি? কিন্তু মুরুব্বীরা ঐ ধরনের কথাকে 'কি দরকার ছিল কি দরকার' ছিল ধরনের সম্মতি হিসেবেই গণ্য করে থাকেন।

আসলে প্রবৃত্তি প্ররোচিত হলে, মাথায় নষ্ট বুদ্ধি চাপলে বিয়ে সাদীর চিন্তা মাথায় আসার ফুরসৎই হয় না। তখন বেড়া তো দূরের, মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টি দূর্গের মত বাড়ীর দেয়ালও কাউকে আটকে রাখতে পারে না।

শহুরে সমাজে কচি ডালের কলির মত যৌবনমুখী তরুণী, তন্বি, কিশোরীদের মধ্যে যৌন তাড়না সৃষ্টির জন্য এবং তাদের দ্বারা ঘরের বেড়া ভাঙ্গার জন্য নানা ছন্দের বিনোদন অনুষ্ঠান আছে, নানা জাতের প্রতিষ্ঠান আছে, নানা শ্রেণীর মেয়ে শিকারী পুরুষ আছে। তাদের কেহ সিনেমায়, ভিডিও ক্যাসেটে, টেলিভিশনে যৌন ছবি প্রদর্শন দ্বারা, কেহ সিনেমা পত্রিকার নামে যৌন সংবাদ পরিবেশন দ্বারা, আবার কেহ বড় বড় হোটেলের চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান এবং ডিনারের নামে অর্বাচীন স্বপ্নচারি তরুণীদের প্রলোভিত করে মা-বাবার ঘরের বেড়া ভাংতে প্ররোচিত করে থাকে।

মডেলিং তেমনি একটি অভিজাত যৌন টোপ। এখানে দেহ প্রদর্শন দ্বারা সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত হওয়ার এবং সমঝদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লোভ যেমন আছে, তেমনি প্রচুর টাকা প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। সুতরাং কাজের পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ অপরিণত বয়সের কিশোরীরা সহজেই নিজ সত্ত্বা বিস্মৃত হয়ে মাদকের নেশায় ভরপুর এই টোপটি গিলে থাকে।

শবরী ও ডুম্বিনী প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন শবরী ও ডুম্বিনীদের জীবন চর্চার পদ্ধতি উল্লেখ করেছি। যৌবনবতি শবরী ও ডুম্বিনী মেয়েরা দিনের বেলা বাবুদের বাড়ী এসে নেচে গেয়ে যৌবন প্রদর্শন করে ডালা কুলা বিক্রি করত।

তাদের লাস্যময় দেহ মদিরায় মত্ত হয়ে বাবুরা জাত পাত ভুলে রাতের বেলা তাদের দরজার কড়া নাড়ত।

মডিলিং ও তেমনি। তরুণী তন্বী যৌবনবতি মেয়েরা অর্থের বিনিময়ে নেচে গেয়ে যৌবনের জৌলুস প্রদর্শন দ্বারা ব্যবসায়ীদের পণ্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মডেলিং-এ এনে টাকার লোভ দেখিয়ে ঐ অর্বাচিন কিশোরীগুলোর শালীনতাবোধ, সঙ্কোচবোধ ইত্যাদি যা কিছু নৈতিকবোধ আছে, সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের দেহ সচেতনতা এবং সুপ্ত যৌনবোধকে উত্তেজিত করে দেয়া হয়। শাড়ী ব্লাউজ খুলে দু একটি বিজ্ঞাপনে যখন তাদের কচি দেহ মদিরার পঞ্চরস দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়, আর দর্শকেরা তা দেখে উল্লাসে, আগ্রহে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে, মেয়েগুলি তখন হক কচিয়ে উঠে। তারা তাদের শরীরকে আরও গতিশীল আরও সাবলিল করে দর্শকের আগ্রহ উত্তেজনা ভাগ করে ভোগ করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে।

পত্রিকার পাতায় একবার এস.এস.সি ফেল করা তেমনি এক কিশোরী মডেলের কাহিনী দেখেছিলাম। কতইবা তার বয়স, জীবনটা সম্পর্কে কি ই বা তার ধারণা কি-ই বা তার জ্ঞান। নবম শ্রেণীতে থাকাকালে সে মডেলিং এ আসে। মডেলিং এর শৃঙ্গারে তার দেহ মনের দুয়ার যত খুলেছে, তার জ্ঞানের দুয়ার তত বন্ধ হয়েছে। সে এস.এস.সি পরীক্ষায় ডাব্বা মেরেছে।

কিন্তু তাতে তার খেদ নেই। যারা পরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে সে ঈর্ষান্বিত হয়েছে অন্যসব সফল মডেলদের প্রতি। অপর এক মডেল সম্পর্কে সে বলেছেঃ

"মডেল হওয়ার মত কোন গুণ বা যোগ্যতা তার নেই। এদেশে তো গাধারাও কলকে পায়। ফলে সে খেতে পারছে। চেহারায় আবেদন নেই, ফিগার তৃতীয় গ্রেডের, ফ্যাশান বোঝে না। চলতি কথায় যাকে বলে একেবারে ক্ষেত। সস্তা জনপ্রিয়তা পেয়েছে সে। তার ভারী শরীর দেখে রিক্সাওয়ালা, ঠেলা গাড়িওয়ালারা উদ্বেলিত হতে পারে। আমার তো মনে হয় না রুচিবান কোন কিশোর বা যুবক তার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবে, এতই বাজে ওর ফিগার।"

অর্থাৎ কত গুলি ইচড়ে পাকা কিশোরী তরুণী দেহ শোভার দেমাগ নিয়ে ময়দানে নেমে ব্লাউজ ব্রেসিয়ার খুলে ফেলে চুলাচুলি করছে। তাদের চুলাচুলির বিষয় হচ্ছে কে কত সুন্দরী, কার বয়স কত কম, কে কয়টা কিশোর যুবার

মাথা খেতে পেরেছে, কে রিক্সাওয়ালার আর কে ঠেলাগাড়িওয়ালার উপযুক্ত ইত্যাদি। মডেলিং এ কম বয়স এবং সুপুষ্ট বক্ষই তাদের পেশার প্রধান পুজি।

আমেরিকার বয়স্কা মেয়েরাও সার্জারীর মাধ্যমে বক্ষ পুষ্ট ও দৃঢ় করে নিজের তারুণ্য প্রদর্শন করে। তাদের বুড়িরাও কথা বলার সময় এমন তর-তর, থর থর, করে কথা বলে যেন সে নিতান্তই একটা কচি খুকী। তারা কচি খুকির অভিনয় করে বুঝাতে চায় তাদের বয়স খুবই কম। আর তাদের ঐ বাচাল অভিনয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষ শিকার করা।

সংবাদে প্রকাশ, সেদিন রাজমনি সিনেমা হলে চাঁদনী ছবিটি দেখার পর একদল যুবক হলের ভিতরে মিছিল শুরু করে এবং শ্লোগান দেয়– 'আর দেখব না বুড়া গাই, নতুন মুখ দেখতে চাই" তার কারণ ছবিটিতে নতুন পিচ্চি নায়িকারা বম্বে ষ্টাইলের উদাম দেহ দেখিয়ে অভিনয় করেছে। খবরে আরও প্রকাশ, সিনিয়র নায়িকারা খোলা মেলা পোজ দিতে সঙ্কোচ বোধ করে, কিন্তু নতুনেরা বম্বে ষ্টাইলে যদৃচ্ছা খোলামেলা পোজ দিয়ে যাচ্ছে। (সাপ্তাহিক আপন জন ১৬-৯-৯৩)

সুতরাং দর্শকদের মধ্যে যেমন কিশোরী দেহ দর্শনের আকাঙ্খা বাড়ছে তেমনি কিশোরীদের মধ্যে নিজের তারুণ্য এবং নগ্ন দেহ প্রদর্শনের প্রবণতা বাড়ছে।

এই প্রগতির যুগে মডেলিং অভিনয়, ভিডিও ইত্যাদির দ্বারা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অর্থবিত্তের প্রতি এক সীমাহীন স্বাদ-আহলাদ প্ররোচিত হয়ে চলেছে। এই প্ররোচনায় কারও বিত্তের প্রতি স্বপ্নচারী কিশোরীর লোলুপ দৃষ্টি, আর কিশোরীর কচি শরীরের প্রতি বিত্তবানের লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই দুই মেরুর আকর্ষণের ফলে সমাজে বহু দুর্ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে, যার কিছু কিছু পত্রিকার পাতায় সংবাদ হয়ে বের হচ্ছে।

এই তো সেদিন স্বনামধন্য এক শিল্পীর তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী কন্যার সংবাদ পত্রিকার পাতায় বের হল। কন্যাটির বাড়ীতে তার মা-বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু যৌন সার্দুল এক কোটিপতি প্রৌঢ়ের অবাধ মেলামেশা। কন্যাটি তাকে চাচা সম্বোধন করে। চাচাটি তাকে নিয়ে দিনের পর দিন হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে এবং তলে তলে তাকে যৌন মদিরার মাতাল বানিয়ে দেয়।

মা-বাবা প্রথম বাধা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। বরঞ্চ ভেবেছেন ভালই হল, ঐ কোটিপতির সাথে শেরাটন, সোনারগা হোটেলের বড় বড় পার্টিতে লাঞ্চ, ডিনার-ড্যান্স করে প্রগতির শিক্ষা পাবে, উঁচু সমাজে চলার

কায়দা কানুন শিখবে। কিন্তু যখন দেখলেন মেয়ে হোটেলে হোটেলে ড্যান্স-ডিনার করে রাত কাটাতে শুরু করেছে তখন তাদের চোখ খুলল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন আর তাকে বাধা দিয়ে ঘরে আটকে রাখা যায় না। বাধা দিলে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে, পাগলের মত বেরিয়ে যেতে চায়।

বিপদ বুঝতে পেরে মান সম্মান রক্ষার জন্য মা বাবা তাকে তার চাচার কাছে লন্ডন পাঠিয়ে দেন। কিন্তু লন্ডন যাওয়ার তিন দিনের মাথায় চাচা-চাচির চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেই যে সে বেরিয়ে গেল তার আর কোন হদিস পাওয়া গেল না। তার মা বলেন- আমার মেয়েকে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে উচ্ছন্নে নিয়ে গেছে লোকটি। শত চেষ্টা করেও আমি আর তাকে ফেরাতে পারিনি। আর এই না পারার কারণ কন্যাটির মধ্যে রূপ সচেতনতা যতটুকু বেড়েছিল তার চেয়ে বেশী বেড়েছিল তার যৌন চেতনা।

মডেলিং এর মাধ্যমে নিজের রূপ যৌবনকে বিজ্ঞপিত করে বিত্তবানের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ার এবং বিত্ত ও যৌন নেশায় দেহ ব্যবসার প্রতি লালায়িত হওয়ার এবং মা বাবার ঘরের বেড়া ভাঙ্গার ঘটনাও পত্রিকায় বের হচ্ছে।

১৯৯৩ সনে এক পত্রিকা সম্পাদকের যুবতী কন্যা টুথপেষ্টের বিজ্ঞাপনে মডেলিং করতে এসে তেমনি ঘটনার জন্ম দিয়েছে। মেয়েটি বেড়া ভাঙ্গছে দেখে মা-বাবা তাকে লন্ডন পাঠিয়ে এক প্রবাসী ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন এবং লন্ডনে এপার্টমেন্ট ভাড়া করে দেন। কিন্তু একবার যে নিজের দেহ সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপনের বিষয় করেছে সে তো এক পুরুষে তৃপ্ত হতে পারে না, সে যে হাজার মানুষের সম্পদ হয়ে যায়।

সুতরাং তিন মাসের মাথায় মেয়েটি স্বামী বেচারীটিকে পরিত্যাগ করে লন্ডনের এপার্টমেন্টে একা বসবাস করতে থাকে। প্রৌঢ় যৌন সার্দুল যে কোটি পতিটি স্বনামধন্য এক শিল্পীর তের চৌদ্দ বছর বয়সী কন্যাকে যৌন মাতাল করে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে বলে উপরে উল্লেখ করেছি তার আবির্ভাব ঘটে এখানেও। ঢাকার পরিচয়ের সূত্র ধরে মেয়েটির বাবার সমবয়সী এই লোকটি এখানে এসেও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। মেয়েটির নিজের ভাষায় "লন্ডনে এক রেস্তোরায় আমরা খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে বসেই ও আমার প্রিয় মুরগীর একটি চাইনিজ ডিসের অর্ডার দিল। আর আমার অজান্তে এ খাবার বাড়ীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সে খাবার পরে কয়েকদিন ধরে আমি খেয়েছিলাম। ব্যস, সেখান থেকেই তাকে আমার ভাল লেগে গেল।"

তারপর ঢাকায় এসে মেয়েটি তার মা-বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোটিপতিটিকে বিয়ে করে ফেলে। তার বাবা এই বিয়ের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন দেখে মেয়েটি এক বিবৃতি প্রচার করে এবং বলে আমি স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, আমার বাবা তাঁর অযৌক্তিক পিতৃত্বের অহংকার বোধের কারণে আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছেন এবং ঐ লোকটির সাথে আমার বিয়ের বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিতে পারছেন না। সুস্থ মনের অধিকারী ও প্রাপ্ত বয়স্কা হিসাবে আমি আইনগত ভাবে আমার নিজের বিয়ে সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমি আমার পিতামাতার কোনরকম জোরাজোরি অথবা সামাজিক হুমকির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য নই।

আরও বলেছে, মেয়েটি "আমি অবুঝ নই। আমার ভবিষ্যৎ বোঝার ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। আমি মা হতে চলেছি। আমার আর কিছু পাবার নেই।" এই বলে সে স্বামীর হাত ধরে ১৩ জুন, ৯৩ লন্ডন চলে গিয়েছিলেন। বাবা শুধু বললেন– "ও বাচ্চা মেয়ে, বুঝতে পারছে না, এই বিয়ে বড়জোর ছয়মাস টিকবে।"

৩১ শে মার্চ থেকে ৩১ শে আগষ্ট– মোট ৫ মাস দুই দিন শেষে মেয়েটি পহেলা সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকায় ফিরে এসেছে ত্যাজ্য স্ত্রীর মত। আসার সময় নাকি ঐ লোকটিকে সে বলে এসেছে যদি সে তার পেছনে লাগে তবে তাকে উলঙ্গ করে ছাড়বে।

মেয়েটি ঢাকা বিমান বন্দরে নেমে মাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। কাঁদতে কাঁদতে বলল মা, বাবা আমাকে ক্ষমা করবে তো? আমি যে তাকে অনেক কষ্ট দিলাম। মরতে পারিনি বলেই তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।"

তার ছোট বোন তাকে জড়িয়ে ধরলে বললঃ "তোরা আমাকে ক্ষমা করে দিস বোন। আমি জানতাম নারে এমনটি হবে। আমি হেরে গেলাম রে।"

কিন্তু বিলাপ কি এখানেই শেষ হবে? তার পেটে যে ঐ লোকটির সন্তান। সুতরাং বিলাপতো সবে শুরু। লন্ডন যাবার সময় সে বুঝতে পারেনি এমনটি হবে। কিন্তু তার বাবা কি করে বুঝতে পেরেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে এবং তার মত মেয়েরা কি কোনদিন তা বুঝতে পারে?

দর্প দম্ভ সহকারে মেয়েটির লন্ডন যাওয়া এবং কান্নাকাতর দেহ নিয়ে ফিরে আসা দেখে আমার বাল্যকালে দেখা একটি বাস্তব দৃশ্য মনে পড়ে গেল।

অতি প্রাচীন কাল হতে ভারতের উড়িষ্যার অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র জীবন যাপন করে আসছে। কোথাও কাজ পাওয়া যায় শুনলে তারা দল বেঁধে

সেদিকে ছুটত। তাদের উড়িয়া বলা হত। এরা বিশ্বস্ত ছিল বিধায় বাংলাদেশে দারোয়ান, মালি, বেহারার কাজে এদের একচ্ছত্র অধিকার ছিল। ব্রাক্ষণ উড়িয়ারা বাংলাদেশের হিন্দুর ঘরে, হোটেলে, রেস্তোরায় পাচকের কাজ করত।

ভারত বিভাগপূর্ব যুগে উড়িয়ারা ইংরেজের চা বাগানে কাজ করা জন্য দলে দলে সিলেট যেত। এরা ষ্টিমারে চাঁদপুরে নেমে বেশীর ভাগই কুমিল্লা চাঁদপুর রোড ধরে পদব্রজে সিলেট রওয়ানা দিত। পথে পথে হাটবাজারের অলিগলিতে বসে পিঁয়াজ কাঁচা মরিচ সহযোগে ছাতু খেয়ে রাত কাটাত। এদেরে চদরী বললে খুব খুশী হত।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করত– ক্যায়া চদরী কাঁহা যা রাহা। সে হাত-পা নাচিয়ে নর্তন কুর্দন করে গর্ব ভরে বলত হাম চা বাগান মে ইংরাজ চাহাবকা সাথ কাম করনেকা যা রাহা হ্যায়, ওহা বহুত বড়া বড়া নকরী মিলতা। কথা বলার সময় এমন ভাবসাব দেখাত যেন সে বিলেতী সাহেবের সহকর্মী হতে যাচ্ছে এবং এই তো, বিরাট বড়লোক হয়ে সে ফিরে এল বলে।

এই ছবির বিপরীতে দেখা যেত বহু উড়িয়া শ্রমিক সিলেটের বৈরী আবহাওয়ায় পড়ে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডায়রীয়ায় আক্রান্ত হয়ে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় ফিরে আসছে। তাদের দেখা যেত রাস্তার পাশে দোকান ঘরের বারান্দায় কিম্বা কোন স্কুল ঘরের বারান্দায় শীতের কুকুরের মত কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে কোঁকাচ্ছে।

এদেরে যদি জিজ্ঞেস করা হত-ক্যায়া চদরী কাঁহাছে আয়া। কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে উত্তর দিত- বাবু হাম চা বাগান কা কামসে গ্যায়া থা। লেকিন বিমার পড় গ্যায়া। আভি দাওয়াকা পয়সা ভি নেই হ্যায়। থোড়া মদদ কিযিয়েনা বাবু, বলেই দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করত।

ঐ মেয়েটির দর্প দম্ভ দেখিয়ে লন্ডন চলে যাওয়া আর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসার সাথে চা বাগানের উড়িয়া কুলিদের কি সুন্দর মিল রয়েছে।

শুনেছি প্রথমোক্ত শিল্পীর মেয়েটি, যে নাকি লন্ডনে তার চাচার বাসা থেকে ঐ কোটিপতি প্রৌঢ় লোকটির হাত ধরে হারিয়ে গিয়েছিল সেও নাকি হাটি হাটি পা পা করে অতি সঙ্গোপনে ফিরে এসেছে। এমনটি যে হবে এবং শেষোক্ত মেয়েটির মত রিক্ত হয়েই যে ফিরে আসতে হবে এমনটি সেও বুঝতে পারেনি। আসলে এসব মেয়েদের বয়সটাই হচ্ছে একটি রঙিন চশমা, তাতে বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মনে হয় যেন আজকে যা দেখছি চিরদিন এভাবেই চলবে। প্রগতির হাতছানি দ্বারা

প্ররোচিত হওয়ার কারণে মা-বাবার পরিণামদর্শিতা এবং দূর দৃষ্টিসম্পন্ন আদেশ নিষেধকে তারা সেকেলে বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকে।

আজ আমাদের ঘরে ঘরে কত হাজার হাজার ঐ ধরনের মেয়ে মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে, মা বাবার মর্মব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, নাচের নেশায় মত্ত প্রগতির প্রবক্তারা সে হিসাব করার ফুরসৎ পায় না বা চা বাগান যাত্রী উড়িয়া শ্রমিকের মত মডেল যাত্রীরাও তা বুঝতে পারে না।

চা বাগানের কুলি উড়িয়াদের মধ্যে আর মডেল কন্যাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- চা বাগানের উড়িয়ারা অল্পদিনের মধ্যে রোগ শোক জ্বরাগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসত আর মডেল কন্যারা অর্থলিপ্সা আর যৌবন নিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। মডেল কন্যাদের অপরিণামদর্শী যৌবন আছে কিন্তু উড়িয়াদের মত পেটের ধান্ধা নেই।

কারণ মডেলিং হচ্ছে দেহ পুঁজির প্রাইমারী শিক্ষা কেন্দ্র। দেহ সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে এখানে যারা সফল হবে তারা সিনেমা সাম্রাজ্যের সেকেন্ডারী কেন্দ্রে প্রমোশন পাবে। আর ঐ প্রমোশন পেলে দেহ বিপননের হায়ার সেকেন্ডারী শ্রেণীর হাজার একটা দুয়ার তার সামনে খুলে যাবে। সুতরাং এদের পরিনতিটা একটু দেরীতে আসে কিন্তু তা আসে অতি ভয়ঙ্কর রূপে। যেমন বিশ্বের সাড়া জাগানো অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো ১৯৬২ সনের ৪ আগষ্ট আত্মহত্যা করে মারা যান। মৃত্যুর কদিন পূর্বে তিনি ফটোগ্রাফার বার্ট স্টার্মকে ঘরে ডেকে এনে তার সামনে নগ্ন হয়ে বিভিন্ন পোজের ছবি তুলতে দিয়ে নিজ জীবনের পরিনতির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন।

মনরোর জীবন শুরু হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে মডেল সেজে ক্যামেরার সামনে ন্যাংটা পোজ দিয়ে। ১৫ বছর বয়স হতে একের পর এক চারটি বিয়ে করেও ঘর বাঁধতে পারলেন না। ২৩ বছর বয়সে ক্যালেন্ডারে সম্পূর্ণ নগ্ন ছবি দিয়ে বিখ্যাত হওয়ার পর থেকে তার শরীর আর শান্তি পায় নাই। এই ব্যবসা তার দেহে যে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল সেই জ্বালার কারণেই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে তাকে সকল জ্বালা হতে মুক্ত হতে হয়।

সম্ভ্রম

খবরে প্রকাশ, যশোর বেনাপোল সড়কে একটি যাত্রিবাহী বাসের রাত্রিকালীন যাত্রায় যাত্রীরা পথে পথে নামতে থাকলে এক পর্যায়ে সুফিয়া নামের ১৫ বছরের একটি মেয়ে পরবর্তী স্টপেজ এক বাজারে নামবে বলে বাসে একা পড়ে যায়। এ সুযোগে বাসের অসৎ কর্মচারীরা সুফিয়াকে জোর করে সম্ভ্রম হরণ করে চলে যায়। সম্ভ্রম হারানোর ক্ষোভে দুঃখে অতিষ্ঠ হয়ে সুফিয়া ঐ বাজার থেকে কীটনাশক খরিদ করে এনে বাসে বসেই আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। এ খবরটি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এমন ঘটনাতো সারা দেশে প্রতিনিয়ত কতই না ঘটছে, কিছু পত্রিকার পাতায় আসে বহুই আসে না।

চাপাইনবাবগঞ্জে গোমস্তাপুর থানার অধিবাসী ১৪ বছর বয়স্কা শাবানা রাত্রিবেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের বাইরে গিয়েছিল। এই সুযোগে সিটু নামক ২৫ বছর বয়সের এক যুবক শাবানার মুখে কাপড় গুজে পার্শ্ববর্তী ঝোপের আড়ালে নিয়ে ধর্ষণ করতে থাকে। শাবানার মা অনেকক্ষণ থেকে মেয়ের সাড়া শব্দ না পেয়ে ঘরের বাইরে এসে খুঁজতে গিয়ে মেয়ের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং ধর্ষণরত সিটুকে হাতের বদনা দিয়ে আঘাত করেন। এ ক্ষেত্রে ও সম্ভ্রম হারানোর বেদনা সইতে না পেরে শাবানা কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ারা গাছের ডালের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনাটি ২রা জুলাই ৯৫ তারিখের পত্রিকায় এসেছে। শুধু জবরদস্তি ধর্ষণের ক্ষেত্রেই নয়, নিজ শরীরটা স্বামী ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করবে ভয়ে মেয়েদের আত্মহত্যা করার প্রচুর কাহিনী আছে।

এ দেশের মেয়েরা নিজ সম্ভ্রমকে তার জীবনের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করে আসছে অনাদিকাল থেকে। ১৩ আগষ্ট ৯৫ তারিখের পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ফেনী সদর থানার ছায়েদুল হক তার কর্মস্থলের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের মনোরঞ্জনের জন্য তার সুন্দরী স্ত্রী রাহেলাকে রেষ্ট হাউজে পাঠাতে চেষ্টা করে। এখানে ও তার শরীর সম্ভ্রম পাষন্ডদের হাতে নিপীড়িত হবে ভয়ে রাহেলা বিষপানে আত্মহত্যা করে। এমনি করেই মেয়েরা চিরদিন নিজের সম্ভ্রমকে নিজের জীবনের চেয়ে বড় মনে করে আসছে। তার শরীরের বৈশিষ্ট্যই তাকে স্পর্শকাতর করে রেখেছে। এই স্পর্শকাতরতা এবং ঐ বৈশিষ্ট্যের কারণেই মেয়েরা নিজের শরীর গোপন করার জন্য ব্যগ্র থাকে।

অপরদিকে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি কুপ্রস্তাব দেয়, মেয়েদের আক্রমন করে, অপহরণ করে, ধর্ষণ করে, নিপীড়ন শেষে হত্যাও করে। কিন্তু কৈ, কোন মেয়েকে তো কোনদিনও কোন ছেলেকে প্রকাশ্যে কুপ্রস্তাব দিতে শোনা যায় নি, কোন মেয়ে কোন ছেলেকে কখনও আক্রমন ও করে না, অপহরণ ও করে না, ধর্ষণ নিপীড়ন বা নিহতও করে না। তার কারণ তার শরীরের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, ঐ সব কর্মগুলোর কোনও একটি করার মত শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, ইচ্ছা বা সাহস তার নেই। শারীরিক এই বৈশিষ্ট্যের সহজাত প্রকৃতি হচ্ছে নারীর লজ্জাবোধ, সম্ভ্রমবোধ, সঙ্কোচবোধ ইত্যাদি যা নারীকে করেছে মোহনীয় এবং মহীয়সী। অর্থাৎ যা ছিল নারীর দুর্বলতা তাই হয়েছে বৈশিষ্ট্য, যা ছিল বৈশিষ্ট্য তাই হয়েছে তার আবরণ এবং সেই আবরণগুণেই সে হয়েছে মোহনীয় এবং মহীয়সী।

শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশের নারীরই যাদের মধ্যে সামান্যতমও সত্তাবোধ আছে তাদের মধ্যে অবশ্যই এ সম্ভ্রম-সঙ্কোচবোধ আছে।

ভারতীয় লেখক কৃষণ চন্দর এর 'হংকং এ এক রাত' নামক একখানা বইতে লেখক দেখিয়েছিলেন মেয়েদের সম্ভ্রম-সঙ্কোচবোধ কত গভীর হতে পারে। বইটিতে লেখক বি ডি ইসরানী নামক এক ব্যবসায়ীর কাহিনী লিখেছিলেন।

পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে মাত্র দশ ডলার হাতে নিয়ে ইসরানী নামক এক গরীব মিস্ত্রী সুদূর হংকং এ এসে কেমন করে বিশাল সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক হয়েছিল তারই বর্ণনা দিচ্ছিলেন বইটিতে। ইসরানী লেখককে তার সম্পদের উৎস দেখানোর জন্য যেসব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল সেগুলোর সবগুলোই বহ্যত ছিল দোকান। দোকানের পেছন দরজা দিয়ে ঢুকলে দেখা যায় টয়লেট। টয়লেটের সামনে কিছু অর্ধবয়সী মানুষ তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে কতগুলো সাংকেতিক শব্দের প্রচলন আছে। যারা তা জানে না তারা শুধু প্রস্রাব করে ফিরে যায়। আর যারা ঐ সাংকেতিক শব্দ জানে এবং উচ্চারণ করে তাদেরে ভেতরের দরজা পার হয়ে একটি ঘরে যেতে দেওয়া হয়, যেটা একটা জুয়াখানা। তারপর দশটা চাকচিক্যময় কামরা, যার প্রতিটিতে রয়েছে মোহময়ী চীনা মদিরাক্ষী। তাদের হাতে রংবেরং এর পান পাত্র। বড় বড় শেঠরা এসে এসব কামরায় রাত কাটিয়ে যায়। তদ্বারা ইসরানীর ব্যাংক ব্যালেন্স ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং ইসরানী বুঝতে পারে সহজ ব্যবসার জন্য সম্ভ্রমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।

কামরার পর কামরা দেখাতে দেখাতে অবশেষে ইসরানী একটি প্রায়ান্ধকার কামরায় আসে। সেখানে হাত পা বাধা অবস্থায় একটি মেয়ে সোফার উপর বসে গোঙ্গাচ্ছিল। ইসরানীর ইঙ্গিতে তার হাত পায়ের বাধন খুলে দেওয়া হল। মেয়েটির বয়স পনের ষোলর বেশি হবে না। ইসরানী অনেকক্ষণ ধরে তাকে চীনা ভাষায় শাসাল। কিন্তু মেয়েটি বরাবর মাথা দোলাচ্ছিল এবং শেষে চিৎকার শুরু করে দিল। মেয়েটি উঠে যেতে চেষ্টা করছিল। এমন সময় ইসরানী তাকে এক প্রচন্ড ঘুষি দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলল। মেয়েটির নাক মুখ থেকে রক্ত ঝরতে রাগল। একটি চরম ভয় বিভীষিকা তার মুখাবয়ব আচ্ছন্ন করে ফেলল। দারুণ যন্ত্রণায় সে গোঙ্গাচ্ছিল আর অতি করুণ চোখে চার দিকে তাকাচ্ছিল।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ইসরানী বলল গতকাল তাইওয়ান থেকে ছয়টি মেয়ের একটা ব্যাচ আনিয়েছি। একেবারে আনকোরা, কিছুই জানে না হারামজাদীরা। বাইরে এসে ইসরানী একজন কর্মচারীকে ডেকে বলল, ওই মেয়েটার কামরায় জনা দশেক লোক লাগিয়ে দাও। মেয়েটির কাছে আত্মসত্বার জন্য সম্ভ্রমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। অথচ ইসরানীর কাছে সহজ ব্যবসায়ের জন্য সম্ভ্রমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।

ঐ মেয়েটি যদি আত্মহত্যা করার সুযোগ পেত হবে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সেও অবশ্যই আত্মহত্যা করত। কারণ দৈহিকভাবে পৃথিবীর সকল নারীই যেমন একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারীনি তেমনি তার লজ্জা সম্ভ্রম সঙ্কোচ ও একই প্রকৃতির। কিন্তু মেয়েটির আত্মহত্যার সুযোগ নেই। সুতরাং দশটি পুরুষ দ্বারা তার সম্ভ্রম হরণ করে তার সকল সঙ্কোচ নিরসন করে দেওয়া হবে এবং এক সময় মেয়েটি হয়ে যাবে একটি স্বার্থক বারবণিতা। তখন মেয়েটির আত্মহত্যা বলে আর কিছু থাকবেনা।

সঙ্কোচ কাটার এই পদ্ধতিটি বোম্বের চিত্রজগতের অভিনেত্রীদের উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। আমরা দেখে থাকি সিনেমায় অভিনেত্রীরা ন্যাংটা হয়ে অভিনেতার কোলে শোয়, বসে, কোলে ওঠে নাচানাচি করে, নায়কের বুকের নীচে নিপীড়িত হয়, কোন সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই। এর কারণ হল সিনেমা জগতে আসার প্রস্তুতিপূর্বে ইসরানীর গল্পের ঐ মেয়েটির মত দশ পুরুষ দ্বারা তাদের সঙ্কোচ কাটানো হয়েছে এবং এটা সত্যি কথা যে, সঙ্কোচ সম্ভ্রম নিয়ে কোন মেয়েই বম্বে মার্কা সিনেমার যৌন শৃংগারের অভিনয়কে পেশা হিসাবে নিতে পারেনা। কারণ শৃংগারের অভিনয়টা সাপ নিয়ে খেলা করার মত।

সাপের শরীরে যার স্পর্শ লাগবে, সাপের আক্রমণ হতে তার নিস্তার নেই। সে যত দূরেই থাক না কেন, সাপ তাকে খুঁজে বের করবেই, যতদিনেই হোক না কেন, সাপ তাকে ছোবল মারবেই। আমাদের দেশের অভিনয় জগতেও দেখা গেছে মেয়েরা শৃংগারের অভিনয় শেষে সবার অলক্ষ্যে নিজ পছন্দের নায়ককে নিয়ে অজ্ঞাত বাসে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কারণ আমাদের দেশের সিনেমাও বম্বের পথ অনুসরণ করে চলেছে। তাতে সিনেমাগুলো বাণিজ্যিকভাবে সফল হচ্ছে তো বটেই সাথে সাথে আমাদের সমাজের সম্ভ্রম সচেতন স্ত্রীপুরুষ সকলের সঙ্কোচ শরমকে লন্ড ভন্ড করে দিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, সংস্কার-সঙ্কোচ এবং সম্ভ্রম ধ্বংস করার জন্যেই যেন সিনেমাগুলোকে ইসরানীর সেই দশটা পুরুষের মত আমাদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের নায়িকাদের নিয়ে অনেক কাহিনী তৈরী হয়েছে যাতে তারা যে বম্বের অভিনেত্রীদের সমান্তরালে চলে গেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে।

সাপ্তাহিক পূর্ণিমার ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৯৫ তারিখের সংখ্যায় আমাদের দেশের এক অভিনেত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে, "টান টান ফিগারের অধিকারীনি ছিলেন তিনি। অনেকেরই তা নজর কাড়ত। চলচ্চিত্রে পা রাখার আগেই তার অনেক কিছু রপ্ত ছিল। নায়িকা হবার প্রতিযোগিতায় এসে আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে ওঠেন তিনি। তাতে অনেক রথী মহারথীদের সাথে পরিচয় হয়েছে আর দু'হাত ভরে টাকা এসেছে।

--- তারপর দীর্ঘদিন ডুব দিয়েছিলেন। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ঘোষণা দেন, আমি এখন ঢাকায়। এতদিন তিনি নাকি আমেরিকায় ছিলেন। কথিত আমেরিকা থেকে ফিরে এসে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছেন। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে তার বাসায় বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ ও জানিয়েছেন। তার দাওয়াত গ্রহণ করলেও সে দাওয়াত পালন করার গরজ দেখা যায়নি কারও মধ্যে। তাদের কথা, "পশ্চিমা দেশগুলোতে এখন এইডস-এর যা ছড়াছড়ি। আর তার যা স্বভাব তাতে করে এইডস ভাইরাস বয়ে আনার প্রসঙ্গটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর চেয়ে তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই ভাল।" কথাগুলো এখানে হুবহু উদ্দৃত করা হল।

উপরে আমরা দেখেছি, সম্ভ্রম হারানোর বেদনায় নারী কত অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়, আমরা দেখেছি সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বি ডি ইসরানীর আমদানি করা মেয়েটি কি অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করছে। কিন্তু একবার যার সম্ভ্রম

গেছে তার সঙ্কোচও গেছে এবং একসময় সে নিজেই দেহদানের জন্য অসঙ্কোচ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, যে নারী পাঁচজন পুরুষকে দেহদান করেছে সে বেশ্যা হয়ে গেছে। বেশ্যার তো সম্ভ্রম সঙ্কোচ নেই।

আমাদের দেশে অশ্লীল সিনেমা, পর্ণফিল্ম, পর্ণ সাহিত্য ইত্যাদির দ্বারা সম্ভ্রমের উপর হামলা চালিয়ে আমাদের সকল সঙ্কোচ শরম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। নায়িকাদের উপরোল্লিখিত আচরণ তারই একটা লক্ষণ মাত্র। দেশের যুব সমাজ শুধুমাত্র কিছু উপলক্ষের অপেক্ষা করছে। একটু ইন্ধন পেলেই ফেটে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তারই ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি নারীর অধিকার আন্দোলনের মধ্যে। ঐ আন্দোলন উপলক্ষ করে রাজপথে নেমে যুবতী মেয়েরা শ্লোগান দিয়েছে "আমার শরীর আমার মন, কথায় কেন অন্যজন। শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার" ইত্যাদি।

শুধু সিনেমাই নয়, এই সম্ভ্রম হরণ দ্বারা সঙ্কোচ কাটানোর পদ্ধতি নিয়ে কথা উঠেছে টেলিভিশন নাটকের ক্ষেত্রেও। টেলিভিশন নাটকগুলো ঘরোয়া বিনোদনের মাধ্যম হওয়ার কারণে বম্বের নায়ক নায়িকাদের মত নোংরামি এখানে চলে না বলে অভিনয় গুলো পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু অভিনয়ের সাবলীলতার প্রয়োজনে পারফরমারদের সকল সঙ্কোচ ঝেড়ে মুছে ফেলার ব্যবস্থা করতে হয়। শক্তিমান এবং কুশলী পারফরমার যারা তারা নিজ গুণেই নিঃসঙ্কোচ অভিনয় করে থাকেন ও করতে পারেন। আর অন্যদের ঐ গুণ অর্জনের জন্য এবং শুধু টিভি নাটকে একটু সুযোগ লাভের জন্য বম্বের তারকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় বলে সাপ্তাহিক পূর্নিমায় বর্ণিত উপরোল্লিখিত নায়িকার আচরণ হতে আভাস পাওয়া যায়।

গত বছর (১৯৯৪) জুন মাসের মাসিক টেলিভিশনের একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছিল, "নায়িকাদের সতীত্ব নিয়ে বিটিভিতে তুলকালাম।" তাতে একজন অভিনেত্রী-উপস্থাপিকা নিজেই মন্তব্য করেছেন, "বিটিভির কোন নায়িকাই সতীসাধ্বী নন।" একজন অভিনেত্রীর এহেন মন্তব্য টেলিভিশন অভিনেত্রীদের ক্ষুদ্ধ করেছে আর দর্শকদের ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ বম্বে ছবির বহুভোগ্য নায়িকাদের ছবি দেখে, কাহিনী শুনে বিটিভি দর্শকরা বিটিভি নাটকের নায়িকাদের সম্পর্কে ঐ ধরণের মন্তব্য বিশ্বাস করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। দর্শকরা ভাল করেই জানেন যে, এদেশের চলচ্চিত্র তারকারা বম্বের তারকাদের অনুসরণ করে সফল হওয়ার চেষ্টা করছে আর বিটিভির তারকারা চলচ্চিত্র তারকাদের অভিনয় এবং তার

আনুসাঙ্গিক অনুশীলন করে চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়ার রাস্তা তৈরী করছে। অর্থাৎ বম্বের ছবির মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতির সম্ভ্রম হরণ করারই ব্যবস্থা হয়েছে।

আসলে বম্বে মার্কা প্রতিটি ছবি যেন একেকটি বি ডি ইসরানী, প্রতিটি বম্বে ছবি যেন দশ দশটি ন্যাংটা ন্যাংটা চিত্র তারকাকে আমাদের সম্ভ্রম সঙ্কোচ হরণ করার জন্য আমাদের সংস্কারের পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছে, আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আর ইসরানীর সেই বন্ধ ঘরের বন্দী মেয়েটির মত আমাদের বিটিভির সামনে ছেলেমেয়েরা বন্দী হয়ে তাকিয়ে আছে-ভিডিওতে চিত্র তারকারা অশ্লীল উপায়ে তাদের সম্ভ্রম লুটে নিচ্ছে, সঙ্কোচ হরণ করছে।

আশির দশক হতে এদেশের বম্বের ভিডিও ছবির যে আগ্রাসন শুরু হয়েছে তার দেখাদেখি আমাদের দেশীয় ছবিতেও বম্বের অশ্লীলতার প্রয়োগ শুরু হয়েছে। তার ছিঁটে ফোটা আসছে বিটিভি নাটকেও। টিভির সামনে বসে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা ভিডিওর এসব দৃশ্য গোগ্রাসে উপভোগ করতে গিয়ে উত্তেজক রোগের শিকার হচ্ছে। দিনের পর দিন ঐ সব দৃশ্য তাদের সঙ্কোচ শরম হরণ করে নিচ্ছে। যার ফলে তাদের কাছে সম্ভ্রম বলে আর কিছু থাকে না। তার পাশাপাশি নারীবাদী আন্দোলনের শরীর যার সিদ্ধান্ত তার শ্লোগান দ্বারা সম্ভ্রমকে আরও সস্তা পণ্যে পরিণত করে দিচ্ছে। তার উপর আবার পাপ পূণ্যের লাঠি হাতে ধর্ম নামক যে পুলিশটি অনাদিকাল হতে মানুষের শরম সম্ভ্রম এর পাহারায় নিয়োজিত আছে, নাস্তিক্যবাদী এক শ্রেণীর মানুষ সেই পুলিশটিকেও নিষ্ক্রিয়, নিরস্ত করে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মনে পাপ সম্বন্ধে সন্দেহ দানা বাঁধছে অথবা তাদের মনে পাপ পূণ্যের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। এর পরিণতি যে কত বিষময় হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাম্প্রতিককালে পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদ হতে। নমুনা হিসেবে দুটি করে সংবাদ উদ্ধৃত করা হল।

মিডিয়া সিন্ডিকেট পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়েছে, "আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম গত ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং পূর্ববর্তী সাড়ে তিন বছরে ৬ হাজার ৯শ' ৩৯টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে। তন্মধ্যে ৩ হাজার ৮শ ৮২টি ছিল অজ্ঞাত শিশুর লাশ। এটা সামাজিক অনাচার বৃদ্ধির একটি লক্ষণ। উল্লেখ করা হয়েছে, মাতৃগর্ভে মৃত শিশুর সিংহভাগই অবৈধ যৌন মিলনের ফসল। সমাজ ও লোক লজ্জার ভয়ে এসব শিশুকে জন্মের পূর্বেই নানা উপায়ে মেরে ফেলা হয়। পরবর্তীতে এদের ডাস্টবিন অথবা অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া

হয়। মাতৃগর্ভে শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শহরের একশ্রেণীর অতি আধুনিক ছেলেমেয়ের নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনাচার দায়ী বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।" (দৈ, ইনকিলাব ২৬/৬/৯৫)।

১৯শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকার মগবাজারের একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে ছয় জোড়া নর-নারীকে গ্রেফতার করে। এরা স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে দুপুর বেলা হোটেলে অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিল। (ইনকিলাব ২০/৬/৯৫)

এতো গেল যারা ধর্ম নামক পুলিশকে বিশ্বাস করে না বা ভয় করে না তাদের কথা। যারা ধর্ম পুলিশকে ভয় করে তাই বলে তারাও বসে নেই। তারা ধর্মসম্মত উপায় অবলম্বন করে যৌন ক্ষুধাও মিটাচ্ছে সম্ভ্রমও রক্ষা করছে। যেমন 'ঘরে ঘরে এফিডেভিট ভীতি' শিরোনামে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ১৪ই জুন ১৯৯৫ সংখ্যায়। তাতে বলা হয়েছে "নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ের ঘোষণা দেয়ার সুযোগ থাকায় বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলের একশ্রেণীর টিন এজ তরুণ-তরুণীর মধ্যে ঘর ছেড়ে বিয়ে করার আগ্রহ যেমন বেড়েছে তেমনি ঘরে ঘরে এফিডেভিট আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ইদানিং স্থানীয় পত্র-পত্রিকাসমূহের প্রতিটি সংখ্যায়ই থাকছে ঘর ছাড়া তরুণ-তরুণীদের অশুভ দাম্পত্য বন্ধনের শ্রুতিকটু সংবাদ। শুধু তরুণ-তরুণীরাই নয় এখন ৩/৪ সন্তানের পিতামাতারাও অনেক বেশি সংখ্যায় পরকীয়ায় মত্ত হয়ে নিজে ঘর ছাড়ছে নয়তো কাউকে ঘর ছাড়া করছে। অভিজ্ঞজনরা এটাকে ডিসএন্টেনা কালচারের বিষময় ফল বলে আখ্যা দিয়েছেন।"

পাশ্চাত্যের যেসব দেশে চুম্বন-আলিঙ্গন শৃংগারের ছবিসম্বলিত ছবি তৈরী হয়, ব্লু ফিল্ম তৈরী হয়, সেসব দেশই এখন ঐ সব ছবির কুফল সম্পর্কে শংকিত হয়ে উঠেছে, নিজেদের শোধরাবার জন্য আইন তৈরী করতে যাচ্ছে। খবরে প্রকাশ! "বৃটিশ সরকার টেলিভিশনে সহিংসতা ও অনৈতিক দৃশ্য প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যাচ্ছে। বিবিসির নিউজ চার্টারে রুচি ও শোভন সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করে এই অভিযান চালানো হবে। এতে প্রদর্শিত দৃশ্যে যাতে এমন কিছু না থাকে যা অশোভন ও অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং তা নিশ্চিত করার জন্য কর্পোরেশনকে বলা হবে। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী থেকে এই সনদ কার্যকর হবে বলে খবরে প্রকাশ। বিবিসির পরিচালকরা বলছেন, এ বছরের শেষ দিকে তারা এ ইস্যুটির উপর এক সেমিনারের আয়োজন করবে। বিবিসি সহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি

চ্যানেলগুলো বিভিন্ন নাটকে সমকামীবাদ, সহিংসতা ও বিভিন্ন বিতর্কিত দৃশ্যাবলী প্রচারের ফলে সংবাদপত্রে এর তুমুল সমালোচনা হওয়ার পর সরকার এই পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। (ইনকিলাব ৩০/৭/৯৫)

আমাদের দেশের সেন্সর আইনেও অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে কঠোর বিধান রয়েছে। কিন্তু একটি মেয়ের সম্ভ্রম হরণ দ্বারা সঙ্কোচ কাটানোর জন্য সেই বি ডি ইসরানী যেমন করে মেয়েটির উপর দশটা মরদ সওয়ার করে দিয়েছিল তেমনি আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির উপরও নাস্তিক ও নারীবাদী নামক বহু মরদ সওয়ার হওয়ায় আমাদের সেন্সর বোর্ডেরই সঙ্কোচ শরম নষ্ট হয়ে গেছে। সাথে সাথে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ সম্ভ্রম হারিয়ে এখন আমাদের ভগ্নি ও কন্যাদের বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিচ্ছে এবং তদ্বারা জঘন্যভাবে তাদের দেহ ব্যবসায়ে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাবাব নাম দিয়ে আমরা যেমন করে গোশত পুড়ে খাওয়ার আদিম স্বাদের জাবর কাটি, বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতাও তেমনি নারীদেহ উপভোগের এক আদিম পন্থার পুনরাবৃত্তি যা সভ্যতার নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানবতাকে তদ্বারা ধোকা দেওয়া হচ্ছে।

পর্ণ থেরাপি

কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটার চিড়িয়াখানায় দুটি গরিলাকে গত ২৪ বছর যাবৎ একই খাঁচায় একত্রে রাখা হয়েছে। গরিলা দুটির একটি পুরুষ এবং একটি মেয়ে। কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন, মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব দুটি একত্রে বসবাসের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হবে তাদের মধ্যে যৌন আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং তারা সন্তান জন্ম দিবে- এটাই ছিল কর্তৃপক্ষের সাধারণ প্রত্যাশা। কারণ ঐ চিড়িয়াখানায় বাঘ, সিংহ, বানর, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর পশুই এরকম অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করে থাকে। কিন্তু এই গরিলা দম্পতিটি এতদিন পর্যন্ত একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন যৌন উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়নি এবং তারা সন্তান জন্ম দেয়নি। এই না হওয়াটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যৌন উত্তাপ সৃষ্টির জন্য এই প্রাণী দুটিকে ভিডিওতে পর্ণ ছবি প্রদর্শন করানো হবে। তারা আশা করেন ভিডিওতে যৌন সঙ্গমের দৃশ্য দেখে তারা হয়তো যৌন তাড়না অনুভব করবে। এই সংবাদ সাপ্তাহিক সন্দ্বীপ পত্রিকার ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যার প্রকাশিত হয়েছিল।

মানুষের সাথে গরিলার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তাই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ মনে করেন পর্ণ ছবিতে যৌন সঙ্গমের দৃশ্য দেখে মানব সন্তানরা যেমন করে কামতাড়িত হয়ে থাকে গরিলারও হয়তো তেমনি অবস্থা হবে। পুরুষ গরিলারা শরীর স্বাস্থ্যে মেয়ে গরিলার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ আকারের হয়ে থাকে। দাম্পত্য ক্ষেত্রে পুরুষ গরিলারা এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট নয়। তাদের হেরেমে অনেকগুলো এমন কি ১০টি পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গী থাকে এবং সেখানে অন্য কোন পুরুষ গরিলার প্রবেশাধিকার থাকে না। পক্ষান্তরে গীবন এর সাথে গরিলার বহু সাদৃশ্য থেকে থাকলেও গীবন পুরুষ এবং স্ত্রী একই আকারের হয়ে থাকে। যৌন জীবনে গীবন পুরুষেরা অনেকটা বেরসিক। তারা একজনের বেশী স্ত্রী সঙ্গী রাখেনা। সুতরাং গরিলাদের যৌন উচ্ছাস তার সমগোত্রীয়দের চেয়ে অনেক বেশী। যেহেতু গরিলারা বহুনারী গমনে অভ্যস্ত সেহেতু কর্তৃপক্ষ ধরেই নিয়েছেন যে, পর্ণ ছবির যৌনকর্মের দৃশ্য দ্বারা গরিলাটির মধ্যে তার সঙ্গীনির প্রতি যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা এবং উভয়কে কামতাড়িত করা সম্ভব হবে পারে-মানুষের সমাজে যেমনটি হয়ে থাকে।

যেসব সিনেমায় স্ত্রী অঙ্গের প্রদর্শনী এবং ব্যবহার যত বেশী নগ্ন এবং যত বেশী অশ্লীল সেসব সিনেমার প্রতি দর্শকদের আগ্রহ তত বেশী এবং সে

সিনেমা তত বেশী সফল এবং হিট হয়ে থাকে। নারী অঙ্গের যৌন প্রদর্শনীর সময় দয়িতেরা যৌনকাতর হয়ে নর-নারী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে গিয়ে এক সময় সর্বনাশা পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফেলে যার পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর।

পাশ্চত্য দেশগুলোতে বহু পূর্ব হতেই পর্ণ সংস্কৃতি প্রচলিত আছে। সেসব দেশে ঐ সংস্কৃতির প্রভাবে তরুণ তরুণীরা অতি অল্প বয়সেই উত্তপ্ত হয় এবং নিজের শরীরের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করে থাকে। ফলে তাদের সমাজ আজ কুমারী মাতৃত্ব, অকাল মাতৃত্ব, জারজ সন্তান ইত্যাদির সমস্যায় জঘন্যভাবে জর্জরিত। সর্বোপরি তাদের অনাচারের ফসল এইডস ব্যাধির চাবুক আজ তাদের সভ্যতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। খবরে প্রকাশ: যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্কদের প্রতি ৯২ জনের মধ্যে একজন এইডস রোগী।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। যৌন শাসন মুসলমানদের ধর্মীয় নীতির প্রধান একটি বিধান। দেশটির তিনদিক ঘিরে, রয়েছে যৌনকীর্তি প্রসিদ্ধ দেবতাদের ধর্মানুসারী হিন্দু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ভারত। পাশে রয়েছে পতিতা বাণিজ্যে ব্যস্ত ব্যাংকক, হংকং, ম্যানিলা ইত্যাদি। অপরদিকে বিশ্বময় পাশ্চাত্য যৌন সভ্যতার ধারা প্রবাহমান। বিশ্বের কাম সফরকারীরা ভোগ বাসনার তাড়নায় তাড়িত হয়ে বম্বে ব্যাংকক, হংকং, ম্যানিলা ইত্যাদিতে কাম সফর শেষে বাংলাদেশে এসে এখানকার যৌন শাসনের কঠোরতা দেখে থমকে দাঁড়ায়। "যাকে না দেখেছি সে বড় সুন্দরী"। বাংলাদেশের মহিলাদের ওড়না বোরকার পর্দা দেখে তারা বুঝত বাঙ্গালী মহিলারা বড় সুন্দরী। সুতরাং এদের বোরকা ওড়না খোলার জন্য এবং যৌন উত্তাপ দ্বারা এদের উত্তপ্ত করার জন্য ঐসব দেশেগুলো বাংলাদেশের উপর বোগোটার গরিলার মত পর্ণ ছবির থেরাপী প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ বলিউডের পর্ণ ছবির ভিডিও ক্যাসেট এবং স্যাটেলাইট টিভির যৌন সঙ্গমের দৃশ্য দ্বারা আমাদের টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলোকে সয়লাব করে দেওয়া হচ্ছে। বোগাটার চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের গরিলার উপর পর্ণ থেরপী প্রয়োগ করে কতটুকু সফল হয়েছে তা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলিউডের ভিডিও এবং স্যাটেলাইট অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কিশোর যুবাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

ডিস এন্টেনার বদৌলতে আজ আমাদের দেশের ঘরে ঘরে যুব সমাজ দিবস রজনীর সর্বাধিক সময় স্যাটেলাইট টিভির অশ্লীল সব পর্ণ সিনেমা দেখে

কাটাচ্ছে। তার ফলে অপরিপক্ক কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের মধ্যে ভয়াবহ যৌন উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় যেসব ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা আমরা পাঠ করে থাকি এবং যেসব লোমহর্ষক সন্ত্রাসী ঘটনার কথা শুনে থাকি তার সাবগুলোই স্যাটেলাইট টিভি, বলিউডের সিনেমা এবং আমাদের দেশের বাণিজ্যিক সিনেমা দ্বারা প্ররোচিত।

মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মানুষ যেমন দিগবিদক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, অশ্লীল ছবিতে শৃংগার ও সঙ্গমের ছবি দেখেও যুবা ও কিশোররা তেমনি জ্ঞান হারিয়ে থাকে। বরঞ্চ যেকোন নেশার চেয়ে এসব ছবি প্রসুত মত্ততা অনেক বেশী ভয়ঙ্কর এবং কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীরাই বেশী করে এ মত্ততার শিকার হয়। এখানে প্রতিদিনের সংঘটিত হাজারো দুর্ঘটনার মধ্য হতে মাত্র দুটি দুর্ঘটনা উল্লেখ করছি:

১৯৯৫ সনের ৩রা এপ্রিলের ইনকিলাব পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ- লাবন্য নামে এক ষোড়শী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ৩১/১০/৯৫ তারিখে পতিতাবৃত্তি গ্রহনের জন্য ঢাকা হতে নারায়নগঞ্জের বাস চেপে বসে। তার চোখে মুখে অনিশ্চিত যাত্রার যে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠে তদৃষ্টে একজন বাস যাত্রী চাতুর্যের সাথে কথা বলে জানতে পারলেন, সে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং সে জন্যই নারায়ণগঞ্জ টানবাজারে যাচ্ছে। নারায়নগঞ্জে বাস থেকে নেমে ঐ ভদ্রলোক মেয়েটিকে কৌশলে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

একই পত্রিকার ১৭/৪/৯৫ তারিখের আর এক খবরে প্রকাশ- হাতিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ১৩ বছর বয়স্কা এক কিশোরী স্কুলের উদ্দেশ্য বাড়ী থেকে বের হয়ে হাতিয়া এ, এম উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ১৫ বছর বয়স্ক এক কিশোরের হাত ধরে পালিয়ে যায়। তারা স্থানীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করে। পুলিশ ঐ কিশোরের বাড়ীতে হানা দিয়ে এই দম্পতিটিকে পাকড়াও করে স্থানীয় আদালতে হাজির করলে হাকিম কিশোরীকে জামিন দিয়ে তার পিতার হেফাজতে যেতে দেন এবং কিশোরকে হাজতবাসে প্রেরণ করেন।

স্যাটেলাইট টিভির এই জঘন্য প্ররোচনা যুব সমাজকে কতটুকু যৌন উন্মাদ করে তুলেছে উপরের ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। যেখানে ছেলেরা ছিল এতদিন মেয়ে শিকারী সেখানে এখন যৌন সংস্কৃতির প্ররোচনার কারণে মেয়েরা নেমেছে ছেলে শিকারীর ভূমিকায়। অভিনেত্রীরা অভিনয়ের নামে আজকাল নিজ দেহের নিভৃত গোপন ভাঁজকেও দর্শকের সামনে পরতে পরতে মেলে ধরছে শুধুমাত্র নিজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য। তাতে তাদের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(১) যে অভিনেত্রী যত বেশী দর্শককে মত্ত করতে পেরেছে সেই অভিনেত্রী এবং তার অভিনীতি সেই ছবি তত বেশী সফল। প্রযোজকদের কাছে ঐ অভিনেত্রীর দাম বেশী এবং তারা তাকে আরও বেশী ন্যাংটা হতে উৎসাহ দেয়।

(২) পুরুষের চোখে সেই অভিনেত্রীর কদর বেড়ে যায়। আর যৌন উত্তাপে আর্ত হয়ে সাথী বদলের নামে সে প্রতিনিয়ত একের পর এক নিত্য নতুন পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হতে থাকে। সুতরাং তার আর লজ্জা থাকে না। কামতাড়িত হয়ে ঐ অভিনেত্রীরা নিজেদের চেয়ে কম বয়সী এবং অবিবাহিত নায়কের সাথে অভিনয় করার জন্য উতলা হয়ে উঠে। জুলাই, ২০০৮ সালে অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদীর স্ত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী সুবর্না মোস্তফার ২২ বছরের বিবাহ বিচ্ছেদ এবং তার নতুন নাট্যকার স্বামী গ্রহনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

মাসিক টেলিভিশন পত্রিকার জুন ১৯৯৪ সংখ্যায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নায়িকা জানিয়েছেন– "বিবাহিত নায়কদের বিপরীতে অভিনয় করতে মুড আসেনা। নতুন প্রজন্মের প্রায় সব চলচ্চিত্র নায়কই বিবাহিত অর্থাৎ ছোবড়া হয়ে গেছে। এদের সাথে রোমান্টিক সংলাপও জমে উঠতে চায় না।"

অপরদিকে নতুন নায়িকারা নতুন নায়কদের মত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে উৎসাহি নন। অর্থাৎ তারা কারো দখলভুক্ত হয়ে থাকা পছন্দ করে না। নায়িকা চম্পা চানিয়েছেন অল্পবয়সী নায়কদের সাথে অভিনয় করলে নাকি মন মেজাজ ভাল থাকে এবং এতে চেহারায় বার্ধক্যের ছাপও দেরীতে পড়বে বলে তিনি মনে করেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বেও যৌন বিষয়ক যে কথা বলতে মানুষ আড়ালে আবডালে ফিস ফাস করে বলত; অশ্লীল সিনেমা এবং স্যাটেলাইট অনুষ্ঠানের কল্যাণে এখন কোন রাখ ঢাক না করেই বৃদ্ধ যুব কিশোর কিশোরী সবাই মিলে সে বিষয়ে রসাত্মক মজলিসী আলোচনায় মেতে উঠে। তারই বিষময় ফল হিসাবে ষোড়শী লাবন্যরা যৌন মাতাল হয়ে বেশ্যার খাতায় নাম লেখাতে নারায়ণগঞ্জ ছুটে যায়। তের বছর বয়সের কিশোরী স্কুল পালিয়ে ১৫ বছর বয়েসী প্রতিবেশী কিশোরের হাত ধরে গিয়ে বিয়ে করে। একই কারণে খাল-বিল নর্দমায় ডাষ্টবিনে প্রতিনিয়ত পাপের ফসল নবজাতকের বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া যায় এবং তার সংখ্যা উদ্বেগ জনক যার খতিয়ান উপরে উল্লেখ করেছি।

টেলিভিশনে আজকাল 'অভিমত' নামে একটা মূল্যবান অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। গত ১১ই নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখের অভিমত অনুষ্ঠানটির আলোচ্য বিষয়

ছিল স্যাটেলাইট টিভি অনুষ্ঠান আমরা কিভাবে গ্রহণ করবো। অনুষ্ঠানের আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশিষ্ট কর্মকর্তা জনাব মুস্তফা মনোয়ার, বিশিষ্ট চারুশিল্পী জনাব কাইয়্যুম চৌধুরী এবং বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী আনোয়ারা সাইয়্যেদা হক।

বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকাল দেশের শহর গ্রাম গঞ্জের ঘরে ঘরে টেলিভিশনের বিস্তার ঘটেছে। শিশু-কিশোর, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় সংবাদ, বিশ্ব সংবাদ, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, বিদ্যা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি হাজরো বিষয় উপভোগ করেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। এমন একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যমে পরিবারের সকলে যখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, যুবক-কিশোর-বৃদ্ধ সহকারে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন এমনি সময়ে যদি টেলিভিশনের পর্দায় নর-নারীর যৌন সঙ্গমের বা শৃঙ্গারের দৃশ্য ভেসে উঠে তখন স্বামী-স্ত্রী, সোমত্ত পুত্র-কন্যা, পুত্রবধু চাকর-চাকরানী পরিবেষ্টিত আনন্দ বিভোর পরিবারটির যে মানসিক বিপর্যয় ঘটে তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অভিমত অনুষ্ঠানের আলোচক আনোয়ারা সাইয়্যেদা হক এই কথাটিই স্পষ্ট করে বুঝাতে চেয়েছেন। দিনের পর দিন যদি ঐ ধরনের সঙ্গম এবং শৃঙ্গারের দৃশ্য যুবক-যুবতীদের চোখ জলসাতে থাকে তবে তাদের সংযমের বাধ ভেঙ্গে যেতে পারে এবং যৌন অনাচারে সমাজ জীবন সয়লাব হয়ে যেতে পারে।

আনোয়ারা সাইয়্যেদা হকের এই সহজ যুক্তি অপর দু'জন আলোচক মেনে নিতে পারেননি। তাদের মতে, প্রগতির এই যুগে ঐসব ছবি আসবেই। সেসব ছবি নিষিদ্ধ করা যাবে না। কারণ, বর্তমান সময়ে যুবক-যুবতীরা তা পছন্দ করে। আমাদের যা করা উচিত তা হচ্ছে আমাদের সন্তানদের ঐসব দৃশ্য হজম করার মত শিক্ষা দ্বারা মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দেয়া। তাদের আলোচনার ধরন দেখে আমাদের সমাজের আর এক ক্যান্সার নাস্তিক ডঃ আহমদ শরীফের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, পাশ্চাত্যের প্রাক-বিবাহ যৌনকর্মের ধারা আমাদের দেশে আসছে, এর জন্য আমাদের যুব সমাজে শিক্ষার দরকার। ঐ অনুষ্ঠানটিতেও একই কথা প্রতিধ্বনি হয়েছে দুই পুরুষ আলোচকের কণ্ঠে।

এই প্রসঙ্গে আলোচকদের পরিচয় প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করছি। কারণ তাদের মতামতরে মধ্যে তাদের পেশার প্রতিফলন ঘটেছে। জনাব মুস্ত ফা মনোয়ার বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার কাছে দর্শক আকর্ষণ এবং দর্শকের তুষ্টি বড় কথা এবং যেকোন উপায়েই

হোক তার টিভি অনুষ্ঠান জনসাধারণের কাছে আদরণীয় করতেই হবে। তাদের ঐ মনোভাবের কারণেই টেলিভিশনে গানের অনুষ্ঠান 'ছায়াছন্দ' নামে সিনেমার সবচেয়ে নোংরা যৌন উত্তেজক ছবিগুলো প্রদর্শন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গানে গানে নায়িকার যৌনাঙ্গ প্রদর্শন এবং নায়ক কর্তৃক সেসব যৌনাঙ্গ উপভোগ এবং নিপীড়নের যে দৃশ্য বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ প্রদর্শন করে থাকে তা হতেই তাদের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা যুব সমাজকে মাতাল করতে পারাকেই তাদের সাফল্য বলে মনে করেন। সুতরাং মুস্তফা মনোয়ার অভিমত অনুষ্ঠানে স্যাটেলাইট টিভি অনুষ্ঠানকে আমাদের দেশের জন্য যে প্রয়োজনীয় মনে করবেন এটা তার ব্যবসায়ির দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

দ্বিতীয় আলোচক জনাব কাইয়্যুম চৌধুরী, ইনি একজন চারুশিল্পী। ক্যানভাসে তুলি চালিয়ে মানুষের শরীরের বাঁক ভাঁজ ও ভঙ্গিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তার কৃতিত্ব। মোনালিসার ছবি এঁকে শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। এখনকার শিল্পীরাও নারীদেহের বাঁক ভাঁজের ছবি দ্বারাই মানুষকে মোহাবিষ্ট করার চেষ্টা করে থাকেন। সুতরাং কাইয়্যুম চৌধুরীর কাছে নারী অঙ্গের বাঁক ভাঁজ হচ্ছে দর্শণীয় শিল্প। সর্বোপরি জনাব কাইয়ুম চৌধুরী নিঃসন্তান। তিনি তো সন্তানাদি সহকারে টেলিভিশমনের সামনে বসেন না যে, অশ্লীল ছবি দেখে বিব্রত হবেন। যদি তার যুবা বয়সের সন্তান থাকত আর অশ্লীল ছবির প্রভাবে সন্তানটি প্রেমের পাগল হত, মেয়ে হলে সে কোন যুবকের হাত ধরে যদি পালিয়ে যেত, ছেলে হলে যদি অন্যের মেয়েকে উত্যক্ত করত, কিম্বা অপহরণ করত তবেই বুঝতেন স্যাটেলাইট কাকে বলে। তাকে তো 'কভু আশী বিষে' দংশেনি!

তৃতীয় আলোচক আনোয়ার সাইয়্যেদা হক। তার প্রথম পরিচয় তিনি একজন মা। ছেলে মেয়ের শরীরে যৌবনের ছোঁয়া লেগেছে দেখলে যে মা আতঙ্কিত হয়ে উঠেন, তিনি সেই মা। সোমত্ত সন্তান পর্ণ ছবির যৌন উত্তাপে আক্রান্ত হয়ে যে কোন মুহূর্তে দিগবিদিক জ্ঞান হারাতে পারে ভয়ে তিনি শঙ্কিত থাকেন। তার দ্বিতীয় পরিচয় তিনি একজন মনোবিজ্ঞানী। সুতরাং তার যুক্তি ছিল অত্যন্ত বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিক।

আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষিতে স্যাটেলাইট অনুষ্ঠান আমাদের যুব সমাজের উপর যে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে এবং ফেলে চলেছে তাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই আলোচক তা বুঝতে এবং স্বীকার করতে চাননি। এমনকি সমাজে প্রতিনিয়ত মানুষের

যে কন্যাহরণ, ভগ্নিহরণ, এমনকি স্ত্রীহরণ, অবশেষে ধর্ষণ, খুন, এসিড নিক্ষেপের ঘটনাগুলো ঘটছে তার কারণ যে স্যাটেলাইট অনুষ্ঠান প্ররোচিত যৌন উত্তাপ, এসব কিছু দেখে শুনেও প্রথমোক্ত আলাচক দু'জন পরোক্ষে স্যাটেলাইট অনুষ্ঠানর পক্ষেই বক্তব্য রেখেছেন। তার কারণ তারা বুদ্ধিজীবি। সুতরাং উদারপন্থী এবং তা সংস্কৃতির নামে যৌনক্ষেত্রেও।

আসলে আমাদের সমাজে একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ আছে যারা উচ্চশিক্ষত হয়েই নিজেকে বুদ্ধিজীবি মনে করে ফেলেন। বুদ্ধিজীবিতা প্রচারের জন্য তিনি প্রগতির বক্তৃতা দিতে আর প্রগতির পরীক্ষায় পাসের জন্য এবং বুদ্ধিজীবির খাতায় নাম লেখাবার জন্য তিনি নাস্তিকতার প্রচার করতে শুরু করেন এবং অচিরেই স্বীকৃত বুদ্ধিজীবি হয়ে যান। এরা মানুষের নৈতিক পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না এবং সংস্কৃতির সকল প্রকার অনাচারকে প্রগতি হিসেবে গণ্য করে অথচ মানুষ আত্মরক্ষার জন্য, সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এদেরই দ্বারস্থ হয়।

বুদ্ধিজীবিদের উদারনীতির কারণে প্রশাসন যন্ত্রও স্থবির হয়ে দুস্কৃতকারীদের পক্ষাবলম্বন করতে বাধ্য হয়। কারণ প্রশাসনে যারা আছেন তারা তো চাকুরী করেন। হাজারো ঘটনার মধ্যে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি:

সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী ভাড়ুখালি গ্রামের মাজেদ সরদারের ১৩ বছর বয়স্কা কন্যা শাহানাকে ২৬ শে জুন ১৯৯০ তারিখে কজন দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। শাহানার বাবা থানায় মামলা দিলে (মামলা নং ২৯ তারিখ ২৬ জুন ১৯৯০) তিন আসামী ধরা পড়ে। কিন্তু পুলিশ আসামীদের কাছ থেকে শাহানার হদিস বের করার পূর্বেই তৎকালীন এক মন্ত্রী ও এমপির চাপে আসামীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং মামলাও বন্ধ হয়ে যায়। শাহানার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। মামলা করার অপরাধে দুর্বত্তরা শাহানার বাবার ধানগোলা পুড়িয়ে দেয় এবং হুমকি দেয়, বেশি বাড়াবাড়ি করলে শাহানার অপর বোনকেও উধাও করে দেয়া হবে। ধমক খেয়ে শাহানার বাবা চুপসে যান এবং বুঝতে পারেন তিনি বিচার পাবেন না। সরকারী জমিদারদের কাছে তিনি বড় অসহায়। তার কারণ আসামীরা এমপি সাহেবের আত্মীয়। সুতরাং বুদ্ধিজীবী মন্ত্রী এবং এমপির ভয়ে প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়ে আর মজলুম অসহায় হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা এখানে শেষ হয়েও শেষ হল না। ঘটনার সাড়ে চার বছর পর ২৫শে নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখ এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়।

ঐ দিন সাতক্ষীরার এক লোক গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া পতিতালয়ে গেলে শাহানার সাথে পরিচয় হয়। শাহানা জানায় সে পতিতালয়ে বিক্রি

হয়েছে। শাহানার অনুরোধে ঐ লোকটি শাহানার বাবাকে ও পুলিশকে সংবাদটি জানায়। ২৮শে নভেম্বর পুলিশ শাহনাকে উদ্ধার করে আনে এবং একজন আসামীকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করে নতুন করে মামলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। সাপ্তাহিক বিচিত্রার ৬-১-৯৫ তারিখের সংখ্যায় এ ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু কে জানে বিচার সম্ভব হয়েছে কিনা। কারণ সেই মন্ত্রী আর সেই এমপি তো মারা যায়নি। তারাতো আসামীর আত্মীয়, শুভাকাঙ্খী, বুদ্ধিবীবি এবং তাদের কাছে নারীহরণ ধর্ষণ বা পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু কখনও শিল্প আবার কখনও বৃত্তি। এ কারণে অশ্লীল সিনেমা এবং স্যাটেলাইট অনুষ্ঠান বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য জীবন মরণ সমস্যা হলেও তাদের কাছে আজকাল সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনেই বোগাটার গরিলার মত আমাদের সামাজের উপর পর্ণ থেরাপী প্রয়োগ করা হচ্ছে।

গাদ্দার

ডিসেম্বর মাস, মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের মাস, বাংলাদেশীদের স্বাধীনতার মাস। একাত্তরের নয় মাস যে মুক্তিযোদ্ধারা জানবাজি রেখে যুক্তিযুদ্ধ করেছিল তারা রাইফেল, গুলি, গ্রেনেড, কাদা, পানি, ঝোপ, জঙ্গল, নদী ও নৌকা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু ভাববার ফুরসত পায়নি। তাদের যুদ্ধ বিপর্যস্ত শরীরের জন্য বারুদের গন্ধ, মাঠের ধূলা, পুকুরের পানি, জঙ্গলের পোকা মাকড়ের চেয়ে পুষ্টিকর আর কিছু সহজলভ্য ছিল না। তাদের মন-মানসিকতায় সামনে- পেছনে চিন্তা-চেতনায় শুধু একটিই উদ্দেশ্য ছিল, হানাদার খেদাও, হানাদার খেদিয়ে দেশ স্বাধীন করতে হবে। কিন্তু স্বাধীন হয়ে কি করবে, অতসব চিন্তা করার মত সময়, মন-মানসিকতা তাদের ছিল না।

আর এক ধরনের রিফিউজি মুক্তিযোদ্ধা ছিল, যাদের নাকে কোনদিনও গ্রেনেড বা গুলি-বারুদের গন্ধ লাগেনি। যারা সর্বক্ষণ কাদা, পানি, ঝোপ-জঙ্গলকে ভয় করেছে। এরা পশ্চিম বঙ্গের রিফিউজি ক্যাম্পে কিম্বা কলকাতা বা আগরতলার আনাচে কানাচে শুয়ে বসে রিলিফ খেয়েছে, মদ খেয়েছে, তাস খেলেছে আর দেশ স্বাধীন হলে পর কি করবে সেই পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে তাদের মনে কোন যুক্তির স্থান ছিল না। রাত্রির অন্ধকার নামতে দেখলে চোর সাধারণত চুরির পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাত্রির নীরবতা নামতে দেখলে সাধক তার সাধনার চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যেকোন সুযোগকে কাজে লাগাতে মানুষ তার নিজ নিজ মানসিকতা অনুযায়ী পরিকল্পনা করে থাকে।

ক্যাম্পবাসী স্বঘোষিত মুক্তিযোদ্ধারাও তেমনি আহার-বিহারে, শয়নে-স্বপনে নিজ নিজ মন-মানসিক অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য তাদের করণীয় কর্মপন্থা ঠিক করেছে। যেমন:

১। একদল ছিল যারা ভেবে রেখেছিল পাকিস্তানীদের তাড়াতে পারলে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যাবে বঙ্গদেশ। পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলার মাঝখানকার সীমারেখা এমনভাবে মুছে ফেলা হবে যেমন করে ১৯১১ সালে একবার মুছে ফেলা হয়েছিল। তার ফলে দুই বাংলায় যারা ১৯৪৭ সনে মোহাজের হয়েছিল তারা পূনঃ স্ব-স্ব বাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২। দ্বিতীয় একদল ভেবে রেখেছিল দুই বাংলা এক করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাতে দেশটির অবস্থা হবে ইসরাইল আর ফিলিস্তিনের মত

নিত্য কোন্দলের আড্ডাখানা। তদুপরি পূর্ব বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর ভার-বোঝা পশ্চিম বাংলার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তা মঙ্গলজনক হবে। বিশেষ করে এই জনগোষ্ঠী নিষ্কর্মা, বিলাসপ্রিয়, সহজে বশীকরণযোগ্য এবং কোন্দলপ্রিয়। যে কারণে পাকিস্তানীরা সংখ্যালঘু হয়েও পূর্ব-বাংলার এই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও বঞ্চনা করে গেছে। সুতরাং পূর্ব-বাংলাকে পূর্ব-বাংলার সত্তায় প্রতিষ্ঠিত রেখে পশ্চিম বাংলা তার উপর পাকিস্তানী কায়দায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এবং এটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

৩। তৃতীয় আর একদল ভেবেছিল, পাকিস্তানীরা চলে গেলে কলকারখানাগুলি অচল হয়ে পড়বে। বিলাসপ্রিয় নিষ্কর্মা বাংলাদেশীরা কারখানার মেশিনগুলি লোহালক্কড় হিসাবে বেচে খাবে। এদিকে তাদের দুর্বলতার সুযোগে ভারত ফারাক্কা বাঁধ চালু করে দিলে পূর্ব-বাংলায় মরু প্রক্রিয়া শুরু হবে। শিল্প পণ্য এবং কৃষি পণ্যের ঘাটতি দেখা দিবে। সুতরাং পূর্ব বাংলাকে মাছ, ডাল, চাল, পিয়াজ, রশুন, তেল, সাবান, স্নো, পাউডার, থালা, ঘটিবাটি এমনকি হালের গরুর জন্যও ভারতের দ্বারস্থ হতে হবে। সুতরাং এই শ্রেণীটির পরিকল্পনা ছিল তারা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর ব্যায়বহুল শাসনভার হাতে নিয়ে নিজ খাজাঞ্চিখানার ফতুর করার চেয়ে এদেশটিকে ভারতের বাজার হিসাবে ব্যবহার করে তাদের খাজাঞ্চিখানার উদর ভর্তি করার ব্যবস্থা করবে।

৪। চতুর্থ দলটির পরিকল্পনা ছিল যথাসম্ভব সঙ্গোপনে শিক্ষার মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়ে মুসলমানী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ নষ্ট করে দেওয়া। তার ফলে পুরা সমাজ ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হবে, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে আর পরবর্তী প্রজন্ম ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আগ্রাসনহেতু পশ্চিম বাংলার সাথে আপনা আপনি মিশে যাবে।

ঐ চারটি দল স্বাধীনতার পর পরই মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐ দলগুলি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই সিক্সটিন ডিভিশন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিশে গিয়ে জুয়েলারী দোকানের নকল হীরার মত জ্বল জ্বল করছে। জুয়েলারীর দোকানের নামে আছে ডায়মন্ড জুয়েলারী সপ, দোকানে ঢুকলে থরে থরে সাজানো অলংকারের চোখ ধাঁধানো হীরার দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়। কিন্তু যতই ঝলমল করুক না কেন, পরীক্ষা করলে দেখা যায় একটিও হীরা নয়, সবই নকল হীরা। দোকানীকে জিজ্ঞাসা

করলে সে জানায় আসল হীরা সিন্দুকে রাখা আছে, দামী জিনিস অমন খোলাখুলি শো কেসে রাখা যায় না।

ভারতের টিভি সিরিয়াল নাটক 'রামায়ন' এবং অন্য আরও বহু নাটকে ছায়াছবিতে নায়িকারা রামভার্যা সীতার অভিনয় করে বিখ্যাত হয়েছে। লোকচক্ষুর সামনে তারা অর্থ সম্পদ ও খ্যাতিতে জ্বল জ্বল করছে। যারা সীতার অভিনয় করে মানুষের চোখে মনে অমন দাগ কাটল আসলে তারা কি সীতার মত সতী হতে পেরেছে? মনে রাখা প্রয়োজন যে সীতার মত সতী যারা তারা সতীত্বের অভিনয় করার জন্য সতীত্ব খোয়াতে কখনোই যায় না। কারণ আমরা জানি বলিউডে বড় মাপের নায়িকা হতে হলে প্রথমেই সতীত্ব খোয়াতে হয়। আর প্রকৃত সীতারা লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের নিভৃত নিবাসে দুঃখ দারিদ্র নিয়ে দীন হীন জীবন যাপন করে থাকে। যা হোক!

মুক্তিযোদ্ধার বাজারেও তেমনি শহর, বন্দর, অফিস-আদালতে নকল মুক্তিযোদ্ধারা চাকুরি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে জনসমক্ষে জ্বল জ্বল করছে। এরা সিক্সটিন ডিভিশনের সহযোগে শিক্ষা ক্ষেত্রে, চাকুরী ক্ষেত্রে, ব্যবসা ক্ষেত্রে, সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। আর খাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের বেশীর ভাগই নিভৃত পল্লী অঞ্চলে খেয়ে না খেয়ে জীবনটাকে নিয়ে টানাটানি করছে। বহু পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ভিক্ষা করার ও রিক্সা চালাবার খবরও পত্রিকায় দেখা গেছে।

পাঠক! যারা মুক্তিযুদ্ধ করে ভারতের ক্যাম্পে বসে রিলিফ খেয়েছে আর আড্ডায় বসে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য করণীয় কর্মের দুষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করেছে, তাদের আড্ডা ডিভিশান নাম দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আশা করছি সিক্সটিন ডিভিশন সম্পর্কে আপনাদের স্মরণ আছে। এরা মুক্তিযোদ্ধের নয় মাস ঘরে বসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রঙ্গ-রস করে বলা গরম খবর শুনেছে, গল্প-গুজব করে দিনমান ক্ষেপন করেছে। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্ত ানীদের আত্মসমর্পনের দিন পাক সেনাদের পরিত্যক্ত রাইফেল কাঁধে নিয়ে জয় বাংলা শ্লোগান মুখে নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে মুক্তিযোদ্ধা উপাধি ধারণ করছে এবং বিবিধ সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে। এরাই সিক্সটিন ডিভিশনের মুক্তিযোদ্ধা।

সিক্সটিন ডিভিশন এবং আড্ডা ডিভিশনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সিক্সটিন ডিভিশন ওয়ালারা দেশের মাটিতে বসে নির্বিকারভাবে নিজের খেয়ে স্বাধীন বাংলা বেতর কেন্দ্রের সরস খবর শুনে গল্প গুজবে দিন কাটিয়েছে, আর আড্ডা ডিভিশনটি সীমান্তের ওপারে বসে পরের ঘরে বসে পরের খেয়ে স্বাধীন

বাংলা বেতারের খবর শুনেছে আর বাংলাদেশের জন্য উপরোল্লিখিত চার রকমসহ বহু নষ্ট ফন্দি এটেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে সিক্সটিন ডিভিশন ওয়ালারা যেমন নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাইফেল কাঁধে নিয়ে মাঠে নেমেছিল, তেমনি আড্ডা ডিভিশন ওয়ালারা দেশে ফিরে কলম ও ধোলাইকৃত মগজ নিয়ে অফিস আদালত শিল্প, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে আসন দখল করে বসে নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্তর্ঘাতমূলক গাদ্দারীর কাজ শুরু করে দেয়।

প্রথম দলের যারা ভেবেছিল, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে গেলে দুই বাংলার সীমারেখা মুছে ফেলে পুনঃ বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা ছিল উচ্চশিক্ষিত অজ্ঞান মানুষ। তাই তারা স্বাধীন বাংলাদেশে আসার সময় সাথে করে পশ্চিম বঙ্গ হতে কিছু বাস্তুহারাকে হিন্দুর ফেলে যাওয়া ভিটায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তা অসম্ভব দেখে তারা নিজে থেকেই ফিরে গেছে। ঐ দলটি তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়নি। তারা পশ্চিম বাংলার শিল্প সাহিত্য-সঙ্গীতের মহিমা কীর্তন করে আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করছে বাংলা সংস্কৃতির মূল রয়েছে পশ্চিম বাংলায়, আর আমরা হচ্ছি ডাল-পালা। সুতরাং পশ্চিম বাংলায় প্রোথিত মূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে আমাদের ভাষা সংস্কৃতি বাঁচবে না।

ঐ কথাটি প্রমাণ করার জন্য তারা এদেশে কবিতা উৎসব করছে, সাংস্কৃতিক উৎসব করছে আর তাতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে 'ওম শান্তি ওম শান্তি' বলে 'মহাশয় নমস্কার' শব্দ ব্যবহার করে সংস্কৃতি চর্চার মূলের মহড়া দিয়েছে। এরা হিন্দুর কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে বোন বিয়ে দিয়েছে, ঈদের দিন ধূতি-পাঞ্জাবি পরে কোলাকুলি করছে। তারা কাব্যে সাহিত্যে বক্তৃতায় আযান, মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতি কটুক্তি করেছে। কিন্তু নায়ের মাঝি অশ্লীল ভাষায় সারি গান গাইলেও যেমন নদীর পানির ক্ষতি হয় না, পানির চরিত্র নষ্ট হয় না তেমনি তাদের ঐসব ক্রিয়াকর্ম দেশবাসীর চরিত্রের উপর রেখাপাত করেনি। বরঞ্চ তাদের নিজেদেরই জঘণ্যতম নিকৃষ্ট চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে।

কিন্তু বেহায়াদের যেমন ধিক্কারে ছিক্কারে লজ্জা হয় না এদেরও তেমনি দেশবাসীর হাজার ধিক্কার ছিক্কারেও লজ্জা হয়নি। এরা ভারতীয় কাম বৃটিশ নাগরিক লর্ড মেঘনাদ জগদীশ চন্দ্র দেশাইকে ডেকে এনে এদেশের মানুষকে নসিহত করেছে ১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগ নাকি এক ঐতিহাসিক ভুল ছিল। (৪ মে ৯৪ তারিখে শেরে বাঙলা নগরস্থ জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল হলে

অনুষ্ঠিত '২১ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর অর্থনীতি সম্পর্কিত সেমিনার।)

২১শে এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখে বাঙালী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র আয়োজিত পঞ্চদশ শতাব্দী বরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে অভিনেতা কাম ঘাদানি সদস্য সৈয়দ হাসান ইমাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলো বিরাট উপ-মহাদেশটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। অথচ আমরা চেয়েছিলাম একত্রে থাকতে। ভবিষ্যতে যে এক হওয়া সম্ভব নয় তা বিশ্বাস করি না।

১৯৭২ সন হতে পশ্চিম বাঙলার সাথে বাংলাদেশ তথা ভারতের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ প্রতিনিয়ত এই হা-হুতাশ প্রদর্শন করে চলেছে। যেকোন ছল ছুতায় কথার সূত্র খুঁজে পেলেই তারা ঐ হা-হুতাশ শুরু করে এবং ভারতীয়রা বার বার এসে সেই সূত্র পত্তন করে দিয়ে যায়। যেমন– ১৯৯২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা শীর্ষক এক সেমিনারে ভারতীয় কংগ্রেস নেতা এবং দেশবন্ধু পত্রিকার সম্পাদক মায়ারাম সার্জন কান্নাকাতর– কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন ইউরোপ যদি এক হতে পারে তাহলে আমরা কেন ৪৭ এর পূর্বাবস্থায় অখন্ড ভারতে ফিরে যেতে পারব না। উপরোল্লিখিত অভিনেতা কাম ঘাদানি সদস্য হাসান ইমাম মায়ারাম সার্জনের এই কথাটিই নকল করেছেন মাত্র। একই সময়ে গাদ্দারের দালাল আর এক মহিলা কবি কাব্য লিখেছেন:

সাতচল্লিশ নামের কাঁটা গলায়
বিঁধেছে, এই কাঁটা আমি
গিলতে চাই না
উপড়ে দিতে চাই,
উদ্ধার করতে চাই আমার
পূর্ব পূরুষদের অখন্ড মাটি।

১৯৪৭ সনে এই মহিলাটির জন্মই হয়নি, অথচ তার গলায় সাতচল্লিশের কাঁটা বিধল? আসলে দেশে এক ধরনের গাদ্দার আছে, তারা ভীমরুলের মত মানুষের গায়ে দেশদ্রোহিতার হুল ফুটাচ্ছে আর বলছে এটা সাত চল্লিশের কাঁটা। ভারতের সাথে এক হয়ে গেলেই নাকি এক কাঁটা আপনা আপনি বের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দলের যারা পাকিস্তানী কায়দায় বাংলাদেশের উপর ভারতীয় কর্তৃত্ব কামনা করেছে, তারা স্বাধীনতার সাথে সাথেই ভারতের সাথে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি সম্পাদন করে তাদের কর্তৃত্বের পথ প্রশস্ত করেছে।

ভারতীয় ব্যাংকার আর স্যাকরাদের ডেকে এনে আমাদের মুদ্রামানের বারটা বাজিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার দাম এমনভাবে স্থির করেছে যাতে ভারতীয় মালামালের কালোবাজারী এবং চোরাচালানী লাভজনক হয়। ফলে বাংলাদেশে রফতানী বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে দেশটি পরনির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় দলটি তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই অবাঙ্গালীদের ফেলে যাওয়া মহামূল্যবান কলকারখানাগুলির প্রশাসনভার হাতে তুলে নেয়। বাসার চাকর-চাকরানী যেমন করে গৃহকর্তার বইয়ের আলমারী হতে মূল্যবান বইপত্র, এমনকি সাহিত্যের পান্ডুলিপি কিম্বা বাড়ীর প্ল্যান পর্যন্ত সের দরে ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করে চানাচুর কিনে খায়, ঐ কারখানা দখলকারী আনাড়িরাও কারখানার মেশিনপত্রগুলি সের দরের মত বিক্রি করে বিলাসিতা করছে। তাদের কেউ বিয়ের শাড়ি, তেল, সাবান কিনতে কলকাতা গেছে। কেউ ফ্রিজ, টিভি কিনেছে।

ওদিকে ভারত ফারাক্কা বাঁধ চালু করে দেশের বিশাল অংশকে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে। তদ্বারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। শস্য শ্যামল মাছ-ভাতের প্রাচুর্যের এই দেশে আজ ভারত হতে হাজার হাজার ট্রাক বোঝাই হয়ে পিয়াজ, রশুন, আদা, জিরা, মাছ, ডিম, দুধ, তেল, সাবান, স্নো, পাউডার, ম্যাচ, লজেন্স, বিস্কুট, চানাচুর, আচার আসছে।

শুধু তাই নয়, যে ভারতে গো হত্যা নিষিদ্ধ, যে ভারতে মুসলমানদের গরু কোরবানী দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ, সেই ভারত হতেই ভ্যান গাড়ী বোঝাই হয়ে আসছে গরুর গোস্ত। তাতে আড্ডা ডিভিশন মুক্তিযোদ্ধারা খুশি। প্রতি বছর ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি হয় হাজার হাজার কোটি টাকা।

১৯৯৩ সনের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে সাউথ এশিয়ান প্রিফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য, শিল্প বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক সার্ক জোট গড়ে তোলাই ছিল সাপটার উদ্দেশ্য।

কিন্তু সাপটার প্রথম বছরেই তথা জুলাই ৯৩ হতে জুন ৯৪ পর্যন্ত সার্ক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৮০০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১৫৬৭ কোটি টাকা। প্রতি বছরই এ ধরনের হাজার হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হয়ে থাকে। এর কারণ আমাদের কৃষিপণ্য এবং শিল্প পণ্যে ঘাটতি। এই ঘাটতির পেছনের কারণ হচ্ছে

কৃষিখাতে ফারাক্কা বাঁধ আর শিল্পখাতে শ্রমিকের রাজনীতি, হরতাল, ঘেরাও ইত্যাদি। এর সবটুকুই আড্ডা ডিভিশনওয়ালাদের চক্রান্তের ফসল।

তারা শ্রমিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে কারখানার উৎপাদন ধ্বংস করছে, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধের ডাক দিয়ে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দিয়ে দেশকে পরনির্ভরশীল করে দিচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যর মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে দেখে তারা বাংলাদেশ আর পশ্চিম বাংলার সীমানা মুছে ফেলার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কৌশল হিসেবে তারা ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য নৌ ট্রানজিট এবং রেলওয়ে ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার।

তদ্বারা বাংলাদেশের নদীতে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় জাহাজ চলাচলের সুবিধা পাবে। বাংলাদেশের রেল লাইন দিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মালামাল পরিবাহিত হবে। এসব পরিবহন এবং মালামালের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে নদীর দুই তীরে, রেল লাইনের দুই পাশে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন হবে। সৈন্যদের জন্য বিশালায়তন সেনানিবাস তৈরী হবে, সৈন্যদের জন্য ফ্যামিলী কোয়ার্টার তৈরী হবে, এসবের প্রশাসনের জন্য হেড কোয়ার্টার তৈরী হবে।

সুতরাং সুদীর্ঘ নদী পথ ও রেল পথের দুপাশে বহু মিনি দূর্গ গড়ে উঠবে এবং সে সব দূর্গের নিরাপত্তার ছুতা-নাতা ধরে আশপাশের নিরীহ জনপদের উপর হামলা হবে এবং মেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার প্রশ্নে গ্রামের পর গ্রাম দখল হবে। ইংরেজরা মোগল সম্রাট শাহজাহানের নিকট হতে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্যের জন্য ফরমান নিয়েছিল। সেই ফরমান বলেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করে নিয়েছিল।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে সুতানটি গ্রামে বসবাসকারী ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি মাত্র দূর্গ তৈরী করেছিল। এই দূর্গটি হতে আক্রমন চালিয়েই তারা পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করেছিল। যারা ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ তৈরীতে ইংরেজকে উৎসাহিত করেছিল, যারা ইংরেজকে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের পরিকল্পনা করে দিয়েছিল এবং যারা ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তাৎক্ষণিক পরাজয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তারা সবাই ছিল নবাবের অতি কাছের মানুষ, আপনজন, রাজনৈতিক সভাসদ, দেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবি।

ঐ গাদ্দারেরা সিরাজউদ্দৌলার আমলে গোলামীর রাস্তা তৈরী করেছে, তারা টিপু সুলতানের আমলে গোলামীর রাস্তার অবশিষ্টটুকু সম্পন্ন করেছে। বুদ্ধিজীবীর আলখেল্লার আবরণে এটাই তাদের পেশা, যুগ যুগ ধরে তারা এই একই কাজ করে আসছে। আজকের বাংলাদেশেও তারা রাজনীতিকের বেশে বুদ্ধিজীবীর বেশে, অফিস-আদালতে কর্মকর্তার বেশে গোলামীর রাস্তা তৈরির কাজে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই আড্ডা ডিভিশন গাদ্দার রাজনীতিক বুদ্ধিজীবীরাই ভারতকে নৌ ট্রানজিট, রেল ট্রানজিট ও বন্দর সুবিধা দেওয়ার জন্য মাঠে ময়দানের বক্তৃতায় সরকারকে ধমকাচ্ছে। অফিস-আদালতে কর্মরত আড্ডা ডিভিশনের গাদ্দার কর্ম-কর্তারাই আমাদের কাছিমের ডিম, ইউরিয়া মিশ্রত চাল, চিনি, গরুর গোস্ত, রুই মাছ ইত্যাদি খাওয়ানোর জন্য অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় ভারতীয় পণ্য আমদানীর লাইসেন্স ইস্যু করে চলেছে। তদ্বারা তারা আমাদের কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ধ্বংস করে বৈদেশিক বাণিজ্যকে পঙ্গু করে দিয়ে দেশের মানুষকে বেকারত্ব ও দারিদ্রের দিকে তাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

চতুর্থ দলের আড্ডা ডিভিশনরা একটা নির্লজ্জ বেহায়া দল। এরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক পেশার মানুষ হওয়ার কারণে এদের প্রচার এবং প্ররোচনা দুটোই সুদূরপ্রসারী। এদের বেশীর ভাগই শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির সাথে জড়িত। এ কারণে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিকে এবং শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকে খুব সহজেই প্ররোচিত করতে পারে। এই সুবিধাটাই তারা স্বজাতি, স্বধর্ম এবং স্বদেশের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো এবং পরধর্ম ও পরজাতি-প্রীতি প্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করছে। কিন্তু তারা জানে যে সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারণে তাদের বক্তব্য মানুষের কাছে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। এ কারণে তারা মুসলমান হয়েও সংখ্যালঘুদের সংগঠন 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদে' যোগ দিয়েছে এবং ঐ সংখ্যালঘুদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলে। সংখ্যালঘুরা যেমন বাংলাদেশী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের পশ্চিম বঙ্গীয় মনে করে, এই আড্ডা ডিভিশনওয়ালারাও তেমনি বাংলাদেশে তাদের স্বজাতি স্বধর্মী সকল মুসলমানকে মৌলবাদি আখ্যা দিয়ে ভ্রুকুটি করে। এরাই এদেশে মৌলবাদ শব্দের আমদানীকারক।

স্বাধীনতার পূর্বে মৌলবাদ ফতোয়াবাজ ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে এদেশের মানুষের কোন ধারনাই ছিল না। প্রবীণেরা মঙ্গল প্রদীপ কাঁসর ঘন্টা, ধূপ ধূনা ইত্যাদির কথা ভুলেই গিয়েছিল এবং নতুন প্রজন্ম এগুলো জানতই না। আড্ডা ডিভিশনওয়ালারা আজ সঙ্গীত সন্ধ্যা, সাংস্কৃতিক উৎসব ইত্যাদি নানা

ছল ছুতার উৎসবের আয়োজন করে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিধান করে কাঁধে চাদর ঝুলিয়ে ঐসব উৎসবে হাজির হয়। সেখানে তারা পরস্পরকে নমস্কার জানায়, মহাশয় নামে সম্বোধন করে। তারা সেখানে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে 'ওম শান্তি' উচ্চারণ করে বন্দনা সঙ্গীত গীত করে। এমনি করে তারা নতুন প্রজন্মের অন্তরে যে সংস্কৃতির বীজটি বপণ করে প্রজন্মের যৌবনে সেই বীজটি পল্লবায়িত হয়ে মহীরুহের আকার ধারণ করবে, প্রজন্ম তখন আবিষ্কার করবে তার মধ্যে আর হিন্দুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের প্রজন্মের মন-মানসিকতার মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহাদেব প্রীতি স্থাপনের জন্য তারা পশ্চিম বঙ্গ হতে বাল্যশিক্ষা আমদানির ব্যবস্থা করেছে। খবরে প্রকাশ, এ ধরনের প্রচুর বাল্যশিক্ষা এদেশে আসছে এবং সেসব বাল্যশিক্ষার ছড়ার মাধ্যমে হিন্দুর দেব-দেবীকে শিশুদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শুধু তাই নয়। এতদিন আমরা দেখেছি ভারতীয় শাড়ী ও প্রসাধনী না হলে আমাদের দেশের মেয়েদের মন ভরে না, বিয়ের বাজার করার জন্য কলকাতায় যেতে দেখেছি। কিন্তু এখন দেখছি শিশুর হাতে খেলনা, লজেন্স, চকলেট দিলেও সে জিজ্ঞেস করে, এটা বিদেশী কি না, তার জন্য জামা, জুতা কিনে আনলে সে জিজ্ঞেস করে, এটা বিদেশী কি না। যদি বলি হ্যাঁ এটা বিদেশী, তবে সে খুশি হয়, আনন্দে নাচে। আর যদি বলি দেশী, তবে সে নাক সিঁটকায়, মন ভার করে, মুখ কালো করে। অর্থাৎ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আড্ডা ডিভিশন গাদ্দাররা আমাদের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার জন্য সাঁড়াসী আক্রমন চালিয়েছে। এ কারণেই শিক্ষিত প্রজন্ম ইতিমধ্যেই অনেকটুকু প্ররোচিত হয়ে পড়েছে।

আমরা ঢালাওভাবে বলে থাকি ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত শহীদের সঠিক সংখ্যা বের করতে পারিনি এবং সেই চেষ্টাও করিনি। তেমনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরও সঠিক হিসেব আজ পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ সিক্সটিন ডিভিশন এবং আড্ডা ডিভিশনওয়ালারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকল হিসেব ভন্ডুল করে দেয়।

বিয়ের বয়স

১৮ই অক্টোরব ৯৩ তারিখে ১২ বছর বয়সের এক স্কুল ছাত্রীর পলায়ন মামলার শুনানি কালে মাননীয় চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– আমাদের দেশে কারও প্রাপ্ত বয়স নির্ধারণের জন্য আইনের সংশোধন করে ১৮ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর করা উচিত। কারণ হিসেবে তিনি অবশ্য আবহাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ, আমাদের দেশের মত নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলীর আবহাওয়ার ছেলে-মেয়েদের অল্প বয়সেই যৌবন প্রাপ্তি ঘটে বলে বৈজ্ঞানীকেরা মনে করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে কোপেনহেগের বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বলেছেন মাতা-পিতার কাছে অবহলিত শিশু কিশোররা তাড়া-তাড়ি বয়ঃসন্ধিকাল পৌঁছায়। এসব শিশুই ইচড়ে পাকা হয়ে থাকে। ডেনমার্কের গবেষকরা ৯ বছর থেকে বয়ঃসন্ধিকালের ৭ শতাধিক শিশু কিশোরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। তারা বলেন অবহেলিত শিশুর বেড়ে উঠার প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং পরবর্তি জীবনে এর প্রভাব দেখা দেয়।

কিন্তু যৌবন প্রাপ্ত হলেই মানুষ কামতাড়িত হয়ে পড়তে পারে না। ছেলেরা এসময় মেয়েদের প্রতি একটু আকর্ষন অনুভব করে বটে, কিন্তু সাধারণত কামতাড়িত হয় না। মেয়েদের ব্যাপারটা অকটু অন্যরকম। ১২ হতে ১৬ বছরের মধ্যে মেয়েদের রজোস্রাব ঘটে এবং রজোস্রাবের সাথে সাথেই ডিম্ব প্রস্ফুটিত হয়। ঐ ডিম্বটি বিস্ময়কর এক ঐশ্বরীক উপায়ে মনুষ্য বংশ বিস্তারের জন্য মেয়েটিকে যৌন তাড়নায় বিচলিত করে তোলে। মেয়েটি গভীরভাবে পুরুষ সান্নিধ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এসব যৌন চেতনা, যৌন আগ্রহ, যৌন তাড়নার সবটুকুই মানুষ বাল্যকাল হতে ধর্ম পুলিশের খবরদারিতে সমাজ, সংস্কার ও শিক্ষার মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে বলেই সভ্য পোশাকে আজও সমাজ বেঁচে আছে।

আসলে আবহাওয়া বলতে শুধু রোদবৃষ্টি, আলো-বাতাসকেই বুঝায় না। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদিও জীবন চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান আবহাওয়া। এই আবহাওয়াটাই আজ কলুষিত হয়ে পড়েছে, বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। যে সমাজ, সংস্কার, শিক্ষা ও ধর্মভীতি একসময় কিশোর-যুবাদের যৌন অনুভূতিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করত– সে সমাজ,

সংস্কার ও শিক্ষাই এখন ঐ যৌন অনুভূতিকে উত্তেজিত করে দিয়ে সমাজের আবহাওয়াকে কলুষিত করে দিয়েছে এবং এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম পুলিশের কথা স্বীকারই করে না।

মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য নামক ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই একসময় সমাজনীতি, শিক্ষানীতি সংস্কৃতি চর্চার রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল এবং ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা আজ আর ষোড়রিপুর নিয়ন্ত্রণের কথা বলে না। বরং নাস্তিক শিক্ষক-সাহিত্যিকদের বর্বর মতবাদর কারণে আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ষড়রিপু প্ররোচিত হয়ে চলেছে।

আজ যেদিকে তাকাই সেদিকেই কামার্ত ছেলেমেয়েদের ভাগোয়াট, হরণ, ধর্ষণ, খুন, ক্রুদ্ধ মানুষের সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুন, লোভার্ত মানুষের হরণ, ছিনতাই, লুট, মোহান্ধ মানুষের চোরাকারবারি কালাবাজারি মদমত্ত মানুষের দর্প, দম্ভ, অহংকার ইত্যাদি দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যজিস্ট্রেটের আদালতে বহু ধরনের অপরাধের মামলা আসে। তার বেশীর ভাগই রিপুতাড়িত মানুষের দ্বারা সংঘটিত অপরাাধ বিষয়ক মামলা। মনে হয় ঐসব মামলার মধ্যে কামরিপুতাড়িত মানুষের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের মামলার আধিক্য বা অদ্ভুত প্রকৃতি দৃষ্টে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বিয়ের বয়স পরিবর্তনের কথা বলেছেন। যে মামলার প্রেক্ষিতে তিনি ঐ মন্তব্যটি করছেন তা ছিল নিম্নরূপ:

ঢাকার গেন্ডারিয়াস্থ, মনিজা রহমান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ১২ বছর বয়স্কা এক ছাত্রী ১৯৯৩ সনের ১৬ জুলাই স্কুলে যাওয়া পথে তার প্রেমিক ১৫ বছর বয়স্ক এক ছেলের হাত ধরে পালিয়ে যায়। দীর্ঘ তিন মাস পলাতক থাকার পর গত ৬ই অক্টোবর তারা আদালতে আত্মসমর্পণ করে। উক্ত সময়ে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে বলে জানায়। আদালত মেয়েটিকে তার মায়ের হেফাযতে দিতে চাইলে সে মায়ের সাথে যেতে অস্বীকার করে এবং তার স্বামীর সাথে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে।

শারীরিকভাবে এবং আর্থিকভাবে ঐ কিশোর-কিশোরীর দাম্পত্য বন্ধনের প্রয়োজন বা আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না। তবুও যে কারণে তারা পরস্পরের প্রতি আকষ্ট হয়েছে সে কারণটি প্রাকৃতিক আবহাওয়া নয়। সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার উত্তাপই এর একমাত্র কারণ। যে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি একসময় মানুষকে জ্ঞানী করত, আবেগ উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করতে

শিখাত আজ সে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি মানুষকে অজ্ঞান করছে। উত্তেজিত করছে।

আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া আজ ত্রিমুখী ইন্ধন দ্বারা তাপিত হয়ে চলেছে। তার প্রথমটি হচ্ছে পর্ণ সিনেমা, দ্বিতীয়টি পর্ণ সাহিত্য এবং তৃতীয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে ধর্মদ্রোহিতার ইন্ধন।

প্রথমত: আজকাল ভিডিও এর বদৌলতে হিন্দি সিনেমা, ইংরেজী সিনেমার নামে পর্ণ সিনেমা ছড়িয়ে পড়েছে শহর-বন্দর, গ্রাম–, গঞ্জের সর্বত্র। টিকেট কেটে তরুণ তরুণীরা প্রদর্শনী হলে গিয়ে অশ্লীল সিনেমার বর্বর দৃশ্য দেখে যৌন উন্মাদ হয়ে বেরিয়ে আসছে। শো শেষ করে অনেকেই আর বাড়ী ফিরতে পার না। ৩১ জুলাই ৯৩ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবের খবরে প্রকাশ আঠার খাদা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের ৪জন মহিলা ৩০ জুলাই তারিখ মাগুরা শহরে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছিল। কদমতলা নামক নির্জন স্থানে পৌঁছলে কিছু যুবক ঐ চার মহিলাকে আক্রমণ করে এবং গণ ধর্ষণ করে। সিনেমার প্রভাবে প্ররোচিত যৌন উত্তাপের এটা ছিল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া।

ঘরে ঘরে যেসব ভিডিও সিনেমা বিনোদন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া আরও সুদূর প্রসারী। আজকাল ঘরে ঘরে ভিসি আর আছে। দিন রাত তাতে হিন্দি ইংরেজী অশ্লীল সিনেমা চলে। তাতে নগ্ন শরীর মেয়েদের সাথে ছেলেদের চুম্বন, আলিঙ্গন সঙ্গমের ছবি প্রদর্শত হয়। এমনকি বাসর রাতের শৃংগারের দৃশ্যও তা থেকে বাদ যায় না।

ওসব দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে ১০/১২ বছরের ছেলেমেয়েরা বারে বারে পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে। তার পরপরই খবর হয় ছয় সন্তানের জনক প্রৌঢ় প্রতিবেশীর সাথে ১৩ বছরের কিশোরী মেয়ে পালিয়ে গেছে, কাজের ছেলের হাত ধরে বা গৃহ শিক্ষকের হাত ধরে গৃহকর্তার কিশোরী মেয়ে পালিয়ে গেছে, কিম্বা কাজের মেয়েটি কাজের ছেলের হাত ধরে পালিয়ে গেছে। এমনকি গৃহকর্ত্রী নিজেও সন্তান-সন্ততি ফেলে গৃহশিক্ষক বা প্রতিবেশী কারও হাত ধরে পালিয়ে গেছে। এমন বহু ঘটনা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় খবর হয়ে আসছে।

২৭শে আগষ্ট ৯৩ তারিখের ইনকিলাব পত্রিকায় নরসিংদিতে বউ পালানোর হিড়িক শিরোনামে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল। তাতে শুধু জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ৯টি বউ পালানোর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একদিনের দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে ২২ বছরের দাম্পত্য জীবন যাপনকারিনী পর্যন্ত রয়েছে।

এর পাশাপাশি রয়েছে পাপের ফসল পরিত্যক্ত নবজাতকের ঘটনা। ঐ পাপের ফসল কখনও পাওয়া যাচ্ছে নালা, নর্দমা, ডাষ্টবিন বা ক্ষেত খামারে মৃত অবস্থায়। আবার কোথাও তরুনী মাতা বেনামিতে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে প্রসব শেষে সন্তান ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে।

ভিডিও সিনেমার প্রদর্শিত যৌন শৃংগারের দৃশ্য এমনি করে ছেলেমেয়েদের নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে দিচ্ছে। তদ্বারা তাদের শৌর্য বীর্য নষ্ট হচ্ছে মেধা নষ্ট হচ্ছে, লেখা পড়ার মন মানসিকতা ও সময় নষ্ট হচ্ছে এবং সামাজিক শৃংখলা ধ্বংস হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তান আমলে নর-নারী নামের একখানা মাসিক যৌন পত্রিকা বহুদিন চেষ্টা করেও এদেশে পারেনি বাজার দখল করতে। কিন্তু এখন বেশীর ভাগ সাপ্তাহিক পত্রিকা নানা ছলছুতায় যৌন রসাত্মক আলোচনা, প্রবন্ধ, গল্প বা চিকিৎসা পরামর্শ পরিবেশন করে চলেছে। যে পত্রিকায় যত বেশী যৌন সংবাদ, উপাখ্যান আলোচনা ইত্যাদি থাকে তার কাটতি তত বেশী হয়। একারণে বেশীরভাগ সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায়ই কিছুনা কিছু যৌন আলোচনা সংযোগ করা হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদটিকেও কামোত্তেজক রমনীয় ছবি দ্বারা কলঙ্কিত করা হয় এবং তাই তার আকর্ষন। পর্ণ পত্রিকা যৌন পত্রিকা ইত্যাদি যত অশ্লীল পত্র-পত্রিকা আছে তার সবগুলোকে ছাপিয়ে এক মহিলার সাহিত্যকর্ম বর্তমানে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাড়িয়েছে। কারণ, অন্যান্য অশ্লীল পত্রিকায় যা পাওয়া যায় তার লেখায় তার চেয়ে বেশী পাওয়া যায়।

যেমন সে তার বহু পুরুষ বন্ধুর মধ্যে একজনের রাতের অভিসারের ঘটনা লিখেছে। সে লিখেছে তার বন্ধুটি নপুংসক। বন্ধুটি প্রতিরাতে তার বিছানায় এসে শোয় এবং তার বিভিণ্ন যৌনাঙ্গ নিয়ে কি কি ধরনের শৃঙগার খেলে তার নির্লজ্জ বর্ণনা দিয়েছে, যা উদ্ধৃত করার নয়। অথচ তার ঐ রচনাই সাহিত্য হয়ে বাজার গরম করেছে। এই সাহিত্য লিখে সে আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছে এবং সেই পুরুস্কার এসেছে নারীমুর্তী পুজক ও বানলিঙ্গ পুজকের দেশ হতে।

অন্যসব অশ্লীল সাহিত্যকে যদি পর্ণ সাহিত্য বলা যায়, তবে এই মহিলার লেখা সাহিত্যকে বলা যায় গণিকা সাহিত্য আর তার প্রকাশককে বলা যায় বেশ্যালয়ের ভাড়।

মহিলাটির এই গণিকা ভঙ্গির বর্ণনাদোষে সে আজ যেকোন অশ্লীল হিন্দি ছবির চেয়েও বেশী আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীরা ঐ ধরনের লেখা নিজে পড়ে, বন্ধু বান্ধবীকে পড়তে দেয়। পড়া শেষ হলে ছেলেটি মেয়েটির চোখে চোখ রেখে আলোচনায় মত্ত হয়। যেহেতু ঐ লেখিকাটির স্বামী নেই বলে বিনা বিচারে নপুংসকেরও শয্যা সঙ্গী হয়ে থাকে সেহেতু তার পাঠক পাঠিকারাও দেহভোগের জন্য স্বামী স্ত্রী হওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। সুতরাং এ ধরনের গণিকা সাহিত্যের চর্চা দ্বারা কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীদের অন্তর যৌন উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। নৈতিকতাবোধ ধ্বংস হয়, সমাজে নৈতিক অবক্ষয় এবং বিশৃংখলা দেখা দেয়।

তৃতীয়তঃ ধর্ম হচ্ছে পুলিশের চেয়ে শাক্তিশালি এক ভয়ঙ্কর শক্তি। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে মানুষ পুলিশকে ভয় করে না এবং ঘরে ঘরে পাহারা দেওয়া পুলিশের কাজও নয়। কিন্তু ধর্ম মানুষের ঘরে ঘরে গিয়েও বিছানায় গিয়েও এবং অন্তরের পরতে গিয়েও অন্তর পুলিশের মত পাহারা দেয়। যে কারণে এখনও মানুষ প্রবৃত্তির তাড়ানায় এক পা ব্যভিচারের দিকে অগ্রসর হলে ধর্মের ভয়ে দশ পা পিছায়। কারণ ধর্ম যেকোন অসৎকর্মের জন্য পাপের বিধান দিয়ে রেখেছে এবং সে পাপের শাস্তি এত কঠোর বলে জানানো হয়েছে, যার ভয়ে যেকোন ধর্মবোধসম্পন্ন মানুষ সর্বমুহূর্তে নিজের প্রত্যেকটি কর্ম সম্বন্ধে সতর্ক থাকে।

কিন্তু আমাদের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি নাস্তিক এহেন ধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই ধর্ম দ্রোহিদের প্ররোচনায় এখন কিছু মানুষ পাপকে আর পাপ বলে মনে করে না। ফলে এখন প্রবৃত্তির তাড়নায় দশ পা এগিয়ে গিয়ে মানুষ ভয়ে মাত্র এক পা পিছায়। সর্বোপরি গণিকা সাহিত্যিকেরা নিজেরাই ব্যভিচারের তালিম দিয়ে ধর্মদ্রোহী প্রবৃত্তীর দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। পাপানুষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের সকল প্রকার শঙ্কা ও সংকোচবোধ কেটে দিচ্ছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মেয়েরা।

পূর্বেই বলেছি, ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েটির রজোস্রাব হয় এবং জরায়ুতে ডিম্ব প্রস্ফুটিত হয়ে তার মধ্যে সন্তান গ্রহণের তাড়না সৃষ্টি করে। সেই ডিম্বটি তার মধ্যে মাতৃসুলভ কোমলতা এবং চঞ্চলতার জন্ম দেয়। এই কোমলতা তাকে পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলে আর চঞ্চলতার কারণে সে পুরুষের প্রতি গভীর আগ্রহ অনুভব করে। কিন্তু সমাজ সংস্কার ও নৈতিকতার বন্ধনের কারণে সে সংযমী হতে বাধ্য হয়।

আজকাল ধর্মদ্রোহী প্রচারণা, ইংরেজী হিন্দীর অশ্লীল ছবি এবং গণিকা সাহিত্যের প্ররোচনায় নৈতিকতার সেই বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে আসছে। তার ফলেই আজ ছেলেরা মেয়েদের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে আর মেয়েরা

আগ্রহভরে আত্মসমর্পণ করছে। বহু ক্ষেত্রেই মেয়েরা নিজেরাও আগ্রাসী হচ্ছে।

ছেলেটি জানে, মেয়েটিকে বাগে আনতে পারলে তৃপ্ত হওয়া ছাড়া তার লোকসানের আর কোন কিছু নেই। কিন্তু মেয়েটি জানে তার গর্ভধারণ হবে, দশমাসের জন্য সে ঘরবসা হয়ে যাবে। সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য আরও দুবছর তার পিছুটান থাকবে, তাকে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে, একটি সন্তান জন্ম হলেই তার কিশোরী লাবণ্য অন্তর্হিত হয়ে যাবে, তার মধ্যে মাতৃত্বের ছাপ পড়ে যাবে, ইত্যাদি জেনে শুনেও জৈবিক তাড়নায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য মেয়েটি চাঞ্চল হয়ে উঠে। অথচ ছেলেটির বেলায় এর কোন একটি ও ভাবনা নেই। শত সন্তান জন্ম নিলেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। সুতরাং তার জন্য চঞ্চল হতে আগ্রাসী হতে, ধর্ম ছাড়া আর কোন বাধা নেই। পর্ণ সিনেমা, গণিকা সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মদ্রোহীদের পাপহীনতার আশ্বাস পেয়ে তারা উভয়েই বেপরোয়া হয়ে উঠে।

মাননীয় চীপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিয়ের বয়স দশ বছর করার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে অল্পবয়সী মেয়েরা যৌন পাগল হয়ে ভাগোয়াট হওয়ার সুযোগ না পায়। কিন্তু খবরে প্রকাশ দশ বছরের কম বয়সের মেয়েরাও আজকাল দেহদান করছে।

২৮শে জুলাই ১৯৯১ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবে "নাবালিকা মেয়েরা নানা অপরাধের শিকার" শিরোনামে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে খুলনা থেকে ঢাকাগামী গাজী রকেটে হুলারহাট থেকে বিউটি, রেখা, সুমা ও কল্পনা নামে চারটি শিশু কন্যা উঠে। তাদের বয়স ৭, ৮, ৯ বছর। এরা দারিদ্রের কারণে পিতা-মাতা কর্তৃক যে অবহেলিত তাদের দেখেই তা বুঝা যায়। জনৈক যাত্রীর সন্দেহ হলে তিনি বহুক্ষন এদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দেখা গেল এদেরকে পেশায় ভিক্ষুক মনে হলেও এরা শহরের অলিত গলিতে রাত্রি যাপন করে এবং এদের সবাই যৌনাচার বৃত্তিতে লিপ্ত। এরা বয়সে অত্যন্ত কাঁচা হলেও ভাব-ভঙ্গিমা কথা-বার্তা শুনলে মনে হবে এরা নব যৌবনা।

এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে যৌন চেতনা, বাসনা বা যৌনক্ষমতা আসে না। কিন্তু অশ্লীল নৃত্য, পর্ণছবির পর্ণ অভিনয় ইত্যাদি দেখে দেখে মেয়েরা বুঝতে শিখেছে যে মেয়েদের যৌন চেতনা বাসনা বা যৌন ক্ষমতার কোনই দাম নেই, তাদের দেহটাই পুরুষের ভোগের নিমিত্ত। সুতরাং ঐ মেয়েগুলি সেই নিয়তিই ভোগ করছে।

আণবিক তেজস্ক্রীয়তা যেমন করে আবহাওয়া দূষণ করছে, ধর্ম দ্রোহিতা এবং গণিকা সংস্কৃতিও তেমনি করে জৈবিক আবহাওয়া দুষিত করছে। পলিথিন আমাদের পরিবেশ দূষণ করছে বলে পলিথিন নিষিদ্ধ হচ্ছে, পর্ণ সংস্কৃতিতো তার চেয়েও মারাত্মক। তদ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হচ্ছে, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং সমাজিক স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং সর্বাগ্রেতো তাকেই উৎখাত করা প্রয়োজন।

যদি সেরকম উৎখাত সম্ভব না হয় তবে মেয়েদর নারীসত্ত্বা রক্ষার জন্য নিম্নের দুটি পন্থায় যেকোন একটি অবলম্বন করা যেতে পারে। তার একটি বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের বিধান অপরটি নাগা রীতি।

বশিষ্ঠ ধর্মসুত্রে বলা হয়েছে– "পিতা রক্ষিত কৌমারে, ভর্তা রক্ষিত যৌবনে রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মইতি" অর্থাৎ নারী কুমারী অবস্থায় পিতার দ্বারা যৌবনে স্বামীর দ্বারা বার্ধক্যে পুত্রের দ্বারা রক্ষিত হবেন। স্ত্রী লোক স্বতন্ত্র থাকতে পারে না।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে ধর্মের গন্ধ থাকায় পদ্ধতিটি ধর্মদ্রোহী নারীবাদীদের পছন্দ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অর্থাৎ নাগা রীতিটি অবলম্বনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

নাগা মেয়েদের রজোস্রাব হয়েছে জানতে পারলেই তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়। অবশ্য তার যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আড্ডাখানা রয়েছে। যেখানে মিলন প্রার্থি ছেলেরা অপেক্ষমান থাকে। সেই আড্ডাখানায় গিয়ে মেয়েটি নিজের পছন্দমত একটি ছেলের বাহুলগ্না হয়ে স্বামী স্ত্রীর মত কালযাপন করতে থাকে। ঐ আড্ডাখানায় এমনি ধরনের বহু ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় বাস করে এবং নিজ খেয়াল খুশীমত সময় সময় সঙ্গী বদলও করে।

এমনি করে বসবাসের মাধ্যমে মেয়েটির যখন গর্ভ সঞ্চার হয় তখন মেয়ের পিতা-মাতাকে সংবাদ জানানো হয়। পিতা-মাতা তখন যে ছেলেটির দ্বারা মেয়েটির গর্ভ সঞ্চার হয়েছে তার সাথে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ছেলেটি তার দায়িত্ব অস্বীকার করে না। কারণ তাহলে তাকে সামাজিকভাবে একঘরে করে দেওয়ার জন্য অন্য আরও বহু শাস্তির বিধান আছে।

শুধু নাগারা নয়, বিশ্বের বহু স্থানে আদিবাসীদের মধ্যে এখনও এই ধরনের বিভিন্ন প্রথা চালু আছে। ছেলেমেয়েদের যৌন চেতনার উন্মেষ মুহুর্তেই যৌন কর্মের সুযোগ করে দিয়ে তারা সামাজিক শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

সভ্য সুন্দর জীবন যাপনের জন্য আমরা ধর্মীয় রীতি পদ্ধতির দ্বারা নৈতিক ব্যবস্থাটি উন্নতি সাধন করেছিলাম। কিন্তু আজ একশ্রেণীর ধর্মদ্রোহি বুদ্ধিজীবিদের কারণে আমাদের এই সভ্য সমাজে ভাগোয়াট খুন হরণ ধর্ষণের যেসব মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটছে, বিয়ের বয়স পরিবর্তন করালেই তার সমাধান হয়ে যাবে না। সময়ের প্রয়োজনে আজ হয় আমাদের ধর্মের বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে নয়তো বশিষ্ঠ ধর্ম সূত্রের বিধান অনুযায়ী পিতা, স্বামী পুত্রের বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে।

এতক্ষণ আমরা কিশোর কিশোরীদের উপর অশ্লীল সিনেমার ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সামান্য আলাকপাত করেছি। কিন্তু বিষয়টি সামান্য নয়। টেলিভিশন, ভিসিপির মাধ্যমে অশ্লীল সিনেমা পর্ণ সিনেমা আজ শহর বন্দরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। বিশাল বিষ বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মত তার বিস্তার ঘটেছে গ্রামগঞ্জের নিথর পল্লীতেও।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের সংসার চেতনা যেমন অল্প বয়সেই এসে থাকে তেমনি তাদের বৈবাহিক তেচনাও অল্প বয়সেই এসে থাকে। কৈশোরে যখন তারা হাড়ি-পাতিল নিয়ে চড়ুইভাতি খেলে তখনই তাদের অবচেতন মনে স্বামী সন্তানের স্বপ্ন দানা বাধে। এমনি অবস্থায় যখন সে সিনেমার দৃশ্যে নগ্নদেহ মেয়েদের পুরুষের কোলে ঝাপিয়ে পড়তে দেখে তখনই তার মধ্যে প্রখর যৌন চেতনা অনুভূত হয়। অশ্লীল সিনেমার বদৌলতে দশ বছর বয়সের অনেক পূর্বেই ঐ যৌন চেতনা আসতে পারে। একারণেই মেয়েদের ছেলেদের চেয়ে পাঁচ থেকে দশ বছর আগে বিয়ে দিতে হয়।

ছেলেদের বেলায় যৌন অনুভূতি আসে দেরীতে, সংসার চেতনা আসে আরও দেরীতে। সাধারণত ১৫ বছর বয়সের পূর্বে তার মধ্যে সংসার চেতনা আসেই না। পর্ণ সিনেমার বদৌলতে আজকাল ছেলেদের মধ্যে কামতাড়না অনেক টুকু এগিয়ে এলেও সংসার চেতনা এগুয়নি। অর্থাৎ, সে নারী দেহ ভোগের প্রতি আসক্তি অনুভব করলও সংসার তৃষ্ণা অনুভব করে না। একারণেই সে বিয়ে না করেই নারী দেহ উপভোগ করার প্রতি প্ররোচিত হয়ে থাকে। তাও আবার পর্ণ সিনেমার বদৌলতে এখন আর হরণ করে ধর্ষণ করতে হয় না। এখন সামান্য প্রলোভনেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে এবং গর্ভ ধারণের ভয় না থাকায় ছেলেরা আগ্রাসী হতেও ভয় পায় না। মেয়েদের গর্ভ ধারণের ভয় থাকলেও পর্ণ সিনেমার প্রভাবে তাদের বেশীর ভাগ সেই ভয় এবং ধর্মের কথা ভুলে যায়, পরিণতির কথা ভুলে যায়। তারা তাড়াতাড়ি স্বামী সংসার চায়, সন্তান চায়। তা না পেলেই স্বাধীন চলার

জন্য, নিজ শরীরের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠে। ধর্মবোধসম্পন্ন পারিবারিক ঐতিহ্যবোধ দৃঢ় না হলে তার পদস্খালন সহজেই ঘটতে পারে।

গ্রামের সাধারণ মেয়েদের পারিবরিক ঐতিহ্যবোধ দুর্বল। এসব কিশোরী যুবতী মেয়েরা নগ্ন সিনেমা দেখে দেখে স্বপ্নচারী হয়ে পড়ে। অভিনয় বা চাকুরীর প্রলোভনে এরা ঘর ছেড়ে শহরে আসতে গিয়ে গুন্ডা-বদশাশের খপ্পরে পড়ে নারীত্ব, সতীত্ব, সম্ভ্রম হারায়। কেউ পতিতালয়ে বিক্রী হয় আবার কেউ বিদেশেও পাচার হয়। শুধু কিশোরীরাই নয়, ২/৪ সন্তানের জননী গৃহিনী কর্তৃক ১৪/১৫ বছরের কিশোরকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং তাকে নিয়ে ঘর বাধার সংবাদও তো প্রায়ই পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। অমন একটি কিশোর কখনোই ঐ বয়সের একজন গৃহিনীকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে পারে না বা বিয়ে করার কথা চিন্তা করতে পারে না।

মেয়েরা দুর্বল শরীর ও কোমল প্রাণা। দুর্বল শরীরের কারণে তারা সহজেই বালাৎকারের শিকার হয়, কোমলপ্রাণা হওয়ার কারণে সহজেই দুদর্শন ছেলেদের প্রলোভনে সাড়া দেয়। কিন্তু প্রলোভনে সাড়া দিলেও দেহ দানের পূর্বে সে ছেলেটির কাছ থেকে বিয়ের একটা আশ্বাস আদায় করে নেয়। এটা তার ধর্মভীরুতা। অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়েছে দেখলে সে বিয়ের আশ্বাসটা ছিল বলে প্রকাশ করে, অন্যথায় তার ঐ ব্যভিচারের ব্যাপারটা গোপন অভিসার হিসাবেই থেকে যায়। কোনদিনই তার প্রকাশ পায় না। ছেলেদের বেলায় কিন্তু তা নয়।

ছেলেদের শরীরে শক্তি আছে। জাগতির ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনে সে প্রকৃতিগতভাবেই কঠিন হৃদয়। পর্ণ সিনেমার অশ্লীল দৃশ্যের প্রভাবে জৈবিক তাড়নাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সে মেয়েদের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। দৃঢ় মনোবলের কারণে সে নির্দয় হতে পারে এবং জৈবিক তাড়নায় কিছুক্ষনের জন্য হলেও তার ধর্মাধর্ম জ্ঞান লুপ্ত হতে পারে। সে মুন্সীই হোক বা মৌলবীই হোক সে তো রক্তমাংসের মানুষ। তেমনি পুলিশের চাকুরী নিলেই একজন মানুষের প্রবৃত্তি অবদমিত হয়ে যায় না। একারণে পুলিশের কাছে ধর্ষণের নালিশ জানাতে গিয়ে পুলিশ দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার সংবাদও পাওয়া যায়। ধর্মাচরণ করালে পুরুষরা খোজা হয়ে যায় না আর মেয়েরা হিজড়া হয়ে যায় না।

ধর্ম হচ্ছে একটা নৈতিক শৃংখল, ধর্মবোধের ভিত্তি শক্ত না হলে এবং পরিবেশ অনুকূল না হলে প্রবল প্ররোচনা দ্বারা সেই শৃংখলও ছিন্ন করে ফেলা

যায়, যেমন ঘষতে ঘষতে পাথরও খয় হয়। সুন্দরী রমনীর সাহচর্য ঋষির ঋষিত্বকেও ধ্বংস করে দিয়েছে এমন বহুদৃষ্টান্ত হিন্দুর অর্থশাস্ত্রে আছে।

পর্ণ ছবির শক্তি এতই প্রবল যে, আজকাল বনের পশুকে কামতাড়িত করার জন্য ও পর্ণ ছবির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। উপরে ভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি যে বোগাটার দুটি গরিলা গত ২৪ বছর ধরে একই খাচায় একত্রে বাস করছে কিন্তু তাদের মধ্যে সাধারণ যৌন উৎসাহও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সুতরাং তাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য কতৃপক্ষ গরিলা দু'টিকে পর্ণ ছবি প্রদর্শন দ্বারা প্ররোচিত করার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকা হচ্ছে পর্ণ ছবির খোলা বাজার। এই পর্ণছবির কারণেই সেখানকার মেয়েদের বয়স ১২ বছর হলেই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল সাথে নিয়ে চলে। কিন্তু গরীব কৃষ্ণাঙ্গরা পিল খেতে পায় না। তাই তাদের মেয়েদের বিবাহ বহির্ভুত সন্তান জন্মের হার হচ্ছে ৫৯ শতাংশ। পিল খাবার নিয়ম মেনে চলা সব সময় সম্ভব হয় না বলে শ্বেতাঙ্গদের এক তৃতীয়াংশ সন্তান অবিবাহিত মেয়েদের গর্ভে জন্ম নেয়। আইসল্যান্ডে শতকরা ৫০টি শিশুই অবিবাহিত মায়েদের গর্ভে জন্ম নেয়।

শিশু-কিশোরদের যৌন জীবন হতে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্য ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান এক প্রচারণা অভিযান শুরু করেছিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় টেলিভিশনকে নিয়ে। মার্কিনীরা যে সময়টাতে সবচেয়ে বেশী টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে সে সময়টাতে তারা বছরে গড়ে নয় হাজার যৌন দৃশ্য দেখে। সুতরাং প্রশ্ন উঠেছে এসব কর্মসূচী টিভিতে অব্যাহত রেখে কিশোর কিশোরীদের যৌন জীবন হতে নিরুৎসাহিত করার কর্মসূচী সফল করা যাবে কিনা। এ জিজ্ঞাসা শুধু আমেরিকার নয় শুরু প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের নয় এ প্রশ্ন বিশ্বের সকল সভ্য মানুষের মনেই জেগেছে।

এতদিন আমরা যৌন সিনেমা ও অশ্লীল সিনেমার জন্য ঢালাওভাবে পাশ্চাত্যকে দায়ী করে এসেছি। কিন্তু এখন অশ্লীন সিনেমা তৈরী হচ্ছে আমাদের দেশেই। আর এসব সিনেমার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন। তারপর চুম্বন, আলিঙ্গন, দেহ পীড়ন। তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কিশোর-কিশোরী ছেলে-মেয়েরা।

বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার জন্য 'মেয়েদের ছবি চাই' বিজ্ঞাপন দিলে হাজার হাজার মেয়ের ছবি আসতে শুরু করে। সিনেমায় অভিনয়ের জন্য নতুন মুখ চাই বিজ্ঞাপন দেখলে কিশোরীদের ঢল নামে। কারণ, এরা দেহ প্রদর্শন এবং পরে দেহ দানের জন্য প্ররোচিত হয়ে আছে। মেয়েরা দু'একটি সিনেমায় দু'একবার অভিনয়ের সুযোগ পেলেই শুরু করে দেহ ব্যবসা। যারা

সুযোগ পান না তারাও আশায় আশায় সিনেমার দালালদের দেহ দান করে করে শেষ পর্যন্ত অভিনয় আর হয় না, দেহ দানই হয়ে যায় পেশা। এর ফলে সমাজে অপরাধের বিস্তার ঘটেছে বন্যার বানের মত। যে স্থানে প্রকাশ্যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে সেখানেই আল্লাহর গযব নেমে আসে এবং ভালমন্দ সবাইকে সেই গযবের শিকার হতে হয়। হাদিসের এই বাণীই প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের সমাজে।

সিনেমার নায়িকাদের নগ্নদেহ, অশ্লীল ভাব-ভঙ্গি, যৌন ইঙ্গিত ইত্যাদি দর্শন করে উত্তেজিত ছেলেরা বাইরে এসে নিরীহ-নির্দোষ স্বামীকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে ৫/১০ জন মিলে বেচারার স্ত্রীকে তার চোখের সামনে ধর্ষণ করে, নিরীহ বাবাকে বেঁধে রেখে মেয়েকে, মাকে বেঁধে রেখে তাদের চোখের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করে, বিয়ের যাত্রীর হাত থেকে দুলহানকে ছিনতাই করে নিয়ে ধর্ষণ করে। এসব ঘটনার উস্কানিদাতা নর্তকীরা কিন্তু ধর্ষণের শিকার হয় না। তারা আরামে দেহ ব্যবসা দ্বারা অন্যায়ের বিস্তার ঘটায়। তাদের শাসন দমন করা যায় না বলে মর্মান্তিক যাতনা সহ্য করতে হচ্ছে নিরীহ স্বামী, নিরীহ মা-বাবা, ভাই এবং নিরীহ নির্দোষ নারী সমাজকে।

কারণ, দুস্কৃতকারীদের দুষ্কর্মের কাছে দেশের আইন বড় অসহায়। রাজনীতিকরা দুস্কৃতকারীদের সহায়। এই যাতনা থেকে সমাজের নিরীহ মানুষকে রক্ষা করার জন্যই প্রেসিডেন্ট রিগ্যান শিশু-কিশোরদের পর্ণো সিনেমার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন। আজ বিশ্বের বহু দেশেই এ ধরণের তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখের সিনহুয়ার খবরে প্রকাশ, চীনের সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি পর্ণগ্রাফী তথা যৌন পত্র-পত্রিকা ও সামগ্রীর চোরা চালান, উৎপাদন, বিক্রী ও বন্টনের দায়ে দোষী ব্যক্তিদের মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন করাদন্ডের আইন পাস করছে। জাতীয় গণ কংগেসের ১৭ তম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চীনের নিরাপত্তা মন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বিদেশ থেকে আসা অসৎ চিন্তাধারা এবং অশ্লীল ভিডিও চীনের তরুণদের মনকে বিষিয়ে তুলছে ও তাদের অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চীনা সরকার লক্ষ লক্ষ পর্ণ গ্রাফীর বই আটক এবং ঐসব বইয়ের প্রকাশনা সংস্থাগুলি বন্ধ করছে, জরিমানা করছে। শুধু তাই নয়, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ প্রকাশ, চীনের হুনাম প্রদেশে ডাকাতি, সন্ত্রাস, ধর্ষন, মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার অপরাধে ১৪০ ব্যক্তিকে প্রকাশ্যস্থানে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে।

নাইরোবির দৈনিক ন্যাশন পত্রিকার খবরে প্রকাশ, নাইরোবি সরকার সকল যৌন, নগ্ন, প্রচন্ড হিংসাত্মক অথবা রাজনৈতিক ধ্বংসাত্মক সকল ভিডিও ক্যাসেটের তালিকা সরকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্দেশ জারি করেছে। সুতরাং বিশ্বের সকল দেশ আজ অশ্লীল ভিডিও, যৌন পত্রিকা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করছে তখন আমাদের সরকার এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

আমাদর ঘরে ঘরে অশ্লীল ভিডিওর প্রদর্শন হচ্ছে, তদ্দারা যুব সমাজে ছিনতাই, হরণ, ধর্ষণ চাঁদাবাজি ইত্যাদি মহামারির আকারে বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে ভিডিও সেন্সর কিম্বা ভিডিও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থাই গৃহিত হচ্ছে না। বরঞ্চ যে পুলিশ অশ্লীল ছবি প্রদর্শন প্রতিরোধ করবে সেই পুলিশের প্রহরাধীনে ভিসি আর এ পর্ণ ছবি প্রদর্শনের সংবাদও পত্রিকার পাতায় বের হয়।

এক পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ: ডেমরা বাজারে এক নাগাড়ে ৫ বছর ভিসিআর চলার পর পুলিশী হামলায় তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মাত্র দুই মাস বন্ধ থাকার পর সারুলিয়া পুলিশ ফাঁড়িকে প্রতিমাসে তিন হাজার সেলামী দিয়ে ভিসিআর প্রদর্শন আবার শুরু করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। সূত্রটি জানায়, রাতের বেলায় ভিসিআর এ যখন ব্লু ফিল্ম দেখানো হয় তখন পুলিশ হল-রুমের বাইরে পাহারা দেয়। দৈনিক সংগ্রাম (১৩-১০-৮৮)

অশ্লীল ছবি, সিনেমা এবং খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস একসূত্রে বাঁধা। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পর্ণ সামগ্রীর উৎপাদন বিপণন এবং প্রদর্শনকারীদের জন্য মৃত্যুদন্ডের আইন পাস করে নিয়েছে। সন্ত্রাস ও ধর্ষণের দায়ে শত শত অপরাধীকে একসঙ্গে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশে সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগার উপরে। কিন্তু কঠোর আইনের বিধান তৈরী হয়নি। ফলে পুলিশরাও ছিনতাই করছে, ধর্ষণ করছে নির্বিচারে। দুষ্টেরা মা, বোনকে ধর্ষণ করে, সন্ত্রাসীরা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে বুক ফুলিয়ে সমাজে বিচরণ করে। মজলুম পরিবার বিচার চাইতে গেলে জালিমরা বংশশুদ্ধ মেরে ফেলার হুমকি দেয়, তাদের ভয় নেই। কারণ, পুলিশতো তাদের দলে।

এসব কিছু দেখে শুনে মনে হয় খুনী সন্ত্রাসীরা আমাদের সরকারকে, আমাদের আইন পরিষদকে ধুতুরার বিষ খাইয়ে রেখে নিজেরা যদৃচ্ছা দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

বৌয়ের বেতন

গৃহবধুদের বেতন সম্পর্কে একবার ম্যাগাজিনের পাতায় কিছু আলোচনা সমালোচনা দেখা গেছে। আপাত দৃষ্টিতে কথাটার মধ্যে অনেকটা ধিক্কারের এবং কিছুটা রসের আমেজ থাকলেও আসলে ব্যাপারটা নিতান্তই রসিকতা নয়। সভ্য সমাজের সভ্য বোধের বিরুদ্ধে একে একটা বিষকুম্ভ চক্রান্তের উদ্যোগ হিসাবে গণ্য করার মত কারণ রয়েছে।

বউ ছাড়া পরিবার হয় না, সংসার হয় না, বংশ বৃদ্ধি হয় না। একটা গৃহ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী একজন বউ। এ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তার কাজের শেষ নেই, অবসর নেই। অথচ তার বেতনও নেই, রিটায়ারমেন্টও নেই কারণ, বউ হচ্ছে সংসার সাম্রাজ্যের মালিক, সম্রাজ্ঞী। সংসারের সকল ব্যয় তিনি করেন হিসাবও তিনি রাখেন। সুতরাং তার বেতনের কোন নিবন্ধন নেই, পরিমাণও নেই। আবার সংসার সাম্রাজ্যের বউটি একজন স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা। সংসারের স্ত্রী কোনদিনই বুড়ী হয় না এবং রিটায়ারও করে না। যত বুড়াই হোক না কেন তিনি তাঁর স্বামীর স্ত্রী এবং শয্যাসঙ্গী। এই বউটি আবার সংসারের সন্তানের মা। আর মা চিরদিনই মা। মা নামটি কোনদিনই বুড়ি হয় না বা তার অবসর প্রাপ্তি হয় না। সন্তান চিরদিনই তাকে মা নামে ডাকে- বয়স হলেও, বুড়া হলেও মা। সংসার কর্মে অসমর্থ হয়ে পড়লেও তাকে অবসর প্রাপ্ত মা বলে ডাকে না।

সুতরাং গৃহবধুদের বেতন নির্দিষ্ট করার দাবীর যুক্তির আবরণে যথেষ্ঠ হাসির খোরাক থাকলেও কারও কারও মধ্যে একটা শঙ্কার ভাব সৃষ্টি হয়েছে। এ শঙ্কা আর কাউকে খুব বেশী শঙ্কিত করতে না পারলেও আমাদের রুস্তম আলীকে খুব বেশী বিচলিত করে ফেলেছে।

রুস্তম আলীকে চিনে না এমন মানুষ এ শহরে খুব কমই আছে। বিশেষ করে যারা বাড়ি তৈরী করেছেন বা করছেন তারা। কারণ, রুস্তম আলী যুগালীর কাজ করে অর্থাৎ রাজমিস্ত্রীর হেলপার।

শরীরে স্বাস্থ্যে সুপুরুষ, দেখা-শোনায় সুশ্রী, মন-মানসিকতায় ভিজে বিড়াল, কথাবার্তায় সুরসিক, কিন্তু কাজের বেলায় বুদ্ধির ঢেকি। গত ক'টা বছর যাবত সে যুগালীর কাজ করছে। তার সাথে যারা যুগালীতে এসেছিল তাদের সবাই দু'চার বছরের ভিতরে রাজমিস্ত্রী হয়ে গেছে। কিন্তু কথার মুন্সী,

বুদ্ধির ঢেকি হওয়ায় রুস্তম আলী যুগালীই রয়ে গেছে। অবশ্য যুগালী নামটা তার বড় নাপছন্দ। তাই সে নিজেকে পরিচয় দেয় এ্যাসিষ্টান্ট নামে।

বাকপটুতা দ্বারা কয়েকবারই সে অফিসে, কারখানায় চাকুরি পেয়েছে। অবশ্য চাকুরির পূর্বে হাতে পায়ে ধরে চাকুরি নেয়, তারপর আরও বেতন, আরও সুযোগ-সুবিধার দাবীতে আন্দোলন ও মালিক ঘেরাও করতে গিয়ে বারবারই চাকুরি হারিয়ে আবার সেই পুরোনো এ্যাসিষ্টান্ট হয়ে এসেছে।

যখন যে বাড়ীতে কাজ করে, নির্মাণাধীন সে বাড়ীরই এক কোণে কাঠ, রড, সিমেন্টের ফাঁকে রাত্রি যাপন করে। কাজ শেষে সন্ধ্যা বেলায় সুর করে জৈগুন বিবির পুঁথি পাঠ করে। দিনের বেলায় শিশি-বোতল, কাগজের ফেরীওয়ালার কাছ হতে সুন্দর সুন্দর মেয়ে মানুষের নগ্ন দেহভঙ্গীওয়ালা যৌন ম্যাগাজিন চেয়ে রাখে। রাত্রে খাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে সেব ম্যাগাজিনের নোংরা ছবি দেখে, নোংরা খবর, নোংরা কাহিনী পাঠ করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

বাড়ী তৈরী শেষ হলে গৃহকর্তার যেদিন গৃহযাত্রা হয়, রুস্তম আলী সেদিন গৃহত্যাগ হয়। এমনি অবস্থার শিকার হয়ে রুস্তুম আলী একদিন সন্ধ্যার পর আমার বাড়ী এসে হাজির হয়।

বছর পনের পূর্বে সে আমার বাড়ীতে কাজ করেছে। তখন সে আমাকে প্রায়ই নষ্ট ম্যাগাজিনের নষ্ট খবর শুনাতো। রুস্তুম আমার দেশের মানুষ, সহপাঠি সমবয়সী গরীবের ছেলে। ষষ্ঠ শ্রেণীর শেষে পড়ালিখা বন্ধ করে বাবার গৃহস্থালী কাজে যোগ দেয়। গত পনের বছর যাবত শহরে গৃহ নির্মাণ এ্যাসিষ্টান্ট এর কাজ করে চলেছে। ছোট কালের সহপাঠি হওার সুবাদে বাকপটুতার মাধ্যমে সে আমার অনেক কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মুক্ত মনে কথা বলে। এমনকি যৌন ম্যাগাজিনের স্কান্ডালের সংবাদ বলতেও দ্বিধাবোধ করে না।

সুতরাং সে অবসর সময়ে আমার কাছাকাছি বসে বড় আফসোসের সাথে অশ্লীলতার নানা নির্লজ্জ সংবাদ শুনাত। কোথায় কোন বড়লোকের বিবিসাব কোন রাস্তার মানুষের হাত ধরে ভাগোয়াটি হয়েছে, কোথায় কোন চিত্রাভিনেত্রী বাড়ী ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যবসা করে আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লে পুলিশকে ধমকিয়েছে, কোন বিবিরা স্বামীকে ঘরে রেখে হোটেলে হোটেলে রাত কাটায়, কোন অভিনেত্রী বছর বছর স্বামী বদলিয়ে দেহভোগের সাধমিটায় এবং কোন অভিন্ত্রী উইটডোর স্যুটিং-এর নাম করে বয়ফ্রেন্ড সাথে নিয়ে শহর হতে শহরের হোটেলে রাত কাটায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব খবরের প্রতি তার আকর্ষণ থাকার একটা বড় কারণ হচ্ছে, সুঠাম দেহী সুদর্শন রুস্তম যেহেতু নির্মাণাধীন বাড়ীতে প্রায়ই একা থাকে এবং সন্ধ্যায় সুকণ্ঠে প্রেমের পুঁথি পড়ে, সেহেতু বহুবার তার সাথে আশেপাশের বহু মেয়ে ঘটিত ব্যপার ঘটেছে যে কারণে কয়েকবারই স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে শেষে তাকে ঐ স্থান ছাড়তে হয়েছে।

আজকালও সে মাঝে মধ্যেই আমার বাড়ীর রঙ করা, মেরামত করার ইত্যাদি নানা কার্যোপলক্ষে আসে এবং ঐ ধরনের সংবাদ শুনায়। আজও সে সন্ধ্যার পর এসে অতি সন্তর্পণে আমার সোপার অন্ধকার পাশটিতে বসতে বসতে বলল: খবর শুনেছেন স্যার?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই আমার কানের কাছেমুখ এনে নীচু স্বারে বলল, ম্যাগাজিনের পাতায় জোর লেখালেখি হচ্ছে, এখন থেকে নাকি ঘরের বউদের বেতন দিতে হবে। বলেই সে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার একটা বিশেষ পৃষ্ঠা খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, এই যে পড়ে দেখেন।

পত্রিকাখানা আমি চিনি। স্ক্যান্ডালের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পত্রিকাখানার দুর্নাম আছে। নিজের নৌকায় নিজে দোলা দিয়ে ঝড় উঠেছে বলে চিৎকার দিয়ে স্ক্যান্ডাল তৈরীর দোষে সম্পাদকের দেশ ছাড়া হওয়ার ইতিহাসও আছে। ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানার মত, সরকার বদল হলে পরে দেশে এসে আবার সেই স্ক্যান্ডাল তৈরীতে আত্মনিয়োগ করেছে।

পৃষ্ঠাটা উল্টে উল্টে দেখলাম, তাতে 'বাংলার বধু বুকে তার মধু' শিরোনামে গৃহবধুদের জন্য বেতনের একটি খাতওয়ারী ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন; কেয়ারটেকারের কাজের জন্য ১০০০ টাকা বাবুর্চির কাজের জন্য ৫০০ টাকা শিক্ষয়ীত্রির কাজের জন্য ৫০০ আয়ার কাজ ৪০০ নার্সিং-এর কাজ ৫০০ বিনোদনের জন্য ৫০০ শয্যা সঙ্গিনী হওয়ার জন্য ১০০০ মোট ৪৪০০ টাকা বেতনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বললাম: তোমার তো মাসিক সাকুল্য আয় দেড়- দুই হাজার টাকা, বউ এর এই বেতন দেবে কি করে?

রুস্তম বলল: ঐ রেটটা নাকি দশ হাজারী-বার হাজারী ঘরের বিবিদের জন্য। কিন্তু স্যার, স্ত্রীর শরীরের ব্যাপারে গরীব আর ধনীর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে যে রেটের হের ফের হবে? আল্লাহ তো ধনীর বৌকে যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন গরীবের বৌকেও তো সেই একই রকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। বরঞ্চ বহু গরীবের বউ ধনীদের বৌদের চেয়ে অনেক বেশী সতী

ও সুন্দরী। তারপর আবার উপভোগের ক্ষেত্রে ধনীর উপভোগ আর গরীবের উপভোগে একই রকম আনন্দ দিয়েছেন। তবে সঙ্গদানের রেট ভিন্ন হবে কেন? বাজারে তো কোন পণ্যেরই ধনীর মূল্য, গরীবের মূল্য বলে কোন ভিন্ন মূল্য নেই।

রুস্তম আরও বলল: স্ত্রী সঙ্গ উপভোগের চার্জ যদি দিতেই হয়, তবে তা মাসের হিসাবে হবে কেন? আমি ৩/৪ মাসে একবার বাড়ী যাই ৩/৪ দিন থাকি। ধরুন ৪ মাসে স্ত্রীকে দিলাম ৪০০০ টাকা, আর ৪ মাসে সঙ্গ নিলাম ৪ দিন। তবে তার সঙ্গভোগের রেট দাঁড়ায় দিনে এক হাজার টাকা। একটা দিন মজুরের বৌ-এর ঘামে ভেজা দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা শরীরের জন্য এক দিনে হাজার টাকা কি একটা রেট হল?

এইতো এই শহরে আছি, দেখছি, একশ টাকায় ঝলমলে শাড়ী-গয়না পরা গায়ে সুগন্ধী লাগানো, টিপ-লিপষ্টিক পরা কত হুরপরী রাস্তাঘাটে বিকোচ্ছে। আর আপনি তো জানেন, আমি নিজেই কতবার বিনে পয়সায় শরীর গ্রহণ না করায়, কত বিবির কাছে নাকানি চুবানি খেয়েছি। বরঞ্চ আমি চাইলে বিবিরাতো আমাকেই বেতন দিয়ে সঙ্গ নিতে রাজি।

আসলে স্যার, ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। এসব কথাবার্তা আমাদের গরীবের জন্য নয়। আমাদের বউরা আমাদের ঘর করার ও সঙ্গ দেওয়ার জন্য পরের বাড়ীতে কাজ করে খানা এনে আমাদের আদর করে খাওয়ায়। মাস মাহিনার টাকা এনে আমাদের হাতে তুলে দেয়। তারা স্বামী ছাড়া আর কাউকে চিনে না। গুনাহর ভয়ে আর কারও সঙ্গ কামনাও করে না। তবুও তাদের ভয়ের শেষ নেই।

দিনের বেলায় তাদের কোন ভয় নেই। কারণ, তারা আপনাদের মত বড়লোকের বাসায় কাজ করে। আপনাদের ভয়ে সেখানে তাদের অন্য কেউ উত্যক্ত করতে যেতে পারে না। ভাল পোশাক পরলে ভাল দেখায় কিন্তু গায়ে ঘামের গন্ধ, মসলার গন্ধ, তাই বড়লোকেরাও তাদের প্রতি হাত বাড়ায়না।

সন্ধ্যা বেলায় ঘরে এসে গোসল করে যখন কাপড় বদলায় তখনই আমাদের ভয়। রাত্রি বাড়তেই মদ খেয়ে মাস্তান আসে, মহল্লার সরদার আসে, সরদারের ছেলে আসে, এসে বলে তোর বউতো খুব সুন্দর, পঞ্চাশ টাকা নে, ওকে দিয়ে দে। আমরা তাই ভয়ে ভয়ে থাকি, সামলে চলি। কারও কাছে নালিশ করতে পারি না। কারণ, ঐ মাস্তানরা, সর্দাররা যে আপনাদের মত বড়লোকদের পোষা কুকুর।

কিন্তু স্যার আপনাদের মেয়েদের ও বিবিসাবদের ব্যাপারে উল্টা। রাতের বেলায় তাদের নিয়ে কোন ভয় নেই। তাদের নিয়ে ভয় দিনের বেলা। তাদের অনেকেই আছে যারা আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই বেরিয়ে গিয়ে পরপুরুষকে বিনে পয়সায় সঙ্গ দেয়। মাঝে মাঝে এরা বেরসিক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সমাজ এদের ছি ছি করে। এটা হচ্ছে সমস্যা। কারণ, ধর্ম নামক একটা বোধ মানুষকে শিখিয়েছে যে, ওটা অন্যায়, ওটা পাপ। দেশের আইনও ধর্মের সমর্থনে তৈরী হয়েছে।

অল্পশিক্ষিত গরিব মানুষ হলেও রুস্তমের চিন্তা চেতনার গভীরতা আছে। সে বুঝতে পারে দুশ্চরিত্র মানুষের জন্য ধর্ম হচ্ছে একটা সমস্যা। ঐ সমস্যাটা সমাধানের জন্য তারা বহুদিন হতে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু ধর্ম মানুষের অন্তরে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, পরপুরুষ দ্বারা জৈবিক ক্ষুধা মিটাতে গেলেই মানুষের অন্তর পাপ পাপ বলে হাহাকার করে উঠে। দেহ বিক্রি করে দু'পয়সা বাড়তি রুজি করবে, তাতেও পাপ এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। অথচ স্বামীর দেয়া টাকায় সব সাধ মিটে না, একজন স্বামীর সঙ্গ দ্বারা সঙ্গ সাধও মিটে না। ওদিকে রুপচর্চা করে সমাজে গেলে মানুষ বাহবা দিয়ে এত সঙ্গতৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয় যে, তখন আর তার স্বামী, সন্ত ান ভাল লাগে না।

রুস্তমের মতে এই পাপ কথাটাকে বিলুপ্ত করার জন্যেই রিপুবিলাসী ঐ ব্যাভিচারীরা এখন বউদের বেতনের ধুয়া তুলেছে। এতে সুবিধা অনেক। যেমন:

১. শ্রমের মূল্য নির্দিষ্ট হয় বেতন দ্বারা। শ্রমিক-কর্মচারীরা যে মালিকের কাছে বেতন বেশী পায়, সে মালিকের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা রাখে। তাতে কোন পাপ নেই, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কও যদি বেতন দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়, তবে স্ত্রী যার কাছে বেতন বেশী পাবে তার কাছেই রাত কাটাবে। প্রশ্নটা যখন বেতনের তখনতো তাতে পাপপূণ্যের প্রশ্ন আসতেই পারে না। এমন কি বিয়ের গুরুত্বও থাকবে না, অর্থাৎ ধর্মই থাকবে না।

২. স্বামীরাও যেখানে কম টাকায় নারীদেহ পাবেন বা কম টাকায় বেশী সুন্দরী বা চটকদার নারী পাবেন সেখানেই যাবেন এতে যেহেতু প্রশ্নটা বেতনের সেহেতু পাপপূণ্যের বাধা থাকতে পারে না।

৩. বেতন বেশী হওয়ার কারণে স্বামী যখন স্ত্রীর সঙ্গ বাদ দিবেন, তখন জৈবিক ক্ষুধা মিটাবার জন্য স্ত্রী বিনা পয়সায় হলেও পরপুরুষের কাছে দেহদান করতে বাধ্য হবেন।

৪. স্বামীকে সঙ্গদানের জন্য বেতন নির্দিষ্ট হয়ে গেলে স্ত্রীর আর্থিক ক্ষুধা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। সুতরাং স্ত্রী রাতের বেলায় স্বামীকে সঙ্গ দিয়ে আয় বাড়াবার জন্য দিনের বেলা ওভারটাইম করবে।

৫. বেতনের দর কষাকষিতে যদি শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে যায়, তবে স্ত্রীরা তলপেটে টু লেট ঝুলিয়ে রাস্তায় নামবে। কারণ, গৃহবধুদের তো আর পতিতালয় খুলতে হবে না। যেহেতু ব্যাপারটা রুটি রুজির, তখন ধর্ম কোন বাধা হতে পারে না।

৬. টু লেট ঝুলাবার আর একটি প্রয়োজনীয়তাও আছে। বৈদিক যুগে নারীহরণ একটা সাধারণ ঘটনা ছিল। তাতে অনেক সময় গৃহবধুও অপহৃত হত। সুতরাং বিবাহিত মেয়েরা কপালে সিঁদুর পরত যাতে তারা অপহৃত না হয়। তেমনি বর্তমানের বেতন প্রথা চালু হয়ে গেলে দর কষাকষিতে বিক্ষুব্ধ নারী-পুরুষরা যখন ইচ্ছা তখন, যাকে ইচ্ছা তাকে আমন্ত্রণ নিবেদন করতে পারবে। কিন্তু হয়ত কোন নারী হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় থাকতে পারে এবং পুরুষটি তাকে নিয়ে গিয়ে বিব্রত হতে পারে। একারণেও নারী টু লেট দ্বারা তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা জ্ঞাপন করতে পারবে। ছেলেদের হায়েজ-নেফাস বা গর্ভধারণ নেই বলে, তাদের কোন বাধা-বিঘ্ন বা সময়-অসময় নেই এবং একারণেই তারা বেপরোয়া হতে অসুবিধা নেই।

উক্তভাবে বেতন পদ্ধতির হিসাব নিকাশের দ্বারা মানুষকে ধর্মাধর্ম পাপপূণ্য ইত্যাদির কথা ভুলিয়ে দিয়ে ব্যভিচারী ধর্মদ্রোহীরা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ বিয়ের কথা যেমন ভুলে যাবে ধীরে ধীরে এক সময় প্রবৃত্তিগত কারণে বেতনের কথাও ভুলে গিয়ে যৌনাচারে রাস্ত াঘাট সয়লাব হয়ে যাবে। কার্তিক মাসের কুকুরের মত নর ও নারী সবাই সবার পেছনে লাগা থাকবে। এবং তা থাকবে সব সময়, কারণ মানুষের তো আর কার্তিক মাস নেই।

রুস্তমের একটা বড় ভয় হচ্ছে, ভবিষ্যতে গরীব মানুষেরা বউ পাবে না। শুধু স্ত্রীর সঙ্গের জন্য যে চার্জের রেট দেওয়া হয়েছে, এ চার্জ কোন দিন মজুরেরা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে ধনীর দুলালদের টাকার লোভে সব মেয়েরা তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়বে।

বাংলার মেয়েদের রুপের সুনাম আছে। যেকোন গেয়ো গরীবের মেয়েও ঠিকমত শাড়ী-গয়না পেলে এবং পরলে বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতা করতে পারে। একারণে বাংলার মেয়েদের শাড়ী-গহনার লোভও দারুণ। শাড়ী-গহনার লোভেই ভদ্র ঘরের সোমত্ত মেয়েরা শিল্পপতিদের পণ্যের বিজ্ঞাপনের

রুপ বিক্রি করতে এসে শেষ পর্যন্ত দেহ বিক্রি করে বসে এবং যুবা-বৃদ্ধ নির্বিচারে টাকাওয়ালার গলায় ঝুলে পড়ে। মডেলিং যেমন বেতনের শ্রম নয়, বিত্তবানের গলায় ঝুলে পড়াও বেতনের জন্য নয়। প্রথমটি রুপবিক্রি, দ্বিতীয়টি দেহ বিক্রি। যার কোনটিতেই কোন মর্যাদা নেই এবং উভয়টিই আদিম পদ্ধতি।

প্রচীনকালে নারীর কোনই মর্যাদা ছিল না। বৈদিক সমাজের নারী 'স্বাচ্ছন্দ্যচারিণী ছিল। মনুসং হিতায় তাই বলা হয়েছে:

১. নৈতরুপং পরীক্ষান্ত নাসং বয়সি সংস্থিতি

সুরুপম্বা, বিরুপম্বা, পুমানিত্যের ভুজ্ঞতে।

অর্থাৎ– স্ত্রীরা সৌন্দর্য অন্বেষণ করে না, যুবক বা বৃদ্ধে পার্থক্য করে না, সুরুপ হোক বা কুরুপ হোক পুরুষ পেলেই তার সাথে সম্ভোগ কামনা করে। (মনুসং হিতা ৯শ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)

তখনকার নারী নিজেকে এমনি করে বিলাত বলেই তখন তার মর্যাদা ছিল না।

২. শয্যাসহ মলস্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম

দ্রোহ ভাবং কুচর্যঞ্চ স্ত্রী ভ্যো মনুর কল্পয়ৎ।

অর্থাৎ- শয়ন, উপবেশন, ভূষণ, কাম-ক্রোধ, কৌটিল্য, পরহিংসা, ঘৃণিত ব্যবহার এই গুলি স্ত্রীলোকের স্বভাবগত। সৃষ্টিকালে মনুই ইহা কল্পনা করছেন। (ঐ ১৭ শ্লোক)

বৈদিক যুগে পরস্ত্রীগমন দোষবহ ছিল না। বরঞ্চ স্ত্রীরা পরপুরুষ গমন করত এবং তা গর্হিত ছিল না। যেমন হিন্দু শাস্ত্রে যে ১২ প্রকারের সন্তান উৎপাদনের বর্ণনা আছে, তন্মেধ্যে একটি হচ্ছে, 'কামীম' অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় সন্তান জন্ম হলে তাকে 'কামীম' বলা হত। কিন্তু আজকালকার জারজ এর মত কামীমরা ঘৃণিত ছিল না।

আবার স্ত্রী যদি স্বামীগৃহের বাইরে কোথাও গিয়ে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে আসত তবে সেই সন্তানকে বলা হত 'যত্র কচনোৎপাদিত'। এসব সন্তানকে স্ত্রীর বৈধ সন্তান হিসাবে গণ্য করা হত।

পৃথিবীতে সভ্যতা প্রসারের জন্য যুগে যুগে ধর্ম পুরুষেরা এসে ঐ বর্বর প্রথাগুলিকে বিলুপ্ত করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে একশ্রেণীর সংস্কৃতি ব্যবসায়ী ঐতিহ্যের নামে ঐ প্রথাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে এবং তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে ধর্ম। কারণ, ধর্মই স্বেচ্ছাচারের ঐ প্রচীন প্রথাগুলিকে উৎখাত করেছে। আর এই

আক্রমণগুলির বেশীর ভাগ আসছে নারী সমাজ হতে। তারাও আবার ঐ নারী, যারা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ছল ছুতায় বাইরে এসে বিত্তবানের পকেটে প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়েছে। কারণ তারা দেখেছে সে যত সুন্দরীই হোকনা কেন কায়িক শ্রমে তার বেতন কম আর সে যত অসুন্দরই হোক না কেন দেহের যৌবনের রুপ বিপননে বেতন বেশী।

একারণেই মনু সংহিতায় যেমন বলা হয়েছে– শয়ন উপবেশন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কৌটিল্য, পরহিংসা, ঘৃণিত, ব্যবহার এসবই হচ্ছে স্ত্রী লোকের স্বভাবগত, তেমনি আবার বলা হয়েছেঃ নারীর অধরে পিযুষ, হৃদয়ে হলাহল, এজন্যই তাদের অধর আস্বাদন করা এবং হৃদয় পীড়ন করা কর্তব্য।

কিন্তু ঐসব ধারণা এবং বিধানের বিরুদ্ধে ইসলাম সোচ্চার। ইসলামের কোরআনে আছে– স্ত্রীরা পুরুষদের পোশাক, পুরুষরা স্ত্রীদের পোশাক" (সুরা বাকারাহঃ ১৮৭) এবং "তোমাদের মধ্যকার নেককার নরনারীর আমল আমি বিফল করব না। তোমরা একে অপরের অংশ"– সুরা আল এমরানঃ ১৯৫)

ইসলামের এ বিধানমতে সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহানুভুতিশীলতা হচ্ছে একের প্রতি অপরের বেতন বা দান, আর সুখী দাম্পত্য জীবন ও সুসন্তান হচ্ছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিদান।

নারী দুর্বল, পুরুষ সবল-একারণে পুরুষ নারীকে পীড়ন করতে বা অবহেলা করতে পারে। তাই কোরআনে বিধান দেওয়া হয়েছেঃ যদি তোমরা তাদের অবহেলা কর, তবে এমন বস্তুকে অবহেলা করলে যার মধ্যে আল্লাহ বহু কল্যাণ রেখেছেন। (সুরা-নেসাঃ ১৯)

এই কল্যাণের অর্থ নারী এমন একটি কেন্দ্রাত্মিক শক্তি যা রসুণের কোষের মত সংসারের সকল সদস্যকে একতাবদ্ধ করে রাখে, যে শক্তিমান মানুষের জন্ম দেয়, দিবস রজনীর পরিচর্যা ও শিক্ষা দ্বারা দেশের শাসক তৈরী করে, যার কোনটিই বেতন দ্বারা পরিমাপ করা যায় না এবং যার কোনটিই সংসারের বেতন করা কাজের মেয়ে দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

সেন্সরসীপ

যথাসময়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, অপরাধীর সাহস বাড়ে অপরাধের পরিধি বাড়ে। তার সাথে সাথে অন্য সকল আইনের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা হ্রাস পায়, দেশের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

আমরা কিছু বুদ্ধিভ্রষ্ট সাহিত্যিকের কথা লিখেছি যারা একাধারে ব্যাভিচারী, দেশদ্রোহী ধর্মদ্রোহী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা বাক স্বাধীনতার নামে সাহিত্যের মাধ্যমে নির্লজ্জভাবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের অন্তরে জঘন্য ব্যভিচারী দেশদ্রোহী ধ্যান ধারণার বীজ বপন করে চলেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বাক স্বাধীনতার নামে, নারীর অধিকারে নামে কিছু মানুষ ঐসব বক্তব্যের সমর্থনে শোভাযাত্রাও করেছে। আর এসব পাগলামী দেখে সরকারের প্রশাসন যন্ত্র যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে 'থ' খেয়ে দাড়িয়ে গেছে।

মনে রাখা উচিত যে, মাছের যেমন পচন শুরু হয় লেজের থেকে, জাতির জীবনেরও পচন শুরু হয় ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশী বা স্বার্থ চিন্তা থেকে। বাংলা তথা ভারতের পরাধীনতার মূলেও ছিল ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুশি এবং স্বার্থজনিত চিন্তা চেতনার পচন।

রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, উর্মিচাঁদ ইত্যাদি হিন্দু সামন্ত ও অমাত্যগণ নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রতি বিদ্বেষ এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ নানা অপপ্রচার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে নবাববিরোধী ঘৃণা ছড়ানোর পরই মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য ইংরেজদের প্রলোভিত করেছিল। ইংরেজদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য স্বার্থান্ধ সেনাধ্যক্ষ অথর্ব মীর জাফর আলী খানকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য নবাবীর টোপ দ্বারা প্ররোচিত করেছিল। সুতরাং যে অমাত্য আর সামন্তরা নবাবের সহায়ক শক্তি হওয়ার কথা, তাদের মগজে পচন ধরার কারণে বঙ্গদেশকে তথা ভারতকে ইংরেজের পরাধীনতা বরণ করতে হয়েছিল একশত নব্বই বছরের জন্য।

আজকাল আমাদের দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সীমানা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যারা আলাপচারিতা করছে, সাহিত্যের ছলে জনমনে যারা পচন ধরাচ্ছে তাদের রাজবল্লভ, রায়দুর্লভদের বংশধর বা জারজ উত্তরসূরী বলে সন্দেহ করার অবকাশ রয়েছে। কারণ মানুষের যেকোন অসদাচার তার

বংশদোষের কারণেই হয়ে থাকে, পূর্ব পুরুষের দোষ গুণইতো মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে।

ঐসব অসদাচারের প্রতি সরকার যে নীরবতা পালন করছে তার ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। একটা মিথ্যা কথা দশ বার বললে যেমন– বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায়, তেমনি দেশের সীমানা বিরোধী ও নৈতিকতাবিরোধী দায়িত্বজ্ঞানহীন আলাপচারিতাগুলো ধীরে ধীরে আমাদের কিশোর তরুণরা সত্য বলে মনে করে ফেলতে পারে।

যেকোন জাতির জাতীয়তাবোধ একটা অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতিটিকে উজ্জীবিত রাখার জন্য এক টুকরা কাপড়ের তৈরী জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার বিধান বিশ্বের সকল দেশেই আছে। জাতীয় পতাকার যেকোন প্রকার অবমাননাকে জাতীয় অবমাননা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে জাতিয় পতাকা তো দূরের কথা, একশ্রেণী বুদ্ধিজীবী আমাদের জাতিয় পরিচয়ের বিরুদ্ধেই ঘৃণার বীজ বপন করছে এবং সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মনে সে ঘৃণাকে পল্লবিত করে চলেছে।

ইংরেজ শাসনামলে আমাদের চোখে যেটা ছিল দেশপ্রেম, ইংরেজদের চোখে তা ছিল দেশদ্রোহিতা। তখনকার দিনে আমাদের যে আচরণ ছিল দেশপ্রেম, স্বাধীনতার কারণে এখন সেই একই আচরণ আমাদের নিজ চোখেই দেশদ্রোহিতা। যেমন তখন আমরা সরকার বিরোধী শ্লোগান দিয়েছি, আইন অমান্য আন্দোলন করেছি ইংরেজকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য। কিন্তু এখন সেই একই আচরণ আমরা করলে তা হবে আত্মঘাতি দেশদ্রোহী আচরণ।

ইংরেজ রাজত্বকাল আমাদের ইংরেজবিরোধী শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইংরেজরা ড্রামাটিক পারফরমেন্স এক্ট ১৮৭৬ নামে একটি আইন জারি করেছিল ঐ আইনের বলে তারা আমাদের দেশপ্রেমিক মানসিকতাকে কঠোর হস্তে দমন করে এদেশে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করেছে। ঐ আইনে তারা কাজী নজরুল ইসলামের ইংরেজ বিরোধী কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে কবিকে বার বার জেলে পুরেছে, কবির কাব্যগ্রন্থ বিষের বাঁশী, অগ্নিবীণা, ভাঙ্গার গান ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সিনেমা শিল্পের প্রসারের কারণে ১৯৪০ সালে ড্রামেট্রিক পারফরমেন্স এক্ট এর আরও সম্প্রসারণ করা হয় এবং ৪০টি নীতিমালা ভিত্তি করে সর্বপ্রথম ফিল্ম সেন্সর বোর্ড গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক। সিনেমার মাধ্যমে যাতে ইংরেজ বিরোধী প্রচারণা হতে না পারে এবং

দেশে যাতে কোন প্রকার সামাজিক, সাম্প্রদায়িক এবং নৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে না পারে তাই ছিল সেন্সর বোর্ডের লক্ষ্য। কারণ যেকোন বিশৃংখলার ছত্রছায়ায় ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠতে পারে বা প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিশৃংখলাবাদটা বসন্ত রোগের মত। জাতপাত নির্বিশেষে যে কারও মধ্যে সহজেই তা সংক্রমিত হতে পারে, কিন্তু সহজে নিরাময় হয়না। নিরাময় হলেও গভীর ক্ষতের দাগ রেখে যায়। পরাধীন আমলে দেশে যেমন সরকার বিরোধী আন্দোলন হত; যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাহিত্য চর্চা হত, এখন নিজের স্বাধীন দেশেও তেমনি সরকার বিরোধী আন্দোলন হয়। সমাজবিরোধী সাহিত্য চর্চা সুনিয়ন্ত্রিত না হলে মানুষের সংবেদনশীল মানসিকতা সহজেই তদ্বারা প্ররোচিত হতে পারে। একারণে আধুনিক সমাজে শৃঙ্খলার গরজে সেন্সর বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে অনুভূত হয়েছে।

তাই ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতার পর একবার এবং ১৯৬৩ সনে আবার পাকিস্তানের উপযোগী করে সেন্সর বোর্ডের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২, ১৯৭৭ ও ১৯৮৫ সন পর্যন্ত তিনবার সংশোধন করে ঐ আইনটি বাংলাদেশের উপযোগী করে গ্রহণ করা হয়। যেকোন ছায়াছবি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের পূর্বে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়, অন্যথায় ছবিটি প্রদর্শনযোগ্য হয় না।

সেন্সর বোর্ড এর সদস্যগণ বিধিভুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে ছবিগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। নীতিমালার পরিপন্থি কোন অভিনয় দৃষ্ট হলে তারা ছবিটিকে প্রদর্শনের অযোগ্য ঘোষণার ক্ষমতা রাখেন। আমরা এখানে শুধু ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম সংস্কৃতি ও শ্লীলতা সম্পর্কিত নীতিমালাগুলোর উল্লেখ করছি যা লংঘন করলে সিনেমাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিধান রয়েছে:

নীতিমালা-২

১: ক) বাংলাদেশ বা দেশের জনগণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি এবং পোশাক-আশাকের প্রতি যদি কোনভাবে ঘৃণার উদ্রেক করে।

১: খ) স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অখন্ডতা বা সংহতি নষ্ট হয় এমন মনোভাব ব্যক্ত করা হলে।

নীতিমালা-৮

৩:ক) কোন ধর্মকে উপহাস, অসম্মান বা আক্রমণ করা হলে।

৩: খ) ধর্মীয় সম্প্রদায়, ধর্ম বা বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করা বা বিবাধ বাধানোর প্ররোচনা দেয়া।

নীতিমালা-৯

৩: গ) বিতর্কিত সামাজিক বিষয়কে সমালোচনা বা সমর্থন করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা।

৪: ক) নৈতিকতা বিবর্জিত; ক্রিয়াকলাপকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং গুরুত্ব কম দেয়া।

নীতিমালা-১০

৪: খ) নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা এবং আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক করে দেখানো।

৪: গ) নষ্ট ও নৈতিকতাহীন চরিত্রকে প্রশংসা করা এবং সহানুভূতির চোখে দেখা।

৪: ঙ) বিবাহ প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করে এমন কিছু বলা বা প্রদর্শন করা।

নীতিমালা-১১

৪: চ) প্রকৃত অর্থে দৈহিক মিলন, ধর্ষণ, গভীর ভালবাসার দৃশ্য যা অশ্লীলতা দুষ্ট বলে মনে হবে তা প্রকাশ করা,

৪: ছ) নোংরা অশ্লীল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এমন সংলাপ গান বা বক্তব্য তুলে ধরা।

৪: জ) প্রকৃত অর্থে বা ছায়ামুর্তিতে মানুষের শরীরের নিভৃত অংশ প্রকাশ করা অর্থাৎ (১) সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে দেখানো (২) অসংলগ্নভাবে যা চটুল ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে কাপড় চোপড় পরা।

৪: ঝ) অশোভন ও কামুক অঙ্গভঙ্গি করা। এর মধ্যে রয়েছে চুম্বন, গভীর আলিঙ্গন প্রভৃতি। এই উপমহাদেশের ছায়াছবির জন্য এ ব্যাপারগুলো নিষিদ্ধ। তবে শুধুমাত্র বিদেশী ছবিতে চুম্বন দৃশ্য অনুমোদন করা যায়।

এইসব নীতিমালার বিধানগুলো পরিষ্কার। এই নীতিমালার ভিত্তিতে ইংরেজ শাসনামলে বহু পুস্তক নিষিদ্ধ হয়েছে, বহু লেখক, সাহিত্যিককে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে প্রকাশিত পুস্তকাদি পাঠ করে এবং নাটক সিনেমা দেখে বিশ্বাসই করা যায় না ঐ ধরনের কোন আইন আছে। অথবা ঐ আইন প্রয়োগ করার জন্য কোন সরকারী ব্যবস্থা যে আছে তাও মনে হয় না। কারণ:

১) কিছু দেশদ্রোহী লেখক সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যের মাধ্যম ২ নম্বর নীতিমালা লংঘন করে বাংলাদেশ এবং দেশের জনগণের ঐতিহ্য সংস্কৃতি

রীতি নীতি এবং পোশাক আশাককে ভ্রুকুটি করে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। তারা বাংলাদেশের সংহতি এবং অখন্ডতাকে কটাক্ষ করে দেশের সীমানা মুছে ফেলে পরদেশের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। কারণ বাংলাদেশ নাকি শালা শুয়ারের বাচ্চা, আর বাংলাদেশীরা নাকি সব গাধা ও গরু।

২) উক্ত সাহিত্যিক উল্লেখিত ৮ নং নীতিমালা লংঘন করে দেশের আপামর জনসাধারণের ধর্মকে অনবরত উপহাস আক্রমন ও অসম্মান করে চলেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্ম এবং বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিবাদ বাধানোর প্ররোচনা দিচ্ছে। তার কারণে বাঙলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে জানমালের নিরাপত্তা সম্পর্কে দ্বন্ধ সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভারতের কোটি কোটি সংখ্যালঘু মুসলমানের জানমাল বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

৩) ঐ লেখার মাধ্যমে ১০ নম্বর নীতিমালার ৪: ঙ ধারা লংঘন করে ঐ সাহিত্যিক জ্বরায়ুর স্বাধীনতার দাবীসহ বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করে বিবাহ প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করার প্রচারণা চালাচ্ছে।

আইনের এতগুলো ধারা অমান্যকারির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দুরের সরকার নিজেই ঐ ধরনের সাহিত্যকদের টেলিভিশনের পর্দায় হাজির করে সম্মানিত করছেন। বিতর্কিত চরিত্রের অভিনেত্রীদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে ১০ নম্বর নীতি মালার ৪ খ ও গ ধারা লংঘন করছেন।

৪) ভিডিও ক্যাসেট ভর করে দেশে প্রচুর পর্ণ ছবি আসছে। আমাদের দেশের মানুষ ঘরে বসে সে সব অশ্লীল ছবিতে দৈহিক মিলন চুম্বন, আলিঙ্গন বিবস্ত্র নটিদের যৌনাঙ্গ প্রদর্শন অশ্লীল চটুল ইঙ্গিতপূর্ণ অভিনয় ইত্যাদি দেখে নৈতি দৃঢ়তা হারাচ্ছে ধর্মবোধ হারাচ্ছে এবং তাদের দেশপ্রেম সংশয়াপন্ন হচ্ছে। কিন্তু ভিডিও সিনেমা সেন্সর করা হয় না।

ভিডিও সিনেমার মারদাঙ্গা দৃশ্য এবং নায়িকাদের লাস্যময়ী দেহের অশ্লীল প্রদর্শনী দর্শকদের রুচি যেমন বদলে দিচ্ছে তেমনি তদ্বারা সেন্সর বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাচ্ছে। ঐসব ছবির জনপ্রিয়তা দৃষ্টে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা ও অশ্লীল ছবি তৈরীর প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন। হাটি হাটি পা পা করে তারা তাদের ছবিতে চুম্বন আলিঙ্গনের দৃশ্য সংযোজন করতে শুরু করেছেন। জ্বরায়ুর স্বাধীনতা বিলাসি চিত্রতারকারও নিজ নিজ দেহ প্রসারিত করে দিচ্ছে। আর আমাদের সেন্সর বোর্ড সেসব ছবির ছাড়পত্র প্রদান করছেন।

নায়ক রাজ্জাক অনন্ত প্রেম নামে তেমনি একটি ছবি তৈরী করেছেন। ছবিটিতে নায়িকা ববিতার সাথে একটি গভীর চুম্বনের দৃশ্য ছিল। একারণে রাজ্জাক ছবিটির ছাড়পত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সেন্সর বোর্ড ছবিটি পাস করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত রাজ্জাক নিজেই সেন্সরের কাজ করলেন। দর্শকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ঐ দৃশ্যটি বাদ দিয়ে তিনি ছবিটি রিলিজ করলেন। একই ঘটনা ঘটে সোহেল রানার বীরপুরুষ ছবিটি নিয়ে। এই ছবিটিতে নায়িকার গোসলের একটি অশ্লীল দৃশ্য থাকায় সোহেল রানা ছবিটি ছাড়পত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এখানেও সেন্সর বোর্ড ছবিটি পাস করে দেয়। কিন্তু সোহেল রানা নিজেই ঐ দৃশ্যটি বাদ দিয়ে ছবিটি রিলিজ করেন। প্রশ্ন আসে তবে আর সরকারের সেন্সর বোর্ড কি জন্য? দেখে শুনে মনে হয় প্রযোজকরা সেন্সর বোর্ডের চেয়েও বেশী হুঁশিয়ার।

অশ্লীল সিনেমার প্রভাবে আমাদের শ্রদ্ধা শালীনতাবোধ তো গেছেই এখন ধর্মাধর্মবোধও আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং এখন জুরায়ুর স্বাধীনতার দাবী উঠছে আর শেষ পর্যন্ত দেশের সীমানা উঠিয়ে দিয়ে পরদেশের সাথে লীন হয়ে যাওয়ার দাবীও উঠছে। সেন্সর বোর্ড যেমন অশ্লীল ছবির ছাড়পত্র দেয় তেমনি জুরায়ুর স্বাধীনতার দাবী এবং দেশের স্বাধীনতা বিরোধী বক্তব্য ও ছাড়পত্র পেয়ে চলেছে।

বিশালদেহী একটি হাতিকে যেমন মাহুত নামের ছোট একজন মানুষ বশ মানিয়ে রাখে, বিশালদেহের একটি ষাঁড়ও একজন রাখালের বশে থাকে। কিন্তু ষাঁড়টি যখন কাম তাড়িত হয় তখন সে আর রাখাল মানেনা, নিজের গোয়াল চেনে না। ষাঁড়ের ভয়ে তখন সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করে। আমাদের সেন্সর বোর্ডের মনে হয় তেমনি দশা হয়েছে। দেশের সিনেমার বিবস্ত্র নরনারীর জঘন্য চুম্বন আলিঙ্গনের দৃশ্য ও টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে অশ্লীল পোশাকের চটুল ইঙ্গিত পূর্ণ যে ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে এসবের বিশালতার কাছে সেন্সর বোর্ড অসহায় হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। একই বলে প্রশাসনিক দুর্বলতা, যে দুর্বলতার কারণে জাতির জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, যে দুর্বলতলার কারণে যুগে যুগে বহু দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে।

হুমকী

ভালর জন্য খেলাম পানি পড়া, পানি পড়া হল কপাল পোড়া। আজকাল দেশে প্রতিনিয়ত হাজারো ঘটনা ঘটছে যেখানে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় চাইতে গেলে সন্ত্রাসীদের হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়, কখনও কখনও তাদের হাতে নির্যাতিত হতে হয়। ভিটে মাটি ছাড়তে হয় আবার কখনও তাদের হাতে স্ববংশে প্রাণ হারাতে হয়।

মাস্তানরা, সন্ত্রাসীরা, খুনীরা যেন সরকারের উপরের সরকার। সরকার প্রধান এবং দেশের আইন এখন যেন তাদের কথায়ই চলে। থানা, পুলিশ তাদের কথায় উঠে বসে। খুনীদের দ্বারা নির্যাতিত ফরিয়াদি যখন দারোগার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য থানার বারান্দায় বসে অসহায় দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করে, খুনীরা তখন দারোগার অফিসে চেয়ারে বসে চা বিস্কুট খায়, ৫৫৫ ঠোঁটে পুরে খোশ গল্প করে। তাকে তখন দারোগার চেয়ে বড় দারোগা বলে মনে হয়। অথচ ঐ বারান্দায় পড়ে থাকা ফরিয়াদির ট্যাক্সের টাকায় দারোগার বেতন হয়, ঐ ফরিয়াদির কষ্টার্জিত অর্থ লুট করে নিয়ে ঐ মাস্তান ভদ্রলোকের পোশাক পরে দারোগার সাথে এক কাতারে দাঁড়ায়ে ফরিয়াদির পকেট লোপাট করার জন্য নতুন ফন্দি আঁটে।

বিচারের নীতি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে– বিচারের ভুলে দশটা অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাক তবু একজন নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়। কিন্তু হায়! আজকাল দশজন নিরপরাধ মারা পড়লেও একজন অপরাধী ধরা পড়ে না। ধরা পড়লেও তাকে ধরে রাখার যায় না। কারণ তাদের বেশীর ভাগই হয় কোন নেতার চাঁই কিম্বা কোন উপনেতার চামচা, নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ ঘায়েলের হাতিয়ার, প্রতিপক্ষকে সামলে রাখার হাতিয়ার। সুতরাং আইনে যত নষ্ট ধারা আছে, যত নষ্ট ফাঁক-ফোঁকর আছে সেসব ফাঁক ফোঁকর গলে মাস্ত ানদের নেতারা নিজ হাতে গলা ধাক্কা দিয়ে তাদের হাজত থেকে বের করে দেন। মাস্তানরা তখন নিজেদের সরকারের উপর বড় সরকার বলে মনে করে।

এমনি করে অভিযোগ মুক্ত হয়ে এসে সে অভিযোগকারীকে হত্যা করে, নির্যাতন করে, ভাল মানুষ সেজে দারোগা পুলিশের নাকের ডগায় বসে সন্ত্রাসের ষ্টীম রোলার চালিয়ে রাজনীতিকদের অভয়ারণ্যে প্রমোদ ভ্রমণ করে। সরকার যেখানে একজন খুনীকে, একজন দাগী অপরাধীকেও সহজে মৃত্যুদন্ড

দিতে পারে না সেখানে মাস্তানরা খুব সহজে এবং যখন তখন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুবিধান করে চলেছে।

আমি ট্যাক্স বা খাজনা দিতে দেরী করলে সরকার আমার সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ পাঠায়, জরিমানার হুমকী দেয়, হাজার কান্নাকাটি করলেও ট্যাক্স মাফ করেন না। কিন্তু সন্ত্রাসীরা মাস্তানরা, আক্রমণ করে আমার সম্পত্তি লুট করে নিয়ে, আমাকে আহত করে নিহত করে। হাজার কান্নাকাটি করলেও তো সরকার এগিয়ে আসে না, থানার দারোগা আমার ফরিয়াদ গ্রহণ করে না। বরঞ্চ ঐ নালিশের চেষ্টা করার কারণে মাস্তানরা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে স্ববংশে নিধন করে দেয়।

মাস্তানের কবল হতে প্রাণ বাঁচার জন্য থানায় নালিশ করার কারণে যে প্রাণ হারানো একই বলে 'ভালর জন্য খেলাম পানি পড়া, পানি পড়া হল কপাল পোড়া'। গ্রামীন সমাজের বহু সুখ, দুঃখ, বেদনার অনুভূতির ফসল এসব প্রবাদ বাক্য। এই যে গত বছর সারা দেশজুড়ে তোলাপাড় করা ঘটনা ঘটে গেল। প্যারাসিটামল সিরাপ সেবন করে বহু রোগীর মৃত্যু হল, সেসব রোগীরা তো বাঁচার জন্যই ঔষধ সেবন করেছিল। অথচ সেই ঔষধই তাদের মৃত্যুর কারণ হল। ঐ ঔষধটি না খেলে তো তাদের মরার কথা ছিল না। অর্থাৎ ভালর জন্য যে ঔষধ খাওয়া, সেই ঔষধেই তাদের কপাড় পুড়েছিল।

আসলে ঐসব মৃত্যুর জন্য এবং ঔষধের বিষক্রিয়ার জন্য ঔষধটি দায়ী ছিল না। এর জন্য ঔষধ কোম্পানীতে কর্মরত রসায়ন কর্মীদের যারা ঔষধে ব্যবহৃত পদার্থের গুণ মান ও মাত্রার মিশ্রণ নির্দিষ্ট করেন তারা এবং অর্থলোভী ঔষধ কোম্পানীর মালিকেরা প্রাথমিকভাবে দায়ী। কিন্তু মূখ্যভাবে দায়ী সেই সরকার, যে সরকার নিজেদের ক্ষমতার দ্বন্দে সমর্থন দানের জন্য এবং দলের জন্য চাঁদা সরবরাহের উৎস হওয়ার কারণে ঐসব সম্পদশালিদের নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে চান না।

দায়ীত্বজ্ঞানহীন রসায়ন কর্মী বা অর্থলোভী ঔষধ কোম্পানীর হাত হতে মানুষকে রক্ষা করাতো দূরের কথা, খুনীর ছুরির নীচ হতে যখন নিরীহ মানুষকে রক্ষা করতে সরকার ব্যর্থ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। সন্ত্রাসীর হুমকী হতে বাঁচার জন্য সরকারের আশ্রয় প্রার্থনা করার অপরাধে একজন পিতা এবং একজন পুত্রকে সন্ত্রাসীর ছুরিকাঘাতে প্রাণহারাতে হল, একজন মা ও একজন কন্যাকে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত হতে হল, একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে

যাওয়ার এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি নিম্নরূপঃ

শহীদউল্লাহ নামে সেনাবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক মিরপুর তার নিজ বাসায় স্ত্রী, চার কন্যা এবং একমাত্র পুত্র নিয়ে বসবাস করছিলেন। সুবর্ণা নামের বড় কন্যাটির বয়স ১৪ বছর, সর্বকনিষ্ঠ সন্তান পুত্রটির বয়স ৫ বৎসর। বাগদাদ অডিও রেকর্ডিং এর মালিক মাইনুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি শহীদউল্লাহর বাসায় গত নভেম্বর মাস হতে পেয়িং গেষ্ট হিসাবে থাকতে শুরু করে। ডিসেম্বর মাসে মাইনুদ্দিন সুবর্ণাকে বিয়ে করার জন্য শহীদউল্লাহর কাছে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শহীদউল্লাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাইনুদ্দিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং শহীদউল্লাহকে নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখাতে শুরু করে। অডিও রেকর্ডিং সেন্টারের সুবাদে মাইনুদ্দিনের সাথে সন্ত্রাসী মাস্তান দলের যোগ সাজেস আছে জেনে ভয়ে শহীদুল্লাহ ২৬ শে জানুয়ারী পল্লবী থানায় ঘটনার বিবরণ দিয়ে একটি সাধারণ ডায়রী করেন। উক্ত ডায়রীর প্রেক্ষিতে পুলিশ সেদিনই মাইনুদ্দিনকে গ্রেফতার করে থানা হাজতে নিয়ে আসে এবং পরদিন ২৭শে জানুয়ারী তাকে মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে হাজীর করলে সে জামিনে ছাড়া পায়।

২৭শে জানুয়ারী দিবাগত রাত ছিল শবেবরাত। শহীদউল্লাহ তার স্ত্রী, ৪ মেয়ে এবং ৫ বৎসর বয়সের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে শবেবরাতের নামায পড়েছেন। রাত জেগে এবাদত করার এক পর্যায়ে বিছানায় বিশ্রাম নিতে গেলে মাইনুদ্দিন তীক্ষ্ম ছোরা হাতে নিয়ে তার কোঠায় ঢুকেই প্রথমে ছেলেটিকে জবাই করে পরে শহীদুল্লাহর বুকে উপর্যুপরী তিনবার ছুরিকাঘাত করলে তিনি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আর্তচিৎকার শুনে পাশের কোঠা হতে স্ত্রী) শাহনাজ বেগম (৩৭) এবং বড়মেয়ে সুবর্ণা (১৪) ছুটে এলে মাইনুদ্দিন তাদেরও ছুরিকাঘাত করে।

দিনের বেলায় হাজত হতে জামীনে ছাড়া পাওয়া মাইনুদ্দিন রাতের মধ্যে দুটি মানুষকে হত্যা অপর দু'জনকে জখম করে একটি পরিবারকে লন্ড-ভন্ড করে দিয়ে পরদিন আবার হাজতে ফিরে এল। ঐ কয়টি ঘন্টার জন্য যদি সে ছুটি না পেত তবে অতগুলি নিরীহ মানুষ জীবন হারাত না। আর শহীদুল্লাহ যদি জীবনের মায়ায় পুলিশী পানি পড়া না খেতো তবে হয়তো জীবনে মরতে হতো না। কারণ একদিনের হাজতবাসই মাইনুদ্দিনকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। মনে হয় যেন আইন তাকে ক্ষিপ্ত হতে বলে দিয়েছিল এরকম ভাবার কারণও

রয়েছে। জামীনে হাজত হতে বেরিয়ে এলে সন্ত্রাসীদের তৎপরতা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায় সেরকম খবর প্রতিনিয়তই পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। এর মাত্র চারদিন পূর্বে জগন্নাথ কলেজেও এমনি ঘটনা ঘটেছে।

কলেজে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং পুরানো ঢাকায় চাঁদা আদায়ের অভিযোগে পুলিশ জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্রকে একবার গ্রেফতার করেছিল। ২৩ শে জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে সে হাজত থেকে ছাড়া পায়। পরদিন ২৪ তারিখে সে কলেজ ক্যাম্পাসে এসে ২০/২৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এত দুইজন কলেজ কর্মচারীসহ একজন ছাত্রনেতা আহত হয়।

এসব দেখেশুনে মনে হয় যেন সন্ত্রাসীরা থানা হাজতে যেতে পারলে তাদের শক্তি সাহস আরও বেড়ে যায়। তারা সহজে ছাড়া পেয়ে যায় এবং যে খুন তাদের দ্বারা হওয়ার কথা নয়, থানা হাজত থেকে বেরিয়ে এসে তারা সে খুনও করে। তার কারণ তারা রাজনীতিকদের দোসর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাদের বহু খুন মাফ হয়ে যায়। যেমন সায়েদাবাদের মুন্নাবাহিনী।

মুন্না সড়ক পরিবহন সংস্থার একজন কর্মচারী নিজেকে পরিচয় দেয় ক্ষমতাসীন শ্রমিক দলের নেতা, একজন এমপির সহচর, একজন মন্ত্রীর বাড়ীর কাছের লোক এবং ওসির সোর্স ইত্যাদি হিসাবে। সুতরাং সন্ত্রাসে তার একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। জমীদারীর খাজনা আদায়ের মত বহুকাল হতে সে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে চাঁদা আদায় করে আসছে। যত অপরাধই করুক না কেন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে না। সে নাকি সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে সরকারি দলের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে। সুতরাং পুলিশ তার গায়ে হাত দিতে পারে না।

গত বছরের মাঝামাঝি মুন্না তার প্রতিবেশী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী লাকীকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। তাতে বিফল হয়ে মুন্না লাকীর নাভীতে ভাঙ্গা গ্লাস ঢুকিয়ে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু লাকীর চিৎকার শুনে বাড়ীর লোকজন ছুটে আসায় হত্যা করতে পারেনি। মুন্না হুমকী দেয় এই ঘটনা যদি কাউকে জানানা হয় বা পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট করা হয় তবে লাকীর পরিবারকে শেষ করে দেয়া হবে।

ডেমরা থানায় মামলা দিতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। লাকীর পরিবারের লোকজনও ভয়ে আর মুখ খুলত সাহস করেনি। কিন্তু লাকীর হাসপাতালে ভর্তির কারণে সংবাদটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়ে যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে লাকীর পরিবারের উপর মুন্নার অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। উল্টো মামলা দায়ের করে লাকীর বড় ভাইকে হাজতে ঢুকায়, লাকীদের

বাড়ীতে সদলবলে হামলা চালিয়ে লাকীদের টেলিভিশন, ভিসিআর, ডেকসেট, ১২ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে যায় এবং যাওয়ার সময় সোফাসেটগুলি ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়ে যায়।

এসব সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ পেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আদেশে মুন্নাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু মুন্না আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। জামিন পেয়েই মুন্না সায়েদাবাদ ছেড়ে যাওয়ার জন্য লাকীদের হুমকী দেয়। বিপর্যস্ত লাকী আইনের আশ্রয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ২২শে আগষ্ট ১৯৯৩ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অসহায়ত্বের ঘটনা উপস্থাপন করে এবং দেশের পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা অবহিত হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আবার মুন্নাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন এবং অনেক পরে মুন্না গ্রেফতার হয় এতদিন পর এ সময়ে এসে মুন্নাকে চাঁদাবাজী, মাস্তানী ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ সড়ক শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে বহিস্কার করা হয়।

শুধু এই এক মুন্নাই নয়। সারাদেশে অমন হাজার হাজার মুন্না সন্ত্রাসী করে বেড়াচ্ছে। সে সব মুন্নাদের হুমকীর ভয়ে দেশময় হাজার হাজার মানুষ স্বপরিবারে ভীত-সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করছে এবং কখনও কখনও প্রাণ হারাচ্ছে। কখনও বা ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যে চৌকিদার মানুষের ট্যাক্স খায় সেই চৌকিদারও এখন আর চৌকি দেয় না।

গত বছর জানুয়ারী মাসে সবুজবাগ থানার গার্মেন্টস শ্রমিক পারভীনের স্বামী সালাউদ্দিনের বাসা থেকে মাস্তান শওকত তার সঙ্গী সাথী নিয়ে এসে জোর পূর্বক তিন হাজার টাকা নিয়ে যায়। ঘটনাটি থানায় জানানোর কারণে প্রতিরাতেই ছিনতাইকারী অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য হুমকী দিতে থাকে। অবশেষে তারা ২৭শে জানুয়ারী সালাউদ্দিনকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে ফেলে।

গত বছর ২৮শে আগষ্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানাধীন গোপীনাথপুর বহুমুখী সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ নিহত ফয়েজ মাষ্টারের স্ত্রী ৫টি নাবালক সন্তান সাথে নিয়ে হাজির হন। তিনি অভিযোগ করেন সমিতির কিছু কর্মকর্তা কর্তৃক চার লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তোলায় তারা ফয়েজ মাষ্টারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ ব্যাপারে দায়েরকৃত মামলাটি তুলে নেয়ার জন্য নিঃস্ব পরিবারটিকে অনবরত জীবননাশের হুমকী দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

গত বছর আগষ্ট মাসে মংলা থানার মাছ মারা গ্রামের দিন মজুর মালেক জমাদারের কন্যা পারভীন আক্তারকে স্কুলে যাওয়া আসার পথে কুমারখালী গ্রামের সাহিদ হাওলাদার প্রেম নিবেদন করতে থাকে। বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবশেষে ১৮ই আগষ্ট ১৯৯৩ তারিখে রাত ২টায় সন্ত্রাসী দল নিয়ে অস্ত্রের মুখে পারভীনকে তুলে নিয়ে যায়। ১৯ তারিখে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে পালিয়ে এসে থানায় মামলা দিতে গেলে একটি প্রভাবশালী মহলের টেলিফোনের কারণে থানা মামলা না নিয়ে কাগজপত্র রেখে পারভীনকে তাড়িয়ে দেয়। সন্ত্রাসীচক্র তার মা, বাবা, ভাইকে তুলে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। এ ব্যাপারে মামলা হলেও আসামীরা ধরা পড়েনি। এক সময় হয়তো দেখা যাবে ঐ মাস্তানরা আবার মঞ্চে হাজির হচ্ছে, আবার পারভীনকে শাসাচ্ছে। অপহরণ করছে, ধর্ষণ করছে আর মাস্তানে পুলিশে দূরে দাঁড়িয়ে গলাগলি করে তামাশা দেখছে। আর রাজনীতিকরা অনতিদূরে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবার গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরে অনতিবিলম্বেই তারা দেশের মানুষকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে দেবেন।

তাদের তারস্বরে বক্তৃতা এবং মাস্তানদের হাততালির কারণে পারভীনদের আর্তবিলাপ শোনা যায় না, পারভীনরা দুঃখ বেদনার ভার নিয়ে তখন দুঃখ সাগরের অতলে তলিয়ে যায়।

ডাংকী টিচারস মাংকী বয়েজ

প্রাচীন মানুষেরা গুহায়-গহবরে, অরন্য বনানীতে জন্তু জানোয়ারের সান্নিধ্যে বসবাস করত একথা আমরা জানি। উদার উদাম অরণ্যে বসবাস করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রকৃতির রুদ্র-রোষের মোকাবিলা করে চলতে হত। কখনও ঝড় ঝঞ্ঝায় প্রকৃতিতে যে তান্ডব সৃষ্টি হত তাতে মানুষের জীবনও লোকালয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত, আবার কখনও বিভীষন জন্তু জানোয়ারের আক্রমনে জীবন বিনষ্ট হত। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ বালাই, বিপদ আপদ এবং জন্তু জানোয়ারের হিংস্র থাবাকে তার অপদেবতার ক্রিয়া হিসাবে গন্য করত।

বিশাল অজগর সাপ মানুষসহ গরু ছাগল এবং বন্য জন্তু জানোয়ার গলাধঃ করন করে ফেলে দেখে তারা তাকে অপদেবতা হিসাবে গণ্য করতে থাকে। ইঁদুর শস্যকনা সহ খাদ্য দ্রব্যাদি বিনষ্ট করে ফেলে দেখে তাকেও অপদেবতা হিসাবে গণ্য করতে থাকে। অবশেষে মানুষের মনে এক সময় এমন বিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে যে তাদের বহু আচরন হয়তো অপদেবতাদের পছন্দ হয়না, তাদের ভুল ভ্রান্তি অন্যায় আচরণের কারণেই হয়তো অপদেবতারা রুদ্র রোষে ফেটে পড়ে মানুষের উপর প্রতিশোধ নেয়।

সুতরাং নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানুষ অপদেবতাদের সন্তুষ্টি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। মানুষ বুঝতে পারে যে অপদেবতার আক্রোশ করে আত্মরক্ষা করতে হলে প্রকৃতির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর আত্মসমর্পন করতে হবে এবং অপদেবতার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য উপযুক্ত স্তুতিবাক্য রচনা করে তদ্বারা পূজা করতে হবে। তাছাড়াও নিজেদের আচার-আচরণকে উদ্দেশ্যমূলক নীতি নিয়ম বিধি বিধান দ্বারা এমনভাবে শৃংখলিত করতে হবে যাতে অপদেবতারা রুষ্ট হওয়ার সুযোগ না পায়। এমনি করেই মানব সমাজে একদিকে সুশৃংখল জীবন যাত্রার নিয়ম-কানুন পালন করার ধারনার উদ্ভব হয় অপরদিকে অপদেবতাদের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য নানা পুজা অর্চনার মানষিকতার উদ্ভব ঘটে। তারা সাপকে তুষ্ট রাখার জন্য মনসা পূজার প্রচলন করে, ইঁদুরকে তুষ্ট রাখার জন্য তারা ইঁদুর পূজা করে এবং এসব পুজা হিন্দু সমাজ আজও প্রচলিত আছে।

এই পূজা অর্চনা এবং নিয়ম কানুন মানব সমাজে বিরাট পরিবর্তণের সূচনা করে। এসব নিয়ম কানুনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সভ্য জীবনের সূচনা হয়েছিল। আর অপদেবতার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য মানুষ যে স্তুতিবাক্য রচনা

করেছিল সেই স্তুতিবাক্য ভর করে ধর্মের শুভ যাত্রা শুরু হয়েছিল। কালে ঐ স্তুতিবাক্য হয়ে যায় মন্ত্র, আর ঐ মন্ত্র উচ্চারনই হয়ে যায় ধর্মাচার।

কিন্তু মানুষের জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। এক পুরুষে তৈরী মন্ত্র পরবর্তি পুরুষ খুঁজে পেতনা। তাদের উপর যত বিপদ আপদ বালা মুসিবত আসত, তারা মনে করত মন্ত্র তন্ত্র না জানার কারনেই সেসব বালা মুসিবত আসে। সুতরাং মানুষ তাদের কষ্টের তৈরী মন্ত্র গুলিকে ধরে রাখার জন্য এবং অপদেবতার সামনে মন্ত্রপাঠের পদ্ধতি গুলিকে পরবর্তি পুরুষে উত্তরনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। তাদের এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ফলই হচ্ছে ভাষার আবিষ্কার।

অপদেবতাকে খুশী রাখার জন্য মন্ত্রসহ নানা প্রথা পদ্ধতির আবিষ্কার এবং সে সব লিপিবদ্ধ করে রাখার উপায় হিসাবে ভাষা আবিষ্কারের জন্য আদি মানব যত মেধা, শ্রম এবং অধ্যাবসায় ব্যয় করেছে জীবন যাত্রার আর কোন একটি ক্ষেত্রে সে সময়কার মানুষ অত অধ্যাবসায় বা শ্রম ব্যয় করেনি, অত মেধার চর্চা করেনি। অর্থাৎ জীবনের নিরাপত্তা ও সুখ শান্তির গরজে মানুষ ধর্ম চর্চার প্রতি অনুপ্রানিত হয়েছে, নিজেদের উদ্ভাবিত প্রথা ও পদ্ধতিগুলি পরবর্তিদের জন্য রেখে যাওয়ার গরজে মানুষ লেখা পড়া আবিষ্কার করেছে এবং ধর্মীয় প্রথা পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ সভ্যতার স্বাদ আস্বাদন করেছে। এই মেধা চর্চার মাধ্যমে মানুষের যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির সাথে সাথে মানুষের কৃষ্টি চেতনারও উদ্ভব ঘটে। মানুষ তার উদ্ভাবিত ধর্ম ও শিক্ষা চর্চার জন্য দুটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার প্রথমটি হচ্ছে বাড়ীতে একটি উপাসনালয় স্থাপন করে ধর্মচর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং তদ্বারা নিজের আত্মিক এবং সামাজিক শৃংখলা নিশ্চিত করা। এতদুদ্দেশ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধরা নিজ নিজ বাড়ীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে আর মুসলমানরা তার বাড়ীতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে যেমন ধৈর্য, ত্যাগ, আত্মনিয়ন্ত্রন, পরার্থকামনা, দান-দক্ষিণা ইত্যাদিসহ সামাজিক আদান-প্রদানের দ্বারা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা বেড়েছে, অপরদিকে তেমন সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আদিকাল হতে শুরু করে এই ধারা আজও বর্তমান আছে। আজও মানুষ দান-দক্ষিনা সহমর্মিতা ইত্যাদিকে পূর্ণকর্ম হিসাবে গন্য করে চলেছে। দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে ধর্ম শিক্ষার জন্য বাড়ীতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। তখনকার দিনে ব্রাক্ষণ ঠাকুরের বাড়ীতে ঢোল চতুষ্পাঠী এবং মিয়া বাড়ীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করাকে শ্লাঘার বিষয় বা

আভিজাত্যতার পরিচায়ক হিসাবে মনে করা হত। সে সময় অর্থনীতি, রাজনীতি বা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা, সে সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাও ছিল না। মানুষের অসুখ বিসুখ ছিল। কিন্তু ডাক্তার ছিল না বা ঔষধ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। ধর্মগ্রন্থের গাছ গাছালি দ্বারা চিকিৎসার পদ্ধতি ছিল। সুতরাং চিকিৎসার জন্য মানুষকে ধর্মগ্রন্থের মুখাপেক্ষি হতে হত এবং ধর্মগুরুর নিকট হতে চিকিৎসার বিধান গ্রহণ করত।

আবার ধর্মশিক্ষার মধ্যেই মানুষ রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আস্বাদ পেত। ধর্মজ্ঞানে গুণী ব্যক্তিই রাজা হতেন যে কারণে বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মনরাই রাজা হতেন। এজন্য প্রাচীনকাল হতেই ধর্মচর্চার লাভালাভ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এবং ধর্মের গুরুত্ব ও মাহাত্ম প্রচারের জন্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে হৃদয়গ্রাহি নানা উদাহরণ উপমা, নানা রসালো কাহিনী, এমনকি দেবতাদের সম্পর্কিত অলৌকিক এবং কাল্পনিক কাহিনীও ধর্মতত্ত্বের নামে আকর্ষনীয় করে সংযোজিত হত। তৎকালে সে সব কল্পকাহিনী ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে এমন সাহিত্যরস সিঞ্চন করত যে মানুষ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী কেউ ধর্মের নামে সাহিত্যরস উপভোগ করত আবার কেউ সাহিত্যের নামে ধর্মচর্চা করত। উদাহরণ হিসাবে প্রাচীনকালে রামায়ন মহাভারতের উল্লেখ করা যেতে পারে যাকে একাধারে কাব্য, ইতিহাস এবং বহু উপাখ্যান সমৃদ্ধ এবং রসসমৃদ্ধ এক অনন্য সাহিত্য সম্ভার বলা চলে।

যুগ যুগ ধরে রামায়ন মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে হিন্দু সম্প্রদায় যাত্রা, থিয়েটার নাটকের অনুষ্ঠান করে আসছে। বর্তমান সময়ে এসে রামায়ন মহাভারতের কাহিনী ভিত্তিক বহু সিনেমাও তৈরী হয়েছে। তবু মানুষের সাহিত্য তৃষ্ণা নিবৃত হচ্ছেনা। তার একমাত্র কারণ এ শুধু সাহিত্যই নয়, মূলে এটি ধর্মকথা এবং একারণেই এর প্রতি মানুষের এই সীমাহীন আকর্ষন। ভারতীয় দূরদর্শনে প্রদর্শনের জন্য সেখানে রামায়ন মহাভারতের সিরিজ নাটক তৈরী হয়েছে। প্রতি রবিবার সকালের অধিবেশনে বহুদিন পর্যন্ত তা দূরদর্শনে প্রদর্শিত হয়েছে।

আমাদের দেশের এক লেখিকা ভারতে বেড়াতে গিয়ে এক রবিবারের সকালে কলকাতার রাস্তা জনশূন্য দেখে লিখছিলেন:সকাল দশটার দিকে রাস্তায় হাঁটছি আর অবাক হচ্ছি কলকাতাকে এত ফাকা লাগেনিতো কখনও! যেন পুরা কলকাতা কোথাও নিমন্ত্রন খেতে গেছে। বিকেলে তারাপদ রায়ের বাড়ী গিয়ে শুনলাম রোববার সকালে কলকাতা কলকাতাতেই থাকে, তবে ঘরের বাইরে বেরোয় না, কারণ দূরদর্শনে তখন 'মহাভারত' দেখায়।

রবিবারে সকল সংসার কর্ম বন্ধ করে দিয়ে পুরো একটা শহরের মানুষ কি শুধু নাটকই দেখে? দেশে নাটকের কি এতই আকাল রয়েছে। না, আসলে নাটক দেখার জন্য নয়। নাটকের আবরনে ধর্মীয় মাহাত্ম দেখার জন্য, শুনার জন্য এবং নাটকীয়তার মাধ্যমে অন্তর দিয়ে ধর্মকে উপলব্ধি করার জন্যই সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধার শিহরণ নিয়ে ঘরে বসে থাকে। এমনি করেই সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মকে মানুষের অন্তরে গ্রথিত করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে ধর্ম কত বেশী করে মানুষের জীবনের জন্য আবশ্যকীয়।

শুধু রামায়ন মহাভারতই নয়, মানুষের ধর্ম তৃষ্ণার কারণে মানুষ সকল ধর্ম গ্রন্থেই রোমান্টিক কাহিনীর অন্বেষন করেছে যাতে সাহিত্যের ঢঙে ধর্মকে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমন ইসলামের কোরআনে ইউসুফ জোলায়খা প্রণয় সম্পর্কে অতি সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কিন্তু পারস্যের রোমান্টিক কবিগন ঐ ছোট কাহিনীটিকে পল্লবায়িত করে বিশাল রোমান্টিক কাব্য রচনা করেছেন যার নাম হয়েছে ইউসুফ জোলায়খা। এই কাব্যের ছায়া অবলম্বনে আবার রচিত হয়েছে লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ ইত্যাদি বহু সাহিত্য সম্ভার।

যাহোক। সভ্যতার গরজে মানুষ ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধর্মকে সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বৈদিক সমাজ ধর্মকে সাহিত্যাশ্রয়ী করেছে। সুতরাং মানুষ সহজেই ধর্মশিক্ষা উপলক্ষ করে টোল চতুষ্পাঠীতে গিয়ে ধর্মভিত্তিক সাহিত্য পাঠ করে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হত। কিন্তু টোল চতুস্পাঠীতে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করলেই পান্ডিত্য লাভ হত না। জ্ঞান লাভের পরিপূর্ণতার জন্য শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা গুরুর স্নেহভাজন হতে হত। দেবমন্দিরের সেবায়েৎ আর গুরুগৃহের শিষ্যের আচরনে পার্থক্য থাকত না বলে শিষ্যের কাছে গুরুগৃহ ছিল শিক্ষামন্দির সদৃশ। যে পর্যন্ত গুরু তার শিষ্যের আচার-আচরণ এবং অধ্যবসায় দৃষ্টে তার প্রতি সন্তুষ্ট না হতেন সে পর্যন্ত শিষ্যের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হত না।

সেকালের ঢোল চতুস্পঠীর ছাত্ররা সাধারণত গুরুগৃহে অবস্থান করত এবং অধ্যয়ন ছাড়াও একজন গৃহ ভৃত্যের মত চাষাবাদ হতে শুরু করে গুরুর গৃহস্থালীর সকল কার্য সম্পাদন করে গুরুর সন্তুষ্টি আদায় করার জন্য সচেষ্ট হত। শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে যেদিন গুরু তার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা দিতেন সেদিন শিষ্যের শিষ্যত্ব শেষ হত এবং দিব্যজ্ঞান লাভের মত তার সকল জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে বলে মনে করা হত।

কিন্তু জ্ঞান লাভ হয়ে গেলেও শিক্ষকের প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন শেষ হত না। অতি প্রাচীন কাল হতে শিক্ষাগুরুকে পিতৃ সমতুল্য জ্ঞান করা

হয়ে আসছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে গুরুর পিতৃতুল্যতাকে বিধিবদ্ধকরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সংসারে মানুষের পাঁচজন পিতা রয়েছে, যাদেরে শাস্ত্রে পঞ্চপিতা বলা হয়েছে। এই পঞ্চপিতার হচ্ছেন জনক, শিক্ষক, শ্বশুর অন্নদাতা এবং ভয়ত্রাতা। অর্থাৎ জন্মদাতা পিতার পরেই শিক্ষাগুরুকে এবং তারপর শ্বশুরকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এই বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিক পর্যন্ত পাঠশালার ছাত্রদের শিক্ষাগুরুর ফসলের ক্ষেত্রে কাজ করতে আমরা দেখেছি। আজও যেকোন মেধাবী ছাত্র এবং প্রকৃত জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিকে তার শিক্ষা গুরুকে পথে ঘাটে দেখলে তার পাদস্পর্শ করে সালাম করতে দেখা যায় এবং তার সামনে আসামীর মত বা একটি ছোট শিশুর মত শ্রদ্ধাবনত হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়।

শুধু বিদ্যালয়র শিক্ষাগুরুই নয়, যার কাছে জীবনে একদিনও একটি জ্ঞান লাভ হয়েছে তাকে গুরু হিসাবে গণ্য করে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মুসলমানের ইমাম আবু হানিফা (রঃ)। তিনি ধর্ম গবেষনার পাশাপাশি পশু পাখি নিয়েও গবেষনা করতেন। কথিত আছে কুকুর কখন সাবালক হয় ইমাম সাহেবের তা একসময় জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি কারও কাছে এ প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিলেন না। এক ব্যক্তি তাকে জানাল যে শহরের ঝাড়ুদার হাম্মাদ অনেকগুলি কুকুর পোষে। সে হয়তো এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবকে সাহায্য করতে পারবে। ইমাম সাহেব ঝাড়ুদারের কাছে গিয়ে জানলেন সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুকুর পেশাব করার সময় বসে পেশাব করে। কিন্তু সাবালক হওয়ার পর সে পেছনের এক পা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে।

ঐ ঘটনার বহুদিন পর একদিন ইমাম সাহেব শহরের জ্ঞানী গুনীদের সমবিব্যহারে নিজ আস্তানায় বসে ধর্মতত্ব আলোচনা করছিলেন। এমন সময় কোন কার্যোপলক্ষে সেই ঝাড়ুদার হাম্মদ সেখানে এসে উপস্থিত হয়। হাম্মদাকে দেখামাত্র ইমাম সাহেব সসম্মানে দাঁড়িয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। এত দৃষ্টে সভাসদগন হতবাক হয়ে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম সাহেব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন তিনি হাম্মাদকে গুরু হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। তিনি আরও বললেন: "যদিও হাম্মাদের বাড়ী আমার বাড়ী হতে সাত গলি দূরে তবুও আমি তার বাড়ীর দিকে পা মেলে বসিনা।"

হাজার হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে যে সব মনীষীরা বিচরণ করে গেছেন এবং যাদের মেধা মননশীল পরিচর্যায় পৃথিবীতে সভ্যতা পল্লবীত ও পুষ্পীত হয়েছে তারা সকলেই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন। তাদের সকলের গুন গরিমার মূলে যে শিক্ষাগুরুর স্নেহসিক্ত

আশীর্বাদ ছিল এই তথ্যটি তারা গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এই বিংশ শতাব্দির প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত গুরু ভক্তির এই তথ্য সত্য ছিল। শতাব্দির শেষার্দ্ধে এসে স্বাধীনতার নামে, গনতন্ত্রের নামে এক শ্রেণীর শ্রদ্ধাবোধ বিরোধী মানুষ ধর্মবোধ এবং মূল্যবোধের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব সন্দেহ সৃষ্টি করে মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে ফেলেছে।

বর্তমান সময়ের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে এক শ্রেণীর শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা জ্ঞান সাগরের কনামাত্র মন্থন করে তা থেকে অনুমাত্র জ্ঞান আহরণ করেই অহঙ্কারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ খোদায় আর বিশ্বাস করে না। শিক্ষার মৌলিক ধারনা ভুলে গিয়ে ঐ অহঙ্কারী মানুষগুলি নাস্তিক হয়ে যায়। নাস্তিকদের নিজ মগজই যেখানে শূন্য সেখানে তারা শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের কি প্রদান করবে? অথচ আজকাল ঐ শূন্য মগজ নাস্তি কদেরই শিক্ষাকতা পেশায় অধিষ্ঠিত দেখা যায়। সুতরাং ছাত্ররা এই নাস্তিক শিক্ষকদের মধ্যে শ্রদ্ধা করার মত কোন গুণ খুঁজে পায়না। ছাত্ররা ঐ নাস্তিক শিক্ষকদের প্ররোচনায় গুরুভক্তিকে একটি প্রাচীনপন্থি ধারনা হিসাবে গন্য করতে শিখেছে। ফলে আজকাল প্রায়শই পত্রিকার সংবাদে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোথাও না কোথাও ছাত্ররা শিক্ষকদের লাঞ্চিত করছে, শিক্ষককে প্রহার করছে। বরঞ্চ ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক প্রহারের ঘটনা এখন এক মর্মান্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সুতরাং শিক্ষক প্রহারকারী এই ছাত্ররা শিক্ষকের স্নেহধন্য হয়ে জ্ঞানীয় হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ এরা ঐশ্বরীক উপায়ে অভিশপ্ত হয়ে থাকে। এরাই শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র-রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। এরা শিক্ষকদের অভিশাপসহ অন্য সকল বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জন বিঘ্নিত করার কারণে ক্ষুদ্ধ মানুষের অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে এক সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজের ঘাড়ে এসে চেপে বসে।

যে ছেলে শহরের শিক্ষা জীবন শেষ করে বড় কোন কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত গ্রামে এসে মানুষের শিক্ষা দীক্ষা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করার, মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াবার, মানুষের রুজী রোজগারের পথ ও পন্থা চিন্তা করার কথা সেই ছেলের মাথায় সেসব করার মত বুদ্ধিমত্তা কাজ করে না। সে এখন গ্রামে চাঁদা তোলে, ক্লাব ঘর তৈরী করে আড্ডামারে, রাত্রি বেলা কখনও ক্লাব ঘরে বসে মদ খায়, দলাদলি করে, মারামারি করে এবং গ্রাম শুদ্ধ মানুষের রাতে ঘুম হারাম করে। সে দলাদলি মারামারি ছেড়ে দিতে চাইলেও এখন ছেড়ে দিতে পারে না। কারণ সে এখন যুতটুকু মা-বাবার সন্ত ান তার চেয়ে বেশী করে সে এখন রাজনৈতিক দলের মাস্তান। মা-বাবার

এখন আর তার পকেট খরচ চালাতে হয়না। হরতালের সময় হলে, মিছিলে সময় হলে, এম.পি সাহেব তার হাতে কড় কড়ে নোট গুঁজে দেন। এতে যতোদিন চলে ততদিন সে নেতা। এ টাকা শেষ হয়ে গেলে আবার সেই চাঁদাবাজী বা কখনো কখনো ছিনতাই। এছাড়া আর উপায় কি?

এক সময় ধর্মের প্রয়োজনে, ধর্মদ্বারা, ধর্ম ভিত্তি করে যে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল সে শিক্ষাকে এখন ধর্মের বন্ধন মুক্ত করে বিধবা বৃদ্ধার মত বিবসনা করে দেওয়া হয়েছে। একসময় শিক্ষার প্রধান উপচার ছিল গুরুভক্তি আর গুরু ছিলেন ঋষিতুল্য। কিন্তু এখন নাস্তিক শিক্ষকরা যেন গর্দভ গুরু আর তারা তৈরী করছেন বানর শিষ্য। এই বানর শিষ্যদের দিয়েই শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকেরা রাজনীতির মঞ্চে বানর নাচের খেলা দেখান।

রাজনীতিকরা ঐ ছাত্রদের হাতে কখনও দশ টাকা দামের একখানা নীতি কথার বই তুলে দেন না, কিন্তু অস্ত্রবাজির জন্য লক্ষ টাকার অস্ত্র তুলে দিয়ে সন্ত্রাসের মাঠে ছাত্রদের ঘোড়া চাবকানোর মত চাবকিয়ে থাকেন। জ্ঞান চর্চায় মনোযোগী হওয়ার জন্য রাজনীতিকরা ছাত্রদের কখনো উপদেশবানী খয়রাত করেন না। কিন্তু মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে নেতাদের আন্দোলন জোরদার করার জন্য প্রতিনিয়ত জ্বালাময়ী ইন্ধন সিঞ্চন করেন। ঐ ইন্ধনে ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষের আগুনে তাদের মগজ টগবগ করতে থাকে।

উর্বর মাটিতে ফেললে যে ধান হতে গাছ গজিয়ে শষ্য শ্যামল রূপ ধারন করে, সেই ধানই খোলায় পড়লে খৈ হয়ে ফুটে শেষ হয়ে যায়। ছাত্রদের মেধাও তেমনি। শিক্ষকের আদেশ উপদেশের মধ্যে একনিষ্ঠ থাকলে ছাত্রের যে মেধা জ্ঞানে-গুনে পল্লবায়ীত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারত, সেই মেধাই রাজনীতিকদের হিংস্র প্ররোচনায় টগবগ করে উঠে। তাদের মেধার এই টগবগানীর নামই সন্ত্রাস। এই সন্ত্রসের কারণে বিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞান চর্চার সময় সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তৎস্থলে ছুরি-চাকু ও গুলি চর্চার কারণে ক্যাম্পাসগুলিতে দিনের পর দিন আহতের সংখ্যা নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক পশুত্বের দংশনে আজ ছাত্ররা জ্ঞানে মারা যাচ্ছে প্রানেও মারা যাচ্ছে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আমরা দেশ বাসীরা তাদের অজ্ঞান আচরনের প্রতিফল ভোগ করছি। যেমন:

১। শিক্ষা জীবন শেষে ছাত্রদের ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক অঙ্গিকারের কারণে তাদের ছাত্রত্ব শেষ হয় না। বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন বয়সসীমা না থাকার কারণে তারা প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় যে কোন বিষয়ে অধ্যয়নের নামে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্রত্ব দীর্ঘায়ীত করে

নিয়ে সন্ত্রাসী ও মাস্তানীর ধারা অব্যহত রাখে। এই পেশাদারী ছাত্রত্ব অবস্থায় বহাল থেকেই তারা বিয়ে সাদী করে, বৌ-বাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার করে। তাদের সংসার জীবন যাত্রা জন্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিযোগিতামুলকভাবে অনির্দিষ্ট উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে। সুতরাং সন্ত্রাসকর্মকে তারা জীবকা হিসাবে গ্রহন করে নিশ্চিন্ত মনে ঐ কর্ম চালিয়ে যায়।

এরা সন্ত্রাস কর্মে প্রায়শই নিজেরা খুনও হয়। আর খুন হলে এদের জন্য নেতা নেত্রীদের কুম্ভীরাশ্রুবর্ষন করতে এবং অকালবৈধব্য প্রাপ্ত যুবতী বধুদের পিঠে হাত বুলিয়ে সমবেদনা জানতে দেখা যায়। আর যারা ছাত্রত্ব শেষ করে সংসার জীবনে এসে জায়া-জননী, পুত্র-কনার ভরন-পোষন নিয়ে প্রানান্ত ব্যস্ত থাকে, আন্দোলনের মোক্ষম সময়ে রাজনীতিকরা তাদেরও স্মরণ করেন। বেচারারা তখন হারানো দিনের দলীয় অঙ্গিকার স্মরণ করে এবং রাজনীতির জিয়ন কাঠির ছোঁয়া পেয়ে তেজে বীর্যে জ্বলে উঠে। ঘরে কান্না কাতর বৌ-বাচ্চা ফেলে, অফিসে কর্তব্য ফেলে তারা মুখে আল্লাহু আকবর নিয়ে মিছিল নিয়ে গোলাগুলির সামনে হাজির হয়। গাড়ী ঘোড়া ভেঙ্গে আন্দোলন সফল করে তারা প্রায়শই লাশ হয়ে মিছিলের শোভা বর্দ্ধন করে, গুরুত্ব বৃদ্ধিকরে, আর বেঁচে গেলে– নেতাদের থ্যাংকু গ্রহণ করে বাড়ী ফিরে যায় অথবা আহত হয়ে হাসপাতাল যায়।

কর্মহীন পুরানোদের ক্ষেত্রে আবার ব্যাপরটা অন্যরকম। এরা রাজনীতিকদের পারমানেন্ট টাউট, আন্দোলনের সময় লাঠিয়াল, অন্য সময় চোরাচালানী, কালোবাজারী, হাইজাকার। পুলিশ তাদের খুনের দায়ে ধরে আনলেও ধরে রাখতে পারে না, নেতাদের হুকুমে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কোর্ট তাদের বিচার করতে পারে না। কোর্টের দেওয়া সাজা মাফ হয়ে যায়। ছাড়া পেয়ে তারা আরও দুর্ধর্ষ হয়ে আরও জঘন্য অপরাধ করে।

সুতরাং আজ সমাজে যত ছিনতাই হয়, যত অপহরণ হয়, যত সন্ত্রাস হয়, যত চাঁদাবাজী হয় তার সবগুলির জন্য দায়ী নাস্তিক শিক্ষকের শিষ্য রাজনীতিকদের ঐ পোষ্যরা।

২। শিক্ষা জীবনে বিদ্যালয়ে সন্ত্রাস-সংঘর্ষ করে রাজনীতিকদের পোষ্যরা দুষ্কর্মে এতই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে চাকুরী জীবনে এসে তারা অফিস, আদালত, শিল্প-কারখানাকেও সন্ত্রাস, সংঘর্ষ এবং আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সেহেতু তারা জ্ঞান চর্চার সুযোগ পায়নি সেহেতু অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের সন্ত্রাসী রাজনীতি যে কি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

৩। এমনিতেই রাজনৈতিক প্ররোচনা ছাত্রদের প্রতিনিয়ত কান্ডজ্ঞানহীন নিষ্ঠুর কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে, তার উপর আবার সেই নাস্তিক শিক্ষকেরা ছাত্রদের নৈতিকতার আবাল্য অভ্যাসগুলিকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফলে এমন বহু ছাত্র তৈরী হয়েছে যাদের কাছে খুন-হরণ-ধর্ষণ এখন আর পাপ বল গণ্য হয় না। নাস্তিকতার কোন শাস্ত্র না থাকায় এদের কোন আচরনবিধি নেই। সে কারণে সেই গর্দভ গুরুর বানর শিষ্যরা কোন দুষ্কর্মকেই দুষ্কর্ম মনে করে না।

৪। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িতরা ছাত্র আন্দোলনের নামে মিটিং-এ, দরবারে শিক্ষক-গুরু, নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী-মিনিষ্টারদের গালাগাল করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এমনকি শারীরিক নির্যাতন করে ঐসব দুষ্কর্মে অভ্যস্ত হয়ে যায় ফলে সমাজ জীবনে এসে এরা কোন মানুষকেই আর মানুষ বলে মনে করে না। যারা শিক্ষক, নেতা, মন্ত্রী-মিনিষ্টারকেই তোয়াক্কা করে না তাদের কাছ বাবা-মা, অফিসের কর্তা, সমাজের মোড়ল-মাতব্বরতা ছেলে মানুষ।

৫। রাজনীতিকরা ছাত্রবাহিনী পোষনের নামে ছাত্রদের যথেষ্ট অর্থ প্রদান করে। তদ্বারা তারা সহজ পন্থায় অর্থ আহরণের পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। চাঁদা আদায় এই সহজ পদ্ধতিগুলির অন্যতম। খবরে প্রকাশ, চাঁদাবাজদের অত্যাচারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ঠিকাদারই কাজ নিতে সাহস করে না।

৬ই জুন, '৯২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদারবৃন্দ নামে 'প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন' শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিল। তাতে ঠিকাদারবৃন্দ বলেছিলেন– "প্রায় প্রতিদিনই আমাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে এবং কর্মরত শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করে আসছে। বর্তমানে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, আমাদের পক্ষে আর কোনক্রমেই কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ঐ সমস্ত চাঁদাবাজরা শুধু সাইটে নয়, আমাদের নিজ বাড়িঘরে এমনকি প্রশাসনিক ভবনেও উর্ধবতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মুখে আমাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করছে।

আবার ১৪ই জুলাই '৯২ তারিখে ঢাকার মেয়র সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাস্তাঘাটের করুণ অবস্থা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন– "ওখানে কেউ কাজ করতে যেতে চায় না। প্রকৌশলী, সুপারভাইজার যেমন যেতে চায়না তেমনি কোন ঠিকাদারও যেতে চায় না।"

৬। চাঁদা ও সন্ত্রাসের মানসিকতা নিয়ে ঐ ছাত্ররা কর্মজীবনে এসে চাঁদার বিকল্প হিসাবে ঘুষ ও দুর্নীতর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এক সমীক্ষায় দেখা

গেছে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগীরা কর বিভাগের চাকুরীকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তার কারণ কর বিভাগের চাকুরীতে হঠাৎ অর্থ-বিত্তে ফুলফেঁপে উঠা যায়, আর দেশের সম্পদশালীদের তোয়াজ পাওয়া যায়।

৭। সন্ত্রাসী ছাত্র নেতাদের অর্থলিপ্সা যেমন প্রবল, আত্ম-সম্মানবোধ ও তেমনি প্রবল। ছাত্রজীবন শেষে বিয়ে করতে এসে এরা এমনভাব দেখায় যেন সে ফকিরের সন্তান নয় যে যৌতুক চাইবে এবং নিবে। কিন্তু বিয়ের পর যৌতুকের হেরফের হলে এরা বৌ পিটায়, বৌকে নির্যাতন করে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে গাল মন্দ করে। বরঞ্চ নেতা-মন্ত্রীদের গালাগাল করে অশ্লীল ভাষনে অভ্যস্ত হওয়ায় সর্বাচ্চ শিক্ষিত ছেলেটিও সমাজ জীবনে একটা উদ্যত বেয়াদব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৮। এছাড়াও আজকাল দেখা যায়, এক পরিবারে চার ভাই থাকলে চারজন চার দলের লেজুড়বৃত্তি করে। এর মধ্যে একজন অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলের চাঁই হবে। একজন দুষ্কর্ম করে অসুবিধায় পড়লে, পুলিশে ধরলে ক্ষমতাসীন দলেরজন তাকে উদ্ধার করবে এবং অপরাধটা যত বড়ই হোক না কেন, 'নেতাদের সোজা কথা ছেড়ে দাও।'

রাজনীতি আমাদের অজ্ঞান করেছে বলেই হোক বা রাজনীতিতে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলেই হোক, আমাদের রাজনীতিকরা ক্ষমতার ব্যাপার যতটুকু চক্ষুষ্মান, দেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে ততটুকু অন্ধ হয়ে আছেন।

দেশের কলকারখানার বন্ধ্যাবস্থার কারণ যে তারা নিজেরা, ছাত্র সন্ত্রাসের কারণ যে তারা নিজেরা, ছাত্রখুনের আসামী যে তারা নিজেরা, রাজনৈতিক অন্ধত্বের কারণে তারা তা দেখতে পাচ্ছেন না।

বেকারের হাহাকারে যখন দেশের বাতাস ভারি হয়ে উঠে, আহত ও নিহত ছাত্রের মাতা-পিতার আহাজারিতে যখন আল্লাহর আরশ কাঁপে তখনও রাজনীতিকদের হৃদয় কাঁপে না। একদল খুনী ছাত্রকে গ্রেফতার করিয়ে দেয় তো অপরদল তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মিছিল-মিটিং-হরতাল করে। সেসব মিটিং মিছিলে প্রচুর জনসমাগম হয়, মিটিং শেষে গাড়ী ভাংচুর হয়, হরতালও সফল হয়।

যাই হোক, রাজনীতি আমাদের অজ্ঞান করেছে বলে রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মহার্ঘ্য পুরুষ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। তারা বিরোধী দলে থাকাকালে ছাত্রদের অদম্য সন্ত্রাসী করে দিয়ে যখন ক্ষমতা হাতে পান তখন রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলার প্রয়োজনেও ছাত্রদের

আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারন না। তারা কম্বল ছাড়লেও কম্বল তাদের ছাড়ে না। আর দলতো এটি নয়। আরওতো শতদল আছে।

কিন্তু তবু তারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করবেন না। কারণ তারা জানেন ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। আজকের বিরোধীদল কাল যখন ক্ষমতা নিয়ে নিবে, তখনতো আবার আন্দোলনের প্রয়োজন হবে, তখনতো আবার ঐ মহার্ঘ্য পুরুষদেরই প্রয়োজন হবে।

আমি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলছি না। আমি বলছি রাজনীতিকরা রাজনীতি করবেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা বাস্তব রাজনীতি, আর ছাত্ররা করবে থিওরেটিক্যাল রাজনীতি বা তাত্ত্বিক রাজনীতি যার সবটুকুই হবে পুস্তকভিত্তিক এবং ক্যাম্পাসের চার দেয়ালে অভ্যন্তরে যুক্তিবিদ্যার অনুশীলনে। রাস্তার আন্দোলন আর অস্ত্রের কোন প্রশ্নই সেখানে আসতে পারে না।

সেখানে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের অনুকরণে মিনি সংসদ অনুশীলন করবে, বিতর্ক দল সংগঠন করে সংসদীয় রীতি-পদ্ধতিতে যে কোন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিতর্কানুষ্ঠান করবে, চিন্তাবিদ হবে। ছাত্র ইউনিয়নগুলির কোন রাজনীতিক পরিচয় থাকবে না। নামে, আদর্শে, কার্যক্রমে তাদের নিজস্ব পরিচিতি থাকবে, যা একান্তই ক্যাম্পাসভিত্তিক বৈশিষ্ট্য বহন করবে। ছাত্র রাজনীতির এটাই পদ্ধতি যা বিশ্বের সর্বত্র অনুসরণ করা হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও ই পদ্ধতি অনুসরণ করেই ষাটের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বড় বড় রাজনীতিবিদ তৈরী হয়েছে। ষাটের দশক হতে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ষাটের দশকেই রাজনীতিকরা নিজেদের ক্ষমতার দখল নিস্কন্টক রাখার জন্য ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতির রণক্ষেত্র করে তুলেছে। তখনকার ক্যাম্পাস সত্তরের দশকে এসে আরও যুদ্ধাংদেহী হয়েছে, আরও নৃশংস হয়েছে। রাজনীতিকরাও ছাত্রদের যা খুশী তা করার স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে। আর শিক্ষকরা নাস্তিকতা চর্চা করার কারণে একদিকে শিক্ষার মান নেমে গেছে অপরদিকে শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধ অন্তর্হিত হওয়ার কারণে বিশৃংখলার বিস্তাতার ঘটেছে।

রাজনীতির চাষ

দেশের বাড়ী খুব একটা যাওয়া হয় না। শহরের সাথে অর্থ, স্বার্থ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে এমনিভাবে সাত পাকের বাধনে বন্দী হয়ে রয়েছি যে, দেশে যাওয়ার মন হলেও সময় সহজে হয় না। অথচ গেলে ভাল লাগে। আমার শরীরের উপর আমার জন্মস্থানের প্রভাব আমি রক্তে মাংসে হাড়ে মজ্জায় টের পাই।

কর্মক্লান্ত প্রবাসী সন্তান শহুরে দূষিত খাদ্য ও দূষিত পরিবেশগত শ্রান্তি-ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এলে মা যেমন করে অল্প সময়ের মধ্যে খানা-পিনায়, আদরে যত্নে শরীরে মনে তাকে চাঙ্গা করে তোলেন, প্রবাসী ঘরে এলে জন্মস্থানও তেমনি তার নির্ভেজাল খাদ্য, দূষণমুক্ত আবহাওয়া ইত্যাদি দ্বারা অল্প সময়ে তাকে চাঙ্গা করে তোলে। শহরে তা সব সময়ই অম্ল-অজীর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য খাদ্যে অরুচি লাগাই থাকে। সব সময় শরীর মেজমেজ করে। চলতে খেতে ইচ্ছে করে না। একটু ভ্রমণ করে ক্ষুধা বাড়াব তারও উপায় নেই। রাস্তায় নামলেই ছিনতাইয়ের ভয়, হাইজ্যাকারের ভয়, যখন তখন যেখানে সেখানে সন্ত্রাসী এবং তাদের গোলাগুলির ভয়। অলিতে গলিতে ক্লাব নামক সন্ত্রাসীর আড্ডা রয়েছে। তার পাশ দিয়ে ঐ গলি দিয়ে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে কিংবা স্কুল-কলেজ ছাত্রী কন্যাকে নিয়ে পথ চলতেও ভয়, কি জানি কখন কে ওড়ানা ধরে টানাটানি করবে বা কোন অশ্লীল উক্তি করবে অথবা স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করবে কিম্বা বাবাকে বেঁধে কন্যাকে নিয়ে ধর্ষণ করবে। গ্রামে কিন্তু এমনি হওয়ার যো ছিল না।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা রোগ ভোগের পর রোগীদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কোন স্বাস্থ্য নিবাসের তথা দূরবর্তী কোন স্নিগ্ধ শ্যামলীমায় ঘেরা প্রত্যন্তাঞ্চলে যাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আসলে আমি লক্ষ্য করেছি সর্বোত্তম স্বাস্থ্য নিবাস হচ্ছে নিজের জন্মস্থান। একারণে অন্তত স্বাস্থ্যগত কারণে হলেও আমি মাঝে মধ্যেই জন্মস্থানে যেতে চেষ্টা করি এবং লক্ষ্য করে দেখেছি বাড়ী পৌঁছার সাথে সাথেই শরীর মন ঝর ঝরে হয়ে যায়। আগের রাতে বাড়ী পৌঁছালে সকালেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যায়। অগ্নিমন্দা অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল ইত্যাদি সকল উপসর্গ নিরাময় হয়ে যায়। শাক, মাছ, ডাল, ভাত সব কিছুরই স্বাদ ঘ্রাণ যেন অন্য রকম। শুধুই খেতে ইচ্ছে করে, আর খেলেই হজম হয়ে যায়। তারপর পরই আবার খাওয়ার জন্য ক্ষুদা লাগে।

অন্তত দিন চারেক বাড়ীতে কাটাব বলে ক'মাস পূর্বে বাল্যের বহু স্মৃতি বিজড়িত জন্মস্থানে এসে পৌঁছি। এক এময় বাড়ীর একটা বড় আকর্ষণ ছিল আমার আব্বার সংগ্রহের কয়েকশত বই। কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মোশাররফ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, অতুল প্রসাদ, বিদ্যাসগর ইত্যাদি বহুবিধ রুচির বই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি যখন হাইস্কুলের ছাত্র, বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি যখন দুর্বার আকর্ষণ জেগে উঠেছে তখন বইগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার আব্বা আমার হাতে ন্যস্ত করেন। আর আমি তখন বইগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য প্রতিবেশী সহপাঠীদের উৎসাহে একটি পাঠাগার খুলে বসেছিলাম। প্রতিবেশী ছাত্ররা এবং বয়স্করাও বই পড়তে নিতেন আবার ফেরৎ দিয়ে যেতেন। তখনকার দিনে গ্রামে দেশে ক্লাব নামটার বহুল পরিচিতি ছিল না। তাই কোন প্রকার খেলা-ধুলার ব্যবস্থা এই পাঠাগারের মাধ্যমে ছিল না।

ম্যাট্রিক পাস করে আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য শহুরে কলেজের বৃহত্তর পরিসরে চলে যাওয়া অবধি বাড়ীর এই পাঠাগারটির প্রতি নজর দেওয়ার সময় সুযোগ হয়নি। ফলে এক যুগের মধ্যেই বইগুলি সব বেহাত হয়ে যায়।

বাড়ী পৌঁছে সেদিন শীতের সকালে কৈশোরের স্মৃতি সমৃদ্ধ রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে খেজুর গুড় ও নারকেল সহযোগে খোলা পিঠা খাচ্ছিলাম আর আমার লাইব্রেরীর অবশিষ্ট যে দু'চার খানা বই আছে তার পাতা উল্টিয়ে হারানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। বই-এর ভিতরে জায়গায় জায়গায় এমন সব বন্ধুর নাম আছে, সহ আছে, যাদের কারও নাম মনে আছে তো চেহারা মনে নেই, আবার কারও চেহারা মনে আছে তো নাম মনে নেই। এই মুহূর্তে সেসব নাম চেহারার মিলন ঘটাতে চেষ্টা করছিলাম। এদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে, হিন্দু যারা তাদের বেশিরভাগই ১৯৪৭ বা ১৯৫২ সালে দেশ ত্যাগ করেছে। আজ অর্ধশত বছর পর তাদের কথা ভাবতে গিয়ে স্মৃতির অতলে সাঁতার কেটে চলেছি, এমন সময় বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের বাগানের দিকে মার মার কাট কাট শব্দের সাথে অনেক মানুষের ছোটাছুটি ও হৈ হৈ রৈ রৈ শুনে সেদিকে ছুটে যাই।

ওখানটায় আমাদের বাঁশ বাগান। এখন আর সেই রমরমা বাগান নেই, তবুও কিছু বাঁশ আছে। বাগানের পাশের চাতালে দু'দল যুবক সামনা সামনি মারমুখো হয়ে আছে। এক দিকে আমার বাড়ীর কাজের লোক এবং আমার কলেজে পড়ুয়া ভাতিজারা। অপরদিকে একই বয়সের ৭-৮ জন ছেলে যাদের

কাউকেই আমি চিনি না। তাদের নিরস্ত করে ঘটনাটা জানতে চাইলাম। আমি তাদের মাঝখানে দাঁড়ানোটা মনে হল কারও পছন্দ হয়নি, কারও কারও মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যেন- "এ আবার কোন মুরুব্বির আপদ রে বাবা"। একজন সামনে এগিয়ে এসে জানাল, তারা বাসস্টপেজের ওখানে একটা ক্লাব ঘর তৈরী করবে, তার জন্য কিছু বাঁশ নিতে এসেছিল। এ বাড়ীর কলেজ ছাত্র জিল্লু বাঁশ দিতে পারবে না বলে নিষেধ করে আন্দরমহলে চলে যায়। কিন্তু তারপরও একটি ছেলে বাঁশ কাটতে থাকে। শব্দ শুনে জিল্লু বাড়ী হতে বের হয়ে এসে ফের নিষেধ করলে ছেলেটি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে বাঁশ নিতে এসেছি বাঁশ নিয়েই যাব। তখন জিল্লু তাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয়।

জিজ্ঞেস করে জানলাম ছেলেগুলি সবাই স্কুল-কলেজের ছাত্র। কেউ দশম শ্রেণীর আবা কেউ আই.এ, বি.এ ক্লাসের ছাত্র। তার মধ্যে একজন আছে বহু আগে বি.এ ফেল করা বম্বেটে।

গ্রামের পাশ দিয়ে ট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে। এখানে একটি বাসস্টপেজ আছে, যাকে কেন্দ্র করে বহু চায়ের স্টল ও দোকানপাট গড়ে উঠেছে। আর তারই পাশে কিছুদিন পূর্বে সাবেক এম.পি সাহবের অনুপ্রেরণা, সাহায্য ও সহযোগিতার রাজনৈতিক দলের নামধারী একদল যুবক একটি ক্লাব তৈরি করেছে। সুতরাং অন্য দলের এম.পি সাহেবের আর্থিক সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে আর একটি ক্লাব তৈরী করা জরুরী হয়ে পড়েছে এবং সেজন্যই এই বাঁশ কাটা।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম: তোমরা সবাইতো ছাত্র। বলতো এখন কয়টা বাজে? একজন বলল, এখন ৯টা বাজে। আমি বললাম: তার মানে তোমরা সকাল ৮টায় আগেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছ। এসময়টা ছাত্রদের পড়ালেখার জন্য মোক্ষম সময়, এসময় কি কোন ছাত্র পড়ার টেবিল ছেড়ে ক্লাব ঘর তৈরীর কাজে যেতে পারে?

একজন মাটির দিতে তাকিয়ে বলল: ক্লাবও তো বিদ্যাচর্চারই কাজ। এই বাড়ীতেও তো ক্লাব ছিল বলে শুনেছি এই ধরণের ক্লাব সংগঠন করেই তো এ বাড়ীর মানুষ বড় বড় শিক্ষিত হয়েছেন, বড় বড় চাকুরি করেন। এই বাড়ীর ক্লাবের সীল মারা বই এখনও আমার আব্বার কাছে আছে দেখেছি।

জিজ্ঞেস করলাম: বইতে যে সীল দেখেছ তাতে পাঠাগার লেখা আছে নাকি ক্লাব লেখা আছে।

এবার সে বলল, পাঠাগার তো ক্লাবই।

বললাম, অন্য যে ক্লাবটা সেখানে আছে, তাতে কি কোন বই আছে?

ওরা জানাল: কোন বই নাই। এখন কিছু তাস আছে কেরাম আছে। এম.পি সাহেব বলেছেন ভবিষ্যতে বই দিবেন।

বললাম: দেখ, ক্লাব শব্দের অর্থ হচ্ছে লাঠি, অপর অর্থ হচ্ছে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত সমিতি বা সংঘ। তোমাদের ক্লাব এর অর্থ হচ্ছে নেতারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমাদের দিয়ে লাঠি সংঘ তৈরী করাচ্ছেন। সেখানে তোমরা লাঠির ঘায়ে অন্যের মাথা ভাংবে অথবা নিজে খুন হবে। তোমাদের লাশ প্রদর্শন করে নেতারা মানুষের ভোট আদায় করবেন আর তোমাদের মাতা-পিতার বুক ফাঁটা হাহাকার করবেন।

কিন্তু পাঠাগারে বই ছাড়া আর কিছু থাকেনা। পাঠাগারের অর্থ পাঠ করার স্থান। এ বাড়ীতে যে পাঠাগারটি ছিল তা শুধু পড়ার জন্য। প্রচুর বই ছিল, বিকেল বেলায় তোমাদের বাপ চাচাদের কেউ কেউ আসতেন, খাতায় নাম লিখে বই নিতেন, পড়া হয়ে গেলে খাতায় উশুল দিয়ে বইটি রেখে যেতেন। এখানে তাস বা কেরাম ছিল না, যা তোমাদের ক্লাবে থাকে।

এমপি সাহেব কোনদিনই তোমাদের ক্লাবে বই দিবেন না। তিনি দিবেন নির্ভেজাল ক্লাব বা লাঠি এবং অবশেষে অস্ত্র-সস্ত্র কেনার টাকা। সেই লাঠি এবং অস্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হবে নির্বাচনী মিছিলের ব্যানারে, পরে দুই দলের লাঠালাঠিতে। এবং শুধু এই লাঠালাঠির প্রয়োজনেই একই জায়গায় চায়ের দোকান আর বাসস্টপকে কেন্দ্র করে দুই এমপি সাহেব দুই ক্লাব বা লাঠির আড্ডা তৈরি করেছেন। আর দুদিন পর তোমরা চা খাওয়ার পয়সা পাবে চা পান করে চাঙ্গা হয়ে এমপি সাহেবের পক্ষ নিয়ে দুই দলে হানাহানি করে হয় মরবে না হয় পঙ্গু হয়ে মা-বাবার ঘাড়ে চেপে বসবে বা অন্য কাউকে ওরকম করবে।

পাঠাগারের সাথে লাঠির কোন সম্পর্ক নেই। পাঠাগারের সদস্যরা বিদ্যাচর্চা আর চিন্তাচর্চার বাইরে আর কিছু জানেন না। এমপি সাহেবদের রাজনৈতিক টাউটগিরী পাঠাগারের পাঠকরা বুঝতে পারেন, তাই এমপি সাহেবরা কোন মহল্লায় কোন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন না। বাংলাদেশের শহর বন্দরে এমন বহু মহল্লা আছে যেখানে রাজনৈতিক দলের নামধারী পাঁচটা দশটা ক্লাব আছে, পাশাপাশি গোপনে গাঁজা চরস আর লাঠি থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের কোথাও এমন একটিও মহল্লা খুজে পাওয়া যাবে না যেখানে রাজনৈতিক দলের নামধারী একটি পাঠগার আছে। না: নাই, কোথাও নাই। অর্থাৎ আমাদের দেশের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীরা আমাদের সন্তানদের

পাঠাগার থেকে, পড়ার ঘর বা ক্লাশ থেকে বের করে নিয়ে ক্লাব ঘরের লাঠির ট্রেনিং দেয়াটাকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে।

স্কুল-কলেজে ক্রীড়া শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকার আইন পূর্বেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু রাজনীতিকদের দুরাচারের কারণে আজকাল সকল শিক্ষায়তনে সন্ত্রাস শিক্ষার জন্য বিশেষ অলিখিত ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়ে গেছে। ফলে আগে যেখানে মা বাবা পরিজন সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে বছরের শেষে সুশিক্ষিত সফল সন্তান বুকে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন এখন সেখানে তারা সন্তানের লাশ হয়ে আসার আশঙ্কায় আতঙ্কিত থাকেন।

কিন্তু আমার কথা শুনার জন্য ছেলেগুলি অপেক্ষা করে নেই। কথার ফাঁকে ফাঁকে এক এক করে তারা সবাই কেটে পড়ে।

যা হোক পরদিন আমি ঢাকা চলে আসব বলে সকাল ৮টায় গোসল করছিলাম। ৭-৮টি ছেলে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পা ধুচ্ছিল আর আমার কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করছিল, বাড়ীতে ছেলেদের মধ্যে কে কে আছে।

কাজের ছেলেটি বলল: জিল্লু ভাইয়া আছে।

আবার প্রশ্ন জিল্লু ভাইয়া কি করে?

উত্তর: জিল্লু ভাইয়া কলেজে পড়ে।

তাদের মধ্য থেকেই একজন বলল: ওকে জান না? ওতো কলেজে পড়ে।

একজন উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল: ওঃ গুড, অমন ছেলেইতো আমরা চাই।

এবার পুকুর থেকে উঠে তাদের দিকে মুখ ফিরে তাকাতেই তাদের চোখে মুখে- "এটা আবার কোন মুরুব্বী", ধরনের প্রশ্ন ভেসে উঠে। দেখলাম এরা গতকালের তারা নয়। জিজ্ঞেস করে জানলাম, এরাও সবাই স্কুল কলেজের ছাত্র। বাসস্ট্যান্ডর ওখানে যে ক্লাবটি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরা সেই ক্লাবটির সদস্য। কর্মী-সদস্য সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ভাতিজা জিল্লু এ বাড়ীর একমাত্র টার্গেট। কারণ জিল্লু কলেজ ছাত্র, মিটিংয়ে ময়দানে আকথা-কুকথা মিছে কথা সাজিয়ে বক্তৃতা করতে পারে। সবার ধারণা কলেজের খাতায় নাম থাকতে থাকতেই আকথা-কুকথা মিছে কথার জোরে জিল্লু এমপি হয়ে যেতে পারবে, চাই কি, এক সময় মন্ত্রীও হতে পারবে। জিল্লুকে নিয়ে তাদের যেমন উল্লাসের শেষ নেই তেমন জিল্লুকে নিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। কারণ জিল্লুর যেমন মুখের জোর আছে তেমনি তার মগজেরও ধার আছে। বিদ্যার্জন দ্বারা মগজকে শান দিয়ে দেশ গড়ার

রাজনীতি শিক্ষা করার আগেই যদি এমপি মন্ত্রী হয়ে যায় তবে তো তার রাজনীতি দেশের সর্বনাশ করবে। সে আকথা-কুকথা মিথ্যা কথা দিয়ে দেশের মানুষকে উত্তেজিত করতে পারবে, শান্ত করতে পারবে না। যে গাড়ী সে তৈরী করতে পারবে না উত্তেজিত জনতার দ্বারা সে গাড়ী ভাংগতে পারবে। যে কারখানা সে গড়তে পারবে না বা যে বেকারের কর্মসংস্থান করতে পারবে না উত্তেজিত শ্রমিকের দ্বারা সে কারখানা ধ্বংস করে সে শ্রমিককে বেকার করতে পারবে। এতক্ষণে ছেলেগুলি আমার পরিচয় জানতে পেরে তাড়াহুড়া করে সবাই কেটে পড়েছে।

আমাদের কাজের লোকটি আমাকে বলল: চাচা, জিল্লু ভাইয়াকে ঢাকায় নিয়ে যান আপনাদের চোখে চোখে থাকবে। সামনে ইলেকশন। এখানে যতজন প্রার্থী হবে ততটা ক্লাব হবে। সকল ক্লাবই জিল্লু ভাইকে দলে টানতে চাইবে, টাকা দিবে মটর সাইকেল দিবে, সাঙ্গপাঙ্গ দিবে আর সকল অন্যায় অপরাধ তথা সাত খুন মাফ করে দিবে। কদিন পরেই শুনবেন ক্লাব কর্মীরা বিনা পয়সায় চা পান করে দোকানীদের সাথে মারামারী শেষে বাসস্টপে বাস ভেঙ্গেছে, রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। জিল্লু ভাইকে যদি সরিয়ে না নেন তবে পড়া-লেখা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। বাংলাদেশটা হয়েছে নদীর নতুন জাগা চরের মত। চর দখলের জন্য ধান পাকার মৌসুম এলে সর্দাররা যেমন লাঠিয়ালদের জড়ো করে চা পান, পকেট খরচের অর্থ সংস্থান শুরু করে, নির্বাচন প্রার্থীরাও ছাত্রদের নিয়ে তেমনি করে থাকে।

আমার গ্রামে শতবর্ষের পুরানো একটি হাইস্কুল আছে। গত কয়েক বছরের প্রগতির ধারায় সেখানে একট গার্লস হাইস্কুল এবং একটি সহশিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং গ্রামের পরিবেশ বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুলির শব্দে গ্রামের কলেজ কেঁপে ওঠে। ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে রাস্তায় গাড়ী ভাংচুর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে কোন ছাত্রী লাঞ্চিত হয়েছে বা ধর্ষিতা হয়েছে খবর পেলে কলেজ ছাত্ররা মিছিল নিয়ে গার্লস স্কুলের অর্গলবদ্ধ গেইটে গিয়ে অশ্লীল ভাষায় ধর্ষণের খবর বর্ণনা করে মেয়েদের মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য আহবান জানায়। এতদিন কালেভদ্রেও রাস্তায় স্কুল ছাত্রীদের প্রতি দু'একটি অশোভন উক্তির ঘটনা শোনা যেত না। কিন্তু আজকাল মাঝে মধ্যে শোনা যায়। তার উপর এখন আবার ক্লাব প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। সুতরাং অচিরেই চাঁদাবাজি, খুন রাহাজানি, উত্যক্তকরণ, ছাত্রী অপহরণ ইত্যাদি দুষ্কর্মগুলিও শুরু হবে নিশ্চয়। সুন্দরী ছাত্রীর দখল নিয়ে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ হবে এবং আল্লাহ

জানেন আরও কত কি যে ঘটবে। ঐসব দলের দলনেতারাই এক সময় সমাজের নেতৃত্ব হাতে নিবে এবং তাদের অপকর্মে সমাজ জীবন জর্জরিত হবে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে আছে।

যেমন: গত ১৩-৮-৯৫ তারিখের ইনকিলাব পত্রিকায় খবরে প্রকাশ- রাজশাহী শহরের হাজরাপুকুর এলাকার আবদুর রাজ্জাক ফকিরের মেয়ে পান্না (১৫) কে একই এলাকার কতিপয় বখাটে যুবক হাতে ধরে টানাটানি করে। ঘটনাটি পান্না তার পিতাকে জানাল তিনি এর প্রতিবাদ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বখাটেরা ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা আবদুর রাজ্জাক ফকিরসহ পরিবারের মহিলাদের প্রহার করে যায়। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখের ঐ একই পত্রিকার খবরে প্রকাশ, চট্টগ্রামের লোহাগড়া থানার বড় হাতিয়া গ্রামের মেয়ে হাসিনা বেগমকে ৪ জানুয়ারী '৯৫ তারিখে এলাকার কতিপয় সন্ত্রাসী পড়ার টেবিল থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার আর্তচিৎকারে বৃদ্ধ পিতা আবদুল আজিজ মেয়েকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাকে কিল ঘুষি ও লাথি মেরে হাসিনাকে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। হাসিনার পিতা ও বড় ভাই থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ আসামীদের আটক করে এবং ১৭ দিন পর হাসিনাকে উদ্ধার করে।

সশস্ত্র অপহরণকারীরা জামিনে মুক্তি পেয়ে হাসিনা এবং তার পরিবারর সকলের জীবন নাশের হুমকী দিয়ে বেড়াচ্ছে বলে ৬ এপ্রিল হাসিনা চট্টগ্রাম এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এবং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সকল বিবেকবান মানুষের সাহায্য কামনা করেছেন।

কিন্তু আমরা জানি তাতে কোন ফল হবে না। তার কারণ ঐ সাহসী দুর্বৃত্তদের সবাই রাজনীতিকদের গৃহপালিত সন্ত্রাসী। এদের শাস্তি দিয়ে বিগড়ে ফেলা যাবে না বা হাজতবাসেও পাঠানো যাবে না। কারণ এদের ছাড়া নেতাদের নির্বাচনের বাজার গরম করা যাবে না এবং নির্বাচনে জয়ী হওয়া যাবে না। সুতরাং এদের সাত খুন মাপ করে রাখতে হয়। ভোটাররা মারা যাক, তবুও সন্ত্রাসীরা বেঁচে থাক। আর এটাই রাজনীতির বর্তমান বাজারের মূল কথা, অর্থাৎ গণতন্ত্রের দুর্বল শাসনে সন্ত্রাসীরা হচ্ছে শাসকের সবল শক্তি।

এই দু'দিন গ্রামে অবস্থান করে উন্নতির নামে গ্রামের পরিবেশের অবনতি দৃষ্টে চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমাদের এ অঞ্চলটা এতদিন ভালই ছিল। মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ ছিল। শিক্ষিতের নামে এখন সমাজের সর্বত্র বেকারের

বিস্তার ঘটেছে এবং শ্রদ্ধাবোধ, মূল্যবোধ তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজে মানুষের সাথে মানুষের যে ভেদাভেদ বোধ দ্বারা সমাজ শাসিত হত, গণতন্ত্রের অপপ্রয়োগ দ্বারা সেই ভেদাভেদবোধ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন সমাজে অপরাধের বৃদ্ধি ঘটছে। দৃষ্কৃতিকারীরা সৎপথে চলার এবং সৎকর্ম করার যেমন অনুপ্রেরণা পায় না তেমনি দুষ্কর্ম করতেও কাউকে ভয় করে না। সমাজে প্রতিকারের কোন উপায় না থাকার কারণে সাধারণ মানুষকে থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারীর আশ্রয় নিতে হয়। তদদ্বারা থানা পুলিশের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় এই চাপ নিরশনের জন্য এবং মামলার সহজ নিষ্পত্তির জন্য তারা অর্থ লেনদেনের আশ্রয় নেয়। এমনি ভাবেই ঘুষ ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সর্বকর্মে। আর গণতন্ত্রের দুর্বল শাসনে ঘুষ দমন করবে এমন শক্তি সরকারের নেই। কারণ গণতন্ত্রের এই দেশে আমরা সবাই রাজা।

শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম এতদিন শহুরে জীবনের কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা, ডিসপেপশিয়া, খাদ্যে অরুচি ইত্যাদি ভুগে বছরে দু'চারদিনের জন্য বাড়ী এলে দেখেছি রাতের বেলায় বাড়ী পৌছলে সকাল বেলায় কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে প্রচন্ড ক্ষুধা পেত, যা-ই খেয়েছি তাই মজা লেগেছে এবং শহরে ফিরে গিয়ে দেখেছি কিছুটা ওজনও বেড়ে গেছে। মনে হয় ভবিষ্যতে বাড়ী এলে ওসব রোগ বালাই ভালতো হবেই না বরঞ্চ হয়তো হৃদকম্প নামক আর একখানা নতুন রোগ অর্জন করে ফিরতে হতে পারে।

পলিটিক্যাল ওয়াইন

কৃষকের বৃষ প্রীতি

গৃহপালিত পশুর মধ্যে কৃষকের কাছে বৃষ বা ষাঁড়ের কদর বেশী। আবার সন্তানাদির মধ্যে ছেলের কদর বেশী। ঐ আদর কদরের কারণ একটিই। গৃহস্থ তার ছেলের প্রতি একটু বেশী যত্নবান হয়। তার কারণ ছেলেটি শক্ত-সবল শরীর, বল, বীর্য, মেধা নিয়ে গড়ে উঠলে সে বড় বড় কাজ করে প্রচুর রুজি-রোজগার করবে। তদ্বারা বাবা মার দুঃখ দৈন্য দূর করবে, বিপদ আপদে শক্তি সহস প্রয়োগ করে বাবা মার জীবনের নিরাপত্তা বিধান করবে।

ষাঁড়ের আদরের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে দু'টি। প্রথম উদ্দেশ্য ষাঁড়টিকে তাড়াতাড়ি মোটা তাজা করে কোরবাণী দেওয়া বা কোরবানীর হাটে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে লাভবান হওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাকে দিয়ে লাঙ্গল টানা, গাড়ী টানা, ঘানি টানা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা। কিন্তু ষাঁড়টির প্রজনন ক্ষমতা বজায় থাকলে সে উত্তেজিত থাকে বলে তাকে দিয়ে কাজ করানো যায় না। সুতরাং ষাঁড়টির অন্ডকোষ ফেলে দিয়ে তার প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে তাকে বলদ রূপান্তরিত করা হয়। তদ্বারা তার বলবীর্যকে সংরক্ষণ করে কৃষক তাকে চাষাবাদ বা গাড়ী টানার কাজে ব্যবহার করে। এটাই কৃষকের বৃষ প্রীতির রহস্য।

রাজনীতিকদের মধ্যে যে ছাত্র প্রীতি পরিলক্ষিত হয় তার সাথে কৃষকদের বৃষপ্রীতির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। রাজনীতিকের প্রখর মেধাবী, উৎসাহী উদ্যমী ছাত্রদের মহার্ঘ্য পুরুষ হিসেবে গণ্য করে থাকে। তারুণ্যে টগবগ করা এই ছাত্ররা ধর্ম, দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে জ্ঞানী-গুণী হওয়ার জন্য যখন এক বুক আবেগ আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে শিক্ষাঙ্গণে ইতস্তত পদচারণা শুরু করে এমনি সময়ে রাজনীতিকরা তাদেরকে আদর করে কাছে ডেকে হিরোইনের ডোজের মত এক ডোজ রাজনীতি আস্বাদন করিয়ে দেন। এর নামই রাজনীতিক সরাব বা পলিটিক্যাল ওয়াইন।

অক্ষম ক্ষমতার স্বাদ পেলে যেমন বেপরোয়া হয়ে পড়ে, দরিদ্র প্রচুর অর্থ হাতে পেলে যেমন অহংকারে নিজ অবস্থান ভুলে যায়, তারুণ্য অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি পেলে যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে, ক্যাম্পাসের নবাগতরাও তেমনি পলিটিক্যাল ওয়াইনের প্রথম ডোজেই চঞ্চল হয়ে উঠে।

গৃহস্থের যে ছেলেটির বুক এতদিন একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের একটি 'ওয়ালাইকুম' শব্দ শুনলে, গর্বে ফুলে ফুলে উঠত, সেই ছেলেটিই এবার বড় বড় দলের বড় বড় নেতাদের সান্নিধ্য পেয়ে, আপ্যায়ন পেয়ে, শক্তি সাহসে টগবগিয়ে উঠে। সে তার অন্তর্নিহিত উৎসাহ, অনুসন্ধিৎসা, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানের তৃষ্ণা ভুলে যায়। পলিটিক্যাল ওয়াইনের নেশায় মত্ত হয়ে সে নেতাদের নির্দেশিত মিছিল হরতাল, অবরোধ, গাড়ী ভাংচুর, সন্ত্রাস কাটা রাইফেল, পিস্তল, চাপাতি ইত্যাদির রণরঙ্গে তার সকল মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করে। অর্থাৎ কৃষক যেমন ষাঁড়ের সম্ভাবনাময় প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে তাকে বলদ বানিয়ে চাষাবাদের কাজে লাগায়, রাজনীতি করাও তেমনি ছাত্রদের জ্ঞানচর্চার সময়, সুযোগ ও মানসিকতাকে নষ্ট করে দিয়ে তার সম্ভাবনাময় মেধাকে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে।

মেধার এই বিপথগমনের ধারা চলে আসছে গত তিন দশক ধরে। ষাটের দশকের শেষের দিকে থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পলিটিক্যাল ওয়াইনের নেশাখোরদের মাতলামীর কারণে বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান চর্চাতো দূরের কথা, সাধারণ লেখাপড়ার সুযোগটুকুও অবশিষ্ট থাকেনি।

দুই তিন দশক পূর্বে যারা ছাত্র ছিল আজ তাদেরই কেউ বড় রাজনীতিক, কেউ সমাজ সেবক, কেউ অফিস আদালতের কর্ণধার। অথচ এই প্রবীণদের কেউ দেশের অর্থনীতি বা রাজনীতির দিক নিদের্শনা দিতে বা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারছেন না। ডান রাজনীতি, বাম রাজনীতি, পার্শ্ব রাজনীতি সকল রাজনীতিতেই মেয়ে মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে এবং প্রবীণদের প্রজ্ঞার পরিবর্তে তরুণদের আবেগকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

ঘাদানক নামে কোন রাজনীতির কথা কেউ কোন সময় চিন্তাও করেনি। শহীদের সংখ্যা যদি ত্রিশ লক্ষ হয়ে থাকে তবে এই ত্রিশ লক্ষ শহীদের বাবা, ভাই বা পুত্রও অন্তত ত্রিশ লক্ষ আছে। তাদের মধ্যে শতকরা দশজনও যদি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে থাকে তবে শহীদের আওলাদ তিন লক্ষ শিক্ষিত পুরুষ ছিল। কিন্তু কোথায়, কোন পুরুষের মাথায় তো ঘাদানিক ধরনের রাজনীতিক চিন্তার উদয় হয়নি। অথচ যেই মাত্র একজন মেয়েমানুষ ঘাদানিক-এর ধারণা প্রকাশ করলেন, তখনি দলে দলে উচ্চ শিক্ষিত বহু পুরুষ মানুষ তার পেছনে কোমর বেঁধে নেমে গেল। আসলে ঘাদানিক নেত্রীর আবেগের ফসলই যে ঘাদানিক, নেত্রীর হুযুগপ্রিয় সমর্থকরা একথাটির চিন্তা করার সুযোগ পাননি।

মেয়ে মানুষের মধ্যে আবেগের প্রাধান্য থাকে বলে তার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে। ঘাতক দালাল নির্মূলের ধারণা তাই একজন মেয়ে মানুষের মগজেই জন্ম নিয়েছে। একজন জ্ঞানী মানুষ হলে দালাল চক্রের দেশ প্রেমকে দেশ গড়ার কাজে ব্যবহার করার জন্য কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতেন। কারণ ১৯৭১ সালের পূর্বে আমরা সবাই পাকিস্তানী ছিলাম। আজ যারা ঘাদানিক-এর সাথে জড়িত এদের অনেকের জন্য তখন কাব্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে পাকিস্তানী দেশপ্রেমের কারণে তখন পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করাই স্বাভাবিক ছিল।

ব্রিটিশ দেশপ্রেম যেমন করে পাকিস্তানী দেশপ্রেম হয়েছিল, পাকিস্তানী দেশপ্রেম তেমনি করেই বাংলাদেশী দেশপ্রেম হবে সেটাই স্বাভাবিক। শেখ মুজিবর রহমান তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সকল দালালকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের দৈন্যের কারণে শুধু দালালের বিচারই নয়, আবেগের বশে ঘাদানিকদের কেউ কেউ বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলার জন্য, কোরআন, কিতাব, বেদ, বাইবেল বাতিল করার জন্য, মেয়েদের জ্বরায়ুর স্বাধীনতার জন্যও আন্দোলন শুরু করেছে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের এই দৈন্যের কারণ হচ্ছে বর্তমানকার নেতারা ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির শরাব পান করে বলবীর্য খুইয়ে নীতিজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছেন। পত্রিকার পাতা খুললেই তাদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেখা যায়, তারা নীতির প্রশ্নে আপোষ করেন না। তার পাশাপাশি কলামে খবর দেখা যায়, শত শত হাজার হাজার নেতাকর্মী দল বদলের ডালি হাতে নিয়ে বিভিন্ন দলীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন এবং নতুন নীতির লেবাস ধারণ করছেন।

সত্তর-এর দশকের শেষের দিকে হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছে, আশির দশকে হাজার হাজার আওয়ামী এবং বিএনপির নেতা ও কর্মী জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছে। এখনও সোৎসাহে আন্তঃদলীয় দল বদলের পালা চলছে। শুধু দল বদলই নয়। নীতির ছলছুতা বের করে তারা নিজদল ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নতুন দল তৈরী করতে গিয়ে একদলের বিরুদ্ধে অপরদল ফতোয়া জারি করছে এবং নিত্যি নিত্যি তাদের নীতির কবর রচনা করছে।

৩০ জুলাই ১৯৯৪ তারিখের হরতাল শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এক এমপি এক নতুন ফতোয়া দিয়ে বলেছেন, জামায়াতের ইসলামীর কথার প্রতিবাদ করলে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন।

এমপি সাহেবের মূলই নেই তিনি আবার এই মৌলবাদ রপ্ত করলেন, কোথা হতে? তার কাছে আল্লাহ কখন ঐ বাণী পাঠালেন। কি করে পাঠালেন কোন ফেরেশতার মাধ্যমে পাঠালেন ইত্যাদি কোন তথ্য বা সূত্র তিনি উল্লেখ করেননি। তার মত একজন নেতার জানা উচিত ছিল যে, তথ্যসূত্র ছাড়া কোন ফতোয়া দেওয়া যায় না এবং এ ধরণের ফতোয়া দিয়ে মৌলবাদীও হওয়া যায় না। মৌলবাদী হতে হলে সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। ছাত্রকালে পড়ালেখা ছেড়ে, রাজনীতির কিতাব ছেড়ে যারা রাস্তার মিছিলে রাজনীতির ছবক নেয় ইতিহাস জ্ঞানের অভাবে তারা নাপিতের ফোড়া কাটার মত এ ধরণের ফতোয়া দিতে পারে বটে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতাদের দৈন্য যে কত প্রকট এই ফতোয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। আর এই ধরণের কথার বাজিকররাই আমাদের রাজনৈতিক দলের নেতা। জনসাধারণ যাতে তাদের আহাম্মক বলতে না পারে সেজন্য তারা পিকেটিং-এর হরতাল দিয়ে জনগণকে, জনগণের রুজি রোজগারের পথ বন্ধ করে দিয়ে কষ্টে ফেলে' প্রমাণ করতে চায় তারা বড় নেতা।

রাজনীতিক ছেলে ধরা

শিশুর হাতের মোয়াটি খসাতে হলে তাকে খোশামোদ করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে হয় যেমন– তুমি কত ভাল, তুমি কত বড় হয়ে গেছে ইত্যাদি। শিশু তখন তার সাধের মোয়াটি দিয়ে দেয় সাথে সাথে সে বড় হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দু'চারটি গ্লাস, প্লেট, পেয়ালাও ভেঙ্গে দেখায় সে কত বড় হয়েছে। আবার চোর, বদমাস, ছেলেধরা, শিশুদের খেলনা চকলেট-এর লোভ দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে পঙ্গু করে ভিক্ষার ব্যবসা করে অথবা নাচ শিখিয়ে ঘেটু নাচের ব্যবসা করে। আজকাল আবার বিদেশে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি ও মেয়ে হলে বেশ্যাবাড়ীতে বিক্রি করে অথবা রক্ত, চোখ, কিডনী খুলে বিক্রি করা হয়। আমাদের রাজনীতির নেতারা অর্বাচীন ছাত্রদের তেমনি খোশামোদ করে প্রলোভন দ্বারা ক্লাশরুম থেকে বের করে রাস্তায় নামিয়ে নিজেদের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নিয়োজিত করেন। শিশুর গ্লাস পেয়ালা ভাঙ্গার মত রাস্তায় গাড়ি ভেঙ্গে, অস্ত্রবাজি করে দেখিয়ে দেয় তারা কত লায়েক হয়েছে।

আবার ছেলে ধরাদের মত নেতারা অধ্যয়নরত ছেলেদের ক্ষমতার মোহ দ্বারা মুগ্ধ করে ক্লাস থেকে বের করে রাস্তার হরতাল, পিকেটিং মিছিলে গুলির সামনে ঠেলে দেন, গুলি খেয়ে ছাত্র মারা যায়, আর নেতারা শকুনের মত লাশ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। এমনি করে নেতারা ছাত্রদের রাজনীতিতে নিয়োজিত

করে তাদের জ্ঞান চর্চার পথ বন্ধ করে দিয়ে, মন, মানসিকতা ধ্বংস করে দিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পঙ্গু করে দেন। এই বুদ্ধিবৃত্তিক পঙ্গুত্ব নিয়ে তারা দুর্গম সংসার পথের খুব বেশী দূর অতিক্রম করতে পারে না। সৃজনশীল কিছু করার মত জ্ঞানে অভাবে শেষ পর্যন্ত এরা রাজনীতিকদেরই চামচাগিরি করে, অথবা সন্ত্রাসী অথবা গ্রাম্য টাউট-বাটপারির দুর্বিষহ জীবন যাপন করে এবং সমাজ জীবনে অশান্তির বীজ ছড়ায়। আন্দোলন ও নির্বাচনের মৌসুমে এই টাউটরাই হয় নেতাদের নির্বাচন যুদ্ধের হাতিয়ার।

কে বা ছেলের পিতা মাতা

নাকের নথ আর কানের দুল বিক্রি করে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে মা যখন জায়নামাযে বসে তসবীহ পড়েন– রাব্বি জিদনী এলমা, হে আল্লাহ আমার সন্তানকে বিদ্যা দাও, জ্ঞান দাও, সে সময় হয়তো ছেলেটি বই পত্র সিকেয় তুলে নেতাদের হুকুম তামিল করছে, তখন সে হয়তো ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়ে রক্তক্ষয়ী নির্বাচনী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। জায়নামায়ে বসে মা-বাবা যখন কল্পনার চোখে দেখছেন ছেলে পরীক্ষায় পাস দিয়ে ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন। আসলে তখন হয়তো নির্বাচনী সন্ত্রাসে সে খুন হয়েছে। অথবা মাথা ফাটিয়েছে, অথবা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ঢাকায় দলের হেড অফিসে গিয়ে নেতাদের পিঠ চাপড়ানি, আহলাদের বাণী আর আন্দোলনের কর্মসূচি শ্রবণ করছে।

রাজনীতির আব্বাজান

নেতারা ছাত্রদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কখনও তাদের নিজের সন্তান বলে উল্লেখ করেন, আবার কখনও এমনভাবে কথা বলেন, যেন ছাত্ররাই তাদের মা-বাবা গার্জিয়ান। ছাত্রদের প্রতি ক্ষমতালিপ্সু নেতাদের বাবা আমার, সোনা মানিক আমার ধরনের ছেলে ভুলানো বক্তৃতার মধ্যে নেতাদের বিবেকের, নেতৃত্বের এবং প্রজ্ঞার যে দৈন্য প্রকাশ পায় তা দেখে সত্যি তাদর নেতৃত্বের প্রতি করুণা হয়। যেমন: এরশাদ সরকারের আমলে ৬ জুলাই ১৯৮৭ তারিখে ২২টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিএনপির চেয়ারপার্সন অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ২২টি ছাত্র সংগঠনকে আহবান জানান (ইত্তেফাক ৭ জুলাই ১৯৮৭)

২৯শে জুন ১৯৮৮ তারিখে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নবীণবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র সমাজসহ সকল গণতন্ত্রকামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। (ইত্তেফাক ৩০-৬-৮৮)

১৮ আগস্ট ১৯৮৮ক তারিখে জাতীয়তাবাদী দলের কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল শাখার ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে বিএনপির চেয়ারপার্সন বলেছিলেন, অচিরেই আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া হবে। ছাত্রদলকে তার জন্য মুখ্যভূমিকা পালন করতে হবে এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনসহ এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব নিতে হবে। (ইনকিলাব ১৯-৮-৯৯)

১৫ অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখে কালিয়াকৈর ও শ্রীপুর থানার দেড় শতাধিক ছাত্রদল নেতা, কর্মী ও সমর্থক ছাত্রদলের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আওয়ামী ছাত্রলীগে যোগদান করতে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এলে আওয়ামী লীগ নেত্রী তাদের ৭ দফা আদায়ের লক্ষ্যে জনগণের পাশাপাশি আরও ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানান। (ইত্তেফাক ১৬-১০-৮৮)

৩১ জানুয়ারী ১৯৮৯ তারিখে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত নবীণবরণ অনুষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব ছাত্রদের প্রতি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার আহবান জানান। (ইত্তেফাক ১-২-৮৯)

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ তারিখে ঘাটাইল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নব নির্বাচিত সদস্যগণ বিএনপি কার্যালয়ে বেগম জিয়ার সাথে দেখা করতে এলে তিনি তাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। তিনি বিএনপি ও ৭ দলীয় জোট ঘোষিত আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচি গ্রামগঞ্জে পালন করার জন্য নেতা কর্মীদের প্রতি আহবান জানান। (ইত্তেফাক ২৮-৯-৮৯)

৯ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রদের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান উপলক্ষে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিএনপির চেয়ারপার্সন বলেন, চলমান সংগ্রামে বিজয় ছিনিয়ে আনতে ছাত্র সমাজ আপোষহীনভাবে এগিয়ে যাবে এটিই জাতির প্রত্যাশা। (ইনকিলাব ১০-১১-৮৯)

২৯ মার্চ, ১৯৯০ তারিখে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ছাত্রদল সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিএনপির চেয়ারপার্সন বলেন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য এই বিজয়কে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের জন্য স্বৈরাচারী সরকারই দায়ী। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ছাত্রদলকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। (ইনকিলাব ৩০-৩-৯০)

১৯৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদ সরকারের ৯ বছরের শাসনামলকে স্বৈরাচারী শাসন নাম দিয়ে আন্দোলনের জন্য ছাত্র সমাজকে যে রাজনৈতিক শরাব পান করানো হয়েছে তার সামান্য কিছু উপরে উদ্ধৃতি করা হল।

ছাত্রদের প্রতি ঐ আহবানগুলির মধ্যে নেতাদের এক বিশেষ অসহায়ত্ব ও দৈন্য ফুটে উঠেছে। রাজনীতির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক খোকারা যেন সবাই বিশৃংখল এবং উচ্ছৃংখল হয়ে পড়েছে। এই খোকাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ছাত্র আব্বাজানদের আহবান জানানো হচ্ছে। আবার কখনও দেশের মানুষকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য, ব্যাপকভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, গ্রামগঞ্জে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পালন করার জন্য এবং আপোষহীনভাবে এগিয়ে যাবার জন্য দিনের পর দিন নেতারা ছাত্র আব্বাজানদের আহবান জানিয়ে চলেছেন। এই উপদেশ এই আহবানগুলির কোথাও গুরুজনোচিত একটিও বাক্য নেই। সবগুলোতেই শুধু উদ্ধত হওয়ার জন্য, হিংস্র হওয়ার জন্য, মার-মার-কাট-কাট রবে প্রতিপক্ষের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার জন্য, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছাত্রদেরকে আহবান জানানো হয়েছে। ভুলেও কেউ তাদেরকে অধ্যয়নের কথা, জ্ঞানী গুণী হওয়ার কথা, পড়া লেখায় মনযোগী হওয়ার কথা বলেনি।

একজন ছাত্র পথের একটি ফকিরের হাতে একটি পয়সা তুলে দিলেও ফকিরটি বলে বাবা বেঁচে থেকো। আল্লাহ বিদ্যাবুদ্ধি দিক, পড়ালেখা করে জ্ঞানী গুণী হও। একজন ছাত্র মাঠের একজন চাষাকে সালাম জানালে চাষাটি বলে বাবা ভাল করে লেখা পড়া করো যাতে ভাল পাশ দিয়ে মা-বাবার কলিজা ঠান্ডা করতে পার। আমাদের রাজনীতিকরা কি ঐ ফকির আর ঐ চাষার চেয়েও খারাপ?

নেতাদের খোশামোদ দ্বারা উত্তেজিত ও উৎসাহিত হয়ে ছাত্ররা আজকাল নিজেরাই রাজনৈতিক দল গঠন করছে এবং বই খাতা তাকে তুলে রেখে তাদের হল রুমকে রাজনৈতিক দলের অফিস এবং অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যবহার

করছে। তেমনি একটি দল হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ। শিশুকে খোশামোদ করলে সে যেমন ঘরের হাড়ি পাতিল ভেঙ্গে প্রমাণ দেখায় সে কত বড় হয়েছে, তেমনি এই ছাত্র সমাজটি ৩০ শে জুলাই, ১৯৯৪ তারিখে এনডিপিএর অফিস, জাগপার অফস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অফিস ভেঙ্গে তছনছ করে দেখিয়েছে তারা কত বড় হয়েছে। এদেরই কেউ কেউ একদিন বড় নেতা হবে, গরিব মারা হরতাল করবে, বাপ ভাইয়ের কষ্টের টাকায় বিদেশ হতে খরিদ করা গাড়ী ভাঙ্গবে, কলকারখানায় সিবি এ আন্দোলন করে শিল্পপতি হত্যা করবে, কারখানা বন্ধ করবে এবং শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত করে বেকার বানাবে। আর শিশু শিল্পদ্যোক্তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেশের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে আসবে।

সরকারের পর সরকারের শেষ হয়। কিন্তু আন্দোলন এবং ছাত্রদের প্রতি আহবানের ধারাতো শেষ হল না। শেষ হবেও না। কারণ স্বেচ্ছাচারিতা আর দুর্নীতি আছে রাজনীতিকদের রক্তে মাংসে। আজ ৪৭ বছরে তা মজ্জাগত হয়েছে। সুতরাং যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক সেই স্বৈরাচারী হবে। শেখ মুজিব স্বৈরাচারী ছিলেন অভিযোগে তাকে হত্যা করা হয়, যেকোন অভিযোগেই হোক জিয়াউর রহমানকেও হত্যা করা হয়। এরশাদ স্বৈরাচারী ছিলেন তাই সকল দল মিলে আন্দোলন করতে হয়েছে। বেগম জিয়াকে আর এক স্বৈরাচারী বলে তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়েছে। সাথে সাথে আন্দোলন সফল হওয়ার নরবলি তথা ছাত্রবলির সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

তার সাথে ছাত্রদের প্রতি সেই পুরানো তালের লেখাপড়া বন্ধ করে বিনা বেতনের লাঠিয়ালী করার আহবানও চলেছে।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে ভূয়াপুর ইব্রাহিম খাঁ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সদস্যগণ বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারী বাস ভবনে দেয়া করতে এলে তিনি বলেন, এ বিজয় মুক্তিযুদ্ধের শক্তির বিজয়। তিনি বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাবার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার বর্বর সন্ত্রাস দমন আইন বাতিলের লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানান। (ইনকিলাব ১৩/১২/৯৩)

২৪ জুলাই ১৯৯৪ তারিখ আশুগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের এক প্রেসিডিয়াম সদস্য ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। (ইনকিলাব ২৫/৯৪)

রাজনীতিকরা যে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য আব্বাজান মনে করে সেই ছাত্রদেরও আব্বাজান আছে। সেই আব্বাজানেরা দিনে পাঁচবার জায়নামাজে গিয়ে দোয়া করেন কোন অপদোষ, অপচিন্তা, অপকর্ম যেন তার সন্তানের পড়া লেখার মন-মানসিকতা ও মেধাকে বিঘ্নিত না করে। সাথে সাথে হিসেব করেন পড়া লেখার খরচ আর কত টাকা লাগতে পারে, আর কতদিন লাগতে পারে, আর কতদিন পর তার সন্তানের পক্ষে সংসারের হাল ধরা সম্ভব হতে পারে।

হাতির পিঠে চড়তে পারলে শিশু যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাটির দিকে তাকাবার ফুরসৎ পায়না, ছাত্ররাও তেমনি বড় বড় রাজনৈতিক দলের পিঠে চড়তে পেরে মা-বাবার দিকে তাকাবার ফুরসৎ পায় না। তারা ভাববার অবকাশও পায় না যে তাদের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেলে রাজনীতিকরা তাদের নিজ নিয়তির হাতে ছুড়ে ফেলবে। আর বেকার ছেলের বোঝা মাথায় নিয়ে ন্যুব্জ মা-বাবা সংসার খরচের বাজেট পুনর্নির্ধারণ করবেন, মাছ বাদ দিয়ে শাক খাবেন বা শাক বাদ দিয়ে ডাল খাবেন অথবা তাও বাদ দিয়ে শুধু নুনে আর ভাতে, ভাতে আর নুনে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে যাবার চিন্তা করবেন।

ছাত্র নেতৃত্বের বিদ্রোহ

উপরে উল্লেখ করেছি রাজনৈতিক দলগুলির জনশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে বিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ আর শিল্প-কারখানার শ্রমিক সমাজ। ছাত্র সমাজের বিপথগমন যেকোন জাতির ভবিষ্যত নষ্ট করে দিতে পারে। আর শ্রমিক সমাজের উচ্ছৃংখল আচরণ যেকোন জাতির অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে পারে। আমাদের ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা দেশের ছাত্র ও শ্রমিক সমাজকে তাদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে ঐ উভয় সর্বনাশটি করে ফেলেছেন।

রাজনীতিকরা ছাত্রদের হাতে কলমের জায়গায় তুলে দিয়েছেন পিস্তল, বন্দুক, ছুরি, কিরিচ। জ্ঞানচর্চার স্থলে দিয়েছেন সন্ত্রাস, ভন্ডামির তালিম। তাদের মা-বাবাতো তাদের সন্ত্রাসী করার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাননি। কিম্বা সন্ত্রাসী করার জন্য বন্দুক, পিস্তাল, ছুরি, কিরিচ সাথে দিয়ে দেননি অথবা অস্ত্র খরীদ করার জন্য মা-বাবারা কোন টাকাও দেননা এবং অমন অস্ত্র খরীদ করার মত অর্থ সংস্থানের সামর্থ্যও মা-বাবার নেই। যদি থাকত এবং যদি সন্ত্রাসী কর্মের মানসিকতাই হত তবে মা-বাবারা সন্তানদের বিদ্যালয়ে না

পাঠিয়ে চর দখলের কাজে লাগাতেন। তাতে দু'পয়সা আয় হত অথবা বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া যেত। অপরদিকে কান্ডজ্ঞানহীন রাজনীতিকদের অপরিনামদর্শী প্ররোচনায় শ্রমিকেরা মেশিনের সুইচ গিয়ার ছেড়ে হাত তুলে নিয়েছে দাবিদাওয়া লেখা মিছিলে ব্যানার, উৎপাদনের স্থলে তারা করছে ভাংচুর।

এহেন ছাত্ররা যখন সংসার জীবনের দুয়ারে এসে পৌঁছে, তখন থমকে দাঁড়ায়। তারাতো এমন কিছু বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করেনি যাদ্বারা কিছু একটা করে জীবিকার্জন করবে। রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করতে করতে চাকরি বয়সও হরিয়েছে। কলে কারখানায় বয়স লাগেনা। কিন্তু সেগুলোতে দিনের পর দিন লোকসানের ঘানি টানছে, একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। এতদৃষ্টে দেশের কোটিপতিরা শিল্পকারখানা তৈরী করতে সাহস পাচ্ছে না, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা মৌমাছির পালের মত দেশের আকাশে এসে ভন ভন করে অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকদের টাউট হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। রাজনীতিকদের হয়ে পাড়ায় মহল্লায় তারা যুব সংগঠন গঠন করে, বাঁশের বেড়া দিয়ে ক্লাবঘর তৈরী করে, তা দেখিয়ে চাঁদাবাজি করে আর রাজনীতিকদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে সন্ত্রাস করে, ছিনতাই করে, খুন জখম করে। পুলিশ তাদের ধরতে আসে না, ধরলেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কারণ তারা রাজনীতকদের আন্দোলনের হাতিয়ার।

যারা ছাত্রজীবনের সন্ত্রাস করে গেছে তাদের জনসাধারণ ভাল চোখে দেখেন না। বিশেষ করে ছাত্রজীবনে তারা নেতা-নেত্রীদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করেছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মুরুব্বী এবং রজনীতিক নেতাদের অপমান করেছে, প্রহার করেছে, ছাত্র খুন করেছে। সুতরাং তাদের মুখ পেকেছে, হাত পেকেছে। এখন সমাজে গিয়ে তারা সমাজের মুরুব্বী, মোড়ল, মাতব্বরকে চুনোপুটির মত মনে করে। অপরদিকে মোড়ল, মাতব্বররাও তাদের বাঁকা চোখে দেখে, খুনী, সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করে। যে ছাত্র কাউকে খুন করেনি তাকেও মানুষ খুনী মনে করে। রাজনৈতিক মেধা নেই, চাকরি নেই, সমাজেও স্থান নেই, সে যায় কোথায়? বিয়ে সাদী করে যেকালে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কথা সেকালেও মানুষ তাকে খুনী হিসেবে, গুন্ডা হিসেবে গণ্য করে। তখন তাদের কেউ কেউ সম্বিৎ ফিরে পায়। একজন নেতা আক্ষেপ করে বলেছেন: "আমি কখনও কাউকে খুন করিনি। ..... কিছুই জানি না, অথচ একটি হত্যা মামলার আসামী হিসেবে আমার নাম জানা-জানি হয়ে গেল। আদালতের বিচারের আমার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হল। চার বছর জেল

খাটার পর মুক্তি দেয়া হল। কিন্তু খুনীর সাইনবোর্ড আমার শরীরে লেগে গেল। বিয়ে করেছি, সংসার পেতেছি, সন্তান আছে। এখনও আমাকে দেখিয়ে লোকে বলে খুনি। আমার স্ত্রীকে দেখিয়ে বলে খুনীর স্ত্রী, আমার সন্তানকে দেখিয়ে বলে খুনীর সন্তান..... খুব কষ্ট হয়। কতদিন এই কষ্ট বয়ে বেড়াব জানি না।" (সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ১০/৮/১৯৯৪)

ছাত্রজীবন শেষ করা বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ব্যর্থতার ঘানি টানতে গিয়ে তাদের উপলব্ধি বাড়ছে। আজ তাদের মধ্যে যারা পোড় খেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে তারা রাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে এবং বিদ্রোহের চরম ভাষা ব্যবহার করছে।

গত ১০ আগস্ট (১৯৯৪) সংখ্যা সাপ্তাহিক পূর্ণিমার "রাজনীতিতে নিষিদ্ধ চরিত্র" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে প্রকৃত পক্ষে ছাত্র রাজনীতির ধারা ও পরিণাম সম্পর্কে কতিপয় বিক্ষুব্ধ ছাত্রনেতার বিলম্বে বেধোদয় জনিত ক্রুদ্ধ হাহুতাশ বিবৃত হয়েছে। তাতে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে একজন ছাত্রনেতা বলেছেন:

"নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ছাত্র রাজনীতি যদি কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি হয় তাহলে সেটি যেকোন ছাত্রের ধ্বংস ডেকে আনবে। লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করে আমার মত অনেক ছাত্র শিক্ষা জীবনকে কাজে লাগাতে পারেনি। আমি এমএ পাস করেছি, এটা নিছক একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। গোটা ছাত্র জীবন অস্বাভাবিকভাবে যাপন করেছি। বাবা-মা-ভাই-বোনদের দিনরাত টেনশনে রেখেছি। অথচ অন্যের জীবন নিরুদ্বিগ্ন করেছি, স্বচ্ছল-স্বাচ্ছন্দ্য করে দিয়েছি। কখন যে নিজের এত বড় ক্ষতি করে ফেললাম টেরই পেলাম না।

আদর্শের কথা বলে, বিপ্লবের কথা বলে এদেশের স্বার্থপর রাজনীতিবিদরা অসংখ্য তরুণকে বিভ্রান্ত করেছেন, নষ্ট করেছেন, আর নিজেদের সম্প্রদশালী করেছেন, ক্ষমতায় গেছেন। কখনও বা ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে উত্তাপ গ্রহণ করেছেন। আকাশ সমান ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে আজ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে– ব্যক্তি স্বার্থলোভী রাজনীতিকদের কবল থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করুণ। দয়া করে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করুণ। রাজনীতিকরা আমার মত অনেককে খুনী বানিয়েছে। সুযোগ পেলে আরও মায়ের সন্তানকে নষ্ট করে দেবে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য।"

অপর একজন ছাত্রনেতা বলেছেন, "এখন আমার খুনী হওয়ার ভীষণ ইচ্ছে। এদেশের ক্ষমতাপিয়াসী রাজনীতিবিদদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে

প্রবল ব্রাশ ফায়ার করতে ইচ্ছে হয়। এদেশের কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বড় করে অন্য কিছু দেখতে পায় না। নিজেকে ক্ষমতায় বসানো রজন্য এরা দেশের তরুণ সমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে গোলা দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে। অথচ এরাই আবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলে। এরা যেন রাজনীতির এজেন্সী নিয়ে বসেছে। জীবন থাকতে এরা কাউকে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে রাজি নয়। আমি কাউকে খুন করিনি, নির্দেশও দেইনি। আমার সংশ্লিষ্টতায় অনেকে খুন হয়েছে, কিন্তু সেটা পার্টির নির্দেশে। পার্টির নির্দেশ ছাড়া কখনও সন্ত্রাসী কাজে জড়াইনি। ব্যক্তিগত স্বার্থে কখনও অস্ত্র হাতে তুলে নেইনি। পার্টির পেছনে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় নষ্ট করেছি। অবশ্য এই সময় দিতে গিয়ে আমি নিজেকে জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে দেশপ্রেমের নামে কিছুসংখ্যক দল ও রাজনীতিবিদ যে ভন্ডামি করছে তা কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।"

লাশ ও শকুন

বগলে ইট মুখে শেখ ফরীদ

সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে 'সরকার সচেষ্ট' শিরোনামে একটি সংবাদ ১৯ জুন ১৯৯৪ তারিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ১৭ই জুন শুক্রবার মৌলভী বাজারে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মেধা প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত বৃত্তি প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংবাদ পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের শিশু-কিশোরদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তার পরিপূর্ণ ও যথাযথ বিকাশের মধ্যেই জাতির ভবিষ্যত উন্নতি নির্ভর করে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ সাধন ও তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।"

এসব কথা রাজনৈতিক বক্তৃতার গদবাঁধা নিয়ম। মানুষের মন জয় করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে তার জন্য এবং বংশধরদের জন্য সুখের আশ্বাস দেয়া। রাজনীতিকদের আশ্বাসগুলীকে মৃত সঞ্জিবনী সুরা তথা মদও বলা চলে। প্রতারকেরা যেমন বেকারত্বের অভিশাপগ্রস্থ মানুষকে বিদেশে চাকুরীর লোভ দেখিয়ে তার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে, রাজনীতিকরাও তেমনি সুন্দর ভবিষ্যতের মুলা দেখিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদাও নেয় আবার বিনামূল্যে মূল্যবান ভোটও নেয়। ভোটে জিতে তারা সরকারী সম্পদ ও ক্ষমতার আধিপত্য লাভ করে জনগণকে ভুলে যায়। এমনি করে চিরদিন জনসাধারণ রাজনীতিকদের হাতের মুলার পেছনে ছুটে চলেছে। কিন্তু তার হাজার বছরের দারিদ্র ভাগ্য কোনদিনই বদলায়না। আর রাজনীতিকদের বক্তৃতার ভাষাও কোনদিনই বদলায় না।

আশ্বাসের বাণী শুনবার জন্য রাজনীতিকরা সকল প্রকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ভাষণ দেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে গিয়ে এমন ভাষণ দেন যেন ক্ষমতাটা হাতে পেলেই তিনি বাণিজ্য ক্ষেত্রে চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গার সম্ভারে দেশকে সয়লাব করে দেবেন, ব্যবসায়ীদের গুদাম ঘরে লক্ষ্মীর বাসা বাণিয়ে দিবেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তেমনি শিল্পলক্ষীর কথা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গিয়ে 'রাব্বী জিদনী এলমা' বলেন যেমন উপরে বলেছেন। আর যদি কোন উপলক্ষ্য না পাওয়া যায় তবে এক বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে সেখানে সরকারী খরচে পাকা পোল তৈরীর জন্য স্বেত পাথরের ভিত্তি প্রস্তর স্থান করে বক্তৃতার উপলক্ষ্য তৈরী করেন এবং

দেশবাসীকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার নতুন আশ্বাস দেন। এ ধরনের কথা শুনতে খুবই ভাল লাগে। এ ধরনের উপদেশ বাস্তবায়ন করতে পারলে জ্ঞানী গুণী মানুষের চঞ্চল পদচারণায় দেশের মাটি টগবগ করত, কল-কারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, কর্মব্যস্ত মানুষের কলকাকলিতে দেশের বাতাস মুখরিত হয়ে থাকত। বেগার খাটার জন্য দেশে কোন বেকার খুজে পাওয়া যেতনা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে গণতন্ত্রের যুগে নেতারা মুখে যা বলেন মনে তা মানেন না। তার কারণ তাদের চাকরিটা বড় ক্ষণস্থায়ী। এ কারণে দেশের ধান্ধার চেয়ে তাদের নিজের ধান্ধায় সময় দিতে হয় বেশি। মুখে মুখে শেখ ফরিদের কথা বলার সময় বগলের ইট ঠিক রাখতে হয়।

'ট্রাইটুবি আন্ডারষ্ট্যান্ড'

সর্বোপরি গণতন্ত্রের নামে এখন ক্ষমতা এসেছে একদা গরীব অক্ষমদের হাতে। অর্থ ক্ষমতা হাতে পেয়ে একালের ঐ দরিদ্র অক্ষমরা মেতে উঠেছে নারকীয়তায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মা-বাবা নাকের নোলক কানের দুল বিক্রি করে যে মেধাবী ছেলেটাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করান ভবিষ্যতের আশা ভরসা নিয়ে, সে ছেলেটির মেধা ও প্রতিভাকে গণতন্ত্রের নেতারা ব্যবহার করেন নিজ দলীয় কোন্দলে, সন্ত্রাসে, মাস্তানীতে। আমরা যখন ঘরে বসে অপেক্ষা করি কলেজ বন্ধ হলে ছেলেটি কোলে ফিরে এসে জ্ঞানের কথা বলবে, গুণের কথা বলবে, নতুন প্রযুক্তির কথা বলবে তখন হঠাৎই ছেলেটির লাশ আসে এক হৃদয় বিদারক বুলেটের মত। যদি বেঁচে আসেও তবে সে জ্ঞান গুণ বা প্রযুক্তির গল্প শুনায় না। সেসব শুনাবার মত শক্তিই হয়তো তার নেই। কারণ সে হয়তো ভার্সিটির ছাত্রদের গোলাগুলিতে আহত হয়ে এসেছে। অথবা ছাত্র হানাহানির মধ্যে কেউ তার পায়ের রগ কেটে ফেলেছে। এখন হয়তো মাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তা দেখাচ্ছে আর মা অশ্রুভেজা আচল দিয়ে দূর্ভাগা সন্তানের ক্ষতস্থান মুছে দিচ্ছেন। অথবা ছাত্র কোন্দলে সে অন্যের পায়ের রগ কেটে দিয়ে এসেছে বা অন্যের মাথায় গুলি করে এসেছে এবং তাতে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করতে পেরেছে সেসব অস্ত্রের বিবরণসহ মা-বাবাকে সে কতনা দূর্বোধ্য নতুন নতুন অস্ত্রের কথা শুনায়।

সে সন্ত্রাস বিজয়ের গল্প শুনায়, ছাত্র সংসদের বিজয়ের কথা শুনায়। আমি যদি বুঝতে না চাই এবং ওসব কিছু বাদ দিয়ে শুধুই পড়া লেখার প্রতি একনিষ্ঠ হতে যখন বলি, তখন আমার এমএ পড়ুয়া ছেলে আমাকে বলে 'বাবা ট্রাইটুবি আন্ডারস্ট্যান্ড', এটা তোমাদের সেই বই নিয়ে ঘুমানোর হাত কচলিয়ে কথা বলার পুরানো যুগ নয়। আমাকেও চোখের জলে স্বীকার করতে

হয় যে, সে আমার ছেলে আমার খায়, আমার পরে, টাকার প্রয়োজন হলে মায়ের গায়ের গয়না বিক্রি করে টাকা নেয়। কিন্তু ক্যাম্পাসে যেতেই সে হয়ে যায় রাজনৈতিক নেতাদের সন্তান। সুতরাং সে তো ঐ ট্রাইটুবি আন্ডারস্ট্যান্ড ধরনের ইংরেজীই বলবে।

১৭ জুন ১৯৯৪ তারিখে অর্থমন্ত্রী শিশু কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করার জন্য এবং তদ্বারা জাতির উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন। ঠিক তার ১৭ দিন পর ৪ঠা জুলাই বিভিন্ন পত্রিকায় "জুলাই মাসকে ছাত্রদলের সদস্য সংগ্রহ মাস ঘোষণা" শিরোনামে আর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটিতে বলা হয়েছে বিএনপি জুলাই মাসকে সদস্য সংগ্রহ মাস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ উপলক্ষ্যে পোস্টার ও সদস্য সংগ্রহ বই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মওজুদ রাখা হয়েছে। যেসকল জেলা কমিটি এখনও পোস্টার ও সদস্য সংগ্রহ বই নেননি তাদেরকে অতিসত্বর তা নেওয়ার জন্য দলীয় মহাসচিব অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমরাতো আমাদের সন্তানদের প্রতিভা বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাই। কিন্তু ঐ সংবাদটির ভাষা দেখেতো মনে হয় যেন বিদ্যালয়গুলি আসলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির ছাত্রবাহিনীর রিক্রুটিং সেন্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে ছাত্রদের ভর্তি করে নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অশ্লীল ভাষা ও মারাত্মক অস্ত্রের তালিম দেওয়া হবে। ছাত্র সন্ত্রাস কালে কেউ কেউ ছাত্র হত্যা করে নামী দামী ছাত্র নেতা বনে যাবে। দু'চার বার হাজত বাসও হবে। কিন্তু তদ্বারা সে কালপুরুষ হয়ে দাড়াবে। পরবর্তী জীবনে হত্যা খুন গুম রাহাজানি তার জন্য ডাল ভাতের মত হয়ে যাবে। বিশেষ করে তারতো হ্যান্ড-কাপ, কোর্ট, জেল হাজত এসবের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এবং ঐ অভিজ্ঞতা দ্বারা তার ওসবের সংস্কারও কেটে গেছে। সে এখন পুলিশের হাত কড়া আর জেল হাজতের জন্য সামান্য লোকলজ্জাও অনুভব করেনা। বরঞ্চ নেতারা তাকে ছুটিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন এবং ছাড়াপেয়ে জেল গেইটে পৌঁছতেই ফুলে মালায় তার গলা পুরে যাচ্ছে দেখে আরও বার বার জেল খাটার জন্য অনুপ্রেরনা অনুভব করে। তাকে অভ্যর্থনাকারীদের সংখ্যাধিক্য দেখে সে..... গর্ব অনুভব করে এবং আরও বড় বড় দুষ্কর্ম সংগঠনে প্ররোচিত হয়। সুতরাং সে কথায় কথায় প্রতিবেশী মামাকে অপদস্থ করতে, প্রতিবেশী চাচার মেয়েকে অপহরণ করতে, ধর্ষন করতে, যৌতুকের জন্য শ্বশুরের চোখে চোখ রেখে গালি দিতে লজ্জানুভব করেনা। তার

গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা যখনই পত্রিকার পাতায় বের হয় সাথে সাথে এও লেখা থাকে যে, এর আগে সে আরও দু'বার বা চারবার গ্রেফতার হয়েছিল। এছাড়াও নেতারা ছাত্রদের আরও যে একটা তালিম দিয়ে থাকেন তা হচ্ছে অশ্লীল ভাষার তালিম। প্রতিপক্ষের নেতা নেত্রীদের গালাগাল করা, তাদের চৌদ্দপুরুষের অশ্লীল ইতিহাস টেনে এনে অশ্লীল ভাষায় গীবত করা, এসবই তাদের ট্রেনিং এর বিষয়বস্তু।

সুতরাং প্রতিশ্রুতিশীল যে মেধাবী ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে আমরা অপেক্ষা করি সে এসে আমাদের জ্ঞানের কথা, গুণের কথা, দর্শন বিজ্ঞানের কথা শুনাবে, কিন্তু হায়! সে এসে দলের কথা বলে, খুনের কথা বলে। সে একটা অসভ্য বেয়াদবের মত গুরুজনদের সাথে উদ্বত ভাষায় বলে "ট্রাইটুবি আন্ডারস্ট্রান্ড।"

১৯৮৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার একটি কেন্দ্রে পরীক্ষার শেষ দিনে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হাজিগঞ্জ থানার একটি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে বিলিকৃত একখানা গোলাপী রঙের লিফলেট আমার হাতে আসে। তাতে লেখা ছিল–

"প্রিয় পরীক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা!

দীর্ঘ দশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার চূড়ান্ত পর্বে আজ আপনারা উপনীত। সফলতা ও ব্যর্থতার পাশাপাশি আপনাদের প্রতি তাকিয়ে আছে আপনাদের পিতা, মাতা, ভাই-বোন, দেশ ও জাতি। আপনাদের মত এমনি এক পরিস্থিতিতে আমরাও একদিন উপনীত হয়েছিলাম, যে আশা উদ্দীপনা নিয়ে জীবন গড়ার বলিষ্ঠ শপথ নিয়ে আমরা এগিয়ে আসছি। কিন্তু আজ সবই গুড়ে বালি। আমরা দেখছি আমাদের বড় ভাইয়েরা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও আজ বেকারত্বের অভিশাপে ধুকে ধুকে মরছে। আর অধিকার আদায়ের প্রশ্নে যখনই প্রতিরোধ আর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে তখনই ঘাতক বুলেট এসে তার কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়।

বন্ধুরা, সেই ৫২ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যেকোন সংগ্রামে মাতৃভূমির 'সতন্ত্র' প্রহরীর মত ঝাপিয়ে পড়ে এদেশের ছাত্ররা, আজ সেই ছাত্রদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। বই খাতা কাগজ কলমসহ নিত্যদিনের দ্রব্যাদির মূল্য আজ দ্বিগুণ, এসবের বিরুদ্ধে আপনাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। তাই আসুন, লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পতাকা সমুজ্জল রাখতে শহীদ জিয়ার ১৯ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আপোষহীন জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলে যোগদান করি।"

যেসব ছাত্র নেতারা ঐ লিফলেট খানা লিখেছেন, ছাপিয়েছেন এবং বিলি করেছেন তাদের প্রতিভা কতটুকু বিকশিত হয়েছে তা ঐ লিফলেটের ভাব, ভাষাও বানান হতে খুব সহজে উপলব্ধি করা যায়। তাদের ঐ সাংগঠনিক তৎপরতার পেছনে যাদের প্ররোচনা কাজ করেছে তারা যে আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান সাধনার প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল তাও সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ আমরা জানি যারা ঐ প্রচারণার উদ্যোক্তা তারা সবাই সশস্ত্র ছাত্র রাজনীতির ফসল, শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যাদের পেশা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির স্থানীয় টাউটদের চামচাগিরী করা। আর রাজনীতিকদের প্ররোচিত আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধই যেদেশে প্রযুক্তি ও পুঁজির বিকাশকে ভীত সন্ত্রস্ত্র করে রেখেছে এবং এ কারণেই যে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না।

লাশ ও শকুন

মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন হতে জ্ঞান চর্চা বিরোধী যে প্ররোচনা শুরু হয়, কলেজে ভর্তি হতে এসে কিশোর ছাত্ররা এবং তাদের দূরদর্শি পিতা-মাতারা তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করে। ভর্তির দিনই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ভর্তিচ্ছুদের দলভুক্ত করার জন্য এমনভাবে টানাটানি করে যেমনটি সায়দাবাদ বা গাবতলি বাস টার্মিনালে বাসের দালালরা যাত্রীদের নিজ বাসে উঠাবার জন্য টানাটানি করে। দলে নাম না লিখিয়েও উপায় নেই। নইলে ছাত্রাবাসে সিট পাওয়া যাবে না, অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নাম লেখানোর পর জ্ঞান চর্চার এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগতো হয়ইনা বরঞ্চ ছাত্রটির চারপাশ ঘিরে একটা করুণ পরিণতির কালো ছায়া তাকে ছুই ছুই করে। ৭ এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে তেমনি একটা পরিণতি আমরা দেখেছি।

ঐদিন সম্মিলিত বিরোধীদল সচিবালয় ঘোরাও করে। ঘেরাও কালে ডেমরা রোস্তম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ১৬ বছর বয়সের হাবিবুর রহমান মিলন এবং নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্যের ২২ বছর বয়স্ক ছাত্র আমিনুর রসুল পরাণ গুলিতে প্রাণ হারায়। অর্থমন্ত্রী যখন প্রতিভা বিকাশের উপদেশ দেন, তখন রাজনীতি এমনি করেই তরুণ কিশোরদের আন্দোলনের প্রতি প্ররোচিত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। দরিদ্র মানুষেরা যেমন জীবিকার গরজে শিশু-সন্তানকে স্কুল থেকে বের করে ক্ষেত

খামার আর কলকারখানায় কাজে লাগায় আমাদের রাজনৈতিক গরীবেরা তার ব্যতিক্রম কিছু নয়।

একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে দরিদ্র মানুষেরা কিশোর সন্তানকে স্কুল থেকে বের করে নিয়ে জীবিকার্জনের কাজে লাগায় আর রাজনীতিকরা কিশোর ছাত্রটিকে স্কুল থেকে বের করে নিয়ে ঘেরাও অবরোধ, জঙ্গী মিছিল ইত্যাদিতে পুলিশের গুলির মুখোমুখি অবস্থানে লেলিয়ে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সের হাবিবুর রহমানের কি-ই বা জ্ঞানবুদ্ধি যে, সে রাজনীতির টানে ডেমরা থেকে ঢাকা আসবে আন্দোলন করবে, আর রাজনীতির জন্য প্রাণ দেবে। আমিনুর রসূল পরাণও ১৮ বছর বয়স থেকেই ছাত্রদল করে আসছে এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ১৯৯১ থেকে অংশগ্রহণ করে আসছে বলে প্রকাশ। সুতরাং তার জ্ঞান চর্চার এবং প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ রাজনীতিকরা তাকে দেননি। তারা নিজ ক্ষমতার যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য এই কিশোরদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিদ্যালয়ে ভর্তির সাথে সাথে তাকে রাজনীতৈক দলের পোষাক পরিয়েছেন তাকে দিয়ে দিনের পর দিন মিছিল করিয়েছেন, অবরোধ করিয়েছেন, রাস্তার যানবাহন ভাঙ্গিয়েছেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছেলেটির বই নিয়ে বসার মত ফুরসৎ ছিল না।

সচিবালয় ঘেরাও এর দিন কিশোর তরুণদের উস্কে দিয়ে নেতারা অনতি দূরে বসে অনবরত তসবীহ টিপেছেন– "আল্লাহ একটা লাশ দে, আল্লাহ একটা লাশ দে"। যখন দেখেছেন পুলিশ গুলি ছুড়ছে না, লাশ তৈরী হচ্ছে না, তখন তারা একদল অপর দলের উপর গুলি ছুড়ে দুটি লাশ বানিয়েছেন। তারাই উপরোল্লিখিত মিলন ও পরাণ। আর এই লাশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি যেমন টানাটানি করেছেন তার সাথে মরা গরু নিয়ে শিয়াল আর শকুনের টানাটানিরই তুলনা চলে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে দু'ধরনের লাশের মূল্য বেশী। এর মধ্যে তরুণদের লাশ বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হয়। কারণ তদ্বারা জন সাধারণের অনুভূতি আহত হয় এবং আন্দোলনের গতি সঞ্চার হয়। যেমন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ২৪শে জানুয়ারী তারিখে পুলিশের গুলিতে নিহত অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ মতিউর রহমান মল্লিকের লাশ দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ তৈরী হয়েছিল। দ্বিতীয় মূল্যবান লাশ হচ্ছে নেতৃস্থানীয় কারও লাশ। কিন্তু নেতৃস্থানীয়রা কোন সময়ই লাশ হয় না বড়জোর তারা শখ করে আহত হতে পারেন, লাশ হতে পারেন না এবং সেখানে যত কিশোর আর তরুণই লাশ

হোক না কেন, কোন নেতার সন্তান কোন দিনই কোন আন্দোলনে লাশ হয় না। ক্ষমতার নেশাগ্রস্তরা ক্ষমতার যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য স্কুল-কলেজে অধ্যায়নরত সাধারণ মানুষের অর্বাচীন সন্তানদেরই ব্যবহার করে থাকেন।

ইংরেজ শাসনামলে শিকারী হিসেবে ভারতের আলোয়ারের মহারাজার নাকি প্রচুর নামডাক ছিল। প্রায়ই তিনি বাঘ শিকারে যেতেন এবং বাঘকে প্রলোভিত করার জন্য শিশুদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতেন। শিশুদের হতভাগ্য মা-বাবাকে তিনি আশ্বাস দিতেন যে, তাদের সন্তানকে জ্যান্ত ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু কদচিৎ কোন শিশুকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। রাজবাড়ীর কোন শিশুকে তিনি কোনদিনই ঐ কাজে ব্যবহার করেননি। আমাদের রাজনীতিকদের সাথে এর সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে। যা হোক লাশ তৈরীর জন্য আমাদের নেতারা আর একটা অভিনব টোপ ব্যবহার করে থাকেন। আর তা হচ্ছে শহীদ হওয়ার টোপ।

শিশুদের লেখা পড়ার মনযোগী করার জন্য আমরা তাদের হাতি, ঘোড়া, রেলগাড়ী এ্যারোপ্লেন কিনে দেবার লোভ দেখাই, তাতে কাজও হয়। বিদ্যালয়- মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওসব লোভ দেখানো যায় না। কারণ তারা জানে এটা হাতি ঘোড়ার যুগ নয় যে কিনে দিবে বা রেলগাড়ী আর এ্যারোপ্লেন ঘরে কিনে আনার জিনিস নয় যে কিনে দেবে।

সুতরাং রাজনীতিকরা ছাত্রদের অধ্যয়ন ছেড়ে আন্দোলনে নামাবার জন্য শহীদ হওয়ার টোপ ব্যবহার করেন। লাশের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার রোগীরা বিদ্যালয়ের সন্ত্রাসে নিহত বা আন্দোলনের ময়দানে নিহত ছাত্রদের শহীদ নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। তদ্বারা তারা এমন ভাব দেখায় যে, তারাই বেহেশতের মালিক দখলদার। তাদের হয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে যারা নিহত হবে, তাদের সরাসরি বেহেশতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিবেন। এমনি করে তারা তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে আন্দোলনের প্রতি প্রলুব্ধ করেন আর আড়ালে আবডালে বসে শকুনের মত লাশের প্রতীক্ষা করেন।

বর্গার কারবার

যখন ময়দানে আন্দোলন চালাবার মত কোন ছলছুতা সৃষ্টি হয়না তখনও রাজনীতিকরা ক্যাম্পাসে তাদের ভাড়াটেদের দ্বারা আন্দোলনের বিউগল বাজিয়ে অস্ত্রের মহড়া পরিচালনা করে থাকেন। এই মহড়া চালাবার জন্য তারা প্রয়োজনীয় অর্থও সরবরাহ করে থাকেন। নেতাদের দেয়া টাকা খরচ করে করে যখন হাত লম্বা হয়ে যায় তখন নেতাদের দেয়া টাকায় আর সকল

সাধ মিটেনা। সুতরাং তারা রাস্তায় নেমে গৃহবধুর গয়না, পথচারীর পকেট ছিনতাই করে, বাজারে বাজারে চাঁদা আদায় করে।

ক্যাম্পাস পবিত্র স্থান। এখানকার রাস্তাঘাট পুলিশের পদচারণা দ্বারা অপবিত্র হতে দেয়া হয় না। সুতরাং সেখানকার পথচারীদের সর্বস্ব ছিনতাই করলেও ধরা পড়ার ভয় নেই। চাঁদার জন্য বাইরে যেতে হয়। সেখানে পুলিশ থাকে বলে ধরাও পড়ে। কিন্তু আটকে রাখা যায় না। দু'বার, চারবার, পাঁচবার যতবার ধরা পড়ে ততবারই নেতাদের কল্যাণে ছাড়া পেয়ে যায়। এমনি করে নেতারা তাদের হাত পাকিয়ে দেন আর সাহস ও আশ্বাস দিয়ে আরও বড় বড় দুষ্কর্মে নিয়োজিত করে নিজেদের ফায়দা হাসিল করেন। তার ফলে দেখা যায়, নেতারা যেসব কুকর্ম করে থাকেন তাদের শিষ্যদের কুকর্ম তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর। নেতারা এটা চান বলেই গত দুই শতকে তাদের পরিচর্যায় গড়ে উঠেছে এক বিশাল অর্থ গৃধনু সন্ত্রাস বাহিনী। তারা দেশের স্বার্থ বুঝেনা, জাতির স্বার্থ বুঝেনা। তারা মনে করে মাস্তানী, সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, চোরাকারবারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতাদের সাথে তাদের সম্পর্ক বর্গাদারের সম্পর্ক ধরা পড়লে মার-ধরের ঝুঁকি নিজের। আর থানা পুলিশ গড়ালে ঝুঁকি নেতার, তিনিই মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বখরা ফিফটি ফিফটি।

পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ ১৫ই জুন ১৯৯৪ তারিখে এককালিন ছাত্র নেতা বর্তমানের আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী দলের একজন নেতাকে পুলিশ তার গুলশানস্থ বিলাসবহুল অফিস থেকে গ্রেফতার করেছে। বনানীর যে বাড়ীটিতে সে বসবাস করে সে বাড়ীটি মাসিক ভাড়া নাকি ৩০ হাজার টাকা। গুলশানের আশকোনায় তার আটতলা বাড়ী ফাউন্ডেশনের উৎস খুজতে গিয়ে নাকি পুলিশ আরও কয়েকজন নেতার টাকা, গাড়ী, বাড়ী, ব্যবসা, কালোবাজারী ইত্যাদির তথ্য আবিষ্কার করতে শুরু করেছে।

খবরে আরও প্রকাশ, লোকটা ধরা পড়ায় বিশেষ একটি দলের কয়েকজন নেতা এবং তাদের ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন নেতা শংকিত হয়ে পড়েছেন। দলের রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করে এমন দুইজন সাবেক নেতা এবং কিছু বর্তমান নেতা ধরা পড়া সাবেক ছাত্রনেতাকে দিয়ে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। পেশাদারী খুন-খারাবি, অস্ত্র সরবরাহ হাইজ্যাক, ছিনতাই, বিমান বন্দরে যাত্রীদের লাগেজ ছিনতাই, চোরাকারবার ইত্যাদিই ঐ টাকার উৎস।

গোয়েন্দা সূত্র বলেছে, ধরা পড়া লোকটা আন্তর্জাতিক চোরাকারবারের সাথে জড়িত। বিভিন্ন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্নস্থানে সন্ত্রাসী ঘটনায় অস্ত্র সরবরাহ করা তার অন্যতম ব্যবসা। সে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সাথেও জড়িত। তার বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলাও রয়েছে। চাঞ্চল্যকর সগীরা মোর্শেদ হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং সে ইতিপূর্বে আরও দু'বার গ্রেফতার হয়েছিল। কিন্তু নেতারা তাকে ছাড়িয়ে আনে।

এবারও সে ব্যক্তির মুক্তির জন্য নেতারা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ কামনা করে চলেছেন। তাদেরই একজন একমন্ত্রীকে হুমকি দিয়ে বলেছেন ওকে না ছাড়লে তিনি পদত্যাগ করবেন। এই নেতা নাকি শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা অফিসে গিয়েও তাফালিং করেছে। জবাবে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কঠোর ধমক দিয়ে বলেছেন– এটা রাজনৈতিক দলের অফিস নয়, তাফালিং এর জায়গা এটা নয়। সুতরাং নেতাটি সেখান থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসে। উর্ধ্বতন বড় নেতাদের জন্য এইসব নেতারা কতবড় মহার্ঘ পুরুষ ধমক থেকেই তা বুঝা যায়।

শুধু এই এক নেতাই নয়। রাজনীতিকদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এমন বহু যুবনেতা অর্থে-বিত্তে, সাহসে, সন্ত্রাসে, নৃশংসতায়, ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সেখানে সে মন্ত্রীকে ধমকিয়ে কথা বলে সেখানে সে ভয় করবে কাকে যে দুষ্কর্ম সংগঠনে পিছ পা হবে? মন্ত্রীইবা তাকে ভয় করেন কেন এটা কি জনসাধারণ বুঝেনা? শুধু এই কোটিপতি এক নেতাই নয়, এমনি আরও বহু লক্ষপতি, হাজার নিযুতপতি হাজারো নেতা আছে। শুধু এই ঢাকা শহরেই নয়, নেতারা শিষ্যে-পোষ্যে-আড্ডায়-বাচ্চায় ছড়িয়ে আছে সারা দেশময় এবং রাজনীতিকরা এই সন্ত্রাসী নেতাদের চাষ করেন তৃর্ণমূল পর্যায়ে। ৭ মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে মাগুরার উপ-নির্বাচন উপলক্ষ্যে শালিখা থানার আঠপাড়া আইডিয়াল স্কুলের ময়দানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার দলকে তৃর্ণমূল পর্যায়ে সংগঠনের পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। আর সংগঠনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে তরুণ কিশোর ছাত্ররা। এরাই তৃণমূল কর্মী যাদের কথা দিয়ে এই প্রবন্ধের শুরু করেছিলাম। যারা পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত রাজনীতির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যাই হোক তৃণমূলের নেতারা কোটি টাকার স্বপ্ন দেখেনা। তাদের দাপট সন্ত্রাসী, মাস্তানী, চাঁদাবাজী, অপহরণ, ধর্ষণ পর্যন্ত গড়ায়। তদ্বারা যা কিছু অর্থ হাতে আসে তা দিয়ে তারা শুধু চায়ের দোকানে বসে চা-ই খায় না, আড্ডায়

গিয়ে মদও খায়, নীল ছবিও দেখে। পরিণতিতে প্রবৃত্তি উত্তোজত হয়, বিবেক লুপ্ত হয় এবং নারী হরণ ও ধর্ষণের নেশায় মেতে উঠে। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ করে এমন হিম্মত কারো নেই।

২রা মে ১৯৯৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ ছাত্র প্রিলিমিনারীতে ভর্তিচ্ছুক এক তরুণীকে ভর্তি সকল ব্যবস্থা করে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে জহুরুল হক হলের একটি রুমে নিয়ে যায়। সেখানে তরুণ ছাত্রটি তার আরও কয়েকজন বন্ধুর সাথে তরুণীটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ সময় আপ্যায়নের নাম করে খাদ্যবস্তুর সাথে নেশা দ্রব্য খাইয়ে দিয়ে তরুণীটিকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলের একজন আবাসিক ছাত্র জানায় কক্ষের দরজা বন্ধ করে উচ্চশব্দে গান বাজানো হয় এবং দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একদল তরুণ পালাক্রমে তরুণীটিকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনা হলের প্রায় সব আবাসিক ছাত্র জানলেও তারা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

সুতরাং রাজনীতিকদের আশ্রয়ে সকল ক্যাডারের ছাত্রই আছে, কেউ কোটি কোটি টাকা চোরাকারবারের ধান্ধায়, কেউ সন্ত্রাসে, কেউ ধর্ষণে। রাজনৈতিক আশ্রয় আছে বলেই এদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এরা স্বামীর আশ্রয় হতে যুবতী বধুকে ছিনিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করছে, মায়ের কোল হতে কিশোরী কন্যাকে নিয়ে ধর্ষণ করছে, হত্যা করছে। আবার ধমক দিয়ে যাচ্ছে যেন থানা পুলিশ করার চেষ্টা না করে, তাহলে বংশে শেষ করে দেয়া হবে। হিম্মত করে কেউ থানা পর্যন্ত পৌঁছলেও বহুক্ষেত্রেই থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ক্ষেত্র বিশেষে মামলা গ্রহণ করলেও আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না বা আসামী গ্রেফতার করলেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে আসামীদের ভয়ে ফরিয়াদীদের জীবন বিপন্ন হয়। এই অরাজকতা চলেছে দেশের সর্বত্র। যা দেখলে দেশে আইনের শাসন আছে বলে মনেই হয় না।

ভারতের রামপুরার মহারাজার নাকি একবার এক কুৎসিৎ খেয়াল চেপেছিল যে, তার রাজ্যে, কুমারী মেয়েদের ধর্ষণের প্রতিযোগিতা হবে। এই প্রতিযোগিতায় যারা যোগ দেবে তাদের প্রমাণ হিসেবে ধর্ষিতার নাকের নথগুলি জমা দিতে হবে। যেই কথা সেই কাজ, মহারাজের সাঙ্গ-পাঙ্গরা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে পাখী শিকার করার মত কুমারী মেয়ে শিকার করে ধর্ষণ করতে লাগলো আর রাজার কাছে নথ জমা দিতে লাগল। শেষে দেখা গেল রাজার নিজের সংগ্রহের নথের সংখ্যাই বেশী।

আমাদের দেশে এখন রাজা নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে এখন দেশে যত রাজনৈতিক টাউট বাটপার আছে তারা সবাই রাজা এবং তাদের পেশা হচ্ছে রাজনীতির ব্যবসা এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির নামে বহু রাজসিক বদখেয়াল ছড়িয়ে পড়েছে এই অধম অক্ষম রাজনীতি ব্যবসায়িদের মধ্যে। তাদের প্ররোচনায় অধিকারের দাবি নিয়ে স্বাধীকারের দাবি নিয়ে অক্ষমেরা পাখীর ঝাঁকের মত উড়তে শুরু করেছে প্রশাসনের সর্বত্র। এই অরাজক পরিস্থিতির মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছে ছিনতাই, অপহরন, চাঁদাবাজি, নারীধর্ষণ ইত্যাদি। তন্মধ্যে মর্মান্তিক বৃদ্ধি ঘটেছে ধর্ষন ঘটনার। সেসব দেখে শুনে মনে হচ্ছে ঐ অক্ষম রাজনীতিকরাই হয়তো নিজেদের ভোটকর্মীদের খুশি রাখার জন্য ধর্ষণের প্রতিযোগিতায় মাতিয়ে তুলছেন। তদ্বারা প্রকারান্তরে রাজনীতির চেলা চামুন্ডাদের পৌরুষ ধ্বংসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। একারণেই আজ বোধ হয় কাপুরুষ নেতৃত্বে ও কাপুরুষোচিত ক্রিয়া কর্মে দেশ ভরে গেছে।

নেতাদের কাপুরুষতার কারণেই তারা আন্দোলনের সময় কিশোর তরুণদের ছাতা হিসেবে ব্যবহার করেন, নিজেরা সেই ছাতার আড়ালে অবস্থান করেন। এমনি করে বছরের পর বছর তারা কিশোর তরুণদের জানের বিনিময়ে নিজের জান বাচিয়ে চলেছেন। প্রতিভাবান যে কিশোররা একদিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠতে পারত তারা নিহত হয় আর শুধু অথর্বরা বেঁচে থাকে বলেই দেশের নেতৃত্বে কাপুরুষদের প্রাধান্য ঘটেছে, এই কাপুরুষত্বের কারণেই নেতারা হরতাল ছাড়া রাজনৈতিক আর কোন চাল দিতে শিখেনি।

নেতারা বলে থাকেন তারা জনসাধারণের ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য হরতাল করেন। আসলে যে হরতাল দ্বারা তারা দিনমজুরদের ভাতে মারেন তারা তা উপলব্ধি করতে পারেননা। আবার সংসদ নির্বাচনের দিন হরতাল ডেকে যে তারা ১৯৮৩ সালে, ১৯৮৮ সালে এবং ১৯৯৬ সালে মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেন তাও তারা উপলব্ধি করেন না। এটিই হচ্ছে মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়ের নামে হরতাল নামক ভন্ডামী দ্বারা নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করার পন্থা। পরাধীন থাকাকালে নেতারা যে হরতাল করত আজ স্বাধীন হয়েও তারা সেই হরতালের রাজনীতি করে, এটা কেমন রাজনীতি। স্বাধীন জাতি হিসাবে যে আমরা দেশে একটা মোটর গাড়ী আজ পর্যন্ত বানাতে পারিনি, সেই আমরা হরতালে নামে বছর বছর হাজার হাজার গাড়ী ভাঙ্গি এটা আমাদের কোন জাতের রাজনীতি? হ্যাঁ এটারই নাম কমজাতের রাজনীতি।

পেঁয়াজের গন্ধ

১৯৯৩ সালের পহেলা নভেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ভিতরে একদল অস্ত্রধারীর গুলীতে একটি ছাত্রসংগঠনের একমাত্র কেন্দ্রীয় নেতা নিহত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন কর্মচারী মারাত্মকভাবে গুলীবদ্ধ হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় ও চাঁদার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ঐ ছাত্র সংগঠনটির এক গ্রুপের বিরোধকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়।

উপরে আমার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের দুর্ধর্ষ চাঁদাবাজির উপর তথ্যভিত্তিক কিছু আলোচনা করেছি এবং আমরা ৬ই জুন, ১৯৯২ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবে প্রচারিত "প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি আকুল আবেদন" শিরোনামের একটি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞাপনটিতে ঠিকাদাররা বড় আশা করে প্রধানমন্ত্রীর নিকট তথা সরকারের নিকট বড় করুণ ভাষায় কাকুতি করেছিল যে, ছাত্রদের চাঁদাবাজির জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কাজ করতে পারে না। চাঁদা না দিলে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারিদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার নেমে আসে এমনকি ঠিকাদারদের বাড়ী–ঘরেও হামলা হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তারা কাজ করতে পারে না।

কিন্তু হায়, সরকারের কানে ঐ করুণ মিনতি পৌঁছেনি। তারা যদি শুনেও না শুনার ভান করেন তবে কামানের গর্জন করে বললেও শুনবেন না, শাবল দিয়ে খুচিয়ে ঢুকালেও কানে ঢুকবে না। তার ফলে ঐ হত্যাকান্ডটি ঘটতে পারল।

দেখে শুনে মনে হয়, আজকাল রাজনীতিকরা দেশ ও দেশবাসীর চেয়ে দলকে বড় মনে করেন এবং সে জন্যই বোধ হয় সরকার ছাত্রসংগঠন গুলিকে ঐ লাভজনক দুষ্কর্মটি হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করেননি, যার ফল হয়েছে ঐ হত্যাকান্ড।

যুদ্ধকালীন সময়ে সেনাধ্যক্ষরা তাদের সৈনিকদের খুশী রাখার জন্য যা খুশি তা করার স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। একারণেই সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে মরণপণ যুদ্ধ করে, আর অবসর সময়ে লুট-তরাজ, হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্য দুষ্কর্ম করে খুশী থাকে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালে পাক হানাদারদের মধ্যে আমরা ওরকম দুষ্কর্ম প্রত্যক্ষ করেছি। কাশ্মীর ও বসনিয়া হতে নব্বইর দশক ভরে ওরকম দুষ্মর্মের সংবাদ আমরা শুনেছি। আমাদের রাজনীতিকরাও

তাদের ছাত্র বাহিনীগুলিকে ওরকম দুষ্কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে দেশের মূল্যে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষা করছেন? অন্যথায় মজলুমের অত আবেদন, নিবেদন, কাকুতি, মিনতি নিষ্ফল হবে কেন? ছাত্রবাহিনী কি তাদের দুধ দেওয়া গুরু, যে তাদের লাথিও সরকার হজম করে যাবেন? যদি তা হয়ও তবে সেই গরু যদি অন্যের ক্ষেত্রের শস্য সাবাড় করে? যদি সেই গরু অন্যের জীবন বিপন্ন করে তবেও? উপরোক্ত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলির উৎপত্তি চাঁদাও সন্ত্রাসের, নিষ্পত্তি ছাত্র বাহিনীর হত্যায়, আর নিলর্জ্জভাবে ছাত্র বাহিনীর সাথে ছাত্র সেমসাইড, যা ডাকাতদের মধ্যেই শোভা পায়।

ডাকাতির মালের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ডাকাতদের মধ্যে খুন-খারাবী হওয়ার সংবাদ প্রায়ইতো পত্রিকায় পাতায় দেখা যায়। কিন্তু ডাকাতরাতো ডাকাতই, তারা অশিক্ষিত, বর্বর, খুনী, অমানুষ। ছাত্ররাতো তা নয়। এরাতো শিক্ষিত, ভদ্র সন্তান, মেধাবী ছাত্র। যথেষ্টভাবে প্ররোচিত না হলেতো তারা অমন দুষ্কর্ম করতে পারে না। অথচ আজ তাদেরও কেউ কেউ ডাকাতির অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের ভিতর খুন হয়ে ক্যাম্পাসের পবিত্রতা নষ্ট করে।

আজ আমাদের রাজনৈতিকত দলগুলি আমাদের ছাত্র সমাজকে বিনা বেতনের ছেলের সৈনিক হিসেবে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিকে বিনা খরচের সেনা ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন। ছাত্রাবাসগুলি এখন ডজনখানেক ছাত্রবাহিনীর ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুই যুগ ধরে সেখানে একের বিরুদ্ধে অপরের অভিযান চলে আসছে। যেসব বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নেই সেখানকার সন্ত্রাস-সংঘর্ষ চলে মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে। দেশের অসংখ্য বেকার, যুবক, কিশোরেরা ঐসব সংঘর্ষগুলিকে শক্তি চর্চার এবং অবসর যাপনের মাধ্যমে হিসাবে মনে করে এবং সন্ত্রাসীদের সহযোগী হয়ে দাঁড়ায়। তদ্বারা সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটে দাবানলের মত, সন্ত্রাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে জ্যামিতিক হারে।

যে ছাত্ররা একসময় আদর্শ স্থানীয় হয়ে সমাজের শান্তি-শৃংখলার স্বার্থে সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত, দমন করে আসছিল, আজ সেই ছাত্ররাই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আর এর একমাত্র কারণ রাজনীতি। যারা ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে এনে সন্ত্রাসকর্মে নিয়োজিত করছেন তারা ঐ সহজ কথাটিই বুঝতে পারছেন না যে তারা জাতির কত বড় ক্ষতি করছেন, সভ্যতার কত বড় ক্ষতি করছেন। ক্ষমতার মোহে মোহান্ধ থাকার কারণে তাঁরা শুধু তাদের ক্ষমতার কথাই বুঝেন সামাজিক শৃংখলার কলকাঠি চিনেন না।

নতুন বাংলাদেশ কোন নতুন জেগে উঠা চর নয়, রাজনৈতিক দলগুলো কোন চরুয়া সর্দার নয় এবং আমাদের ছাত্ররা কোন চরুয়ার লাঠিয়াল বাহিনীও নয়। অথচ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখলের জন্য চরুয়া সর্দারের মত ছাত্রদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন। আজ যদি রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র সংশ্রব বন্ধ করেন, ছাত্র সংগঠনগুলির নামের সাথে রাজনৈতিক দলের নামের ব্যবহার বন্ধ করেন, বিদ্যালয়গুলিতে বিনয় নম্রতা শ্রদ্ধাবোধের ইসলামী নীতিশিক্ষা সংযোজন করেন, দেখবেন অচিরেই সন্ত্রাস সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের বিদ্যালয় গুলিতে বর্তমানে প্রায় ডজন খানেক ছাত্র বাহিনী আছে। তন্মধ্যে একটির নাম ইসলামী ছাত্র শিবির। নামের কারণে কিছু মানুষের কাছে এই দলটি অসহ্য মনে হচ্ছে। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন ছাত্র শিবিরটি একটি অস্পৃশ্য জাতের ছাত্র সংগঠন এবং তাদের ভাবটা এমন যেন ব্যাটা বজ্জাত, আর সবাই দল করছে সন্ত্রাস করছে, তো করছে, তাই বলে তুইও?

ছাত্রলীগ যখন ছাত্রদলের উপর হামলা করে তখন আওয়ামী লীগ খুশি হয় এবং কেউ গ্রেফতার হলে তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য ক্ষমতা খাটায়। তেমনি ছাত্রদল ছাত্রলীগের উপর হামলা করলে বিএনপি খুশী হয় এবং কেউ ধরা পড়লে তাকে ছেড়ে দেয়ার হুকুম জারি করে। কিন্তু ইসলামী শিবির কখনও হামলা করলে সকল দল মিলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৯৩ সনের ১৭ সেপ্টেম্বরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ছাত্র শিবিরের উপর আক্রমণ চালায়। তাতে ৩৫ জন আহত হয়। ১৮ তারিখ দিবাগত শেষ রাতে ছাত্র শিবির প্রতি আক্রমণ করলে একজন নিহত হয় এবং প্রায় ২০০ জন আহত হয়। এই সংবাদ পরদিন ১৯ তারিখে ঢাকায় পৌঁছে। সাথে সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সকল ছাত্র সংগঠন মিলে ছাত্র শিবিরের সদস্যদের ছাত্রাবাস আক্রমণ করে এবং তাদের না পেয়ে কক্ষ ভাংচুর করে। তার পরদিন ২০ তারিখ খুলনা বিএল কলেজে ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী মিলে শিবির কর্মীদের উপর হামলা করে, মসজিদ আক্রমণ করে, সেখানে আশ্রয়গ্রহণকারী একজনকে টেনে এনে কোরবানীর গরুর মত জবাই করে হত্যা করে, বহুকে আহত করে, আহতদের মধ্যে একজন পরে মারা যায়।

বিএল কলেজে হত্যাযজ্ঞের শেষে তারা যায় খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায়। সেখানে অষ্টম শ্রেণীর আমানউল্লাহকে তারা জবাই করে। আহা, কতইবা

বয়স আমানউল্লাহর? ১৩? ১৪? ১৫? রাজনীতির কি-ইবা সে বুঝে? মুক্তিযুদ্ধের সাত আট বছর পর তার জন্ম। সেতো মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, সে তো রাজাকারও ছিল না।

তার পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রঐক্য মিলে ছাত্র শিবিরকে আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে। এতে শতাধিক আহত হয়।

ভারতের মুসলমান হত্যার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন করে উল্কার মত ছুটে চলে দূর হতে দূরান্তরে, দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত অঞ্চলে, ইসলামী ছাত্র শিবীরের বিরুদ্ধে সকল ছাত্র সংগঠনের অভিযানও যেন তেমনি দূর দূরান্ত অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতই ছড়িয়ে পড়েছিল।

এরপর ২৩শে সেপ্টেম্বর হতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭ দিনে পত্রিকার সংবাদ মতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১০টি ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। তার কোনটিতেই ছাত্র শিবির জড়িত নয় বা তাদের সাথেও হয়নি। প্রত্যেকটিই হয়েছে ছাত্রদলের সাথে ছাত্র লীগের। যেমন ২৩ তারিখ রাঙ্গামাটি কলেজ ও ভালুকা কলেজ, সব কলেজেই ছাত্রদল বনাম ছাত্রলীগ। ২৬ তারিখ, লালমোহন কলেজ, জামালপুর কলেজ, নোয়াপাড়া কলেজ, ছাত্রদল বনাম ছাত্র লীগ। ২৮ তারিখ, নোয়াপাড়া কলেজ, ও সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ছাত্রদল বনাম ছাত্র লীগ ও বহিরাগত। ২৯ তারিখ, হাজিগঞ্জ বাজার, পাবনা পলিটেকনিক, নোয়াপাড়া কলেজ, সবগুলি ছাত্র লীগ বনাম ছাত্র লীগ।

উক্ত সংঘর্ষগুলিতে শতাধিক আহত হয়, লালমোহন কলেজে একজন নিহত হয়, নোয়াপাড়া কলেজে একজনের পায়ের রগ কাটা হয়। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যা ঘটে তার জের চলে দেশময়। সেপ্টেম্বরের ঐ সাত দিন ১০টি ঘটনাই তার প্রমাণ। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সারা দেশের ছাত্ররা এখনও অনুকরণীয় মনে করে।

অক্টোবর ১৯৯৩ সালে ১৯ তারিখ পর্যন্ত ১৯ দিনে ১৯টি ছাত্র সংঘর্ষ সংবাদ পত্রের পাতায় আমার চোখে পড়েছে। সবগুলিই ছাত্রদল, ছাত্রলীগ বা অন্যান্য দলের মধ্য ঘটেছে। তন্মধ্যে গুপ্ত হত্যা আছে তিনটি। যেমন ২ তারিখে নারায়নগঞ্জের জাতীয় ছাত্র সমাজ নেতা বিপ্লব, ৯ তারিখ তিতুমীর কলেজের ছাত্র ইশতিয়াক এবং ১৬ তারিখে তেজগাঁও কলেজের ছাত্র বিপুলকে হত্যা করা হয়েছে। পত্রিকার বর্ণনানুযায়ী এই সন্ত্রাসগুলির কোনটির সাথেই ছাত্র শিবির জড়িত নয়। সবগুলিই ছাত্রদল-ছাত্র লীগের।

অক্টোবরের পত্র-পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ছাত্র শিবির কোন সন্ত্রাস সংঘর্ষ করেনি। কিন্তু তবুও ১৯ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবিরের তিনজনকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করেছে। অপরদিকে শিবির নিষিদ্ধের দাবিতে অনেকে মিছিল করেছে এবং সেই মিছিলেও বোমা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুধু একটি পত্রিকায় যে সংবাদ উঠেছে সেই সংবাদমতে আগস্ট মাস ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে ১৪টি। তন্মধ্যে ছাত্র শিবির দ্বারা সংঘটিত হয়েছে ৩টি। বাকী ১১টির মধ্যে ৪টি হয়েছে ছাত্রদলের সাথে ছাত্র লীগের, ২টি ছাত্র দলের বৈরীগ্রুপের সেইমসাইড, ২টি ছাত্রলীগের সেইমসাইড, ১টি ছাত্র/পুলিশ, ১টি ছাত্র-ছাত্র, ১টি ছাত্রদলের সাথে জাতীয় দলের।

সেপ্টেম্বর মাসে ৩০ দিনে সংঘর্ষ হয়েছে ২৭টি। তন্মধ্যে তিনটির জন্য ছাত্র শিবির দায়ী। বাকী ২৪টি ঘটিয়েছে ছাত্রদল ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা।

সুতরাং ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাস হতে অক্টোবরের ১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬০টি সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, গুপ্ত হত্যা হয়েছে। তন্মধ্যে ছয়টির জন্য ছাত্র শিবির দায়ী। বাকী ৫৪টি অন্যান্য ছাত্র বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। নিহত হয়েছে ১১জন। তন্মধ্যে রাজশাহীর একজন শিবিরের দ্বারা, বাকি ১০টি অন্যান্য দল দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে। অথচ চারদিকে রব পড়ে গেছে– শিবিরের মহামারিতে সারা দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং শিবির মারো। আসলে সংবিধান হতে 'বিসমিল্লাহ' মুছে ফেলার জন্য এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের জন্য একশ্রেণীর রাজনীতিজীবী বহুদিন হতে আন্দোলন করে আসছিলেন। এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ছাত্র শিবির দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটিকে তাদের ঐ পুরানো দাবীটিকে জোরদার করার অজুহাত হিসাবে তারা ব্যবহার করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গুলিতে সন্ত্রাস-সংঘর্ষের জন্য রাজনীতিই যে দায়ী এ সত্য আজ আর কারোই অবিদিত নয়। কিন্তু অন্ধের হাতি দেখার মত তারা দেখেছেন সন্ত্রাস সংঘর্ষের জন্য ইসলামী রাজনীতি দায়ী এবং তাই তারা ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করার দাবী তুলেছেন। আর দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষকে আক্রমণ করে তাদের দাবীর নোংরা দিকটাকে প্রকট করে তুলেছেন।

জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে তাদের দাবি যে কত অসাড় এবং দাড়ি টুপি বিরোধী ক্রিয়াকর্ম যে কত হীন এবং ভন্ডামী প্রসূত তা বুঝার

মত মানসিক শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী আবেশে আবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। তা না হলে যেখানে ডজন খানেক ছাত্র সংগঠন দিনের পর দিন সন্ত্রাস করে চলেছে সেখানে একটিমাত্র ইসলামী দলের বিরুদ্ধে একদিনের একটি সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে এত আক্রোশ হবে কেন। এই প্রসঙ্গে দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি:

১। ১৮৯৭ সনে বোম্বাই শহরে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল মহামারি আকারে। ইংরেজ সরকার ঘরে ঘরে রোগনাশক ঔষুধ ছিটানোর জন্য বহু নিম্নবর্ণ হিন্দুকে নিয়োগ করেন।

নিম্নবর্ণ হিন্দু দ্বারা উচ্চবর্ণ হিন্দুর ঘরে ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা আপত্তি উত্থাপন করে। ১৮৯৯ সাল ২৫শে মার্চ তারিখের বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল– "নিম্ন জাতীয় হিন্দু কর্তৃক হিন্দুদের ঘরে ঔষধ ছিটানো উচিত নয়।"

একজন নিম্নবর্ণ হিন্দু একবার রোগ নাশক ঔষধ ছিটানোর জন্য বেলগ্রামের এক ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করেছিল। গৃহকর্তা ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরে এসে এই সংবাদ শুনে তার জাত গিয়েছে ভেবে ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করেছিলেন।

মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা দেশে ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন তারাও কি তবে দাড়ি টুপির ভয়ে শেষ পর্যন্ত বেলগ্রামের সেই ব্রাহ্মণের মত আত্মহত্যা করবেন?

২। ১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বছর ২০শে জানুয়ারী মাত্র ২০ জন ছাত্র নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মুসলিম ছাত্রদের জন্য ভর্তি নিষিদ্ধ ছিল।

১৮৭৩ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মরহুম নওয়াব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় কলেজটি বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এ বছর কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০১ জন। তন্মধ্যে মাত্র দু'জন মুসলমান ছাত্র ছিল। কলেজের হিন্দু ছাত্ররা মুসলাম ছাত্রদের সাথে ক্লাসে বসতে ঘৃণা প্রকাশ করে। তারা কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের কাছে একটি অভিযোগ পত্র পেশ করে এবং তাতে লেখে: "মহাশয়, আমরা মুসলমান ছাত্রদের নিকট বসিতে পারিব না। কারণ তাদের মুখ হইতে বড় পেঁয়াজের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের নিকট বড় অসহ্য হয়।"

টনি সাহেবকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন কলেজের অধ্যাপক হরিশচন্দ্র কবিরত্ন। তিনি মুসলমান ছাত্রদের ভিন্ন করে বাম পাশে বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমাদের দেশের ডজন খানেক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ঐ বেচারা নিঃসঙ্গ ছাত্র শিবিরটির অবস্থা হয়েছে ১৮৭৩ সালের প্রেসিডেন্সি কলেজের ১০১ জন ছাত্রর মধ্যে দুজন মুসলমান ছাত্রের মত। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ ভাবতে শুরু করেছে তারা ইসলামী নামের ছাত্র শিবিরের মধ্যে পেঁয়াজের গন্ধ আবিষ্কার করেছেন এবং সে কারণে তাকে নিষিদ্ধ করার জন্য আবদার জানাচ্ছেন।

প্রেসিডেনন্সি কলেজে না হয় অধ্যাপক হরিশচন্দ্র মুসলমান ছাত্রদের জন্য বাম পার্শ্বের বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে সে বারের মত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের নব্য ব্রাহ্মণের সমস্যার সমাধান করবেন কারা, কি করে? এখন যে বামে, ডানে, সামনে, পেছনে সর্বত্র পেঁয়াজের গন্ধওয়ালা মুসলামন। শুধু কি তাই, এখন ভারতীয় হিন্দুরাও খাওয়ার সময় বাটি ভরে পেঁয়াজ নিয়ে বসে। তবে আমাদের ঐ নব্য ব্রাহ্মণদের স্থান কোথায়? হ্যাঁ, তাদের একমাত্র স্থান বেলগ্রামের ঐ ব্রাহ্মণের মত আত্মহত্যা করে শ্মশানে যাওয়া। কারণ, শ্মশানটা আগে যা ছিল এখনও তাই আছে ওটাতে কোন পরিবর্তন আসেনি। ওখানে কোন পেঁয়াজখোর মুসলমানকে কখনও দাহ করা হয়নি। সুতরাং আমাদের দেশের নব্য ব্রাহ্মণেরা সেখানে দাহ হয়ে নিরূপদ্রব্যে পরকালের নরকভোগ করতে পারবেন কখনও এতটুকুও পেঁয়াজের গন্ধ সইতে হবে না।

ডকটরেট ডিজিজ

একদা-দরিদ্রের হাতে যদি অর্থ বিত্ত আসতে থাকে তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষে চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তেমনি ইতর প্রকৃতির মানুষ যদি শিক্ষিত হয় এবং অক্ষম যদি ক্ষমতা হাতে পায় অথবা যদি ক্ষমতাসীনের সান্নিধ্যও পায়, তবে হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে করতে পারে না।

১৯৪৭ সনের পূর্বে বাঙ্গালী হিসাবে আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ছিলাম। সে কারণে আর্থিকভাবে এবং মানসিকভাবেও আমরা যথেষ্ট হীন অবস্থার মধ্যে ছিলাম। আমাদের বেশীর ভাগ মানুষকেই বাবুদের খেতমজুর, গুদামের টালি ক্লার্ক, উকিল বাবুর মুহুরী, কোর্টের পেয়াদা ইত্যাদি কাজের দ্বারা মর্যাদাহীনভাবে জীবিকার্জন করতে হত।

সুতরাং নীচু জাতের মানুষের মধ্যে যে ধরনের মন-মানসিকতা, আচার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়ে থাকে, আমাদের একাংশের মধ্যেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না।

১৯৪৭ সনের পরবর্তী ২৪ বছর পূর্ব পাকিস্তানী হিসাবে ক্ষমতা এবং অর্থের ক্ষেত্রে আমরা অংশীদারিত্ব লাভ করে থাকলেও পাকিস্তানীদের ধমক-ঠমকের কারণে আমাদের মানসিক দৈন্য ও শিক্ষার অনগ্রসরতা যেমনটি ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছিল।

কারণ, ঐ ২৪ বছরের প্রথম ১২ বছর ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। এই সময়ে আমরা এককালের ক্ষমতাহীন মানুষের দু'শ বছর পর ক্ষমতা হাতে পেয়ে এবং ক্ষমতার সান্নিধ্য পেয়ে দারুণভাবে উত্তেজিত হয় পড়েছিলাম। ক্ষমতার ব্যবহার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতার কারণে সেই উত্তেজনা এক সময় চরমরূপ ধারণ করে। যার পরিণতিতে আমরা সংসদ অধিবেশন চলাকালে উত্তেজিত হয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত স্পীকারকে হত্যা করে ফেলেছি। উত্তেজিত পূর্ব পাকিস্তানীদের এই উত্তেজনা দমনের জন্য পাকিস্তানী জেনারেলরা ১৯৫৮ সনে সর্বময় ক্ষমতা দখল করে নেয়।

পাকিস্তানী জেনারেলরা যখন তাদের ক্ষমতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার উপায় অন্বেষণ করছিল, তখনই তাদের দৃষ্টি পড়ে এদেশের ছাত্র সমাজের উপর। দেশের ছাত্রসমাজ আবেগ প্রবণ। ১৯৫২ সনে এরা যেভাবে শুধু

মাতৃভাষার ভালবাসায় বুকের রক্ত ঢেলে দিতে পেরেছিল, সেকথা শুধু জেনারেলরা কেন, কোন মানুষেরই ভোলার কথা নয়। সুতরাং জেনারেলরা দু'টি উদ্দেশ্য আবেগপ্রবণ ছাত্রদের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। প্রথমটি জেনারেলদের ক্ষমতা রক্ষার ফ্রন্ট হিসাবে ছাত্রদের ব্যবহার করা, দ্বিতীয়টি ছাত্রদের সন্ত্রাসকর্মে জড়িয়ে দিয়ে এদেশের মানুষের শিক্ষাভিযানের পথ রুদ্ধকরে দেওয়া। কারণ জেনারেলরা বুঝতে পেরেছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এমনিতেই সংখ্যায় বেশী, এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন, তদুপরি শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হয়ে গেলে তদ্বারা পাকিস্তানীদের সমূহ স্বার্থহানির আশংকা রয়েছে। সুতরাং নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা এদেশের মানুষকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনগ্রসর করে রাখা অত্যাবশ্যকীয় বলে ধরে নিয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য ছাত্রদের হাতে প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্র তুলে দেওয়া হল। সেই অস্ত্র আর কোনদিনই ছাত্রদের হাত থেকে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা গেল না। বরঞ্চ পাকিস্তানী জেনারেলদের অনুকরণে বাংলাদেশের রাজনীতিজীবীরা ছাত্র সমাজকে রাজনীতির জন্য সবচেয়ে নির্ভরশীল পুঁজি এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে আজ পর্যন্ত ব্যবহার করে চলেছে।

এই যুদ্ধে প্রতিবছর কত না গরীব মা-বাবার সন্তান বলি হচ্ছে এবং সন্ত ান শোকে কত মা-বাবা ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে, তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না বা তার জন্য কারও মাথা ব্যথাও নেই।

পাকিস্তান আমলের ঐ ২৪ বছর যারা শিক্ষিত হয়ে বের হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী হলেও জ্ঞানের বিচারে তারা অতি নিম্নমানের এবং সময়ের প্রয়োজনের তুলনায় তারা অতি নগণ্য সংখ্যাতে নেমে গেছে।

কারণ, যে ধর্মবোধ, শৃংখলাবোধ, জাতিসত্তাবোধ দ্বারা মানুষের জ্ঞানের ও গুণের মূল্যায়ন হযে থাকে, ছাত্ররাজনীতির কারণে ঐ ২৪ বছরের শিক্ষিতদের বেশীরভাগের মধ্যেই সেই বোধগুলির কোন একটিরও বিকাশ, প্রকাশ ও প্রসার ঘটার সুযোগ হয়নি। অথচ তারাই আজ প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে, প্রবীণ রজনীতিক হিসাবে প্রশাসনের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে আসিন।

তাদের মধ্যে যারা ছাত্রাবস্থা হতে রাজনীতি করে আসছেন তাদের অনেকেই আজ সংসদের আসন অলংকৃত করছেন। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক অবদানের দাবীতে তারা সংসদের ফার্স্ট

বেঞ্চে বসেন বটে, কিন্তু কথা বলেন ব্যাক ব্যাঞ্চারের মত। ছাত্র জীবনে তারা বই পুস্তক বাক্স বন্দী করে, লেখাপড়া না করে, জ্ঞান চর্চা না করে, গলা ফাটা বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করেছেন, রাজা-উজীর মেরে এক গোরে কবর দেওয়ার কথা বলেছেন।

মাঠে মাঠে বক্তৃতা দিয়ে এরা এক সময় দেশবাসীকে আশা-ভরসার হাতছানি দিয়েছেন এবং সেজন্য এত পরিশ্রম করেছেন যে ক্লাসে বসার, বই পড়ার, জ্ঞানচর্চা করার সময় পর্যন্ত পাননি।

সুতরাং আজ সংসদের ফার্স্ট বেঞ্চে বসে তারা শুধু ব্যাক ব্যাঞ্চারের মত কথা বলাই নয়, যতটুকু বলেন ততটুকুর মধ্য মুদ্রাদোষের মত কেবলই সেই আন্দোলন, হরতাল, রাস্তার রাজনীতি, ভাঙচুরের কথাই এসে যায়। যে বেকারের ভোটে, গরীবের ভোটে তারা আজ সাংসদ, তাদের বেকারত্ব দূর করার জন্য, দারিদ্য দূর করার জন্য তারা তখন অনেক বড় বড় কথা বলে থাকলেও এখন পথনির্দেশ দিতে পারছেন না। সংসদে বসে যখন তিনি নিজে বেতন পান, পাঁচ বছরের সাংসদ হওয়ার কারণে তাঁর চিরজনমের পেনশন নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদের ভোটকর্মী বেকারের সন্ত্রাস, ছিনতাই ও রাহাজানি দ্বারা কালক্ষেপণ করে।

জাতির সত্তা স্বাধীনতা অর্থনৈতিক অস্তিত্ব এবং জাতির সাংস্কৃতিক সত্তা যখন মর্মান্তিক হুমকির সম্মুখীন, এমন দিনেও জাতির নেতৃত্ব হাতে নেওয়ার মত প্রজ্ঞা, প্রতিভা তারা দেখাতে পারেননি।

লজ্জার বিষয় যে, তাদের ব্যর্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত জীবনে যারা কোনদিনই রাজনীতি করেননি, এমনকি যাদের কোন রাজনৈতিক পরিচিতি বা উত্তরাধিকারও নেই, এমন সব গৃহবধু ও নেতৃত্বের হাল হাতে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারী দলের নেতৃত্ব, বিরোধী দলের নেতৃত্ব, পার্শ্ব দলের নেতৃত্ব ইত্যাদি যেকোন নেতৃত্বেই এক কালের সেই তুখোড় ছাত্র নেতাদের অপারগতার কারণে গৃহবধুদের এগিয়ে আসতে হয়েছে।

আর যারা সেই ছাত্রাবস্তার রাজনৈতিক কৃতিত্বের দাবীতে আজ সাংসদ, তারা এখনও সেই ছাত্র রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতাই করেন এবং সেই পুরানো ভাষায়ই কথা বলেন। নিজেদের জীবন হতে শিক্ষা গ্রহণ না করে এখনও তারা ছাত্রসমাজকে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার করে চলেছেন। তাদেরই উস্কানিতে ছাত্ররা শিক্ষককে প্রহার করে নিজেদের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত করছে।

শিক্ষককে অপদস্থ করা বা প্রহার করা তো দুরের কথা, শিক্ষককে অশ্রদ্ধা করেও কেউ কোনদিন শ্রদ্ধাস্পদ হতে পারে না, উন্নত হতে পারে না। আর যারা শিক্ষককে প্রহার করে তারা নিজের জীবন, যৌবন এবং ভবিষ্যতকেই ধ্বংস করে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৯৪০ সালে যখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চরমে পৌছেছে তখনকার ঘটনা। চাঁদপুর জিলার হাজীগঞ্জ থানাধীন বলাখাল জে, এন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন বাবুকে সাম্প্রদায়িক কারণে একদল মুসলমান ছাত্র প্রহার করে। যারা প্রহার করেছিল তাদের একজনও মেট্রিক পাস করতে তো পারেইনি, বরঞ্চ তাদের অনেকেই টি, বি রোগ, পান্ডু রোগ, ইত্যাদি নানা রোগে মারা গেছে। আর যারা সরাসরি প্রহার করায় অংশ নেয়নি, কিন্তু নেতৃত্বের অংশীদার ছিল, তাদের কেউ কেউ তৃতীয় বিভাগে পাস করেও চরম দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করেছে বা এখনও বৃদ্ধাবস্থায় এসে কষ্ট পাচ্ছে।

যেমন, একজনকে আমি জানি, যিনি পুরুষত্বহীনতায় ভুগে বহুদিন কষ্ট পেয়েছেন। অনেক দেরিতে (পঞ্চাশের দশকে) তিনি বিয়ে করে এক মাত্র পুত্রের জনক হয়েছেন। পুত্রটির জন্ম ১৯৬০/১৯৬২-এর দিকে। কিন্তু শুনেছি। এখনও এই ১৯৯০সাল পর্যন্ত সে প্রতিবছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। আমি উক্ত ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষদর্শী। এর বিপরীতে ক্লাসের গুরুভক্ত ছাত্রদের উন্নতি দেখেও আমি বিস্মিত হয়েছি।

সুতরাং, আমি আরও কিছু ঘটনা দেখে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, শিক্ষককে অবমাননা করার শাস্তি শুধু নিজের জীবনের উপর দিয়েই যায় না-এই শাস্তির ধারা বংশ পরম্পরায় ভুগতে হয়। পাঠক, আমাদের দেশে গত ৩০ বছর ধরে সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি চলছে। এই সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু শিক্ষক ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, প্রহৃত হয়েছেন। একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন, যেসব ছাত্র ঐসব দুষ্কর্ম করেছে তাদের কে কি অবস্থায় আছে বা তাদের পুত্র কণ্যারা কে কি হালে আছে। সে সব সংবাদ সংগ্রহ করে নিজে চিন্তা করুন এবং সমাজের সামনে তুলে ধরুণ, যাতে আমাদের কোমলমতি ছাত্ররা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তারা যেন ক্ষমতার মদমত্ত রাজনীতিকদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে আর কোনদিন শিক্ষকদের গায়ে হাত তুলে নিজের জীবন-যৌবনকে ধ্বংস না করে, নিজের বংশ নষ্ট না করে। পৃথিবীতে যত জ্ঞানী, গুণী ও বিখ্যাত মানুষ আছে, তাদের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে সংবাদ নিলে দেখা যায়, নিঃশর্ত গুরুভক্তিই ছিল তাদের উন্নতির চাবিকাঠি। প্রতিবছর দেশে মেট্রিক পরীক্ষার ফল বের হলেই স্ট্যান্ড করা কৃতি

ছাত্র–ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার পত্রিকায়, টিভির পর্দায় দেখা যায়। সেখানে কৃতি ছাত্র–ছাত্রীরা ভক্তিভরে শিক্ষকদের অবদানের কথা স্বীকার করে।

অক্ষমের হাতে ক্ষমতা গেলে কত বড় মর্মান্তিক বিপত্তি ঘটতে পারে তার একটি হৃদয়বিদারক উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৮৩ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে বিমানে একটি কার্গো চালান আসে। চালানটি সম্পর্কে কাস্টম অফিসারদের সন্দেহ হলে তারা তা খুলে দেখেন তাতে অবৈধভাবে আসা কয়েক হাজার ঘড়ি রয়েছে, যার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। তৎকালীন ক্ষমাসীনদেরই কেউ নাকি ঐ অবৈধ চালানটির মালিক ছিলেন।

সুতরাং যে অফিসারগণ ঐ চালানটি ধরেছিলেন, পরের দিন রাতের অন্ধকারে সেই অফিসারদের বাসা থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়। ঘটনাটিকে চিরতরে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য ঐ অফিসারদের মধ্যে ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট জনাব আবদুর রউফকে পরদিনই হত্যা করে ফেলা হয় এবং তার সহকর্মী জনাব মকবুল হোসেনকে চৌদ্দ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

কর্তব্যনিষ্ঠার কারণে একজন সৎ কর্মকর্তাকে জীবন হারাতে হল, একটি প্রতিশ্রুতিশীল পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। সারা জাতি স্তব্ধ হয়ে রইল, যেন কোথাও কিছু হয়নি। কেউ বুঝতেই পারল না যে, একজন অক্ষম রাজনীতিক তার ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা শুধু একজন ব্যক্তিকেই হত্যা করেনি, সেদিন প্রকৃতপক্ষে জাতির কর্তব্যপরায়ণ মানসিকতাকে হত্যা করে কর্তব্যবিমুখ তাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, যার জের এখনও চলছে।

সত্তরের দশকের শুরুতে আদর্শিক মত পার্থক্যের কারনে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদলের শীর্ষ নেতার নির্দেশে সিরাজ শিকদার নামের এক ক্ষুদ্রদল নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। গভীর রাতে এবং নির্জনে ঘটনাটি ঘটেছিল বলে পরদিনের পত্র পত্রিকায় সংবাদটি স্থান পেতে পারেনি। কিন্তু পরদিন সংসদের অধিবেশন চলাকালে ঐ নেতা সংসদে দাড়িয়ে সগর্বে বলেছিলেন আজ কোথায় সেই সিরাজ শিকদার।

সাংসদরা কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সবাই নড়ে চড়ে বসেন, এবং সবাই সবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন। সেদিন বেলা বাড়ার সাথে সাথে খবর ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত জাতি স্তম্ভিত হয়ে সিরাজ সিকদার হত্যার কথা জানতে পারে। But no crime goes unpunished বিশ্ব বিধাতা নামক একজন মহাবিচারক আছেন। খুনী যত ক্ষমতাধরই হোক না কেন, তিনি ঠিক সময়ে ঠিক বিচারটি করে থাকেন। তাই সিরাজ সিকদার হত্যার কয়েক বছরের

মধ্যেই সেই নেতাও অনুরূপভাবে গুলিতেই নিহত হয়েছিলেন। পার্থক্য শুধু সিরাজ শিকদারের মত একজন ছোট নেতাকে হত্যা করতে নির্জন নদীর তীরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আর ঐ বড় নেতা নিহত হয়েছিলেন তার নিজ ঘরে, সশস্ত্র বাহিনীর পাহারাধীন বাড়ীতে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের মত ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বহুদিন পূর্বেকার ঘটনা। তখন দেশ ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। এক গ্রামে এক পীর সাহেবের আস্তানা ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসার সাথে তিনি একটি এতিমখানাও পরিচালনা করতেন। তিনি সব সময় সাগরেদ মুরীদ পরিবেষ্টিত থাকতেন।

এক হিমেল শরতের বিকালে তার খেয়াল হল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে কিছু কলার চারা রোপন করবেন্ কথাটা মুখের বাহির করতেই মুরীদদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কেউ কোদাল আনল, কেউ সাবল আনল এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে সবাইকে নিরাশ করে দিয়ে হুজুর জালালেন তিনি নিজেই গর্ত খোড়বেন এবং চারা লাগাবেন।

হুজুর সাবল দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে মাটি আলগা করে দিচ্ছেন আর একটি এতিম ছেলে ঐ মাটি তুলে আনতে থাকে। এমনি করে তিনি গর্ত করছেন, এতিম উপুড় হয়ে গর্ত থেকে মাটি তুলে আনছে, আর তিনি সাগরেদ মুরীদানের সাথে খোশগল্প করছেন।

এরই মধ্যে গর্ত অনেকটুকু হয়ে গেছে। হুজুরও গল্পের নেশায় মেতে গেছেন, এতিম ছেলেটি অনেকটুকু উপুড় হয়ে মাটি তুলছে। হঠাৎ ছেলেটি যেই মাথা নীচু করেছে, অন্যমনস্ক হুজুরের সাবলের কোপ ছেলের গাড়ে লেগে মাথাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিতায় সবাই মুছড়ে পড়ে। মুরীদদের মধ্যে একজন সবাইকে খামুস করিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে কলার চারার জন্য করা গর্তটাকে তাড়াহুড়া করে আর একটু বড় করে নিয়ে ঐ ছেলেটিকে ঐখানেই করব দিয়ে দেয়। কাক পক্ষী ও বুঝতে পারলনা ঘটনাটি ওখানেই শেষ হয়ে যায়। তার পর বহু বছর পর হয়ে গেলে পর একদিন রাতে পীরসাহেবের গ্রামে এক বাড়ীতে ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা বাড়ীর কর্তাকে খুন করে মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। হৈ চৈ শুনে হুজুর ও সেখানে যান। দরদী হুজুর খুন হওয়া লোকটাকে জড়িয়ে ধরে শুশ্রুষা দিতে চেষ্টা করেন। তাতে তার নিজের শরীরও রক্তাক্ত হয়ে পড়ে।

সকাল বেলায় পুলিশ এসে হুজুরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পেয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে কোর্টে মামলা উঠলে হুজুরের ফাঁসির হুজুম হয়ে যায়। ফাসির হুজুম শুনার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত মুরীদ এবং সাগরিদরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং হৈ চৈ শুরু করে দেয়।

তখন সকলকে খামুস করে দিয়ে হুজুর বললেন, আমাদের সবার উপরে, বিচারকের উপরেও একজন বিচারক আছেন, তিনি ঠিক সময়ে ঠিক বিচার করে থাকেন। হ্যাঁ ফাঁসী আমার প্রাপ্য, তবে এই খুনের জন্য নয়। বলেই তিনি তাঁর হাতে খুন হওয়া সেই ছেলের গল্প বললেন।

জনগণের ভোটে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে অক্ষম শাসক রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে নিয়োজিত কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে হত্যা করে, যে নিজের ক্ষমতা নিষ্কন্টক করার জন্য কর্তব্য সচেতন নাগরিকদের হত্যা করে, তাদের জন্যই ইতিহাসের আঁস্তাকুড় নামক স্থানটি নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রতারণার ভোটে মনসদে বসলেও আসলে তারা সেই মসনদের উপযুক্ত নয়।

ইতর প্রকৃতির মানুষ শিক্ষিত হলে যেমন দৃষ্কর্ম করে থাকে তদ্বারা শুধু ব্যক্তির মানসিকতা বা শিক্ষার ক্ষেত্রই বিপর্যস্ত হয় না, তদ্বারা সমাজ এবং সভ্যতাই বিপর্যস্ত হয়ে থাকে।

ডঃ হুমায়ুন আজাদ কর্তৃক গৃহীত এক সাক্ষাৎকারে একবার জনাব শওকত ওসমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছিলেন "ডক্টর আজাদ, কিছু মনে করো না, ওখান থেকে ডিজিজ তৈরী হয়, ডক্টর না। ওখান থেকে উৎপন্ন হয় বৈদ্য নয় ব্যাধি। যে যত উচ্চপদস্থ বৈদ্য সে ততো দুরারোগ্য ব্যাধি।" (সাপ্তাহিক রোববার ২১ শে এপ্রিল, ১৯৮৫)

১৯৯০ সনের মার্চ মাসে টি, এস, সি তে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার পরিবেশ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রফেসর মঈনুল ইসলাম বলেছিলেন "স্বায়ত্বশাসন আমাদের অধিকার। কিন্তু এর নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? শিক্ষকতা পেশায় জ্ঞান ও গুণের প্রয়োজন কিন্তু এখন অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হচ্ছে, যারা শুদ্ধভাবে পাঁচ লাইন বাংলা বা ইংরেজী লিখতে পারেন না কিন্তু পদোন্নতিসহ অনেক বিষয়ে দল বেঁধে গিয়ে বলা হয়, এটা করে দিতে হবে, ওটা করে দিতে হবে।" (সাপ্তাহিক বিক্রম ১৯ শে মার্চ ১৯৯০)

কারা ঐ ডিজিজ, কারা ঐ শিক্ষক যারা পাঁচ লাইন শুদ্ধ কথা লিখতে পারে না এবং যাদের কারণে অমন অবমাননাকর বক্তব্য জনসাধারণকে শুনতে হয়?

এ ডিজিজই হচ্ছে নাস্তিকতা আর ঐ শিক্ষকরা হচ্ছে নাস্তিকদের ছাত্র, যারা পরীক্ষা পাস দিয়ে শিক্ষক হয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষকতা করার মত জ্ঞান তাদের মধ্যে সঞ্চিত হয়নি। কারণ, যে ধর্ম সকল জ্ঞানের উৎস, সেই ধর্মকে

যে শিক্ষক অস্বীকার করে তিনি নিজেই যে অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন। তিনি কি দিয়ে ছাত্রদের জ্ঞান দান করবেন?

বিশ্বে জ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল ধর্মচর্চা উপলক্ষ করে। আজও ধর্মগ্রন্থই সকল জ্ঞানের উৎস। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কিছুতেই অত জ্ঞানের উপাদান নেই। সুতারাং যারা ধর্ম মানে না, ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না, তাদের হৃদয়ে এবং মগজে জ্ঞানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এধরনের নাস্তিকেরা যদি শিক্ষক হয় তবে তারা ছাত্রদের কিছুই দিতে পারে না। Ex nihils nihil fit (এক্স নিহিলো নিহিল ফিট) নামে একটি ল্যাটিন প্রবাদ আছে যার অর্থ out of nothing nohting comes.অর্থাৎ যেখানে কিছুই নেই সেখান হতে কিছুই পাওয়া যায়না। তেমনি যে শিক্ষকদের নিজেদের মাথায় কিছু নেই, তাদের কাছে ছাত্ররা কি পাবে? বরঞ্চ ছাত্ররা যেটুকু মেধা ও প্রতিভা নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ঐ শিক্ষকদের সাহচর্যে তারা সেটুকুও হারিয়ে ফেলে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক নাস্তিকতার ডিজিজ আক্রান্ত শিক্ষকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধর্মের প্রধান শিক্ষা যে আদব, বিনয়, নম্রতা, নাস্তিক শিক্ষকেরা ধর্ম বিশ্বাস করে না বলে তাদের মধ্যে ঐ গুনগুলি নেই এবং তাদের ছাত্ররাও ঐ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ এরা আমাদের সন্তানদেরে বেআদব বানাচ্ছে। সুতরাং ঐ শিক্ষকরা প্রবৃত্তি চর্চা ও সন্ত্রাস চর্চার ডিজিজ ছড়াচ্ছে।

এদের কুশিক্ষার কারণেই এক সময় যে ছাত্র শিক্ষককে সামনে দেখলে পা ছুঁয়ে সালাম করে জড়োসড়ো হয়ে রাস্তার পাশে নেমে দাঁড়াতো, এখন সে ছাত্রকে রাস্তায় দেখলে শিক্ষক ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে রাস্তার পাশে নেমে দাঁড়ান।

ঐ বেআদবীর শিক্ষা নিয়ে এরা সামাজে জড়িয়ে পড়ে, মুরুব্বীদের সাথে বেআদবী করে বেড়ায়। অফিস আদালত ও কল-কারখানায় শ্রমিকদের দিয়ে মালিককে প্রহার করায়, মালিককে হত্যা করায়। শিল্প কারখানা বন্ধ হয়, শ্রমিক বেকার হয়ে বেকারের সংখ্যা বাড়ায়।

নতুন নতুন শিল্প কারখানা তৈরীর পথরুদ্ধ হয়ে যায়। নতুন শিল্পদ্যোক্তারা নিজের সঞ্চিত অর্থ কলে কারখানায় বিনিয়োগ করে আরামের জীবন যাপনকে শ্রেয় মনে করেন। ফলে নতুন প্রজন্মের জন্য কর্ম সংস্থানের পথ বন্ধ হয়ে যায়। নতুন প্রজন্মের বেকার এবং বন্ধ কারখানার বেকার মিলে সব বেকারেরা তাদের পকেট খরচের অর্থ সংকুলানের জন্য ছিনতাই হাইজ্যাক, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষনের লোমহর্ষক সংবাদে এক সময় দেশের

পত্রিকার পাতা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আবার অন্য সময় ঐসব অপরাধীদের সংসদ সদস্য হওয়ার বা ইউপি চেয়ারম্যান হওয়ার সংবাদও ঐসব পত্রিকার পাতায় বের হয়।

ঐ সব বেআদবদের দ্বারা শিল্প কারখানার মালিক প্রহৃত বা নিহত হতে দেখেই সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের পুজি নিজের সিন্ধুকে আবদ্ধ করেন। এ কারণেই দেশে যথেষ্ট শিল্প সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, মানুষের হাতে যথেষ্ট অর্থ বিত্ত এবং প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে না। অথচ লক্ষ লক্ষ, কোটি বেকারের বিষন্ন পদভারে রাজপথ, জনপথ হাহাকার করছে। আর এই দুঃখের মূলে রয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনে বিচরণকারী নাস্তিক শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা।

আদব, বিনয়, নীতিজ্ঞান ইত্যাদির উৎস হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু নাস্তিক শিক্ষকদের ধর্মদ্রোহিতার কারনে শিক্ষার ঐ ধারা আজ বিলুপ্তির পথে। একারনেই শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররা শিক্ষক প্রহার করে, কর্মচারী তার কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করে, আর কুশিক্ষিত রাজনীতিকদের প্ররোচনায় শ্রমিক উৎপাদন ব্যহত করে এবং নির্যাতন করে, হত্যা করে। যতদিন এই নাস্তিক শিক্ষকদের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হতে অপসারণ করা না হবে ততদিন পর্যন্ত জাতির এই দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে না।

পৃথিবীতে শিক্ষার সূচনা হয়েছে ধর্ম চর্চার প্রয়োজনে, ধর্মকথা নির্ভর করে। নীতিকথা এসেছে ধর্ম হতে। ঐ নাস্তিক শিক্ষকেরাও ঐ শিক্ষায়ই শিক্ষিত হয়েছে। অথচ, কত সহজে তারা সেই ধর্মানুভূতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছে। যেন অমৃত পান করে বিষ বমন করার মত। তাই কবি চন্ডীদাস এদের ডালে-মূলে উপড়িয়ে সাগরে ভাসিয়ে দিতে বলেছেন। কবির ভাষায়ঃ

অন্তরে অসার বাঁশী
বাহিরে সরল
পিবয়ে অধর সূধা
উগারে গরল
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী
তারে যদি পাও
ডালে মুলে উপাড়িয়া
সাগরের ভাসাও
(চন্ডিদাস পাদাবলী)

বলদ সমাচার

আমাদের সমাজে বুদ্ধিজীবী নামধারী কিছু বলদ কিছুদিন থেকে সরবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে এদের জন্ম মুক্তি যুদ্ধের আগে। মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বদেশী সারের প্রভাবে এদের শিকড় বদ্ধমূল হয়েছে, এদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে বিদেশী সারের প্রভাবে এবং ভাবশিষ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। পর্ণ সংস্কৃতির প্রভাবে।

বলদ সাধারণত কোন ভীতিপ্রদ জীব নয়। বরঞ্চ এরা মানুষের গৃহপালিত পোষ্য জীব এবং নিরীহ সেবক। কিশোর অবস্থায় এরা মানুষের কাছে আদরণীয় হয়ে থাকে। যৌবনে যখন এদের শিং গজায় তখনও এদের বেশীর ভাগই তেমনি নিরীহ এবং আদরণীয়ই থেকে যায়। এরা লাঙ্গল টেনে ক্ষেতের ফসল ফলায়, রাস্তায় গাড়ী টেনে মানুষ ও মালামাল পার করে। তিলে তিলে নিজের জীবন ক্ষয় করে এরা মানুষের সেবা করে থাকে।

সকল গরুরই শিং হয় কিন্তু সকল গরু হিংস্র হয় না। কোন কোনটি হিংস্র হয়ে যায়। যতদিন ষাঁড় থাকে ততদিন তীক্ষ্ণ শিং নিয়ে সে যখন কারণে অকারণে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ফোঁস ফোঁস করে পথচারীকে তাড়া করে আসে তখন সে এক ভীতিপ্রদ জানোয়ার হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়। এদের হিংস্রতা কমানেরা জন্য অন্ডকোষ ফেলে দিয়ে বলদ করে দেওয়া হয়। তারপরও এদের অনেকেরই হিংস্রতা যায় না। এ ধরনের বলদের শিং এর গুতায় মানুষ মরার বহু ঘটনা ঘটে।

হিংস্র বলদকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এদের সব সময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং একমাত্র দক্ষ রাখালই জানে হিংস্র বলদকে কি করে শাসন করতে হয় । শাসনে না রাখলে সে তার শিং এর গুঁতোয় পথচারীর পেট ছিদ্র করে নাড়ী ভূড়ি বের করে ছাড়বে। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য রাখালের মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে তীক্ষ্ণ পিন লাগানো পাচনি। পাচনের ঐ পিন দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে রাখাল তার দুষ্ট বলদকে বশে রাখে। অনেক সময় বলদকে নিয়ে পথ চলার সময় রাখালকে কাবু করে বলদটি ক্ষেতের ফসল খেতে চেষ্টা করে। দক্ষ রাখাল তারও ঔষধ জানে। বলদের মুখে পরাবার জন্য রাখাল কামুর (গরুর মুখের লাগাবার খাঁচা) মজুদ রাখে। ঐ কামুর পরালে বলদ আর মুখ খুলতে পারেনা, ফসলও খেতে পারেনা।

বলছিলাম আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী বলদের কথা। এই বলদেরাও ঐ চার পা ওয়ালা পশু বলদের চেয়ে কোন ব্যতিক্রম নয়। কৈশোরে এরা মানুষের আদর সোহাগের পাত্র থাকে। যৌবনে এরা পরিবার ও সমাজের আশা ভরসাস্থল হিসাবে গণ্য হয়। মা-বাবা দারুণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এদের বিদ্যালয়ে পাঠান আর মনে মনে স্বপ্ন রচনা করেন, তারা এক সময় রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সংস্কৃতিবিদ, সমাজবিদ হয়ে বেরিয়ে আসবে। অর্থে-সম্পদে,শান্তি-শৃঙ্খলায় জ্ঞান ও গুণের ছটায় সমাজ জীবন উজ্জ্বল করে তুলবে।

কিন্তু হায়! আজকাল আর বিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান বা গুণের চর্চা হয় না। তাই বিদ্যালয়গুলীতে এখন আর বৈদ্য তৈরী হয় না, নাস্তিকতা চর্চার কারনে এখন সেখানে তৈরী হয় ব্যাধি। এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠছে। তাতে দেখানো হয়েছে বিদ্যালয়ে এখন আর বিদ্বান তৈরী হয় না, তৈরী হয় শিংওয়ালা হিংস্র বলদ। উপরে আমরা বুদ্ধিজীবী বলদের কথা বলেছি তারাই সেই হিংস্র বলদ।

১৯৬২ সনের কথা। ঐ বছরের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দেলনের রুপ ধারণ করে। এই ছাত্র আন্দেলন নস্যাৎ করার জন্য তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান এন. এস. এফ নামের এক ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটির আত্মপ্রকাশের সাথে সাথেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। মেধাবী ছাত্ররা পুস্তক বগলদাবা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই ছাত্র সংগঠনগুলির কোন না কোনটিতে নাম লেখিয়ে লেখাপড়া ফেলে হকিষ্টিক হাতে নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মে মেতে ওঠে তখনকার দিনে এখনকার মত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছাত্ররা জানতনা। হকিষ্টিক দিয়েই তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের মাত্রা বেড়ে চলেছে, অপরদিকে লেখাপড়ার মান নিম্নগামী হয়ে যাচ্ছে দেখে শিল্পী মোস্তফা আজিজ ব্যথিত হয়ে পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর কার্টুন ছাপিয়েছিলেন। কার্টুনটিতে দেখানো হয়েছিল। প্রতিভাবান ছাত্ররা প্রতিভাদীপ্ত তারুণ্য নিয়ে নম্র ভদ্র পদক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। আর শিক্ষা জীবন শেষে মাথায় দুটি তীক্ষ্ণ-ধার শিং নিয়ে বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ তারা হিংস্র ভীতিপ্রদ বলদ হয়ে বেরিয়ে আসছে।

পূর্বেই বলেছি সকল বলদেরই শিং হয় কিন্তু সকল বলদ হিংস্র হয় না। বেশীর ভাগ বলদই শিং থাকা সত্ত্বেও ভদ্র ভাবে চাষার লাঙ্গল টেনে, গাড়োয়ানের গাড়ী টেনে মানুষের সেবা করে থাকে। কিছু বলদ সামনে মানুষ দেখলেই ফোঁস-ফাঁস, ঘোঁৎ ঘাঁৎ শব্দে তাড়া করে আসে বটে, কিন্তু আক্রমন করেনা।

বিদ্যালয় হতে বেরিয়ে আসা মোস্তফা আজিজের আবিস্কৃত শিংওয়ালারাও সবাই হিংস্র হয়ে যায়নি। সে সময়কার শিংওয়ালাদের বেশীর ভাগই আজ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। এদের কেউ কেউ শিং নেড়ে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে ঘুষ আদায় করছে। কেউ রাজনৈতিক টাউট সেজে সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আর কিছু শিংওয়ালা পরিণত বয়সে এসে হিংস্র জানোয়ারের মত হয়ে গেছে। এরা মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি সব কিছুর প্রতি ঘোঁৎ ঘোঁৎ ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসছে। শান্তি-শৃংখলার সকল বিধি বিধানকে সমানে মারাত্মকভাবে গুতোচ্ছে।

দুষ্ট গরুকে সামলে রাখার জন্য যে রকম দক্ষ রাখালের প্রয়োজন সে রকম দক্ষ রাখাল বুদ্ধিজীবী বলদদের জন্যও দরকার কিন্তু সে রকম রাখাল দেশে নেই বলে হিংস্র বলদগুলির হিংস্রতা হু হু করে বেড়ে চলেছে। দেশের শাসনভার যাদের হাতে তারাও ঐ বলদের মত। এ কারণে তারা দেশের শাসনের ঘানি টানে বটে, কিন্তু শাসনের দন্ড প্রয়োগ করার দক্ষতা তাদের নেই। ফলে তীক্ষ্ণধার শিংওয়ালা বলদগুলির হিংস্রতা বেড়েই চলেছে। তারা দেশের সকল মানুষকে নিজেদের মত বলদ মনে করছে। আর সমানে গুতাচ্ছে।

২৮ শে এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখের পত্রিকার পাতায় দেখলাম ডক্টরেট ডিগ্রীধারী তেমনি হিংস্র এক বুদ্ধিজীবী বলদ বলেছেন "লেখাপড়া জানে অথচ মনের দিক থেকে অশিক্ষিত কিছু লোক সারাদিন তসবীহ গুণে কপালে দাগ ফেলে দিয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বেশ কুসংস্কার রয়েছে। যদি অবস্থা এমন হয় যে বাপের নাম মিথ্যা বললে বেঁচে যায় তবে তা বলেন কেন? তার মতে জন্ম যখন হয়েই গেছে বাপ হিসাবে যে কেউ একজনের নাম বলতে অসুবিধা কোথায়।"

মুসলমানরা বাপ ছাড়া আর কাউকে বাপ বলেনা। কোন ধর্মের মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন যাকে প্রয়োজন তাকেই বাপ হিসাবে পরিচয় দেয় সে কথাটা ঐ বলদ উল্লেখ করেনি। এ প্রসঙ্গে পিতৃ পরিচয় বিবর্জিত বলদের কথাই মনে পড়ে গেল।

আমাদের একটা গাভী ছিল। একবার গাভীটা একটা বাছুর প্রসব করে। বাছুরটা এঁড়ে বাছুর । বছর খানেকের মধ্যেই সে মোটা তরতাজা ষাঁড় হয়ে ওঠে। মাঠে ঘাস খেতে গিয়ে সে প্রায়ই তার মায়ের উপর লাফিয়ে ওঠে, দেখে আমরা আশ্চর্য হতাম। তারও বছর খানেক পর সে পরিপূর্ণ ষাঁড় হয়ে তার মায়ের পেটে বাচ্চা দেয়। তখন ব্যাপারটা মনে দাগ কেটেছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম পশুর সমাজে মা-বাপ বলে কিছু নেই-জন্মটাই বড় কথা। আমাদের উল্লিখিত ডক্টরেট বুদ্ধিজীবির বাপ পরিচয়ের উপদেশ শুনে শিল্পী মোস্তাফা আজিজের সেই শিংওয়ালা বলদের কথা আরেকবার স্মরণ হল। ঐ শিংওয়ালারা মানুষ আর পশুর পার্থক্য রাখতে চায় না। তারা চায় সবাই তাদের মত বলদ হয়ে যাক।

গরুরা জন্মদাতাকে বাবা ডাকে না । যে কোন ষাঁড়কেই যে কোন গরুর বাবা মনে করা যেতে পারে। আর ঐ শিংওয়ালা ডক্টরেট এই পদ্ধতিটিই অনুসরণ করার কথা বলেছে। এই ডক্টরেটটি একজন শিক্ষকও বটে। সুতরাং তার শিক্ষাধীনে আরও বহু বলদ নিশ্চয় তৈরী হয়েছে যারা সমাজে বহু কদাচার করে চলেছে। মোস্তফা আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে বেরিয়ে আসা বিদ্বানদের মাথায় শিং গজিয়ে সেই কদাচারের ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন বলে মনে হয়। বর্তমান সময়ে বহু বলদ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করেছে। কারণ ষাটের দশকে যারা ছাত্র ছিল তারাই আজ দেশের কর্ণধার তারাই আজ বুদ্ধিজীবী।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ১২ই মে, ১৯৯৪ বৃহস্পতিবারে সংখ্যায় তেমনি এক বলদ বুদ্ধিজীবী এক কুষ্মান্ড কান্ড করে বরেছে। সে তার তীক্ষ্ণ হিংস্র শিং দ্বারা জীবিতদের নাড়ী ভুড়ি বের করতেই শুধু চেষ্টা করেনি, সে ইউ আর ই'দুরের মত সমাজ কাঠামোর কড়িবর্গাতেও দাঁত বসাতে চেষ্ট করেছে। উই আর ইদুরের দেখ ব্যবহার, যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার। তাদের কাছে ঘরের বাঁশ বেত, কাঠ-কুটা, কোরআন-হাদিস, বই-পত্র, আসবাব-সামগ্রী, লেপ-তোষক ইত্যাদি সব কিছু শুধু দাঁত দিয়ে কাটার বস্তু। শিংওয়ালা হিংস্র বলদের কাছেও পীর, দরবেশ-পন্ডিত, চোর-ছেচ্চর, চেংড়া, বদমাস সবাইকে সমানে গুঁতোনতেই তার সুখ।

জনকণ্ঠের বুদ্ধিজীবীটির কাছেও ইংরেজী উর্দু আরবী বাংলা ইত্যাদি সকল ভাষার শব্দই ঈশ্বর। শব্দ যতটুকু তার নিজ প্রকৃতির সাথে মিলে ততটুকুই সে বুঝে। ইংরেজী ব্যালাড শব্দ শুনে সে মনে করে "বলদ" বিলিয়ার্ড শব্দ শুনেও মনে করে বলদ। আর আরবী বালাদ শব্দ শুনেও মনে করে বুঝি বলদ। আরবী জাইতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে জলপাই কিন্তু ঐ বুদ্ধিজীবীটির কাছে এটা হচ্ছে জয়তুন বিবি। উপরে ষাঁড়ের কথা বলেছি, ষাঁড়টি তার মায়ের উপর

লাফিয়ে উঠে এবং এক সময় মায়ের পেটে বাচ্চা দেয়। ষাঁড় হতেই বলদ হয়। বলদ হওয়ার পর ষাঁড়ের শক্তি লোপ পেলেও স্বভাবতো লোপ পায় না। জনকণ্ঠের বলদটিও জাইতুন শব্দ শুনেই লাফিয়ে উঠেছে এবং অর্থ করেছে এটা জয়তুন বিবি। জয়তুন বিবিটি যে তার সকল ধরা ছোঁয়ার বাইরে তা সে বুঝতে পারেনি, বলদ তো।

মানুষ টক ঝাল খেয়ে মুখে চুক চুক শব্দ করলে কুকুর তাকে ডেকেছে মনে করে ছুটে আসে। তেমনি ব্যালাড, বিলিয়ার্ড, বালাদ শব্দ শুনলে বলদেরা মনে করে বুঝি তাদের কথাই বলা হয়েছে। আবার মেয়ে মানুষের নাম শুনলেই যেমন বেশ্যার ভাড়েরা হকচকিয়ে উঠে, তেমনি জাইতুন শব্দটি শুনেই ঐ বলদের ভেতরের লম্পট জয়তুন বিবির নেশায় টগরগিয়ে উঠে।

যাই হোক ঐ পত্রিকার বলদটি কোরআন শরীফের সুরা ত্বীন এর প্রথম তিন আয়াতকে একটি আয়াত মনে করে অর্থ করতে গিয়ে তার বলদামীর বহরকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। তার কথা শুনে মনে হয় যেন মোস্তফা আজিজ তার মত বলদকে লক্ষ্য করেই পূর্বোল্লেখিত কাটুনটি এঁকেছিলেন।

সূরা ত্বীন এর ঐ আয়াত তিনটি হচ্ছেঃ

(১) ওয়াত্বীনে ওয়াজ্জাইতুনে অর্থ, ডুমুরের এবং জলপাইয়ের কসম,

(২) ওয়াতুরে চিনিনা অর্থ, সিনাই পাহাড়ের কসম,

(৩) ওয়া হাজাল বালাদিল আমিন অর্থ এই নিরাপদ শহরের কসম।

ঐ আয়াতগুলির বঙ্গানুবাদ করতে না পেরে বলদটি আরবী শব্দগুলিকে বাংলার সাথে মিলিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে প্রয়াস পেয়েছে।

সে (১) ওয়াত্বীনে ওয়াজ্জাইতুনের অর্থ করেছে ওরা তিনজন, তার একজন হচ্ছে যয়তুন নামের এক মহিলা

(২) ওয়াতুরে চিনিনা–মানে, তোরে চিনি না

(৩) ওয়াহাযাল বালাদিল আমিন অর্থ–করেছে একজন বলদ আর একজন আমিন। বদমাস বাটপার বা বাচাল ছেলেরা যেমন দেশী বিদেশী সকল ভাষারই কদর্থ করে থাকে এও ঠিক তেমনি করেছে।

ছোটকালে গ্রামোফোন রেকর্ডে একটি কবিতার প্যারোডি শুনেছিলাম। কবিতাটি ছিল–

ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য সুধা মনোহর
গুণ গুণ গুণ রবে কত মধুকরে
কতই পুলকে তারা মধুপান করে।

যতটুকু মনে পড়ে প্যারোডিটি ছিল এমনঃ এক ব্যক্তি তার যুবতী মেয়ে সুধার জন্য মনোহর নামক এক গৃহ শিক্ষক রেখেছিল। গৃহ শিক্ষকটি যখন সুধাকে কবিতাটি ব্যাখ্যা করছিল তখন সুধার প্রশ্নের জবাবে যুবক শিক্ষক মনোহর বলছেঃ পুকুরে পদ্মফুল ফুটে আছে, সুধা আর মনোহর পুকুর পাড়ে বসে তার সৌন্দর্য দেখছিল। ধরিয়াছে কি আশ্চর্য সুধা মনোহরের মানে সুধা সেখানে মনোহরকে জড়িয়ে ধরে। নিকটেই মধু বাবু গুণ গুণ গান করছিলেন। অমনি তিনিও সেখানে হাজির হলেন। তখন মধু বাবু আর মনোহর দু'জনে মিলে কি আনন্দে সুধার মধু উপভোগ করল।

মনে যদি বদমাসী থাকে তবে অমৃতকেও হলাহল করে তোলা যায়। যে যার নিজ রুচিমত, নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী পবিত্র বাণীরও কদর্থ করতে পারে ঐ মনোহর মাষ্টারের মত। ছোট ছোট কথার মধ্যে মানুষের মানসিক পর্যায়ের এবং মানুষের চরিত্রের আভাষ পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐ বুদ্ধিজীবী বলদটাতো শিক্ষিত মানুষ। তার কলম দিয়ে তো অমন বাচালতা বের হওয়ার কথা ছিল না। তবে কি সে লেখাপড়া করেনি। বিদ্যালয়ে শুধু হকিষ্টিক চালিয়েছে, সন্ত্রাস করেছে আর ঐ পিতৃপরিচয় বিরোধী ডক্টরেট (না ডিজিজ) এর তত্ত্বাবধানে পশুতর শিক্ষা নিয়ে সেই কার্টুনের শিংওয়ালা বলদের মত হিংস্র জানোয়ার হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

পূর্বেই বলেছি হিংস্র বলদদের শাসনে রাখার জন্য সাহসী ও দক্ষ রাখাল পিন লাগানো পাচনি, শক্ত রশি, মুখ বন্ধ করার কামুর আর মজবুত খুটি ও গোহালের প্রয়োজন হয়। হাতিয়ার যতই থাকুক রাখালের দক্ষতা না থাকলে কোন হাতিয়ারই কাজে আসবে না। কারণ রাখালের যদি দক্ষতা ও সাহস না থাকে হিংস্র বলদকে রশি দিয়ে বাঁধতে পারবেনা, মুখে কামুর লাগাতে পারবেনা, গোহালে ঢুকাতে পারবেনা, বলদ তার আগেই তাকে গুতিয়ে অক্কা পাইয়ে দিবে।

মানুষ বলদের বেলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। পশু বলদকে সামলে না রাখলে তারা মানুষকে গুতোয়, গোহালের অন্য গরুদের গুতায়, ক্ষেতের ফসল খায়, বাগানের ফুল খায়। মানুষ বলদকে শাসনে না রাখলে সাধারণের ঘরে চুরি ডাকাতি খুন খারাবি করে সমাজের শান্তি নষ্ট করে আর বুদ্ধিজীবী বলদেরা মানুষের হাজার হাজার বছরের ধর্ম শৃংখলাবোধ দ্বারা লালিত সামজিক শান্তি শৃংখলাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

সুতারাং আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দক্ষ এবং সাহসী রাখাল খুঁজে বের করা। অন্যথায় আরও বহু হিংস্র বলদের আবির্ভাব ঘটবে, সন্ত্রাসের আতংকে সমাজে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

রাজনীতির প্লেগ

আমাদের দেশে পলিটিক্স এর প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। প্লেগ অত্যন্ত ছোয়াচে রোগ। কোন গ্রামে একজনও যদি প্লেগে আক্রান্ত হয়, পুরো গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ে একবার আক্রান্ত হলে মৃত্যু ছাড়া তার আর কোন গতি নেই। আমাদের দেশে পলিটিক্স ও তেমনি প্লেগের মহামারীর মত ছাত্র রাজনীতির নামে বিদ্যালয়গুলিতে এবং সি, বি, এর নামে শিল্প কারখানাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে যত লাশ পড়ে তত লেখা পড়া হয় না, কারখানাগুলিতে যত আন্দোলন হয় তত উৎপাদন হয় না। ফলে এই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার কলকারখানা মারা পড়ছে। বহু কারখানা মালিক দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। নতুন নতুন বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দূরে সরে আছে পলিটিক্স প্লেগের ভয়ে।

২৫মে ১৯৯৪ তারিখে দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদনে প্রকাশ, শিল্প মন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ১৪ হাজার কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির এই লোকসানের ফলে দেশ বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ ও চাকুরীর সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছে। এই লোকসান না হলে ঐ টাকা বিনিয়োগ করে দেশে দুই কোটি লোকের চাকুরীর সংস্থান করা যেত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী আরো উল্লেখ করেছেন জাতীয়করণের পূর্বে বস্ত্রমিল ও পাট কলগুলো প্রতিবছর লাভ করেছে। অন্যান্য খাতের প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানও লাভ করত। জাতীয়করণের পর বস্ত্র ও পাট কলগুলোতে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও লোকসান দিচ্ছে। বেসরকারী উদ্যোক্তারা প্রথমে একটা মিল স্থাপন করে তার লাভের টাকা দিয়ে পর পর অনেক মিল স্থাপন করত। এগুলো সবই শিল্পমন্ত্রীর সাহসী সত্যভাষণ।

সরকার পক্ষ সাধারণত দেশের অবস্থা সম্পর্কে এমন সত্যভাষণ প্রচার করে না। ১৪ হাজার কোটি টাকার লোকসানের বোঝার চাপে যখন দেশের মানুষ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে, ঘাটতি পূরণের জন্য ট্যাক্সের বোঝা বইতে গিয়ে যখন মানুষের ত্রাহি ডাক ছোটে তখন সরকারী দল বুঝাতে চেষ্টা করে যেন মানুষ সুখ–সমীরণে মহানন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। গত ২৩ বছরে যখন ঐ ১৪ হাজার কোটি টাকার লোকসানের পাহাড় গড়ে উঠেছে তখন প্রথম তিন বছর

আওয়ামী লীগ সমৃদ্ধির ঢোল পিটিয়েছে এবং এখন ও সে সময়কার ঐ স্মৃতি রোমঞ্চন করে চলেছে। পরবর্তী ৬ বছর জাতীয়তাবাদী দল, তারপর ৯ বছর জাতীয়দল, তারপর আবারও জাতীয়তাবাদী দল সেই খুশির ঢোলই পিটিয়েছে।

শিল্পমন্ত্রী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলেননি। লোকসান করে করে বেসরকারী কত প্রতিষ্ঠান যে বন্ধ হয়েছে তাও উল্লেখ করেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন, বেসরকারী উদ্যোক্তারা প্রথমে একটি মিল স্থাপন করে তার লাভের টাকা দিয়ে অনেক মিল স্থাপন করত। তার মধ্য হতে কিছু মিল রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর ১৪ হাজার কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এই লোকসান না হলে ঐ টাকাটা বিনিয়োগ করে দুই কোটি লোকের চাকুরীর সংস্থান করা যেত। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব এই সাথে ধরা হলে লোকসানের পরিমাণ কত হত এবং তদ্বারা কত বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হত তা কল্পনাতীত।

লোকসানের ফলে হাজার হাজার বেসরকারী মিল-কারখানা বন্ধ হয়েছে কিন্তু সরকারী মিল বন্ধ হয়নি। যেমন আদমজী মিল, এ মিলটি বছরে নাকি ১০০ কোটি টাকা লোকসান দেয়। তারপরও মিলটি চালু আছে। তারপরও মিলটিতে বর্ধিত বেতন ও বর্ধিত সুযোগ সুবিধার জন্য আন্দোলন হয়, ধর্মঘট হয়, অসম্ভব সব দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সেসব দাবীর কাছে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়। রীতিমত কর্মচারীর বেতন দিতে হয় এবং বেতন খাতে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। এই লোকসানের মিলটির শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য নিয়মিত ভাবে ব্যাংক হতে ধার নিতে হচ্ছে। ধারের অংকও হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? কেন চলবে? মরা গাছে পানি ঢেলে পানির অপচয় না করে ঐ পানি দিয়ে একটি উষার মরুর বনায়ন সম্ভব হতে পারত। কিন্তু সরকার কোন কথা বলেন না, কোন, পরিকল্পনা নেননা। কিন্তু কেন?

রাজনৈতিক দলের জনশক্তি কেন্দ্রঃ

আমাদের দেশের রাজনীতি হচ্ছে পেশীনির্ভর। পেশীশক্তি প্রদর্শনের জন্য রাজনীতিকরা জনশক্তির দু'টি উৎসস্থলকে মহামূল্যবান কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করে থাকেন। প্রথমটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসম্প্রদায়, যেখানে ছাত্ররা বাবার খায় হলে-হোষ্টেলে থাকে। স্ত্রী পুত্র কন্যার কোন দায় দায়িত্ব না থাকায় এ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি পেলেই এদের তারুণ্য টগবগিয়ে উটে। রাজনীতিকরা তাদের ক্ষমতার উত্তাপ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। শেষ পর্যন্ত অর্থ অস্ত্র হাতে দিয়ে ক্ষমতায় উত্তাপ দিয়ে ক্ষমতার চর দখলের লাঠিয়াল

হিসাবে ব্যবহার করে। বয়স গড়িয়ে এই ছাত্ররা যখন সংসার জীবনের দুয়ারে এসে দাঁড়ায় তখনই তারা উপলব্ধি করে যে জীবনের মূল্যবান সময়ের সবটুকু ব্যয় করে রাজনীতিকদের প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে, আর নিজে ব্যর্থতার সবটুকু গ্লানি ঘাড়ে নিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু যখন বুঝতে পেরেছে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ছাত্রদের মধ্যে যারা রাজনীতিকদের কাছে মহার্ঘ্য পুরুষ হিসাবে গন্য হতে পেরেছে তারা ছাত্রত্বকে রাজনীতিকদের বেতন ভুক পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ক্যাম্পাসেই শিকড় গেড়ে বসে ক্যাম্পাসে থেকেই তারা বিয়ে সাদী করে, সন্তানের পিতা হয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে।

রাজনীতিকদের জনশক্তির দ্বিতীয় উৎসস্থল হচ্ছে কল-কারখানার শ্রমিক সম্প্রদায়। জনশক্তির উৎসস্থল হওয়ার কারণেই শত শত কোটি টাকা লোকসান হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার কোটি টাকা ধার করে ঐ জনশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, লোকসানের মিলগুলি একেকটি দুর্গত প্রতিষ্ঠান। সরকারী খরচে সেখানকার কর্মচারীদের খিচুড়ি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঋণ করে অর্থসংস্থান করতে হচ্ছে। আর এই লঙ্গরখানার খানা খেয়েই সেখানকার শ্রমিকেরা কাজকর্ম বন্ধ করে রাজনীতিকদের হয়ে হরতাল সফল করতে কর্মস্থল ছেড়ে মিছিল নিয়ে শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে, মিটিং এ হাজিরা দিয়ে বক্তৃতা শুনে। বক্তৃতা শেষ হলে বক্তৃতার জ্বালাময়ী ভাষা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মিল এলাকায় এসে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতে মারামারি হয়, লাশ হয়, মিল বন্ধ হয়, স্ত্রী বিধবা হয়, সন্তান এতিম হয় বহু শ্রমিক বেকার হয়, বেকারের কর্মসংস্থান বন্ধ হয়।

লাশ পেয়ে রাজনীতিকরা খুশী হয়। লাশের জন্য শহিদী দরজার পাস নিয়ে বিভিন্ন দল টানাটানি করে দু'একটি মিছিল আর ঘটা করে পাঁচ-সাতটা জানাজা দেওয়ার জন্য। এদিকে সরকার পক্ষ লাশের পরিবারকে সাহায্য ঘোষণা করে, কিছুটা নিজ দলীয় সুনাম বৃদ্ধির জন্য আর কিছুটা বিরোধীদের মুখ বন্ধ কারার জন্য। ক্ষতির উপর ক্ষতি। লাঠালাঠির মিলের এই ক্ষতি পোষাবার জন্য সরকার নতুন নতুন ট্যাক্স বসান ভ্যাট সারচার্জ, ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স বসান পানি, বিদ্যুৎ,
গ্যাস ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করেন। ঘরে ঘরে বেকার ছেলেদের ফাঁস গলায় নিয়ে জনসাধারণকে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত বেকার ছেলের পকেট খরচের উপর ঐ বর্ধিত ট্যাক্স খাজনা ও দিতে হয়।

দাবীদাওয়ার প্লেগ রোগ

রাজনীতিকেরা সরকারী মিলের শ্রমিকদের দলীয় মিছিল, মিটিং মারামারির কাজে ব্যবহারের এবং দল সমর্থনের বিনিময়ে যে সকল সুযোগ

সুবিধা প্রদান করে থাকেন ব্যক্তি মালিকানার মিলেও তার ঢেউ এসে লাগে। পাশাপাশি অবস্থান এবং সামাজিক সান্নিধ্যের কারণে সহমর্মিতার খাতিরে হলেও এরা সরকারী মিলের শ্রমিকের অনুরূপ সুযোগ সুবিধার দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামে। এখানেও রাজনীতিকরা উস্কানি সৃষ্টি করেন। বিনিময়ে এরাও মিছিল, মিটিং এবং মারামারিতে অংশ গ্রহণ করে রাজনীতিকদের খুশী করে। তার ফলে কি সরকারী কি বেসরকারী সকল মিলের শ্রমিকরাই যে কোন বিশৃংখল ক্রিয়াকর্মে সমভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং পুরা শিল্পাঞ্চলে প্লেগ রোগের মত বিশৃংখলার রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কাজ কর্ম বন্ধ করে মেশিনের চাকা বন্ধ করে শ্রমিকরা সব দলীয় মিটিং করে। দিনের পর দিন এমনি মিটিং মিছিল চলে, বছরের পর বছর ধরে মিলগুলি লোকসানের ঘানি টানে। সরকারী সহায়তায় সরকারী মিলগুলি নাক উচিয়ে বেঁচে থাকে। আর ব্যক্তি মালিকানার মিলগুলি লোকসানের ঘানি টানতে গিয়ে অস্থিসার হয়ে প্লেগের ইদুরের মত ধুকে ধুকে এক সময় নির্জীব নিস্প্রাণ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, শ্রমিকেরা বেকার হয়, প্রজন্মের কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ হয়।

বড় বড় মিলগুলিই রাজনীতিকদের আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার। এদের সমর্থন আদায় করার জন্য এবং সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য সকল রাজনৈতিক দলই উৎকণ্ঠিত থাকে। এ কারণে তাদের যে কোন অযৌক্তিক দাবী দাওয়া ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি অনাহুতভাবেও অকুস্থলে হাজির হয়ে সমর্থন দেয় এবং উস্কানি সৃষ্টি করে। শুধু কলকারখানাই নয়, স্কুল কলেজ, অফিস আদালত হাট বাজার ইত্যাদির যেখানেই গোলমাল দেখা দেয় সেখানেই তারা আছে। এখানে তেমন একটি ঘটনা উল্লেখ করছিঃ

ঢাকা বঙ্গবন্ধু এভিনিউর ফুটপাথগুলিতে পুরোপুরি হকারদের দোকান বসে গেছে। জনসাধাণ ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার জায়গা না পাওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় হাঁটে। এ নিয়ে পত্র পত্রিকায় জনসাধারণের বহু অভিযোগ ছাপা হয়েছে।

১৯৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসে পুলিশের সাহায্যে দোকানগুলি উঠিয়ে দিয়ে ফুটপাথ পরিষ্কার করা হয়েছিল। হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে হকাররা বিক্ষুব্ধ হয়ে সকাল ১১ টা হতে দুপুর সাড়ে বারটা পর্যন্ত গুলিস্তান এলাকায় ব্যাপক ভাবে দোকান এবং গাড়ী ভাঙচুর করে। তাদের ইট পাটকেল নিক্ষেপে বি আর টিসি বাস ও সাধারণ যানবাহনসহ প্রায় ২০/২২ টি গাড়ী ভাঙচুর হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির হলে হকারা পুলিশের উপর ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ভাংচুর শুরুর

পূর্বে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতা এসে হকারদের মাঝে উস্কানী মূলক বক্তব্য রাখেন।

পত্রিকার সচিত্র সংবাদে আরও বলা হয়, ঐদিন বিকেল সাড়ে তিনটায় ছিন্নমূল হকার সমিতির আহবানে এক হকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বিরোধীদলের একজন নেতা এবং এম পি হাজির হয়ে বলেন, পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের ফুটপাথে হাকার রয়েছে–বাংলাদেশেও থাকবে। (ইনকিলাব ১৩/১২/৯৩।

উল্লেখ যোগ্য, সরকার কর্তৃক ফুটপাথ হতে হকার উচ্ছেদ এবং বিরোধীদল কর্তৃক হকারদের ফুটপাথে ব্যবসা করার অধিকারের প্রতি সমর্থনের এই ঘটনাটিকে ১৯৯৪ সনের ঢাকা সিটি করর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন কালে প্রচারণার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। নির্বাচনে বিরোধীদল প্রার্থীই মেয়র নির্বাচিত হন। একারনেই এবং এভাবেই রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের যে কোন অযৌক্তিক দাবী কিম্বা আন্দোলনের সূত্র ধরে কলকাখানার হাজির হয়ে মায়াকান্না কেঁদে সমর্থন দেয়, মালিকপক্ষকে ধমক দেয়। প্রতিদানে তারা শ্রমিক সমর্থন আদায় করে এবং অব্যাহত সমর্থনের আশ্বাস নিশ্চিত করেন।

কলকাতার সানন্দা পত্রিকার ২৮ মে, ১৯৯৩ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। শিরোনাম ছিল "বাণিজ্যিক সংস্থায় রাজনৈতিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করা উচিৎ কিনা"। তাতে বলা হয়েছিল রাজনীতি হচ্ছে শয়তানের অন্তিম আশ্রয় কিন্তু আমাদের দেশের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে শ্রমিক সংগঠনে নামে সিবিএর নামে যেভাবে রাজনীতির থাবা বিস্তৃত হচ্ছে তা দেখে বলতে ইচ্ছে করে রাজনীতি হচ্ছে শয়তানের কর্মশালা।

নেতারা নিজ দলের প্রতি শ্রমিক সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য শ্রমিক আন্দোনের সাথে যে একাত্মতা প্রকাশ করেন তার ফলে শ্রমিক অসন্তোষের গতি অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে, সরকারী মিলের লোকসান ব্যক্তি মালিকানার মিলে সংক্রমিত হচ্ছে এবং আন্দোনের নেশায় পুরো শিল্পাঞ্চল কর্মবিমুখ এবং আন্দোলন মুখর হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় যেখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্প মালিকেরা লোকসানের ঘানি টেনে টেনে মিল বন্ধ করে দিচ্ছে, কখনও কখনও জীবনের নিরাপত্তার জন্যও মিল বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে নতুন উদ্যোক্তার আসবে কোন সাহসে? বলা যায় "পুজি হচ্ছে ভীরুমতি সুখের পায়রা"। পায়রা যেমন বিড়ালের থাবার শব্দ পেলেই খাঁচা বাসা ফেলে আকাশে পাখা মেলে পালিয়ে যায়, পুঁজি ও তেমনি শ্রমিক অসন্তো বা সরকারের বৈরী নীতির সাড়া পেলেই পালাবার রাস্তা খোঁজে।

আপনি আচরি ধর্ম

শিল্পমন্ত্রীর ভাষায় দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় যে লোকসান এ পর্যন্ত হয়েছে তা যদি না হত তবে তা বিনিয়োগ করে দুই কোটি লোকের চাকুরী সংস্থান করা যেত। দেশে আজ বেকারের সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি। সুতরাং এক কোটির বেশী মানুষকে আমাদের দেশে কাজ করার জন্য বিদেশ হতে আনতে হতো আমাদের অবস্থা হত আরব দেশের মত। বিদেশীরা পুঁজি নিয়ে মেধা নিয়ে আমাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করত, জি হুজুর, জি হুজুর করত। কিন্তু তা না হয়ে আমরাই আজ মিসকিন হয়ে, শ্রমিক হয়ে দেশে দেশে ফিরছি।

যে রাজনৈতিক ভুলের কারণে শ্রমিক অসন্তোষ, যে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে এই লোকসান, পুঁজিভীতির সে কারণগুলির প্রতি নজর না দিয়ে সরকার বিশ্বের বিনিযোগকারীদের আমাদের দেশে বিনিয়োগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু স্পষ্ট কথায় বলতে হয়, যে ঘরে শিয়াল আছে, সে ঘরে কি কেউ মুরগী রাখতে আসতে পারে? তাও আবার দু'রকমের শিয়াল। বুভুক্ষু শ্রমিক শিয়াল যারা মুরগী পেলেই খপ করে কামড়ে ধরবে। দ্বিতীয়ত মোটা তাজা রাজনীতিক শিয়াল যারা শ্রমিক আর মালিকের মাঝখানে দাড়িয়ে বখরা আদায় করবে আর সাধারণ শ্রমিকরা বুড়া আঙ্গুল চুষবে। এমতাবস্থায় আমরা কি করে বিদেশী বিনিয়োগকারী এদেশে আসবে বলে আশা করতে পারি?

মন্ত্রী বলেছেন, বেসরকারী উদ্যোক্তারা প্রথমে একটা মিল স্থাপন করে তার লাভের টাকা দিয়ে পর পর অনেক মিল স্থাপন করত? কিন্তু এখন সেরকমটি হয় না কেন? সেই কেনর উত্তরটি মন্ত্রী দেননি। সরকারের মন্ত্রী হিসাবে সেই কারণটি তিনি উপলব্ধি করেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার কারনে তিনি সেই সত্য কথাটি সত্য করে বলতে পারেন না। কারণ আজকাল রাজনীতিকরা হরতাল, ঘেরাও অবরোধ, ভাঙচুর হত্যা ইত্যাদি দ্বারা তাদের ক্ষমতার যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করে থাকেন। অর্থাৎ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত না করলে হরতাল সফল হয় না। তাই শিক্ষাঙ্গনের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতাযুদ্ধের ময়দান হচ্ছে শিল্পকারখানার অঙ্গন।

আমরা জানি একটি মুরগী অনেক ডিমে তা দিয়ে অনেক বাচ্চা ফুটায়। কিন্তু যদি তাদের ডিমে তা দেওয়া বিঘ্নিত হয় তবে একটিও বাচ্চা ফুটবেনা। মুরগীর বাচ্চা পেতে হলে মুরগীকে এবং তার খাঁচাকে নিরুপদ্রব রাখতে হবে।

তেমনি একজন শিল্পপতি নিরূপদ্রবে কাজ চালাতে পারলে একটির আয় দিয়ে অনেক শিল্পকারখানা গড়তে পারেন। কিন্তু রাজনীতিক শিয়ালদের খামচা খামচির শিকার হলে অনেক মিলতো দুরের কথা আসল মিলটি ফেলে রেখে শিল্পপতিকে জান নিয়ে পালাতে হয়। রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার কারণে মন্ত্রী এ সত্যটি উল্লেখ করতে পারেন না কারণ মন্ত্রী হিসাবে যে কাজটি তার কাছে খারাপ লেগেছে মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর তাকে সেই কাজটিই করতে হবে।

সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে বলে বেড়াচ্ছে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে। তারা খেয়াল করছেন না যে, কৃপণের সিন্ধুকের টাকা যেমন পুঁজি এবং বিনিয়োগ সৃষ্টি করেনা তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বিনিয়োগ সৃষ্টি করেনা এবং তদ্বারা বেকারের বেকারত্ব ও ঘোচেনা। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বলছে আগে নিজেরা বিনিয়োগ বাড়াও এবং প্রমাণ কর যে দেশে স্থিতিশীলতা আছে। তখন দেখবে আমাদের খোশামোদ করে বেড়াতে হবে না, আমরা নিজেরাই পুঁজি নিয়ে আসার জন্য তোমাদের খোশামোদ করব। আপনি আচরি ধর্ম। দেশে শত শত মিলিনেয়ার আছে। আগে তারা বিনিয়োগ করুক,পরিবেশ তৈরী হোক তার পরে তো বিদেশীদের কথা।

নিরপেক্ষ তত্তাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে বিরোধী দলগুলি সংসদ ছেড়ে এখন রাস্তায় মানুষ ক্ষেপাচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঢাকায় স্বীকার করেছেন যে, সংসদ বর্জন সহ হরতাল অবরোধ ভাংচুর ইতাদি ঘটনা চলতে থাকায় তার দেশের বিনিয়োগকারীরা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। বহু প্রকল্পের অর্থ ফেরৎ যাচ্ছে বহু দেশই এ ধরনের কথা বলছে, তবু আমাদের বোধোদয় হচ্ছে না আসলে রাজনীতির মদিরা পান করে আমাদের বোধ শক্তিই লুপ্ত হয়ে গেছে।

বেকার বিদ্রোহ

ছাত্র জীবনের সন্ত্রাসের দায়ভার গ্রস্থ বহু জাঁদরেল ছাত্রনেতাকে আজকাল ব্যর্থতার গ্লানী এবং অপরাধবোধ বয়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে পরিনত বয়সে এসে দুঃখ বেদনার ভারে জর্জরিত তাদের মুখে আজ রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী ফুটতে শুরু করেছে। একই প্রকার বিদ্রোহের বাণী হয়তো অচিরেই বেকার শ্রমিক সমাজের মুখেও ধ্বনিত হবে। শ্রমিকেরাও একদিন হয়তো উপলব্ধি করবে যে শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ঐ রাজনীতিকদের অপকর্মের কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার কোটি টাকা

লোকসান হয়েছে। ঐ রাজনৈতিক অপকার এবং সীমাহীন লোকসানের ভয়ে দেশী–বিদেশী কোন পুঁজিপতিই এদেশে শিল্প কারখানা গড়তে সাহস করে না। ফলে এক কোটির মত সোমত্ত সন্তান বেকার হয়ে ঘরে বসে হা-অন্ন হা অন্ন করছে। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ঘরে গিয়ে বেকার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাবছেঃ

"আমি কি করনু। আন্দোলন কইরা যদি কারখানার লোকসান না করতাম মালিককে না মারতাম তবে সেই মালিক বেচারাতো কারখানার সম্প্রাসরণ করতো তাতে আরও কর্মচারীর দরকার হইত আর আমার পোলার দাবীইতো অগ্রগন্য হইতো। আহা আমি রাজনীতিকদের লেঞ্জায় বান্ধা পইরা কি করনু গো!"

দেশের মানুষ যেন রাজনীতিকদের গবেষণাগারের গিনিপিগ! হরতাল ঘেরাও অবরোধ দ্বারা অর্থনীতিকে পঙ্গু করে মিটিং মিছিলে গোলাগুলির অবস্থা সৃষ্টি করে তাতে মানুষ খুন করে রাজনীতিকরা আন্দোলনমুখর মানুষের রক্ত দিয়ে রাজনীতির গবেষনা চালাচ্ছে। এই রক্তের নেশায়ই রাজনীতিকরা কেউ কারও সাথে আপোস করে না। কোন দলই অপর দলকে দল মনে করে না, অপর দলের রাজনীতিকে রাজনীতি মনে করে না, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে নেতা মনে করে না। রাজনৈতিক দলগুলির কান্ডকারখানা দেখে মনে হয়, প্রত্যেকটি দল যেন একেকটি স্বৈরাচারে প্রেতাত্মা, প্রত্যেকটি দল যেন একটি মুহম্মদ বিন তুঘলক, যেন একেকজন নিরো। দেশ ধ্বংস হোক, জাতি ধ্বংস হোক,দেশের মানুষ মরে যাক, তবুও তারা নিজের বাঁশিতে নিজের সুরই বাজাবে। সব কিছু দেখে শুনে মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলির সব যেন স্বৈরাচারীর আড্ডাখানা। তাই ১৯৪৭ সন থেকে আজ পর্যন্ত কোন দল, কোন সরকারই এই অপরাধ হতে মুক্ত থাকতে পারেনি।

সন্দেহ হচ্ছে, ভোট ও ভাতের ভন্ড আশ্বাস দিয়ে দেশের শ্রমিক সমাজকে আর হয়তো বেশী দিন প্রতারণা করা যাবে না, হিপনোটিজম দ্বারা দেশের মানুষকে আর মহিষের মত নাকে রশি বেঁধে চালিয়ে নেওয়া যাবে না। বিদ্রোহী ছাত্রনেতারা নজির স্থাপন করেছে ছাত্রদের মত করে হয়ত একদিন দেশের সকল দুঃখী মানুষ, চাকুরীচ্যুত শ্রমিক ও বেকারেরা এক হয়ে শ্লোগান দেবে–"ব্যক্তি স্বার্থলোভী রাজনীতিকদের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করুন। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলে বসতে পারে দেশের ক্ষমতাপিয়াসী, স্বার্থান্ধ রাজনীতিকদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে প্রবল ব্রাশ ফায়ার করতে ইচ্ছে করে"।

ভাগ্য লক্ষ্মী চঞ্চলা

পেঁচা বড় লাজুক পাখী। দিনের বেলায় এরা গাছের অন্ধকার কোটরে আত্মগোপন করে থাকে। রাত্রি বেলায় কোটর হতে বেরিয়ে এলেও লোক চক্ষুর অন্তরালে গাছের ডাল পালায় অবস্থান নিয়ে শস্য ক্ষেতের পোকা, মাকড়, ইদুঁর শিকার করে শস্যের ফলন নিশ্চিত করে। এহেন লাজুক পেঁচাই নাকি লক্ষ্মীর বাহন।

হিন্দুশাস্ত্রে আছে লক্ষ্মী নাকি পেঁচার পাখায় ভর করে ভাগ্যবানের ধানের গোলা, গরুর গোহাল খুজে ফিরে পেঁচা যেহেতু লাজুক এবং ভীরু পাখী, স্বাভাবিক ভাবেই পেঁচাটি লক্ষ্মীকে এমন বাড়ীতেই নিয়ে যায় যেখানে কোন ভয় নেই, ভীতি নেই, কলহ কোন্দল নেই। সেই বাড়িতে যতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি থাকবে লক্ষ্মীও ততক্ষণ পর্যন্তই তথায় থাকবে। যে মুহুর্তে সে কলহ কোন্দলও অশান্তির আভাষ পাবে তখনি লক্ষ্মীটি উড়ে পালিয়ে যাবে। এজন্যই বাংলাদেশে প্রবাদ আছে 'ভাগ্য লক্ষ্মী চঞ্চলা।'

শুধু বাংলাদেশেই নয়। সারা বিশ্বই ভাগ্য লক্ষ্মীর শান্তি প্রিয়তা এবং চঞ্চলতায় বিশ্বাস করে। একারণেই ইংরেজীতে বলা হয় Riches have wings অর্থাৎ ভাগ্যের পাখা আছে। বাংলাদেশে আমরা ভাগ্যের পাখা দেখেছি, ভাগ্যকে উড়তে দেখেছি, ভাগ্যের পলায়ন-পরতা দেখেছি এবং এখনও দেখছি।

১৯৪৭ সনের পূর্বেকার ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশে কোন শিল্পকারখানা ছিলনা। ঐ বৎসর ভারত বিভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হল। স্বাধীনতা, শান্তি, স্বস্তির আনন্দে শিল্পদ্যোক্তারা, পুঁজিপতিরা যেন ভাগ্য লক্ষ্মীর মত পেঁচার পাখায় ভর করে এদেশে এসে কলকারখানা গড়তে লাগল। এমনকি বিশ্বে বৃহত্তম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হল এই দেশে। আদমজির দেখা দেখি দাউদ এল, তাদের পেছনে পেছনে, (ইস্পাহানী) বোহরা, যেমন ইত্যাদি কত জাতের পুঁজিপতি শিল্পপতি এল। বিদেশে যারা রাস্তার পাশে সাইকেল মেরামত করত তারা এদেশে এসে সাইকেলের কারখানা গড়ল, বিদেশে যে লোক ঘরে বসে চরকায় সুতা কাটত সে লোক এখানে এসে স্পীনিং মিল গড়ল।

শান্তির প্রতীক কবুতর যেমন গৃহস্তের বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয় পেলে, আহার এবং বিহারে সুবিধা পেলে দল বেঁধে এসে বাসা বাঁধে, তেমনি

এদেশের শান্তি প্রিয় মানুষের নিরীহ প্রকৃতি ও আতিথ্যে মুগ্ধ বিদেশী শিল্পদ্যোক্তারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দলেদলে এদেশে এসে বহু শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছিল। এক সময় হিসাব বের হল ২২টি পরিবারের বাপ, বেটা, নাতি পুতি মিলে সবাই একটার পর একটা শিল্প কারখানা তৈরি করছে আর লাভের পাহাড় গড়ে তুলছে। তারা যে দেশের অর্থনীতিকে প্রাণ চঞ্চল করে তুলছে একথাটা কেউ বলল না। শুধু তাদের লাভটাই দেখল।

দু'শ বছরের দারিদ্র্যতার পর হঠাৎ যেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠল নতুন নতুন কল–কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং তা শ্রমিক কর্মচারী কর্মকর্তাদের কল–কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠে দেশে যেন চাকুরী প্রার্থী লোকজনেরও অভাব দেখা দেয়। রাস্তাঘাট হতে পঁচা, গেদা, হাবা, গবা এমন সব লোকদেরও ধরে এনে চাকুরী দেওয়া হল। যাদের স্পষ্ট করে কথা বলাও ক্ষমতা নেই, যারা সহজ কথাটিও সহজে বুঝে না, যাদের উত্তরে যেতে বললে দক্ষিণে চলে যায় তারাও সুখের ছোঁয়ায় সতেজ হয়ে উঠে।

শুধু চাকুরী নয় কল–কারখানাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ চা, পান, সিগারেট, বাদাম বিক্রি করে, সাইকেল চশমা, ঘড়ি, কলম, জুতা মেরামতের দোকান খুলে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। এমনকি কারখানার পাশের বাড়ীর গৃহবধুটিও অবসর বসে থাকেনি। ঘরে বসে ভাপা পিঠা, খোলা পিঠা তৈরী করে মিল গেটে এসে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছে।

আজকাল রাস্তার পাশে যে খোলা পিঠা, ভাপা পিঠা বিক্রি করার পদ্ধতি আমার দেখে থাকি এই ব্যবসা পদ্ধতিটি ঐ সময়ই চালু হয়েছিল।

দু'শ বছরের বঞ্চনা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যতার পর শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে ঐ দুই দশক ছিল শিক্ষণীয় সময়। কিন্তু সময়টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমাপনীর জন্য যথেষ্ট ছিলনা। তা আগেই আমরা আবিষ্কার করেছিলাম ঐ ২২ পরিবার কল কারখানায় অসীম লাভ করে সব লাভ বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের তাড়াতে হবে। সকল কল-কারখানা দখল করে আমাদের দেশের কারখানা আমরাই চালাব। সকল লাভ আমরাই খাব। আমরা বুঝতে চেষ্টা করিনি যে, গানের কণ্ঠ যেমন এক ঐশ্বরিক দান, শিল্প বাণিজ্যে প্রতিভাও তেমনি এক ঐশ্বরিক দান। ঐ প্রতিভা ছাড়া শিল্প কারখানা চালাতে গেলে বোকা চাষীর অবস্থা হয়, যে চাষীর একটি হাঁস প্রতিদিন একটি সোনার ডিম দিত কিন্তু অধৈর্যে চাষী একদিনে সব সোনার ডিম পাওয়ার জন্য হাঁসটিকে জবাই করে পরে হায় হায় করেছিল।

ভাগ্যলক্ষ্মী ও কবুতর:

কবুতর বড় শান্তিপ্রিয় প্রাণী। তাদের শান্তির প্রতীক হিসাবে গন্যকরা হয়। অভাগার ঘরে নাকি কবুতর বাসা বাধেনা। কারণ অভাগারা শান্তির মর্যাদা বুঝে না তারা শান্তির ঘরেও অশান্তি সৃষ্টি করে। একারণেই কবুতর অভাগার ঘরে আসেনা।

১৯৭২ সনে বাড়ীর কার্নিশে ঝুলানো খাঁচায় আমার এক ঝাঁক কবুতর ছিল। সারাদিন তাদের বাক-বাকুম বাক-বাকুম দাম্পত্য কলরবে তারা আমার বাড়ীর পরিবেশটাকে আনন্দ মধুর সুরে ছন্দায়ত করে রাখত। তদুপরি ক'দিন পরপরই কবুতরের বাচ্চার সুস্বাদু ব্যঞ্জন আমাদের জন্য যেন এক নেয়ামত ছিল।

সে সময় আমার দু'টি পোষা বিড়ালও ছিল প্রচুর দুধ ভাত খেয়ে তারা ঘরময় মেও মেও করে বেড়াত। কিন্তু বিড়াল বড় অকৃতজ্ঞ প্রাণী। ঠিক কুকুরে বিপরিত। গৃহস্থের খাওয়ার পর কুকুর একটু উচ্ছিষ্টের সাথে একটু গোস্ত খাওয়ার ভাগ্য হয়, তাহলে সেও একটু হাঁড়িড খেতে পাবে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ বিড়াল নাকি দোয়া করে গৃহিনী যেন অন্ধ হয়ে যায়, তাইলে সে খাবারের থালা হতে মাছের মুড়া নিয়ে যেতে পাবে, হাড়ির দুধ চুরি করে খেতে পারবে।

যাই হোক্ বিড়ালগুলি তপস্বীর মত ছাঁদের কোণে চোখ বুঁজে বসে থাকে- যেন আল্লাহর নাম জপ করে। হঠাৎ একরাত্রে বিড়াল দু'টি কবুতরের খাচার উপর ঝাঁফিয়ে পড়ে মূহুর্তের মধ্যে ২২টি কবুতর নিকষ কালো অন্ধকার আকাশে ডানা মেলে দেয়। এ বাড়ীর ছাদ, ও বাড়ীর কার্নিশ, এ গাছের ডাল ও গাছের ডাল করে যে যেখানে পা ঠেকাতে পারল সেখানে বসেই রাত কাটিয়ে দিল। ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে আসতেই তারা আশে পাশে যে বাড়ীতেই নিরাপদ বোধ করেছে সেখানেই বাসা বেঁধেছে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতেও এসে ঘুরে গেছে। কিন্তু বিড়াল দেখে আমার বাসায় আসতে আর সাহস করেনি। বিশেষ করে কবুতর বড় ভীরু শান্তি প্রিয় পাখী, সামান্য পটকার শব্দকেও সে এটম বোম বলে মনে করে পুঁজিপতিরাও তেমনি কবুতরের মত ভীরু।

কল-কারখানায় রাজনীতির বিড়াল

মানুষের চেষ্টা, কষ্ট, সহ্য ও প্রার্থনা ফসল যে সঞ্চয় সেই সঞ্চয়ই বিনিয়োজিত হলে পুজি হয়ে যায়। চেষ্টার ও কষ্টে ফসল বলে প্রতিটি পয়সায় থাকে মালিকের ঘামের গন্ধ, অন্তরের মমত্ব। সুতরাং বিনিয়োগে ক্ষেত্রে

প্রত্যেকটি পুঁজিপতি যেন একেকটি ভীরু কবুতর। পুঁজি বিনিয়োগ করতে পুঁজিপতিরা তিন পা এগুয় তো দুই পা পেছনে যায়।

শিল্প প্রতিভা এক বিরল প্রতিভা। ভারত বিভাগোত্তর কালের দুই দশকে শান্তি ও স্বস্তির আনন্দে বিরল প্রতিভার অধিকারী যে ২২ পরিবার এদেশে এসেছিল তারা হাজার হাজার কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ১৯৭২ সনে কবুতরের খাঁচায় বিড়ালের আক্রমনের মত একদিকে সরকারের রাষ্ট্রিয়করণ অপরদিকে সি বি এর দৌরাত্ম দ্বারা সে সব কল-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়েছিল। কবুতরের মত শিল্পপতিরা পুঁজি পাট্টা ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। বিড়াল যেমন কবুতরের হাড়িড মাংস চিবিয়ে খায়, বাংলাদেশী বিড়ালেরাও তেমনি রাষ্ট্রায়ত্ব করা কল-কারখানার লোহা লক্কড় যন্ত্রাংশগুলি পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। বিড়াল যেমন দোয়া করে তার আদরের গৃহকর্ত্রী যেন অন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে আরও বেশী করে মাছের মুড়া, দুধের সর চুরি করে খেতে পারবে। এই মানুষ বিড়ালেরাও তেমনি দোয়া করেছে দেশের মানুষ সবাই যেন অন্ধ হয়ে যায় তাইলে তারা আরও বেশী করে চুরি করতে পারবে।

দেশী শিল্পপতি যারা ছিলেন তাদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে গেল। শ্রমিক ইউনিয়ন নামের বিড়ালেরা এখানেও থাবা বিস্তার করে। অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ রাজনীতিকেরা শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে দলীয়করণ করে নিজ নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শ্রমিকের সাথে মালিকের সম্পর্ককে অহি নকুলের মত করে তোলে। এক সময় মালিকেরা যেসব হাভাতে হাবা, গবা, পচা, গেদাদের রাস্ত া থেকে তুলে এনে নিজ কারখানায় চাকুরী দিয়েছিলেন, ভন্ড রাজনীতিকদের প্ররোচনায় তারাই এবার সুযোগ সুবিধার দাবী নিয়ে রুদ্র মূর্তিতে মালিকের জান কবচ করতে এগিয়ে আসে। স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত শ্রমিক সংগঠনের হাতে বহু কারখানার মালিককে প্রাণ দিতে হয়েছে। রাজনীতিক প্ররোচিত শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার চাপে এবং শ্রমিক সংগঠনের রাজনৈতিক শক্তির দাপটে ব্যক্তি মালিকানাধীন হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়নি শুধু রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানাগুলি।

রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানাগুলির প্রতিটি যেন একেকটি রিফিউজী ক্যাম্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেসব কারখানার শ্রমিকরা রাজনীতিকদের সেবা প্রদান এবং সাংগঠনিক কাজের শেষে খাতির জমা যা উৎপাদন করে তদ্বারা তাদের বেতনের টাকাই আয় হয় না। বরঞ্চ বছরের পর বছর লোকসান করে চলেছে। সে সব মিল কারখানায় লঙ্গরখানা চালাবার মত সরকারী টাকায়

শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়। এই লঙ্গরখানার টাকা খেয়েই শ্রমিকেরা কারখানা এলাকায় বন্দুক যুদ্ধ করে। কথায় কথায় এক শ্রমিক আর এক শ্রমিককে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে গুলি করে বলি দেয়। আদমজি পাটকল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এই আদমজী পাট কলটিই বছরে একশত কোটি টাকা লোকসান দেয়? তারপরও তারা হরতার করে দাবী দাওয়ার আন্দোলন করে। ধর্মঘট করে এবং বেতন নেয়।

সুতরাং বিদেশী শিল্পদ্যোক্তাতো দূরের কথা, এখন দেশে কারখানা প্রতিষ্ঠা করার মত হাজার হাজার কোটিপতি থাকা সত্বেও দেশে কোন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা সাহস পাচ্ছেনা। তারা ভীরু কবুতরের মত শিল্প ক্ষেত্র হতে দূরে সরে আছে। ঐ কোটিপতিরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশে বাড়ী ঘর খরিদ করে, ব্যাংকে টাকা রেখে ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং তুলে আরাম আয়েশের দিন যাপন করছেন। নিজের গাঁটের টাকায় দেশে কারখানা তৈরী করে শেষে হাবা গবা শ্রমিকের হাতে প্রাণ হারাবেন তাতো হয় না।

এখন পচা, গেদা, হাবা, গবা, তো দূরের কথা, বি, এ, এম, এ, পাস করা লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক হা অন্ন হা অন্ন করে রাস্তা ঘাটে ঘুরে মরছে, সুযোগ পেলে পথিকের বুকে ছুরি ধরে তার সর্বস্ব হরণ করে হাত খরচ সঙ্কুলান করছে। এখানে রাজনীতিকরা সংগঠনিক তৎপরতা প্রদর্শন করেন না। মালিকের মিলে গিয়ে তারা শান্তিপ্রিয় শ্রমিকের শান্ত কর্মস্থলে রাজনীতির নামে অশান্তি সৃষ্টি করেন। কিন্তু কৈ বেকারদের সংগঠন করে তাদের জন্য এমন কর্ম সংস্থানতো করতে পাচ্ছেন না, যে কর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে অসৎ চিন্তা বা অসৎ কর্ম করার মত ফুরসৎ তারা পাবেনা। কিন্তু না, তারা বেকারের কর্ম সংস্থানের পক্ষপাতি নন। কারণ বেকার না থাকলে তাদের হরতাল মিছিলের জন্য লোক পাবেন কোথায়?

আশির দশকে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যখন চরম আকার ধারণ করে তখন দেশের কল-কারখানার শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি এক নারকীয় অভিযানের সূচনা করে। কল-কারখানার চাকা বন্ধ করে শ্রমিকেরা বন্দুক, লাঠি ছুরি হাতে নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বন্দুক যুদ্ধে বা ছুরি-লাঠির আঘাতে, কোথাও মালিকের খুনে, কোথাও শ্রমিকের খুনে কারখানা প্রাঙ্গন রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে। রাজনৈতিক মদিরার নেশাগ্রস্ত হাবা, গবা, পচা, গেদা শ্রমিকদের কেউ আর মেশিন ঘরে বসার সময় পায় না। সবাই হরতাল মিছিল, অবরোধ

ঘেরাও ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত। কারখানায় উৎপাদন নেই, আয় নেই, শ্রমিকের বেতন দেওয়ার অর্থ সংস্থান নেই। বেতনের দাবীতে শ্রমিকেরা মালিককে ঘেরাও করে আর রাজনীতিকরা ঘেরাও সফল করার জন্য শ্রমিকের কাতারে দাঁড়িয়ে মালিকের উপর চাপ সৃষ্টি করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যেন শ্রমিকেরা রাজনীতিকদের হরতাল আর মিছিলের কাজ করবে আর মালিকেরা মিল বিক্রি করে তাদের বেতন দেবে। সুতরাং মিল বন্ধ করা ছাড়া মালিকের আর কোন উপায় থাকেনা।

এতদৃষ্টে ১৯৮৬ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লন্ডনের দি ইকনমিষ্ট পত্রিকা মন্তব্য করেছিলঃ "রাজনীতিই বাংলাদেশকে গরীব করেছে। অস্থিতিশীল এবং দুর্নীতিবাজ সরকারগুলি বাংলাদেশের মত একটি উর্বর কৃষিভূমির দেশকে বিশ্বের করুনা ভিক্ষার দেশে পরিণত করেছে"।

পুঁজি বড় ভীরু পাখী

১৯৯১ সন হতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক প্ররোচনার ধারা তো বন্ধ হয়নি। আজ দেশের লক্ষ নিযুত শিক্ষিত বেকারেরা হা-অন্ন হা-অন্ন করছে। আর দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীরা শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন নিয়ে ভীরু কবুতরের মত বা পেচক বাহিত লক্ষীর মত দু'পা এগিয়ে এসে তিন পা পিছিয়ে যাচ্ছে। কারণ এখানে রাজনৈতিক দলের অপরিনামদর্শি প্ররোচনায় প্ররোচিত শ্রমিক সংগঠনগুলি বিনিয়োগকারীদের উপর বিড়াল থাবার নখের বিস্তার করে আছে। বিদেশীরা কোন রাখ ঢাক না করেই কথাটা পরিষ্কার করে বার বার বলে যাচ্ছেন "এ অসভ্য দেশে আর কোনদিন আসবনা।"(দ্রঃ পৃষ্ঠা-৩)

১৯৯২ সনের আগষ্ট মাসে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজের এক সভায় সৌদি দূতাবাসের চার্জ দ্যা এফেয়ার্সকে দাওয়াত করে আনা হয়েছিল। উপস্থিত সদস্যগণ আশা করছিলেন তিনি হয়তো স্বধর্মের খাতিরে বা সৌভ্রাতৃত্বের খাতিরে আমাদের দারিদ্র্যতা নিরসনের জন্য কিছু পুঁজি বিনিয়োগের আশ্বাস দেবেন। কিন্তু তিনি আদমজী জুট মিলসহ দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে ভাবে গোলাগুলি খুনাখুনি হয়, যেভাবে মালিকেরা নিগৃহিত হয় সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। ১৯৯১ সনের ২৫ নভেম্বর তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাট কল বস্ত্র কল শ্রমিকদের ৪৮ ঘন্টাব্যাপী রাজপথ রেলপথ অবরোধ উপলক্ষে শিল্প কারখানায় যে শ্রমিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল যে কোন

বিনিয়োগকারীর জন্য তা এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল। সুতরাং তিনি তার বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন "Capita is coward." তিনি বলেছেন, যে দেশে শ্রমিকদের পরিকল্পিত উপায়ে মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয় সেদেশে কোন মালিকই কারখানা তৈরী করে নিজের জীবন বিপন্ন করতে যেতে পারেনা। তিনি আশা করেছিলেন একথাটি এদশের রাজনীতিকরা হয়তো বুঝবেন।

শুধু সৌদি চার্জ দ্যা এফেয়ার্সই নয় বিদেশী অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, সমাজবিদ সবাই প্রতিনিয়ত বলে যাচ্ছেন যে বাংলাদেশের শ্রমিক উচ্ছৃংখলতা এবং হরতাল ঘেরাও এর বর্তমান ধারা বজায় থাকলে কোন শিল্পপতি এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আসবেনা। কিন্তু সবাই যা বুঝে মনে হয় আমরা তা বুঝিনা। এমনকি আমাদের দেশের দোকান মালিক সমিতি পর্যন্ত গত ১৯-৪-৯৪ তারিখে আন্দোলনকারী রাজনৈতিক নেতাদের জানিয়েছেন হরতালের দিন দোকান ব্যবসায়ীরা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই হরতালের পরিবর্তে অন্যকোন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় কিনা তা যেন ভেবে দেখা হয়।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৮ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে জাপানে ৫ দিনের এক সফরে গিয়েছিলেন। দেশের শিল্পায়নের জন্য জাপানী শিল্প পুঁজিপতিদের খোশামোদ করে আনার চেষ্টাই ছিল তার এই সফরে উদ্দেশ্য। কোন রাখ ঢাক না করেই তিনি জাপানি বিনিয়োগকারীদের পুঁজির কিছু অংশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। এমনকি জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক যৌথ কমিটির ৭ম সভায় প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং শ্রমের উচ্চ মূল্যের কারণে অলাভজনক জাপানী শিল্পগুলিকে বাংলাদেশে সরিয়ে আনার জন্যও আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী জানান যে শুধুমাত্র জাপানী বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ একটি বিশেষ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী জাপানী শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার আশ্বাস দেন। তিনি আরও বলে বাংলাদেশের প্রতিযোগীতা মূলক শ্রম বাজার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, সুপ্রশিক্ষিত পেশাজীবী ইত্যাদির সাথে জাপানী পুঁজি, অভিজ্ঞতা এবং অবকাঠামোগত সুবিধা সংযুক্ত হলে দক্ষিন এশিয়ার বিশাল বাজারে তাৎপর্যপুর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর ঐ সুন্দর সুন্দর কথা শুনে জাপানী একটি ট্রেড ডেলিগেশন এসেও ছিল। তারা নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করতে এসেছে। সুতরাং তারা চোখ কান খোলা রেখেছে চারদিকে। এসেই তারা দেখেছে এদেশে কোন বড় শিল্পেই আইন শৃংখলা নেই, লক্ষ্যমাত্রায় উৎপাদন হয়না। শ্রমিকেরা মালিকদের শাসন করে, মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের যে কোন অযৌক্তিক দাবীর ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের উস্কানী দিয়ে মুরুব্বি সেজে শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। নেতারা যখন তখন হরতাল আহবান করে এবং দিনের পর দিন চালিয়ে যায়। হরতালে, মিছিলে রাজনীতিক জনসভায় জন সমাগম বৃদ্ধির জন্য রাজনীতিকরা কারখানার কল বন্ধ করে শ্রমিকদের রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে যায়। আবার যতদিনই কারখানার কাজ বন্ধ থাকুক না কেন শ্রমিকদের পুরো মজুরী পরিশোধের জন্য মালিকদের বাধ্য করে। ফলে দিনের পর দিন একটি একটি করে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। যখন তখন যেখানে সেখানে রাস্তা বন্ধ করে যান বাহন চলাচল বন্ধ করা হয়। যানবাহন ভাঙচুর করা হয়, বেকারের চাকুরী সংস্থান হলে যেখানে দুস্কৃতকারীর সংখ্যা কমত সেখানে বন্ধ মিলের চাকুরীচ্যুতদের নিয়ে দুস্কৃতকারীর সংখ্যা বাড়ছে। সাথে সাথে বাড়ছে রাজনৈতিক টাউট বাটপারের সংখ্যা। যদ্বারা হরতাল, ঘেরাও, অবরোধ কর্মসূচী সাফল্য লাভ করে এবং বেকারত্বের কারণে এদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

জাপানী ট্রেড ডেলিগেটরা ঢাকায় এসেই শুনেছেন ৭ এপ্রিল (১৯৯৪) এর সচিবালয় ঘেরাও এবং ঘেরাওকারীদের দ্বারা ছাত্র হত্যার ঘটনা, ১০ এপ্রিল এর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল, ১৮ এপ্রিল হতে দেশময় অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষক ধর্মঘট, ২৬ এপ্রিল এর সকাল সন্ধ্যা হরতাল ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ১৪৫ হাজার কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে তাও তারা শুনে গেছেন। দেশের কোটিপতিরা কেন যে শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছেনা, বরঞ্চ বহুকাল থেকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী মালীকানাধীন শিল্প কারখানাগুলি কেন যে এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে তার কারণও তারা বুঝতে পেরেছেন।

১৯৯৪ সনের এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই এই কমাসে বাংলাদেশে যে হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, আন্দোলন এবং লাগাতার সংসদ বর্জনের ঘটনা ঘটেছে তদ্দৃষ্টে বিদেশী কুটনীতিকরা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আর যে সব বিদেশী বিনিয়োগকারী হাটি হাটি পা পা করে এগুতে চেষ্টা করছিলেন তারা পিছুটান

দিয়েছেন। যারা এদেশে বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন তারা থমকে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরকালে এদেশের শ্রমিক সস্তা বলে যে আশ্বাস দিয়ে এসেছেন তার প্রেক্ষিতে কুটনীতিকরা বলেছেন, এদেশের শ্রমিকরা কাজের চেয়ে শোভাযাত্রায় ও মিছিলে অনেক বেশী সময় ব্যয় করে। এই অপব্যয়িত সময়ের মূল্য হিসাব করলে দেখা যাবে এদেশের শ্রমের মূল্য অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশী।

শিল্প ক্ষেত্রে রাজনীতি বিড়ালের থাবা

যারা রাজনীতি করেন তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি আর ক্ষমতার হাতিয়ার হচ্ছে জনশক্তি। আবার জনশক্তি প্রদর্শনের জন্য জনতার উৎস হচ্ছে কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্র সমাজ এবং কল-কারখানার শ্রমিক সমাজ। ছাত্ররা বাবার টাকায় লালিত পালিত আর শ্রমিকেরা মালিকের টাকায়। রাজনীতিকরা অল্প সময়ে স্বল্প খরছে এদের রাস্তায় নামিয়ে এনে বিশাল জন সমর্থণ প্রদর্শন করে নিজেদের ক্ষমতা লাভের পথ প্রশস্ত করে।

কিন্তু যারা পুঁজিপতি, শিল্পদ্যোক্তা তাদের প্রাণ মন নিবদ্ধ থাকে তাদের বিনিয়োজিত পুঁজির নিরাপত্তা ও মুনাফার প্রতি। তাদের কারখানার শ্রমিকরা যদি রাজনীতিকদের কথা মত কাজ ফেলে মিছিলে, মিটিং এ, শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে থাকে তবে আর মালিকের মিল চলবেনা। তারপর আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সবাই যদি কারখানায় তাদের রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠন তৈরী করেন তবে মিলের অস্তিত্বই বিপন্ন তবে। যেমন আদমজী জুট মিলে যতটুকু উৎপাদন হয়, রাজনৈতিক দলের লেজুড় শ্রমিক সংগঠনগুলি তার চেয়ে বেশী বন্দুক যুদ্ধের মারামারি হানাহানি করে এবং বছরের শেষ হিসাবে দেখা যায় শত কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। এটা সরকারী কারখানা, সুতরাং সরকারী টাকা দ্বারা শ্রমিকদের বেতন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয় রাজনৈতিক দলের লেজুড় বৃত্তি করার জন্য। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানার কারখানা যেমনঃ হালিমা টেক্সটাইল মিল, হামিদিয়া জুট মিল, ডব্লিউ রহমান জুট মিল, আফসার স্পিনীং মিল, ইদানীং কালের জলিল টেক্সটাইল মিলসহ হাজারো মিল বন্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে আছে। শ্রমিকদের উপর রাজনৈতিক দলগুলির উস্কানির কারণে যে লোকসান হয় তার ভার সইবার মত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন
মিলের থাকতে পারেনা। সুতরাং মিল গুলি বন্ধ করা ছাড়া আর কিইবা গত্যন্ত র থাকতে পারে?

পরের ধনে পোদ্দারি

কেনা বেচার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী চাইবে খদ্দেরের কাছ হতে কিছু বেশী পয়সা আদায় করতে আর খদ্দের চাইবে কিছু কম পয়সা দিতে। এটা অর্থনীতি একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি মালিক চাইবে শ্রমিকদের কিছু কম দিতে, শ্রমিক চাইবে কিছু বেশী আদায় কতে। এর ফলে যে দর কষাকষি হয় তার জন্য শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিবিএ নামক সংগঠন তৈরী করা হয়েছে।

সিবিএ অর্থ হচ্ছে শিল্প ক্ষেত্রে হাজার হাজার শ্রমিকের সবাই মালিকের সাথে ঝগড়া করতে না গিয়ে তাদের একটা সুনির্বাচিত প্রতিনিধি দল মালিকের সাথে দর কষাকষি করবে মালিক এবং শ্রমিক উভয়ে পারস্পরিক স্বার্থহানি না করে যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়ে এবং যতটুকু সম্ভব নিয়ে শিল্পকে বাঁচাবে, মালিককে ও বাঁচাবে, শ্রমিকও বাঁচবে। এই দর কষাকষির মধ্যে রাজনীতিকদের কিছু থাকার কথা নয়।

কিন্তু আজকাল সিবিএগুলি সবই রাজনৈতিক দলগুলির অঙ্গ সংগঠন হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে দর কষাকষির জন্য একটি সিবিএ, থাকার কথা সেখানে রাজনীতিকরা নিজ স্বার্থে ব্যবহারের জন্য বহু প্রতিদ্বন্দ্বি দল তৈরী করে নিত্য খুনাখুনির আখড়া হিসাবে তাদের ব্যবহার করে চলেছে। ফলে দর কষাকষির সময় এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেন শ্রমিকরাই মালিক আর শিল্পপতিরা যেন তস্করের মত অপরের ধন আত্মসাৎ করছে। আর রাজনীতিকরা মালিককে সমর্থণ না করে মালিকের হাড়ির খবর না নিয়ে বানর বিচারকের মত শ্রমিকের অযৌক্তিক দাবীকেও সমর্থণ করে যান। তার কারণ মালিকমাত্র একজন কিন্তু শ্রমিক হাজার হাজার। রাজনীতিকের প্রয়োজন জনসমর্থন দ্বারা মাঠ গরম করা এবং সেজন্য তার প্রয়োজন হাজার হাজার শ্রমিকের। একজন মালিক তার কোন কাজে আসবেনা এবং সে জন্যে মালিকের এবং তার শিল্পকারখানার বাঁচা মরার কথাও ক্ষমতা পিপাসু রাজনীতিকরা চিন্তা করেন না।

এমন বহু রাজানীতিক আছে যারা শিল্পের 'শ' বোঝে না, অর্থনীতির 'অ' বোঝেনা এবং যারা এক সময় অমন একটা কারখানার একটা কেরানীর চাকুরী পেলেও নিজেকে ধন্য মনে করত, সেই অক্ষমেরাও রাজনীতির ক্ষমতার স্পর্শ পেয়ে যেন আগুন হয়ে উঠেছে। একারনেই এদেশে দেশী বিদেশী কোন বিনিয়োগকারীই রাজনীতিকদের হাতে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেছেনা। একারণেই লক্ষ নিযুত মানুষ আজ বেকার

হয়ে রয়েছে, একারণেই লন্ডনের দি ইকনমিষ্ট পত্রিকা বলেছে রাজনীতিই বাংলাদেশকে গরীব করেছে। কিন্তু অত কিছুর পরও সিবিএর উপর রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপ এবং উস্কানী বন্ধ হয়নি এবং বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

দেশের চেয়ে দলবড়?

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে সোনালী ব্যাংকের একটি সিবিএ সংগঠন বেলা তিনটায় অফিস চলাকালীন সময়ে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ব্যাংক অভ্যন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বি দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং প্রতিপক্ষের নেতাদের আহত করে। এত বড় একটা ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় ব্যাংক ভবনের উত্তর পার্শ্বের চত্বরে বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের বড় বড় নেতারা সিবিএর সমর্থণে গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন। তারা বলেছেন দালাল ও আমলাদের কারনে কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া পূরণ হচ্ছেনা। তারা কর্মচারিদের ১০ সেপ্টেম্বরে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী সফল করার জন্য মাথায় কাফনের কাপড় বেধে রাজপথে নামার আহবান জানান। আর সেদিন ব্যাংকে তাদের উপস্থিতির এটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

রাজনৈতিক দলের সমর্থণপুষ্ট হওয়ার কারণে সিবিএ নেতারা অফিসের বড় কর্তা বা কারখানার মালিকে নাযেহাল করতে, প্রহার করতে, মারাত্মক জখম বা খুন করতেও দ্বিধাবোধ করেনা এবং সেসব দুষ্কর্মগুলি রাজনীতিকরা সমর্থণও করে থাকেন। সুতরাং শিল্প মালিককে কাবু করার জন্য শ্রমিকদলগুলি প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক দলের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। তাতে শ্রমিকদলের অন্যায় দাবীও যেমন ন্যায্য হয়ে যায়, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলির অযৌক্তিক আন্দোলনেও জনশক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। একারনেই কল–কারখানা শ্রমিকরা যখন তখন কাজ ফেলে রাজনৈতিক দলের আশ্রয় এবং প্রশ্রয় লাভের জন্য শহরে ছুটে আসে।

১৯৯৪ সনের ৫ সেপ্টেম্বর ৮টি পাট কলের ১০ হাজারেরও বেশী শ্রমিক বিএনপির আদর্শের প্রতি সংহতি ও সমর্থন এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ব্যাক্ত করে জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলে যোগদান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হেয়ার রোডস্থ কায্যালয়ে আসেন (ইনকিলাব ৬/৯/৯৪)

আবার ৮ সেপ্টেম্বর ২৯ মিন্টো রোডস্থ বিরোধী দলীয় নেত্রীর বাসভবন প্রাঙ্গণে ডেসা শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মরহুম শেখ মুজিবুর

রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শ্রমিক লীগে যোগদান করেন (ইনকিলাব ৯/৯/৯৪) এমনি ধরণের দলভুতির কারণেই শ্রমিক সংগঠনগুলি বেপরোয়া হয়ে থাকে।

এই যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানার শ্রমিকেরা দলে যোগ দেওয়ার জন্য রিজার্ভ বাস নিয়ে শতে শতে, হাজারে হাজারে ঢাকা ছুটে আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে এই আসা যাওয়াতো সস্তা আসা যাওয়া নয়। তারাতো দরিদ্র শ্রমিক। বউ বাচ্চা নিয়ে সংসারের ঘানি টানতেই তো এরা হিমসিম খায়। তারপরও এই ব্যায় বহুল ঢাকা সফর কি করে সম্ভব হয়? আসলে তারা সখ করে আসেনা। রাজনীতিকেরা কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে দলের খরচে তাদেরকে আনান এবং ঢাকা আসা যাওয়ার কারণে কর্মস্থলের অনুপস্থিত দিনগুলির বেতন ও মারা যায় না। নেতারা মিল মালিকের উপর রক্তচক্ষু পাকিয়ে তাদের গলা টিপে মরার উপর খাড়ার ঘা মেরে বেতন আদায় করে দেন।

৮ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে সোনালী ব্যাংক খুলনা অফিসের ডিজি এম সাহেবের কক্ষে ৭/৮ জন সিবিএ নেতা ঢুকে জোর পূর্বক কিছু অযৌক্তিক দাবির নথিতে সই আদায় করতে চেষ্টা করে। তিনি সই না দেওয়ায় নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে এনে প্রহার করে এবং কক্ষ থেকে বের করে দেয়।

খুলনায় এমন একটা ঘটনা যখন ঘটে গেল ঠিক ঐ সময়ই ঢাকার বড় বড় রাস্তার পাশে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সুগন্ধার দেওয়ালেও একখানা বিরাট আকারের চার রঙ্গা পোষ্টার শোভা পাচ্ছিল। তাতে বলা হয়েছিল ২০ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখে সোনালী ব্যাংক হেড অফিসে সি এ বি এর অভিষেক অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে এবং তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা কর্মীসহ চার জন মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সি বি এ একটি বড় রাজনৈতিক দল এবং সোনালী ব্যাংকটি একটি রাজনৈতিক আড্ডাখানা। অর্থাৎ দেশের চেয়ে তাদের কাছে দলই বড়। নীতি নৈতিকতা এবং ধ্বংসাত্মক পদচারনার বর্ণনা মানুষের মনে ঘৃনার উদ্রেক করতে শুরু করেছে।

আমাদের দেশের শিল্প কারখানা, বাণিজিক প্রতিষ্ঠান সহ অফিস আদালতে রাজনীতিকগন যে হিংস্র থাবা বিস্তার করেছে তদৃষ্টে বতে ইচ্ছে করে রাজনীতি হচ্ছে শয়তানের কর্মশালা।

পুঁজী ভীরু চন্দনা

১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে আমাদের দেশে একটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। ঐ নির্বাচন উপলক্ষে দেশে দেশে যে অরাজক আন্দোলন হয়েছিল সে প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লন্ডনের দি ইকনমিষ্ট পত্রিকা মন্তব্য করেছিল–রাজনীতিই বাংলাদেশকে গরীব করেছে যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি অস্থিতিশীল এবং দুর্নীতিবাজ সরকারগুলি বাংলাদেশের মত একটি উর্বর কৃষিভূমির দেশকে বিশ্বের করুণা ভিক্ষার দেশে পরিণত করেছে।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের দেশ হতে বিদেশী কোম্পানীগুলি তাদের পুঁজিপাট্টা নিয়ে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সেসব পুঁজিপাট্টা নিয়ে তারা নিজ দেশে যাচ্ছে না। ঐ পুঁজি নিয়ে তারা নিরাপদ শিল্পাঞ্চলের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বের যেখানেই পুঁজির নিরাপত্তা এবং লাভের আশ্বাস পাবে, সেখানেই তারা যাবে। উদাহরন স্বরূপ লিভার ব্রাদার্স বর্তমানে ইউনিলিভার এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির বিরাট কারখানা কমপ্লেক্স রয়েছে। সম্প্রসারন চাইলে জায়গা, জমি, শ্রমিক ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু হরতাল ধর্মঘট ভাঙচুর ইত্যাদির ভয়ে তারা এদেশে তাদের কর্মকান্ডের কোন সম্প্রসারণ করলনা। তারা সম্প্রসারন করেছে ভারতে। সেখানে তারা নতুন নতুন পণ্য সামগ্রী সেখানকার শ্রমিক দিয়ে তৈরী করে আমাদের দেশে পাঠাচ্ছে। ফলে সেদেশের শ্রমিক চাকুরী পাচ্ছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা পাচ্ছে আর আমরা গরিব বেকারেরা সেসব জিনিস খরীদ করে ব্যবহার করছি।

শুধু এক লিভার ব্রাদার্সই নয়। বহু বিদেশী কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে তাদের পুঁজি পাট্টা নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে। তার কারণ ওসব দেশে পুঁজিপাট্টা হারাবার ভয় নেই, কলকারখানা আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই। সি বি এ এর প্রতাপ নেই কিন্তু আমাদের দেশে এত ভয়টা কেন? আমরা তো বাঘও নই ভালুকও নই বা পাগলা কুকুর ও নই। তবে কেন ঐ ভয়? "ক্যাপিটাল ইজ কাউয়ার্ড" অর্থনীতির এই প্রবাদবাক্য কি আমরা জানি না?

সেদিন একটি বড় ব্যাংকের এক কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার কদিন আগে মাত্র ব্যাংকটির সি, বি এ এর ইলেকশন হয়ে গেছে। পোষ্টারে পোষ্টারে ব্যাংকের ভবনটি এমনভাবে ছেয়ে আছে যে তাকে

অফিস ভবন বলে মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয় যেন একটি যাত্রা দলের প্যান্ডেল। ভবনটিকে অফিসের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে হলে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে হবে।

যাই হোক কর্মকর্তাটির অফিস রুমের দরজা ফাঁক করে দেখি তিনি একদল কর্মাচারির সাথে আলোচনায় ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর সবাই বেরিয়ে গেলে আমার ডাক পড়ল।

ভেতরে ঢুকে শুনলাম ঐ লোকগুলি এবারের সি, বি, এ, নির্বাচনের হারুপার্টি গতবার তারা ক্ষমতায় ছিল এবার তারা ক্ষমতা হারিয়েছে বটে, কিন্তু সি বি এ এর অফিস রুম ছাড়তে রাজি নয়।

তাদের দাবী হচ্ছে সংসদে বিরোধী দলীয়রা যেমন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে, তাদেরকে ও বিরোধী দল হিসাবে গণ্য করে তেমন সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। তাদের দাবীর মধ্যে রয়েছে একটি অফিস কক্ষ দিতে হবে। চেয়ার, টেবিল, টাইপ রাইটার মেশিন এবং টেলিফোন দিতে হবে।

তারপরের প্রধান দাবী হচ্ছে–যারা সদস্য নির্বাচিত হয়েছে তাদের কোন কাজ করতে দেওয়া যাবে না। কারণ তাদের সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং তাদের অন্যত্র বদলী করা যাবে না কারণ তাতে সংগঠনের কাজ কর্মের ক্ষতি হয়। তাদের দাবীর বহর দেখলে মনে হয় যেন প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন মল্লযোদ্ধা প্রতিদিনের শক্তি চর্চার জন্য তিনি সি বি এ নামের কিছু মল্লযোদ্ধাকে তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করেছেন এবং তারা প্রতিদিন তারসাথে যুদ্ধের অনুশীলন করবে। কর্মকর্তাটি বললেন সি, বি, এ, এর নেতারা নির্বাচিত হয়েই নিজেদের অফিসের বড় কর্তার উপরের কর্তা মনে করে বসে। এ প্রসঙ্গে তিনি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন।

অফিসের উর্দ্ধতন এক কর্মকর্তার রুমে তার আসন হিসাবে একখানা খুব সুন্দর চেয়ার ছিল। সি বি এ নেতারা দাবী করলেন ঐ চেয়ারখানা তাদের সভাপতির আসন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

নিজেদের মান মর্যাদা রক্ষার জন্য কর্মকর্তারা সি বি এ এর অনেক দাবী দাওয়া মেনে নিলেও ঐ চেয়ারের দাবীটি মানা হচ্ছিল না। তার কদিন পর এক সুন্দর সকালে কর্মকর্তাটি অফিসে এসে দেখেন ঐ চেয়ারখানা যথাস্থানে নেই। তদস্থলে একখানা নিকৃষ্ট ধরনের ভাঙ্গাচোরা চেয়ার মুখব্যদন করে আছে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। অনেক খোজাখুজির পর চেয়ার খানা পাওয়া গেল। দেখা গেল ঐ চেয়ারখানা সিবিএ অফিস রুমে তাদের সভাপতির আসন উজ্জল করে রেখেছে।

বললামঃ সি, বি, এ, নেতারাতো চাকরি বিধির আওতাভুক্ত কর্মচারী মাত্র। তাদের বিরুদ্ধে তো আপনারা এ্যকশন নিতে পারতেন?

তিনি বললেনঃ পাগল হয়েছেন? প্রাণটা হারাতে যাব? ছাপোষা শ্রমিক কর্মচারী হলে কি হবে, সি,বি,এ, নেতা হওয়ার সাথে সাথেই রাজনৈতিক দলগুলির আর্থিক এবং মানসিক মদদে তারা শক্তি ধর প্রভু হয়ে যায়। তারাতো নিজের শক্তিতে কুঁদেনা, রাজনৈতিক দলগুলির খুঁটির জোরেই না তারা কুঁদে। ঐ শক্তির কারণেইতো তারা তাদের মালিক হত্যা করে থাকে, উর্দ্ধতন কর্তা হত্যা করে থাকে।

আশির দশকের শুরুতে সি, বি, এ, কর্তৃক সোনালী ব্যাংকের এম, ডি এবং জেনারেল ম্যানেজার প্রহৃত হয়েছিলেন। শুধু প্রহারই নয়। এমডি সাহেবের হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাঁর চেম্বারের সকল আসবাবপত্র এমনকি টেলিফোনটি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল।

যে নেতাটির নেতৃত্বে ঐ অপকর্মটি সাধিত হয়েছিল, সেই নেতাটিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং আদালত তাকে সাজাও দিয়েছিল। কিন্তু নেতাটির সৌর্যবীর্য প্রত্যক্ষ করে রাজনীতিকেরা মোহিত হয়ে যান। তার সৌর্যবীর্যকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করার জন্য সরকার নিজেই তার দন্ড মওকুফ করে দিয়ে দলীয় স্বার্থে লোভনীয় দলীয় কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।(বি,এম বাকের)

সুতরাং সি, বি এ, নেতারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে, দুর্দান্ত, এবং সন্ত্রাসী প্রকৃতির হতে পারলে, নৃশংস হতে পারলে রাজনৈতিক দলের আর্থিক এবং মানসিক মদদ লাভ করা যায়, অকালে কপাল খুলে গোপাল হওয়া যায়।

এমন বহু সি, বি, এ, নেতা আছে যাদের নাম স্বাক্ষর করতে পাঁচমিনিট সময় লাগে এবং ঐ নাম স্বাক্ষরটুকু ছাড়া আর কোন লেখাপড়া সে জানে না চাঁন মিয়া নামের তেমনি এক নেতার কথা বললেন। বেতনের রেজিষ্টারে নাম সই করতে গিয়ে সে একটি চন্দ্রবিন্দু এঁকে তার সামনে একটা হাইফেন দিয়ে দিত। চন্দ্রবিন্দুটা চাঁন আর হাইফেনটা মিয়া। হাজিরা খাতায়ও সে চন্দ্রবিন্দু এঁকে হাজিরা দিত। তার পরিচয় হিসাবে জানালেন পাকিস্তান আমলে এক ছোট সাহেবের বাসার কাজের ছেলে ছিল চাঁন মিয়া। বড় হাবা গোবা ধরনের কিন্তু বড় জেদী। মুর্খ মানুষ জেদী হলে যা হয় সেও তাই। ওর বাবা এসে প্রায়ই ছোট সাহেবটির কাছে কান্না কাটি করে ওর ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার বিষয় নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করত। তাতেই ছোট সাহেব বিগলি হয়ে তাকে

অফিসে এনে চাকুরী দেন্ তিনি ভেবেছিলেন শত শত চালাকের মধ্যে একটা হাবা গোবা অবশ্যই চলে যাবে। এই চাঁন মিয়াই কালে অফিসের কাল হয়ে দাঁড়ায়।

এই চাঁন মিয়ার ভয়ে অফিসে সবাই সন্ত্রস্ত থাকত। কখনও সে বলত এম, ডিকে ন্যাংটা করে রাস্তায় ছেড়ে দিবে, কখনও বলত জি,এম, এর মাথা ন্যাড়া করে দেবে।

এমনটি কেন হয়? এক সময় যে মানুষটি সাহেবের বাসার কাজে লোক ছিল, সেই লোকটি সাহেবের অফিসে চাকরি করতে গিয়ে কি করে এত দুর্দান্ত হতে পারে? সে প্রসঙ্গে তিনি বললেন, আমাদের রাজনীতি মঞ্চে জ্ঞানী গুণী এবং নীতিবান নেতার বড় আকাল পড়েছে। রাজনীতির মাঠে নেমে যখন স্থলকুল পায় না, বিদ্যায় বুদ্ধিতে যখন কুলায় না তখন তাদের অবস্থা হয় নৌকাডুবির যাত্রীর মত তারা ঐ চাঁন মিয়াদের মত খড়কুটোদের শক্তি সাহস আশ্রয় করে রাজনীতিতে ভেসে বেড়াবার চেষ্টা করে মাত্র।

কিন্তু ঐ খড়কুটো আশ্রয় করে কোন নেতাই বেশী দিন ভাসতে পারে না। একদিন তারা ডুবে যায় পরে বিরোধী দলে গিয়ে ক্ষমতার লোভে তারা নতুন নতুন খড়কুটেটা তালাশ করতে গিয়ে নতুন নতুন চাঁন মিয়া খুজে বের করেন। রাজনীতিকদের যারা বিরোধী দলে থাকেন তারা যখন "ক্ষমতাসীন নেতাকে বলেন সুখে থাকতে দেবনা" তখন চাঁন মিয়ারাও নিজ প্রতিষ্ঠানের মালিককে একই ভঙ্গিতে বলে সুখে থাকতে দেবনা।

এক্ষেত্রে জাতিয় নেতাদের সাথে চাঁন মিয়াদের দারুন মিল। কারন অর্থনীতি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চাঁন মিয়ারা যেমন ঐতিহ্য বঞ্চিত মূর্খ শ্রমিক, রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐ আনাড়ি নেতারাও তেমনি রাজ রক্তের ধারা বঞ্চিত মানুষ। এরা রাজনীতি না জানার কারনেই নিজেরা জনজীবনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, প্রশাসনিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি সহ রাস্তায় গাড়ী ভাঙ্গে আর বাজারে আগুন লাগায়। আর শ্রমিকেরা রাজনীতিকদের দেখা দেখি শিল্প কারখানার নৈরাজ্য সৃষ্টি করে উৎপাদন ব্যহত করে এবং শিল্পদ্যোক্তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে। ফলে সম্ভাব্য শিল্পপতি এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিদের সবাই এদেশে হতে পাততাড়ি গুটিয়ে নিরাপদ দেশে চলে যায়।

ঐ চাঁন মিয়ারা ১৯৮৬ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকার তারা আয়রন এন্ড ষ্টিল ইন্ডাষ্ট্রিজের একজন অনিয়মিত শ্রমিককে কাজে যোগদানের দাবীসহ কতিপয় দাবীতে মালিককে ঘেরাও করে এবং মানসিক ভাবে নির্যাতন শুরু করে। বিপর্যস্ত মালিক এক

পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন্ তাকে হাসপাতালে নেয়া জন্য এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়। কিন্তু শ্রমিকেরা এ্যম্বুলেন্সটিকে জোর করে বের করে দেয়। তারা মালিককে নোংরা ভাষায় গালাগাল করতে থাকে এবং সেটা চাঁন মিয়াদের ভাষায়।

অনেক পরে পুলিশের সাহায্যে যখন তাকে উদ্ধার করা হয় তখন তিনি মৃত। এত বড় কান্ড চাঁন মিয়ারা নিজের ভরসায় কখনও করতে পারেনা। তাদের পেছনে শক্ত মুরুববী থাকে বলেই তারা এরকম দুর্দান্ত সাহস দেখাতে পারে। সেই মুরুব্বীরা রাজনীতির উত্তাপে উত্তপ্ত বিদিশা রাজনীতিক। বিদিশা হওয়ার কারনে রাষ্ট্রের ভালমন্দ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। সি, বি, এ, এর একটি অতি লজ্জাকর এবং ধ্বংসাত্মক ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সোনার গাঁ হোটেল দেশের একমাত্র পাঁচতারা হোটেল। বিদেশী মেহমান দ্বারা হোটেলটি সব সময় ভরপুর থাকে। তারা সবাই বিশ্বের নামী দামী মানুষ। মেহমানদের তুষ্টি সাধনই হোটেলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একমাত্র দায়ীত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু ঐ হোটেলের কিছু কর্মচারী ঐ মেহমানদের সাথে প্রায়শ দুর্ব্যবহার করে থাকে যা বিশ্বের যে কোন বড় হোটেলের রীতি নীতির পরিপন্থি।

২৮শে জানুয়ারী ১৯৯৬ তারিখে মেহমানদের অভিযোগের ভিত্তিতে একজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩০শে জানুয়ারী ৯৬ তারিখে হোটেল সি, বি, এ সভাপতির নেতৃত্বে ৫০/৬০ জনের একটি বহিরাগত, দল ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে হোটেলে প্রবেশ করে। গুলির শব্দ এবং সন্ত্রাসীদের মার মার চিৎকারে সমগ্র হোটেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লবিতে উপস্থিত দেশী বিদেশী মেহমানরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটা ছোটী শুরু করেন। হামলাকারী সন্ত্রাসীরা হোটেলের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বিভিন্ন রুমে অবস্থানকারী মেহমানরা আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা হোটেলের জি এম জাপানী নাগরিক মিঃ হামানোর কক্ষের দিকে ছুটে গেলে মিঃ হামানো তার কক্ষের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে অন্য কক্ষেচলে যান। হামানো পরে পালিয়ে এসে জাপানী দুতাবাসে আশ্রয় নেন।

ওদিকে সন্ত্রাসীরা ডিউটি ম্যনেজারকে মারধোর করে। রুম ডিভিশন ম্যানেজারকে জঘন্যভাবে ছুরিকাঘাত করে এবং তাকে আশাংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

হামলার পর সি,বি,এ, এর নেতৃত্বে বহিরাগতদের নিয়ে হোটেলের বলরুমে এক সভা হয়। সভায় সি,বিএ, সভাপতি ঘোষণা করেন তাদের দাবী না মানলে সোনারগাঁ হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর তারা চার দফা দাবী নিয়ে এ জি, এম (জেনারেল) এবং এ, জি, এম (পার্সোনেল) কে দিয়ে জোর পূর্বক দাবী মেনে নেয়ার জন্য কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। দাবী সমূহের মধ্যে রয়েছে (১) চাকুরীচ্যুত কর্মচারীকে পুনঃ বহাল করতে হবে এবং (২) সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবেনা। এছাড়াও সি,বি,এ, কর্মকর্তারা সোনারগাও হোটেলের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রককে নতুন জি এম হিসাবে ঘোষনা দেয়।

এতসব ঘটনার সময় থানায় বার বার সংবাদ দিলেও ঘটনার এক ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন পুলিশ আসেনি। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে একজন মন্ত্রী সি,বি,এ, এবং বহিরাগত সন্ত্রাসীদের পক্ষে ছিলেন।

পর দিন ৩১ শে জানুয়ারী সাদা পোশাক ধারী পুলিশ অতিথির বেশে হোটেলে গিয়ে সুকৌশলে সি,বি,এ, নেতৃবৃন্দ সহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। জেনারেল ম্যানেজার সহ সকল কর্মকর্তা ফিরে এসে স্বাভাবিক কাজ কর্ম শুরু করলে টেলিফোনে সহ বিভিন্ন ভাবে ধমক দিয়ে বলেছে আবার শীঘ্রই তারা সবাই হোটেলে ফিরে এসে সবাইকে দেখিয়ে ছাড়বে। কারন তাদের পক্ষে মন্ত্রী আছে এবং মন্ত্রী কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিপক্ষে।

ওদিকে জাপানী দুতাবাস সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে এ ধরনের পরিস্থিতি দেশে চলতে থাকলে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এটাই গরিব বাংলাদেশের গরিবীর ইতিহাস।

১৯৮৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর টঙ্গি মেঘনা টেক্সটাইল মিলের সি,বি,এ, নেতারা শ্রমিকদের দাবী–দাওয়া নিয়ে আলাপ করার জন্য জেনারেল ম্যানেজারের কক্ষে যায়। দুপুরে খাবার সময় হয়ে গেলে আলোচনায় বিরতি দিয়ে জেনারেল ম্যানেজার খেতে রওয়ানা দেন। সিঁড়ি বেয়ে তিনি যখন নীচে নামছিলেন এমন সময় সিঁড়ির কোঠায় অবস্থানরত কিছু শ্রমিক তাকে আক্রমণ করে উপুর্যপরি ছুরিকাঘাত করতে থাকে। ভদ্রলোক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

কোন শিল্পপতি শ্রমিকের হাতে নিহত হলেই শুধু সংবাদ হয় অন্যথায় নয়। অথচ প্রতিনিয়ত কত যে মালিক শ্রমিকের হাতে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এমতাবস্থায় জীবনে নিরাপত্তার জন্য বহু শিল্পপতি তাদের পুঁজি–পাট্টা নিয়ে কেটে পড়তে চেষ্টা করেন।

শিল্পপতিরা কারখানা বন্ধ করতে গেলে রাজনীতিকেরা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে, শ্রমিকেরা বেকার হচ্ছে ইত্যাদি ভন্ডামির সমবেদনা প্রদর্শন করতে থাকেন। আসলে তাদের মাথাব্যাথার কারণটা অন্যত্র। একটা কারখানা বন্ধ হওয়ার মানে তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার শ্রমিক সংখ্যা কমে যাওয়া, তাদের হরতাল, মিছিল, মিটিং ইত্যাদির লোকবল কমে যাওয়া এবং চাঁদার উৎস কমে যাওয়া।

শিল্পপতিরা ঐসব ভন্ডামি বুঝেন, নষ্ট রাজনীতির নষ্ট দর্শনের ভাষা বুঝেন। একারণে দেশের হাজার হাজার শিল্পপতি তাদের কারখানা বন্ধ করে দিয়ে জানমাল নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন। আর চাকরিচ্যুত শ্রমিকেরা হা অন্ন হা অন্ন করে কারখানা খুলে দেয়ার দাবীতে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে বেড়ায়। কোন রাজনীতিকতো তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করতে আসেনা তারা বরঞ্চ আন্দোলন আর মিছিলের জনবল বৃদ্ধি হয়েছে দেখে খুশী।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রাষ্ট্রয়াত্ত কারখানাগুলি নিয়ে। এরা বছরের পর বছর হাজা হাজার কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে তারপরও ঐসব কারখানার শ্রমিকেরা আরও চাই এর দাবী তুলছে এবং সরকারকে তা দিতেও হচ্ছে। তার প্রথম কারণ সরকারের তো নিজের পকেটের টাকা নয়। সুতরাং দিতেও কষ্ট নেই। ঘাটতি পড়লে নতুন নতুন ট্যাক্সের চাপে গরীব মারা যাবে তবুও লোকসানের কলের শ্রমিক পুষতে হবে। দ্বিতীয় কারণ বিরোধী দলগুলি যেমন কারখানার শ্রমিকদের রাস্তায় টেনে এনে সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে সরকারী দল ও আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকদল পোষণ করতে হয়। সুতরাং ট্যাক্স বসিয়ে গরীবের পকেটের টাকা এনে হলেও শ্রমিক দল রক্ষা করতে হবে।

দেশের সর্ব বৃহৎ জুট মিল আদমজী জুট মিল। পাকিস্তানীরা এই জুটমিল হতে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা মুনাফা করত। আমাদের দেশের টাকা নিয়ে গেল বলে আমরা তখন হায় হায় করেছি।

আজও সেই মিল আছে সেই শ্রমিক আছে কিন্তু উৎপাদন নেই। শ্রমিকদের বেতন দিতে হয় কিন্তু মিলে মুনাফা নেই। মিলটির শ্রমিকেরা এখন আর উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় সুযোগ পায় না। রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের সকল সময় সংগঠিত থাকতে হয়। সেখানে বিভিন্ন দলের সংগঠন আছে। সাংগঠনিক আধিপত্য বজায়

রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। আর বছরের শেষে ১০০ কোটি টাকার লোকসান গুণতে হয়।

এই সাংগঠনিক আধিপত্য রক্ষার জন্য আদমজী জুটমিল রাজনৈতিক দলের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মিলের শ্রমিক কলোনীগুলি বিভিন্ন দলের শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রতিনিয়ত লাঠি, সড়কি, রামদা, বন্দুক নিয়ে চরদখলের যুদ্ধের মত যুদ্ধ হয়। সেখানে প্রতিনিয়ত কারও স্বামী মরে, কারও বাবা মরে, কারও সন্তান মরে। তদ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন রোজাদার হয়, রাজনৈতিক দল গুলি জনসাধারণকে ঐ লাশ প্রদর্শন করে দলের জন্য সমর্থন আকর্ষণ করে।

এতদৃষ্টে শিল্পদ্যোক্তারা তাদের নির্মীয়মান কারখানার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়ে নিজের পুঁজির অর্থ ব্যাংকে রেখে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ রেখে আয়েশের দিন যাপন করে। অথবা পুঁজি নিয়ে এমন সব দেশে চলে যায় যেসব দেশ শিল্পদ্যোক্তাকে ঐশ্বরিক দান মনে করে। আর এদিকে দেশের ভুখানাঙ্গা বেকার মানুষেরা হা অন্ন হা অন্ন করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে ছিনতাই করে, চাঁদা চায়, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

একারণেই দি ইকনমিষ্ট পত্রিকা বলেছে রাজনীতিই বাংলাদেশকে গরীব করেছে। রাজনীতিকদের অনধিকার হস্তক্ষেপের ভয়ে যেখানে দেশের পুঁজি পতিরা কলকারখানা তৈরীতে নিরুৎসাহিত হয়ে নিজের সহায় সম্পদ নিয়ে পশ্চাদাপসরণ করছে, যেখানে বিদেশী পুঁজি পতিরা হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সেখানে নতুন বিদেশী পুঁজি আশা করাই যে বাতুলতা।

আমাদের দেশের অদুরদর্শী রাজনীতিকরা পুজির পলায়পরতার কারণ ও পরিনতি সম্পর্কে উদাসীন। সেজন্যই সৌদি রাষ্ট্র দুতকে পরিষ্কার ভাষায় মাথা দুলিয়ে দুবার করে বলতে হয়েছে, Capital is coward. capital is coward. ইকনমিষ্ট পত্রিকার যে মন্তব্য উদ্বৃত করেছিলাম তাতে বলা হয়েছে রাজনীতিই বাংলাদেশকে গরীব করেছে। যে রাজনীতি দেশকে গরীব করে সেই রাজনীতি আবার রাজনীতি হয় কি করে? বাংলাদেশের বেলায় তাই হচ্ছে কিনা উপরে ব্যাপারটা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

যে কোন দেশের উন্নতির প্রধান দু'টি সোপানের প্রথমটি হচ্ছে শিক্ষা দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিল্প। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই উভয় ক্ষেত্রেই আমরা রাজনীতির বিষাক্ত দংশনে জর্জরিত্ মনে হচ্ছে একটা শয়তানী প্রক্রিয়ায় দেশটিকে কেউ যেন দারিদ্রতার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ উভয় ক্ষেত্রেই রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৮৩ সনের ১৫ই অক্টোবর দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত একটি সংবাদের কথা মনে পড়ল। শয়তান জীবিত শিরোনামের ঐ সংবাদটিতে বলা হয়েছিল, বেলজিয়ামের ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসীদের উপর শয়তান সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। ঐ সমীক্ষার মতামতের ভিত্তিতে বলা হয়েছিল, শয়তান বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এদের অর্ধেক মনে করে ট্যাক্স আদায়কারীর ছদ্মবেশে শয়তান সমাজে বিরাজ করছে। আবার কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা, রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং ধর্ম যাজকের কথাও বলেছে।

সমীক্ষাটিতে আরও বলা হয়েছে, অধিকাংশই মনে করে 'শয়তান হচ্ছে পুরুষ, আর শতকরা ১৪ জন মনে করে শয়তান হচ্ছে নারী।

দেশের বিদ্যালয়ে, শিল্প কারখানায়, অফিস-আদালতে ইউনিয়নের নামে যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম চলছে তা দেখে বারবার আমার ঐ সমীক্ষাটির কথা মনে পড়ে যায়। আমার মনে হয়, ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মচারী ইউনিয়নের নামে রাজনীতির ছদ্মবেশে শয়তান তার অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। একারণে রাজনৈতিক দলের নাম ধারণকারী কর্মচারী ইউনিয়নগুলির দরিদ্র কর্মচারীরা পরস্পর পরস্পরের সাথে গোলাগুলি, লাঠালাঠি, হানাহানি করে মৃত্যুবরণ করে। পরিনতিতে কত শিশু এতিম হয়ে, কত নারী বিধবা হয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে বাধ্য হয়, কেউ তার হিসাব রাখেনা।

এজন্য পুঁজিপতিরা জান, মাল ইজ্জত ও পুঁজি হারাবার ভয়ে পুঁজিপাট্টা নিয়ে সরে পড়ে। একথাটিই আমরা এতক্ষন বুঝাতে চেষ্টা করেছি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ৮ অক্টোবর ৯৩ তারিখে খুলনা সোনালী ব্যাংকে অফিস চলাকালীন সময়ে ডি, জি এম সাহেবের অফিস কক্ষে ৭/৮ জন সি,বি,এ, নেতা ঢুকে জোরপূর্বক কিছু বেআইনী ও অযৌক্তিক দাবির ফাইলে সই আদায় করতে চেষ্টা করে। ডি জি এম সাহেব সই দিতে অস্বীকৃতি জানালে নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে অফিসের চেয়ার থেকে টেনে তুলে এনে প্রহার করে এবং কক্ষ থেকে বের করে দেয়।

ডি জি এম পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করতে চাইলে নেতারা তাকে অফিস থেকে চলে যেতে বলে। তিনি অফিস থেকে বের হয়ে গাড়ীতে উঠতে গেলে তখনও বাধাপ্রাপ্ত হন।

খুলনায় সি,বি,এ, নেতাদের হাতে সোনালী ব্যাংকের বড় সাহেব যখন প্রহৃত এবং অপদস্থ হচ্ছেন ঠিক এমনি সময়ে ঢাকার বড় বড় রাস্তার পাশে

বাড়ীর দেয়ালে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সুগন্ধার দেয়ালেও একখানা বিরাট আকারের রঙ্গিন পোষ্টার দেখা গেল। তাতে বলা হয়েছে ২০ শে অক্টোবর ৯৩ তারিখে সোনালী ব্যাংকের সি,বি,এ-র অভিষেক অনুষ্ঠান হবে। তাতে অন্তত চার জন মন্ত্রীসহ বহু রাজনৈতিক নেতা যোগ দিচ্ছেন।

ঐ সময়ে আবার ১০ অক্টোবর ৯৩ তারিখে পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে যারা ইউনিয়নের দোহাই দিয়ে কাজ করেন না তাদের চিহ্নিত করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এক নির্দেশ জারি করেছে।

একদিকে যখন সি,বি,এ, নেতারা অফিসের কর্মকর্তাকে প্রহার করে অফিস থেকে বের করে দিচ্ছে অপর দিকে তখন রাজনৈতিক নেতারা মহাসমারোহে সি, বি, এর অভিষেক অনুষ্ঠান করছেন। ঐ মুহুর্তেই আবার যারা সি,বি,এ, এর ক্ষমতাবলে অফিসে কাজ করেন না তাদের চিহ্নিত করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় নির্দেশ জারি করেন।

ঘটনা পরম্পরার প্রতি দৃষ্টি দিলে বিস্মিত হতে হয়। যারা অফিসের বড় কর্তাকে প্রহার করে রাজনীতির নেতারা তাদের সোহাগ করেন। এই-ই যাদের দৃষ্টি ভঙ্গি তারা কি করে দেশের আইন-শৃংখলার উন্নতি সাধন করবেন বা উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখবেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। যারা ইউনিয়নের দোহাই দিয়ে কাজ করে না তাদের চিহ্নিত করার পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কে?

অফিসের বড় সাহেব তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না। যদি করেন তবে তার লাঞ্ছনা ভোগ করার সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ। কর্মচারীটি বরখাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পুনর্বহালের জন্য মন্ত্রীর হুকুম আসবে আর কর্মচারীটি লাঠি নিয়ে হাজির হবে এবং বড় সাহেবের হাড় মজ্জায় লাঠির সোহাগ লাগিয়ে ছাড়বে। এমনটি আমাদের দেশে ঘটছে। ১৯৯৬ সনের শুরুর প্রাক্কালে খুলনায় ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি বস্ত্রকলের মালিক এক শ্রমিক নেতার দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। অমনি ঢাকা থেকে তাকে পুন বহালের জন্য মন্ত্রীর হুকুম গেল। তারপর? তারপর ঐ শ্রমিক নেতাটি মিল মালিককে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। কারখানা মালিকদের যে কি করে কারখানা চালাতে হয় ঐ মন্ত্রীরাতো তা জানেনা। কারণ তারাতো পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে না তারাতো চড়ুই পাখীর মত পরের ধনে পোদ্দারী করেন। তাই তাদের পক্ষে ঐ ধরনের হুকুম দেওয়া সম্ভব হয়।

যাই হোক। দি ইকনমিষ্ট পত্রিকা বলেছে রাজনীতি আমাদের গরীব করেছে। কিন্তু দারিদ্রতার প্রধান এবং প্রথম কারন হচ্ছে অজ্ঞানতা। রাজনীতি প্রথমে আমাদের অজ্ঞান করেছে পরে আমরা গরীব হয়েছি। একথাটি আমাদের ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক সত্য হওয়া সত্ত্বেও ইকনমিষ্ট পত্রিকা হয়তো শালীনতার খাতিরে বলতে সাহস করেনি।

রাজনীতির প্রভাবে কলে কারখানায় উৎপাদন ব্যহত হয়েছে, কারখানা বন্ধ হয়েছে, রাজনৈতিক কর্মীকে কারখানার কাজে নিয়োগ দিয়ে কারখানা প্রাঙ্গণ আন্দোলনমুখর করা হয়েছে, অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, দু'জন শ্রমিকের কাজের জন্য পাঁচ জনকে রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে অহেতুক ব্যয়ভার জনীত লোকসানের ঘানি টেনে টেনে চালু কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং হচ্ছে, আর ভবিষ্যতের শিল্পপতিরা পিছু হটে গেছে। এসব কিছুর জন্য যে আমাদের অজ্ঞানতাই দায়ী একথা বলাই বাহুল্য।

স্যাবোটেজ

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা এক কালের এই সোনার বাংলার অধিবাসী আমরা। অতি প্রাচীনকাল হতে সোনার বাংলার শ্যামল সম্পদ দূর-দূরান্তের ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, আরবী, আর্মেনীয় ইত্যাদি বহু দূর-দূরান্তের জাতিকে আকৃষ্ট করেছে তারা বাণিজ্যের নামে দলে দলে এদেশে এসে যুগযুগ ধরে সম্পদ লুটে নিয়েছে। আজ আমরা সেই ধনাঢ্য মানুষই দারিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম। এখন আমাদের একমাত্র উপায় শিল্পকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করা, কিন্তু আমাদের কোন প্রকার খনিজসম্পদ নেই, পুঁজি নেই প্রযুক্তি নেই। বার কোটি মানুষের ২৪ কোটি হাত এবং ২৪ কোটি পা আছে। সামান্য মূল্যে আমরা এই হাত পা ভাড়া দিতে পারি। সুতরাং বহুদিন হতেই আমরা বিদেশী পুঁজি প্রযুক্তি ও হাতিয়ার নির্ভর শিল্পখারখানা গড়ে তোলার আশায় সস্তা শ্রমের আশ্বাস দিয়ে ধনাঢ্য বিদেশীদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছি।

আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৪ সনের অক্টোবর মাসে মালয়েশিয়া সফরের শেষ পর্যায়ে ১২ই অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে কুয়ালালামপুরের হোটেল ইস্তামায় মালয়েশিয়ার জাতীয় শিল্প ও বণিক সমিতির আয়োজিত "বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও ব্যবসায় সুবিধা" শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতায় তিনি মালয়েশীয় উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহবান জানিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ পুরোপুরি নিরাপদ এবং অত্যন্ত লাভজনক। তিনি জানান, সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক সুযোগের অংশীদার হবার জন্য উদার ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ মালয়েশীয় উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

বিদেশীদের প্রতি এ ধরনের আহবান, বিদেশী পুঁজিপতি শিল্পপতিদের প্রতি এ ধরনের আমন্ত্রণ এই প্রথম নয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ৫ দিনের এক সফরে জাপান গিয়েও একই ধরনের আহবান আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন। ৩০ শে মার্চ ১৯৯৪ তারিখে টোকিও শিল্প ও বণিক সমিতির সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা সম্পর্কিত এক সেমিনারে ভাষণ দানকালে তিনি উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে জাপানের সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়ার বিষয়ে ইচ্ছা ব্যক্ত করে স্থিতিশীল বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে পুরাপুরি কাজে লাগাতে

তাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য জাপানের বিনিয়োগকারীরা তার আহবানে সাড়া দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী ১৪ই অক্টোবর মালয়েশিয়া হতে ফিরে এসেছেন। মালয়েশিয়ানদের তিনি যত খোশামোদ করে এসেছেন, তাতে সৌজন্যের খাতিরে হলেও কেউ না কেউ বিনিয়োগ পরিবেশ যাচাই করার জন্য অবশ্যই আসবে, এটা আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু ভয় হচ্ছে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার দূর্গ দখলের জন্য যে লড়াই, শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি দাওয়ার জন্য যে লড়াই দেশে হয়ে থাকে, আর লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে যে হরতাল আর ভাংচুর চালানো হয় তা দেখে আমার তো ভয় হচ্ছে, মালয়েশিয়ানরা এসে বিমান বন্দর হতে ফিরে যেতে বাধ্য না হয়। এমন ঘটনা আমাদের দেশে প্রায়শই ঘটছে।

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ শুক্রবার সকালের ফ্লাইটে কানাডার এক বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মি. জি. এ. মেখারী ভারত হয়ে ঢাকা এসে পৌছেন। বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা এবং পরিবেশ যাচাই করাই ছিল তার সফরের উদ্দেশ্য। তিনদিন এখানে থেকে তিনি সোমবার ১২ তারিখে বিকাল ৩টার ফ্লাইটে ফিরে যাবার রিটার্ন টিকেট নিয়ে এসেছিলেন।

শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। পরদিন শনিবার ১০ই এপ্রিল ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি থাকায় তিনি হোটেলের বাইরে যেতে সাহস করেননি। ভেবেছিলেন বরিবার ১১ই এপ্রিল সারাদিন এবং সোমবার ১২ই এপিল দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি তার সকল কাজ শেষে করবেন। কিন্তু শনিবারে হঠাৎ করেই রবিবার ও সোমবার হরতাল ডাকা হয়। শেষ পর্যন্ত কাজ-কর্মতো দূরের কথা সোমবার সকাল ৩টার বিমানে আরোহণ করাই তার জন্য দূরূহ হয়ে পড়ে। সুতরাং সোমবার সকাল ৬টার পূর্বেই তাকে এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাকতে হয়। ভদ্রলোক তার বাংলাদেশী সহযোগীর কাছে জানতে চান, এরকম ঘটনা বছরে কদিন ঘটে এবং সারাদেশে এক সাথে এই হরতাল চলে নাকি।

সহযোগী তাকে জানান যে এগুলো নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার এবং তা আবার এলেই তিনি দেখতে এবং বুঝতে পারবেন। আবার আসার কথাটার সাথে সাথে তিনি মাথা নেড়ে এমন ভাব দেখালেন যেন "না আর আসার দরকার হবে না"।

উপরে সন্দেহ প্রকাশ করেছি, হরতালের কারণে মালয়েশিয়ান কোন ট্রেড ডেলিগেশন এসে বিমান বন্দর হতেই ফিরে যেতে বাধ্য না হয়। আসলে শুধু

হরতালের কারণেই পরে যেতে হয় না। আজকাল সরকারী কর্মচারীরাও রাজনীতি করতে পারে এবং সরকারী কর্মচারী–কর্মকর্তারাও রাজনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িত। সন্দেহ হচ্ছে, এদের অনেকেই অফিসে বসে অন্ত র্ঘাতমূলক আচরণ দ্বারা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিরৎসাহিত করে বাংলাদেশকে প্রতিবেশী দেশের বাজারে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই নাশকতামূলক কাজের ধারা চলে আসছে স্বাধীনতার পর থেকেই এবং তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন–

১। একটি সাপ্তাহিকীর ৩রা নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশ, জিয়া আন্ত র্জাতিক বিমান বন্দরে আমাদের গার্মেন্টস সামগ্রীর দু'জন বিদেশী ক্রেতা দশটি নমুনা সাথে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের দেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অর্ডার দেয়ার জন্য কিন্তু বিমান বন্দর কাস্টমস ঐ নমুনা দশটির জন্য কাস্টম ডিউটি দাবী করে বসে। বিদেশী ক্রেতা জানালেন যে, এগুলি নমুনা হিসেবে আনা হয়েছে এবং কোন আইটেমই একটির বেশি নেই, যদি বল, তবে এগুলো এখানকার উৎপাদনকারীদের দেখিয়ে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া হবে। এর জন্য ডিউটি দিতে হবে কেন? কিন্তু কাষ্টমস কর্মকর্তাদের এক কথা ডিউটি দিতে হবে। বিদেশী ক্রেতা জানতে চাইলেন, এত অল্প জিনিসের জন্য ডিউটি দিতে হবে কেন? কিন্তু তারপরও কর্মকর্তার একই উত্তর, দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত কাস্টমস এর কর্তা হুকুম জারি করলেন, ডিউটি না দিয়ে নিতে হলে পাঁচটি নিয়ে যেতে পারেন আর পাঁচটি কাস্টমস–এর কাছে রেখে যেতে হবে। বিদেশী ক্রেতা লাউঞ্জে ফিরে এসে তার দেশের সাথে টেলিফোনে কথা বললেন এবং সাথে সাথেই ফিরতি ফ্লাইট কনফার্ম করে ফিরে চলে গেলেন। বাংলাদেশের পণ্য কেনার সাধ তাদের মিটে গেছে।

ঐ ঘটনাটি নাকি পত্রিকাটিকে বলেছেন প্রকৌশলী–ব্যবসায়ী– শিল্পপতি জনাব কামাল উদ্দিন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেছেন, "সচিবালয়ে যখন যাই তখন সহকারী সচিবটি আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন যেন আমরা নর্দমার কীট, এমন ভাব দেখান যেন নিউক্লিয়ার মেডিসিন থেকে শুরু করে সর্বশেষ কম্পিউটার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যন্ত সব কিছু তার নখদর্পণে। আমার ফাইলটি যে তিনি দয়া করে ধরেছেন, তার জন্য আমার সারা জীবন তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। খোজ নিলে হয়তো দেখা যাবে, তিনি হয়তো সমাজের কোন অক্ষম পরিবারের অক্ষম পিতার সন্তান কোন মতে বাংলায় একটা ডিগ্রী লাভ করেছিলেন।

যেহেতু তিনি আমলাতন্ত্র নামক প্রশাসন দানবের সদস্য হয়েছেন, সেহেতু তিনি হঠাৎ করেই সর্ববিদ্যার পারদর্শী এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে গেছেন।

২। ১৬ই নভেম্বর ১৯৯৩ মঙ্গলবার বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব নূরুল হক শিকদার দু'জন বিদেশীনী গার্মেন্টস সামগ্রীর খদ্দেরকে সাথে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌছেন। তিনি কাস্টমসকে জানান, তাদেরে সাথে নিষিদ্ধ বা শুল্ক আরোপযোগ্য কিছু নেই। তবুও বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বিদেশিনীদের ব্যাগেজ চেক করার জন্য গোঁ ধরেন। অবশেষে ব্যাগেজ তল্লাশী করতে দিতেই হল। কিন্তু ব্যাগজে তাদের ব্যাবহারের জিনিসপত্র ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না।

জনাব শিকদার একজন বড় মাপের গার্মেন্টস শিল্পপতি এবং একজন সিআইপি। বিদেশে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সামগ্রীর বাজার সম্প্রসারণের জন্য তিনি খোশামোদ করে বিদেশী খদ্দের ধরে নিয়ে আসেন। ঐ দুই বিদেশিনীও তেমনি খোশামোদ করে আনা গার্মেন্টস খদ্দের ছিলেন। তার চোখের সামনে সম্মানিত বিদেশিনীকে নাজেহাল হতে হল দেখে তিনি কাস্টমস কর্তাদের সাথে রূঢ় বাক্য বিনিময় করেন। সরকারী শক্তি বলে বলীয়ান কাস্টমস কর্তারা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জটলা সৃষ্টি করেন। জটলার ফাঁকে কাস্টমস–এর দু'জন সিপাহী এসে তাকে ঘুষি মারে, যার ফলে তাঁর চশমা ও একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। এ সময় একজন নিরাপত্তা কর্মী এসে জনাব সিকদারকে আরও কয়েকটি ঘুষি মারে এবং বুকে লাথি মেরে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে কাস্টমস অফিসে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখে।

এ সময় এ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর এসে ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েন আমলাতান্ত্রিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও মগজের শক্তির অভাবে তার পক্ষে সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভবতো হয়ইনি, বরঞ্চ তিনি থরথর করে কেঁপেছেন। মুহূর্তের মধ্যে এ সংবাদ পৌছে যায় জনাব সিকদারের কারখানায়। কারখানার শ্রমিক–কর্মচারী, কর্মকর্তা মিলে হাজারো মানুষ ছুটে আসে বিমান বন্দরে। দেখা গেল বিমান বন্দরের কাস্টমস কর্মচারী–কর্মকর্তাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী–গুণী, অনেক বেশি বেতনের কর্মচারী কর্মকর্তা রয়েছে জনাব সিকদারের কারখানায় যারা সংখ্যায়ও অনেক বেশি। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে জনাব সিকদারের কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা নেই আর কর্মচারীদের গায়ে সরকারী উর্দী নেই।

৩। ৩রা আগস্ট ১৯৯৪ তারিখে ওয়াং শিউ পিং পিউ নামের মালয়েশিয়ান এক মাল্টি বিলিয়নিয়ার মহিলা শিল্পপতি ঢাকা এসেছিলেন।

মালয়েশিয়ায় তার বহু শিল্প কারখানা রয়েছে এবং তার সম্পদের আনুমানিক মূল্য ছয়শত কোটি ডলার। তার কারখানায় নাকি শুধু বাংলাদেশেরই ৫০০০ শ্রমিক কাজ করে। পত্রিকার ভাষ্যমতে তার বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্য ছিল তিনটিঃ

ক) তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দু'জন বাংলাদেশী শ্রমিক মারা গেছে। সেই শ্রমিকদের পরিবারকে তিনি স্বহস্তে আর্থিক সাহায্য প্রদান করবেন এবং সে জন্য তিনি নগদ অর্থ সাথে নিয়েই এসেছেন। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, তিনি এক লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছেনও।

খ) বাংলাদেশ হতে আরও শ্রমিক তার কারখানায় কাজ করার জন্য মালয়েশিয়ায় নেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে সরকারের সাথে যোগাযোগ করা এবং

গ) বাংলাদেশে একটি টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সে ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

এ সব ব্যাপারে এদেশের শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা শেষে তিনি ৯ আগষ্ট দেশে ফিরে যাবার জন্য রাত ১১ টায় বিমান বন্দরে পৌছেন। ইমিগ্রেশনসহ সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে যখন তিনি হোল্ডিং লাউঞ্জে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সিকিউরিটির লোকজন তার দেহ তল্লাশীর জন্য চ্যালেঞ্জ করে। তিনি প্রকাশ করেন যে, তার কাছে ৬০ হাজার ডলার আছে যা তিনি এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত আইন জানেন না বলে বিনা ডিক্লারেশনে এনেছিলেন। তিনি সিআইপি (কমার্শিয়ালী ইমপর্টেন্ট) ব্যক্তি হিসেবে তার পরিচয়, ব্যবসায়িক এবং ভ্রমণের কাগজ-পত্র প্রদর্শন করেন। কিন্তু কার কথা কে শোনে। কর্মচারীরা তার দেহ তল্লাশী করে ডলারগুলিসহ কাস্টমস-এর হেফাজতে দিতে চাইলে কাস্টমওয়ালারা একজন সিআইপিকে এভাবে আটক করে রাখতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষে নিরাপত্তা কর্মীরা সারা রাত তাকে বিমান বন্দরে আটকে রাখে।

পরদিন সকালে মালয়েশীয় দুতাবাসে সংবাদ দিলে দুতাবাসের লোকজন এবং বাংলাদেশী সিআইপিরা বিমান বন্দরে ছুটে যান। তারপরও বিমান বন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে ব্যাপক বাকবিতন্ডা করতে হয়। কারণ, নিরাপত্তা কর্মীরা আমলাতান্ত্রিক শক্তিতে বলীয়ান, আর সিআইপিরাতো প্রজা। শেষ পর্যন্ত ওয়াং শিউপিং পিউকে দূতাবাস কর্মকতাদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার সাথের ৬০ হাজার ডলারের মধ্যে ২০ হাজার

ডলার পাওয়া যায়। সাংবাদিকদের সাথে বিমান বন্দরে আটকাবস্থায় পিউ বলেন, "এ অসভ্য দেশে আমি আর কোনদিন আসব না।"

প্রধানমন্ত্রী দেশ-বিদেশে ঘুরে শিল্পপতি ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছেন আর নিজের বাড়িতে এনে এমনিভাবে একের পর এক বেইজ্জতি করে ছেড়ে দিলে আর কি কেউ কোনদিন আসবে? ওয়াং শিউ পিং মালিক, যার কারখানায় ৫০০০ বাংলাদেশী কর্মী কাজ করে এবং যিনি আরও কর্মী নিতে এবং এদেশে কারখানা গড়তে এসেছেন তার মত একজন মানুষকে এয়ারপোর্টের চৌকিদার দারোয়ান ইনসপেক্টরদের হাতে এমনভাবে নাজেহাল হতে হল? তদ্বারা তিনি বুঝে নিয়েছেন যে, এ দেশটা অসভ্য মানুষের দেশ এবং এদেশে আর কোনদিন আসা উচিৎ হবে না।

আমরা জানি আমাদের এয়ারপোর্টটা চোর, চামার টাউট বাটপারে ভরা, আমরা জানি আমাদের এয়ারপোর্টে বহু অসৎ ও অমার্জিত আচরণের কর্মচারী আছে। তারপরও একজন ভিআইপি বা সিআইপিকে...এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সঙ্গ দেয়ার মত কোন ব্যবস্থাও এদেশে নেই? শুধু দাওয়াত দিয়ে দেশে আনলেই হল? ইসলামে যেকোন মেহমান যাওয়ার সময় তাকে নিজ বাড়ির সীমানা পার করে দেয়ার যে বিধান আছে সেটুকুও কি আমরা পালন করবো না?

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট গল্প মনে পড়ে গেল। এক শিল্পপতির শিল্প দ্রব্যের সবটুকু মিঃ জেমস নামের এক খদ্দের খরিদ করে নিয়ে যান। প্রতি চালানে কয়েক কোটি টাকার মালামাল মিঃ জেমস নিয়ে থাকেন। একবার মিঃ জেমসের চিঠি আসতে দেরী হওয়ায় কয়েক কোটি টাকার মাল...গুদামে জমা হয়ে পড়ে। খদ্দের দেশের বাইরে থাকায় তার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হচ্ছে না বলে শিল্পপতি মহা ফাপরে পড়ে যান। একদিকে স্থান সংকুলান অপরদিকে আর্থিক চিন্তা ইত্যাদি নিয়ে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত শিল্পপতি একদিন তার পিএকে ডেকে বললেন, আমি বড় ক্লান্ত, আজ আর কারও সাথে দেখা করব না। কাউকে আমার রুমে পাঠাবেন না।

এদিকে মিঃ জেমস দেশ-দেশান্তর ঘুরে সেদিন শিল্পপতির শহরে হাজির। তিনি ভাবলেন এ পথে যখন এসেই গেছি তখন শিল্পপতির সাথে দেখা করে মালামালের অর্ডার দিয়ে যাবেন আর চেকের মাধ্যমে মূল্যটাও দিয়ে যাবেন। কিন্তু বাধ সাধল শিল্পপতির পিএ। মিঃ জেমস যতই বলেন, তিনি খুব জরুরী কাজে এসেছেন, দেখা করা দরকার, ততই পিএ বলে না দেখা করার অর্ডার নেই, আপনাকে ঢুকতে দিলে আমার চাকরি যাবে। ওদিকে মিঃ জেমসের প্লেনের সময় হয়ে গেছে। তিনি সোজা এয়ারপোর্টে

চলে গেলেন্ যাবার সময় পিএকে বলে গেলেন ওনি উঠলে আমার কথা বলবেন।

বিকেল বেলায় শিল্পপতি তার রুম হতে বের হলে পিএ মিঃ জেমসের কথা বললো। সব কথা শোনার পূর্বেই তিনি হায় হায় করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। বসে বসে একখানা বরখাস্ত পত্র লিখে পিএর হাতে দিয়ে আবার রুমে ঢুকে শুয়ে পড়েন। যে প্রতিষ্ঠানের চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন সেই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের খবর যে কর্মচারী রাখে না, সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার উপযুক্ততা তার থাকতে পারে না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী যতই বিদেশে গিয়ে বিনিয়োগ কারীদের দাওয়াত দিয়ে আনুন না কেন, তাদের জন্য এ দেশটাতে প্রবেশ করতে গিয়ে ঐ ব্যবসায়ীর পিএর মত বহুজনের মুখোমুখি হতে হবে এবং উল্লিখিত জনাব নূরুল হক শিকদার এবং ওয়াং শিউ পিং পিউ–এর মত অবস্থা অনেকেরই হতে পারে। এমনকি তাদের এয়ারপোর্ট হতেই ফিরে যেতে হতে পারে। কারণ এয়ারপোর্টের শুল্ক কর্মকর্তারা পূর্বোল্লিখিত শিল্পপতির পিএর মত সরকারী আমলাতান্ত্রিক সংস্করণ। সরকার তাদের বলেছেন শুল্ক আদায় করতে সুতরাং তারা শুল্ক ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এরা সন্ত্রাসী ক্রীয়াকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পরীক্ষা পাশ করেছে এবং চাকরিও পেয়েছে। জ্ঞান চর্চার সময় সুযোগ হয়নি বলে এরা চাকরীর ক্ষেত্রকেও সন্ত্রাসের ক্ষেত্র বলে মনে করে। এরা দেশ জাতি ও অর্থনীতির কিছুই বুঝে না। আর এরাই এখন সরকারী দফতরের বড় বড় আমলা শুধু বিদেশী কেন, দেশী জ্ঞানী গুণী, প্রযুক্তিবিদ এবং বিনিয়োগকারীদেরও এসব আমলাদের হাতে নাজেহাল হতে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আখতার–উল আলম (লুদ্ধক) সাহেবের বর্ণিত কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ে। ঘটনাগুলি তিনি ইত্তেফাকের ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালের স্থান কাল পাত্র কলামে লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে।

তিনি ১৯৮৪ সালে সাউদী আরব সফরে গিয়ে সুবিখ্যাত ফয়সল হাসপাতালে এক বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ পান। ঐ বিশেষজ্ঞটিকে সউদী সরকার পাশ্চত্যের এক হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। হাসপাতাল কমপ্লেক্সটি পরিদর্শনকালে সেখানাকার সউদী আমলাটি বার বার আখতার–উল– আলম সাহেবকে বলছিলেনঃ বাংলাদেশের এই বিশেষজ্ঞটির জন্য তারা গর্বিত।

এমনি ধরণের একজন বিশেষজ্ঞ নিজ দেশে বাংলাদেশের আমলাদের কাছে কি ধরণের ব্যবহার পান তা বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি দুঃখপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তারই দু'একটি উল্লেখ করছি।

তিনি লিখেছেন, দেশের খেদমতের জন্য সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে তেমনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক দেশের খেদমত করার জন্য বিদেশ থেকে নিজ দেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি এসেই তদানিন্তন রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তার ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

তারপর শুরু হল চিকিৎসক ভগ্রলোকের দৌড় ঝাঁপ। সহকারী সচিব থেকে সচিব আবার সচিব থেকে যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সহকারী সচিব করতে করতে তিনি পেরেশান হয়ে পড়েন তবুও তিনি শেষ চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ হাজার হলেও নিজের দেশতো কিন্তু বিপত্তিটা ঘটল তখন, যখন স্বাস্থ্য দফতরের একজন উচ্চপস্থ কর্মকর্তা একদিন তাকে এই মর্মে চার্জ করে বসলেন যে, যেহেতু ভদ্রলোকের এমবিবিএস ডিগ্রী নেই সেহেতু তিনি যে আদৌ চিকিৎসক, সেটা আমলাটি মেনে নিতে পারছেন না। এরপর ঐ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসকের জন্য এদেশে থাকা নিরাপদ হওয়ার কথা নয়। তাকে গ্রেফতার করিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। তেমনি ঘটনা ঘটেছেও। সুতরাং তিনি ফিরতি টিকেট কেটে দেশ ছেড়ে আত্মসম্মান রক্ষা করেন।

এদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করা কর্মসংস্থান করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য ও আদর্শ বুকে নিয়ে এক ভদ্রলোক প্রবাস থেকে যথেষ্ট টাকা পয়সা নিয়ে দেশে এসেছিলেন কারখানা স্থাপনের জন্য। প্রথমেই তিনি থাকার জন্য একটা বাড়ি খরিদ করলেন। তার পর শুরু করলেন ঘোরাঘুরি। অফিস টু অফিস, আমলা টু আমলা ছোটাছুটি করে শরীরের ঘাম ঝরালেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। পরে যখন আমলারা বুঝতে পারল যে, লোকটার হাতে প্রচুর টাকা আছে, তখন শুরু হল ভিন্ন ধরনের প্রেসার। কিন্তু ভদ্রলোকটির কোন ঠ্যাকা নেই। বিদেশে তার মুনাফা অর্জন করার মত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শুধু দেশের ভালোর জন্য তার দেশে আসা। দেশ যদি না চায় তবে তিনি বিদেশে ফিরে যাবেন, তবুও কাউকে ঘুষ দেবেন না।

শেষ পর্যন্ত আমলারা যখন দেখল লোকটা বড় ত্যাদড়, কোন পয়সাই খরচ করতে চায় না, তখন তার নগদ টাকায় খরিদ করা বাড়িটাকে কারসাজি করে এ্যবান্ডন্ড প্রপার্টিতে পরিণত করে ফেলল। এমন ঘটনা একটি দুটি নয়,

দিনের পর দিন এমন ঘটনা বহু ঘটে চলেছে। যে কারণে বাংলাদেশে বহু কোটিপতি থাকা সত্ত্বেও কোটিপতিরা কোন শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসতে সাহস করেন না। আর একারনেই বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এদেশে এসেই প্রশ্ন তোলে, তোমরা নিজেরা কোন বিনিয়োগ করছ না কেন? আমাদের আনতে হলে আগে তোমরা নিজেরা বিনিয়োগ কর, পরে তোমাদের নিরাপত্তা দেখে আমরা আসব কিন্তু দেশী বিনিয়োগকারীরা শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরী করে সরকারী অনুমোদনের জন্য আমলাদের সামনে হাজির হওয়া মাত্রইতো বেচারা পুঁজিপতির উপর মানসিক পীড়ন শুরু হয় যা উপরে বলেছি।

বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং খদ্দেররা বিমান বন্দরে পৌছা মাত্রই শুরু হয় আমলাদের অত্যাচার যা আমরা এতক্ষণ উপরে আলোচনা করেছি্ সব কিছু দেখে শুনে মনে হয় যেন আমাদের অফিসে আদালতে এমন সব কর্মচারী কর্মকর্তা কাজ করছে যাদের অশিক্ষা কুশিক্ষার কারণে উদ্দেশ্য বিধেয় বুঝে কাজ করার ক্ষমতা লাভ হয়নি। অথবা গাদ্দারী মানসিকতার কারণে তারা ইচ্ছে করেই আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নস্যাত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্যাবোটেজ করার জন্য আমাদের বিদেশী খদ্দের এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এয়ারপোর্টে পৌছার সাথে সাথেই অসভ্য ব্যবহার দ্বারা নিরুৎসাহিত করে দেয়।

হরতাল ও শুকনা হাড্ডি

ইশপস–এর বিখ্যাত ব্যাঙের গল্প সবারই জানা আছে। কুয়ায় কতগুলি ব্যাঙ ছিল। পথিক ছেলেরা দেখতে পেয়ে ব্যাঙের উপর ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। ব্যাঙেরা চিৎকার দিয়ে বললঃ ওহে ছেলেরা আমরাতো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি তবুও তোমরা আমাদের উপর ঢিল ছুঁড়ছ কেন।

ছেলেরা বললঃ আমরা তো খেলা করছি,

ব্যাঙেরা বলল তোমাদের কাছে যেটা খেলা আমাদের জন্য যে সেটা মরণ।

আসলে ছেলেগুলি ভাল কোন খেলা জানতনা। কতইতো খেলা আছে কানামাছি, গোল্লাছুট, লুকোচুরি ইত্যাদি খেলাগুলো সম্পর্কে ছেলেগুলির ধারনা ছিলনা বলেই তারা খারাপ খেলা খেলতে শুরু করেছেল, যে খেলায় ব্যাঙের প্রাণ যাচ্ছিল।

আমাদের দেশের রাজনীতিকদের অবস্থাও সেই দুষ্ট ছেলেদের মত। রাজনীতির কোনচালই জানেনা বলে তারা রাজনীতির নামে করে শুধু হরতাল, ভাঙ্গচুর শোভাযাত্রা। যে দল যত বেশি হরতাল শোভাযাত্রা করতে পারে, আর যত বেশি করে গরীবের রিকশা আর ধনীর গাড়ী ভাঙতে পারে, যে দলের ডাকে যত বড় জঙ্গী মিছিল হবে, গোলাগুলি হবে, লাশ পড়বে সেই দল তত সফল দল বলে নিজেকে মনে করে। যে মানুষের জন্য রাজনীতি, রাজনৈতিক দলগুলির ঢিলাঢিলি খেলায় যদি সেই মানুষই মারা পড়ল তবে সেটা কিসের রাজনীতি? যে রাজনীতিতে হরতাল অবরোধ ঘেরাও দ্বারা কল–কারখানা ধ্বংস করে দিয়ে মানুষকে বেকার করে দেয়া হয়, মানুষের রুজি রোজগার তথা মুখের অন্নের উৎস বন্ধ করে দেয়া হয় সেটা কিসের রাজনীতি? অথচ রাজনীতিকরা হরতাল দ্বারা সর্বদাই সে কাজটি করে চলেছে। আর বলছে "আমরাতো ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছি।"

রাস্তার পাশে কুকুরের হাড়ি চিবানোর দৃশ্য অতি সাধারণ দৃশ্য। এই দৃশ্য কারু মনোযোগ আকর্ষণ করার মত নয় বা এ নিয়ে কেউ কোন চিন্তাও করেনা। কিন্তু যখন দেখা যায় কুকুরটা অতি পুরাতন একটা হাড্ডি সারা শরীরের শক্তি দিয়ে অতি আগ্রহের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে কামড়াচ্ছে, তখন তাতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক থাকে। কারণ যে হাড্ডিটা সে কামড়াচ্ছে সেটা হয়তো বহু বছরের পুরানো শুকনো হাড্ডি। তাতে রক্ত, গোস্ত মজ্জা তো

দূরের কথা সামান্য রসও নেই। তবুও কুকুরটা চোয়ালের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাড্ডিটা কামড়ায় কিন্তু কেন?

কুকুর যখন সর্বশক্তি দিয়ে অতি পুরাতন শুকনো হাড্ডি কামড়াতে থাকে, তখন হাড্ডিটির তীক্ষ্ণ খোচায় একসময় তার গাল কেটে হাড্ডটিতে একটু রক্ত লাগে। তা দেখে কুকুরটা উৎফুল্ল হয়ে উঠে সে মনে করে তার চেষ্টা সফল হচ্ছে! আর কিছুক্ষণ চেষ্ট করলে নিশ্চয় গোস্ত মজ্জা বের হতে আরম্ভ করবে। সুতরাং সে জান প্রান দিয়ে হাড্ডিটাকে আরও জোরে কামড়াতে থাকে। তাতে তার নিজেরই গাল কেটে আরও বেশি রক্ত বের হতে থাকে। সে নির্বোধ জানোয়ার। সে বুঝতেই পারে না যে তার নিজের গাল কেটে রক্তক্ষয় হচ্ছে।

কুকুরের পুরানো হাড্ডির মত হরতালও একটি অতি পুরানো এবং আত্মঘাতি পদ্ধতি প্রতিদিনের হরতালে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়। ঐ লোকসান দেখে রাজনীতিকরা উৎফুল্ল হন, পরস্পর পরস্পরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নেতারা দেশবাসীকে হরতাল সফল করার জন্য খুশীতে টগবগ হয়ে ধন্যবাদ জানান। কুকুর পুরানো হাড্ডি কামড়াতে গিয়ে নিজের গালের রক্ত দেখে সফল হয়েছে বলে আনন্দে আটখানা হয়, আর আমাদের রাজনীতিকরা ইংরেজ আমলের পুরানো হরতাল দ্বারা দেশের হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে দেখে, রাস্তার মিছিলে স্বজাতির সাথে স্বজাতির লাঠালাঠি, ঢিলা-ঢিলিতে, গোলাগুলিতে স্বজনের রক্ত ঝরেছে দেখে, মানুষ খুন হয়েছে দেখে সফলতার আনন্দে উৎফুল্ল হন।

প্রতিটি হরতালের পরপরই সরকারের তরফ থেকে বলা হয় অফিস আদালত, হাট বাজার স্বাভাবিক ছিল, গাড়িঘোড়া বেশীর ভাগই চলেছে, কল-কারখানার কাজকর্ম স্বাভাবিক ছিল। আর বিরোধী দল দাবি করে অফিস আদালতে কোন কাজকর্ম হয়নি। কল-কারখানা, হাটবাজার বন্ধ ছিল, গাড়ী-ঘোড়া চলেনি। অত জন নিহত হয়েছে বা অত জন আহত হয়েছে। অর্থাৎ লোকসান হয়েছে, রক্ত ঝরেছে কাজেই হরতাল সফল হয়েছে। এদের মধ্যে আবার কিছু ফতোয়াবাজ রাজনীতিজীবী আছে যারা নিহতদের শহীদ আখ্যা দিয়ে নাম প্রকাশ করেন ভাবটা এমন যেন তাদের কাছে বেহেশতের টিকেট আছে। যারা হরতাল সফল করার জন্য নিজের জান দেবে তাদেরে রাজনীতিকরা সরাসরি শহীদের দরজা দিয়ে বেহেশতের গাড়িতে তুলে দেবেন।

হরতালের ইতিকথা

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী যখন পৃথিবীর সর্বত্র আঘাতের পর আঘাত হেনে বৃটিশের অবস্থা দুর্বিষহ করে তুলেছিল, ভারতীয়রা তখন কাবুল,

বাটাভিয়া, ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র স্থাপন করে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা জোরদার করতে শুরু করে। এসময় ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি ইংরেজ এবং তাদের এদেশীয় দোসর দালালরা বোমার আঘাত, রিভলবারের গুলি ইত্যাদির ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

জার্মানীর সাথে যুদ্ধ অপরদিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের হুমকির মুখে বিপর্যস্ত ইংরেজ সরকার নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতীয়দের শুধু শান্ত করাই নয় বরঞ্চ যুদ্ধেও তাদের সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করেছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে ইংরেজ সরকার নতুন মূর্তি ধারণ করে। তারা সকল প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমনের জন্য যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থাগুলোকে স্থায়ী আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা আইনজীবী মিঃ রোলটের সভাপতিত্বে এজন্য তারা একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রৌলট বিল নামে অভিহিত একটি কালো আইন উত্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাউকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়, কাউকে দ্বিপান্তরে পাঠানো হয়, কাউকে জেলে পুরে রাখা হয়।

এমতাবস্থায় রৌলট বিলটি উত্থাপিত হলে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ বেশ কিছু ভারতীয় সদস্য গর্জে উঠেন। বৈঠকে, মজলিশে, জনসভায় দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় ঐ বিলের সমালোচনা করলেন, বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। সরকারী সদস্যদের ভোটের জোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পন্ডিত মদন মোহন মালব্যসহ আরও কিছু নেতা সদস্যপদ হতে ইসতফা দিয়ে ঐ আইনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের চেষ্টায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাতেও ইংরেজী শাসকদের মধ্যে সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হলনা। বরঞ্চ নেতাদের আস্ফালন মোকাবিলার জন্য তারা আরও নতুন নতুন দমনমূলক আইন প্রবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে সারা ভারতে হরতাল পালন করার জন্য মহাত্মা গান্ধী এক আবেদন প্রচার করেন।

হরতার সম্পর্কে তখনও মানুষের ধারণা অস্পষ্ট। কিন্তু যেহেতু মিঃ গান্ধী ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণাশ্রয়ী শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে সফল হয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর হরতাল আহবান যে জনসাধারনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এটা অনুমিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৬ই এপ্রিল সারা ভারতের সর্বত্র নিরুপদ্রব পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্ণর মাইকেল ওডায়ার এই হরতালের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের পূর্বাভাষ আবিষ্কার করলেন। তিনি ৯ই এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে পাঞ্জাবের দু'জন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ডাঃ সাইফ উদ্দিন কিচলু এবং ডাঃ সত্য পালকে বিনা কারণে গ্রেফতার করে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেন। বাজারে গুজব রটে গেল বৃটিশ সরকার তাদের ফাঁসি দিতে নিয়ে গেছে। সুতরাং তাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে পরদিবস পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর এবং অমৃতসরে আবার সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং অপরাহ্নে নেতৃবর্গের মুক্তির দাবীতে অমৃতসরে এক বিরাট মিছিল বের হয়। পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ক্ষিপ্ত জনতা গুলির ভয় অগ্রাহ্য করে ইংরেজদের কয়েকজনকে হত্যা করে এবং কয়েকটি সরকারী অফিসে ও বিদেশী ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ করে।

দানবের উল্টাবুদ্ধি

১৯১৯ সালে হরতালের অস্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের জানমাল বিপন্ন করে, তাদের উত্যক্ত করে এদেশ থেকে বিতাড়ণ করার জন্য। ইংরেজের পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা ইংরেজ হত্যা করেছিল, ইংরেজের অফিস এবং ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ করেছিল। এর ফলে হরতাল সম্পর্কে ইংরেজদের মধ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। এমনি করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়েছিল।

বৃটিশ শাসন হতে স্বাধীন হওয়ার পর আমরা বাংলাদেশীদের আবার হরতালের অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়েছিল পাকিস্তানি শাসন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য। আমাদের সেই উদ্দেশ্যও সাধিত হয়েছে কিন্তু হরতাল করার যে অভ্যাস ১৯১৯ সাল হতে চলে আসছিল এবং ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে মজ্জাগত হয়েছে, সে অভ্যাস আমরা এখনও ভুলতে পারিনি। তাই যে অস্ত্র দিয়ে একসময় বৃটিশকে ভয় দেখিয়েছি, লোকসান করেছি, যে হরতালের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বৃটিশকে হত্যা করেছি এবং পরিণতিতে তারা এদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে সেই হরতালই আমরা এখন প্রয়োগ করছি নিজের দেশের উপর নিজের মানুষের উপর। হরতালের হট্টগোল সৃষ্টি করে আমরা নিজের দেশবাসীকে হত্যা করছি। দেশবাসীর সহায়সম্পদ ধ্বংস করছি এই ধ্বংস ও জীবনের ভয়ে ইংরেজরা, এদেশ ছেড়ে পালিয়ে বেচেছিল রাজনীতিকরা কি চান যে এদেশের মানুষ সবাই এদেশ ছেড়ে চলে যাক বা সবাই মরে যাক। নইলে হরতালের নামে দেশের মানুষকে মারা হয় কেন, দেশের অর্থনৈতিক

ক্ষতি করে দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি করা হয় কেন? রাজনীতির নামে ঐসব দুষ্কর্মগুলি অবশ্যই দানবীয় কাজ। যে রাজনীতি দ্বারা দেশ গড়ার কথা, দানবের উল্টা বুদ্ধির মত সেই রাজনীতি এখন দেশ ধ্বংসের কাজে মানুষ মামার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আসলে রাজনীতিজীবীরা ইংরেজ খেদা হরতালের অনুকরণে হরতাল ডেকে হরতালের নামে সেই শুকনো হাড্ডি চিবাচ্ছেন। কঙ্কালসার অনাহারক্লিষ্ট টোকাইরা হরতালের নামে যখন রাস্তায় গাড়ি ভাঙ্গে দোকান পাট লুট করে, গরীব ফেরিওয়ালার চাঙ্গারি লুট করে, রাস্তায় ঢিলাঢিলি করে রক্ত ঝরায় তখন রাজনীতিকরা মনে করেন রক্ত যখন বের হয়েছে এইতো হরতাল সফল হল বলে। তারা আরও জোরদার হরতাল ঘোষণা করেন, গোলাগুলির প্ররোচনা সৃষ্টি করেন যাতে লাশ পাওয়া যায়। জোরে জোরে পুরানো হাড্ডি চিবিয়ে কুকুর যেমন আশা করে এই মাংস মজ্জা বের হল বলে, রাজনীতিকরাও তেমনি হরতালকে ১২ ঘন্টা, ৩৬ঘন্টা ৪৮ ঘন্টা, ৭২ ঘন্টায় জোরদার করেন। তাতে রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ফেরিওয়ালা যখন না খেয়ে মরে, ছোট বড় কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষ যখন বেকার হয়ে হা-অন্ন করে ছুটে, তখন রাজনীতিকেরা বলেন, তাদের হরতাল সফল হয়েছে।

ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকেরা দানবীয় পন্থায় দেশ ধ্বংস করে ক্ষমতা চাচ্ছেন। লক্ষ্যণীয় যে, মিঃ গান্ধী আহূত হরতাল উপলক্ষ্য করে কোন স্বদেশীকে জানে প্রাণে হত্যা করা হয়নি বা সম্পদ ভাংচুর বা তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়নি। . পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে জনতা ইংরেজকে হত্যা করেছে, ইংরেজের ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ করেছে কিন্তু এখন স্বজাতি স্বদেশীর গুলিতে স্বজাতি স্বদেশী নিহত হয়, পুলিশ গুলি না চালালে নিজেরা গুলি করে, নিজেদের লোককে হত্যা করে, নিজেদের গাড়ী ভাঙো সম্পদ নষ্ট করে এবং তদ্বারা হরতাল সফল করে।

নতুন কিছু কর

গণতন্ত্রে ক্ষমতা হচ্ছে অমৃত ফলের গাছের মত। সবই এর দখল লাভ করতে চায়। এর ফলে যে দ্বন্দ সৃষ্টি হয় তারই নাম রাজনীতি। এদেশের মানুষ স্ত্রীর সাধের গয়না বিক্রি করে, সন্তানের ধানের জমি বিক্রি করে ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ায়। নির্বাচনে পরাজিত হলে বিজয়ীর বিরুদ্ধে হরতাল করে। নির্বাচনের জন্য জমি বিক্রি করে এরা যেমন তাদের অন্ন সংস্থানের পথ বন্ধ করে, তেমনি হরতাল দ্বারা কল-কারখানায় লাল বাতি

জ্বালিয়ে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে আর দেশের মানুষের চাকুরি সংস্থানের পথ বন্ধ করে দেয়। এটাই তাদের হরতাল সফল করার নমুনা।

প্রতিভাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে নতুন কিছু উদ্বাবন করার, নতুন কিছু করার বা নতুন কিছু বলার মত সৃজনশীলতা থাকে না বলে তারা অভিনেতার ঢঙে পোশাক পরে, নেতার ঢঙে কথা বলে, সাহেবের ঢঙে খায়, চালচলনে শিক্ষক, মন্ত্রীদের অনুকরণ করে। আমাদের দেশের রাজনীতিকদেরও নতুন কিছু করার মত প্রজ্ঞা প্রতিভা না থাকায় তারা আধাশতাব্দি পূর্বে প্রয়াত মিঃ গান্ধীর অনুকরণে আন্দোলন করেন। মিঃ গান্ধী পৌনে এক শতাব্দি পূর্বে ইংরেজ খেদানোর জন্য হরতাল নামের এক অস্ত্র উদ্বাবন করেছিলেন এবং তা ব্যবহৃত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে। আর আমাদের রাজনীতিকরা সেই হরতালকে ব্যবহার করেন স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হিসেবে। আর তা করতে গিয়ে স্বদেশী স্বজাতির জানমাল ধ্বংস করেন, দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেন, দেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেন, মানুষের ভবিষ্যত নষ্ট করেন।

মিঃ গান্ধী যে আমলের মানুষ ছিলেন সেই আমলে যারা রাজনীতি করতেন তারা নিজের খেয়ে, এক ভয়ানক বৈরী পরিস্থিতিতে নিজ প্রতিভা সম্বল করে রাজনীতি করতেন। একারণে তারা ছিলেন রাজনীতিবিদ। তাদের ক্ষমতার লোভ ছিল না। তারা জানবাজি রেখে দেশবাসীর জান মাল রক্ষার জন্য আন্দোলন করতেন, শেষ পর্যন্ত ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতেন।

আজকাল যারা রাজনীতি করেন তারা বাগাড়ম্বর সম্বল করে, ক্ষমতার লোভে পরের খেয়ে পরের টাকায় নিজের নামে রাজনীতি করেন। একারণে তারা রাজনীতিবিদ হতে পারেননি তারা হয়েছেন রাজনীতিজীবী। তারা জনসাধারণের জান মালের মূল্যে হরতাল সফল করেন ক্ষমতা দখলের জন্য। এমনি করে তারা বংশ পরম্পরায় পরের ধনে পোদ্দারী করে থাকেন।

জনসাধারণ এখন রাজনীতিবিদ এবং রাজনীতিজীবীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখেছে। বাংলাদেশে ইংরেজের শাসন নেই। তবু ইংরেজ খেদা হরতাল কেন পালন করা হয়। এটা জনসাধারণ এখন ভাল করেই জানে। সুতরাং আত্মরক্ষা করে রাজনীতি করতে হলে রাজনীতিকদের নতুন একটা কিছু করতে হবে এবং তা এমন একটা কিছু হতে হবে যাতে তাদের দাবীও আদায় হয় অথচ জনসাধারণের সামান্যতম ভোগান্তিও না হয়।

ব্যুরুক্র্যাটিক

নোটিশতো নয়, যেন একাত্তরের হানাদার বাহিনীর গুলীবৃষ্টি। দিনের পর দিন মাসের পর মাস আসছে আর আসছে। কখনও পৌরকর বৃদ্ধি, কখনও পানির মূল্য বৃদ্ধি, কখনও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, কখনও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, বৃদ্ধি আর বৃদ্ধি। যেহাদ আলীর কাছে ওসব এখন সৎ মায়ের চিমটির মত গা সওয়া হয়ে গেছে।

দোকানে আজ দুপুরে যে নোটিশখানা পেয়েছে, দেখি দেখি করেও এই সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানা দেখার গরজ করেনি। অন্যসব নোটিশ কর্মচারীরা হাতে করে নিয়ে আসে, ধমক ঠমকের গরম দেখায়, দু'চার টাকা বখশীশ আদায় করে সালাম ঠুকে চলে যায় কিন্তু আজকের বাহকটি নোটিশখানা রেখেই চলে গেছে। নতুন লোক হবে হয়তো অথবা বোকা, তাই দর্শনী দাবী করেনি।

আকাশের অবস্থা ভাল নয়। তাই যেহাদ আলী আজ সকাল সকাল দোকান বন্ধ করতে লেগেছে। গতকাল একবার বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি যেতে হয়েছে। শুধু ভেজাই নয়। রাস্তায় বাতি ছিল না। অন্ধাকারে ভাঙ্গা রাস্তার খাদে পড়ে এক হাটু কাদা বয়ে যখন বাড়ি পৌছেছিল তখন বউ জমীলা খাতুন 'দুর দুর' করে তাকে স্বাগত করেছিল। কারণ যেহাদ আলীর হাঁটু পর্যন্ত ভরা ছিল বিষ্ঠা, মানে মানুষের 'গু'.. তাজা হলুদ রঙের 'গু'। রাস্তায় বিষ্ঠার লাইন উপচে গিয়ে মানুষের তাজা গুতে রাস্তা সয়লার হয়ে গেছিল। বাইরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে গোসল সেরে ঘরে উঠেই পেয়েছিল পৌর করের বৃদ্ধি নোটিশ। শুধু বৃদ্ধি নয়, তিন-চার গুণ বৃদ্ধি।

দোকানের জানালাগুলো বন্ধ করে বের হবার মুহূর্তে যেহাদ আলী আজকের নোটিশখানা টেনে বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। বিদ্যুৎ অফিস হতে এসেছে। এখন তবে বাণিজ্যিক রেটে বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে। ওই রেটটাও নাকি আবার তিন চারগুণ বেশি। যা একখানা সেলুন, সারাদিনে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে দু'জনে মিলে ভাঙ্গা চেয়ারে খদ্দের বসিয়ে ক'টাই বা মাথার চুল ছাটে আর ক'টাই বা মুখের দাড়ি কাটে। তার আবার বাণিজ্যিক রেট।

ভাবতে ভাবতে যেহাদ আলী রাস্তায় বেরিয়ে আসে। আজ রাস্তায় বাতি আছে কিন্তু আকাশ যেন আর মেঘের ভার সইতে পারছে না। তাড়াহুড়া করে

যেহাদ আলী বাড়ি পৌছে কিন্তু হায় বাড়িতে বাতি নেই। এ এক রসের বাতি। যেদিন রাস্তায় থাকে সেদিন ঘরে থাকে না, যেদিন ঘরে থাকে সেদিন রাস্তায় না। রেডিওতে খবর শুনার সময় হলে বিদ্যুৎ চলে যায়, খবর শেষ হলে আবার আসে। রাত্রে খাবার সময় হলে বিদ্যুৎ চলে যায় খাওয়া শেষ হলে পর সোবার সময় আবার আসে। এ যেন মদখোর মাতাল পিতা মাতার বখে যাওয়া সন্তানের মত, যখন খুশী তখন যাওয়া আবার যখন খুশী তখন আসা। যেহাদ আলীর মনে পড়ে আজকালকার গণতন্ত্রের আমলারাওতো নিজের দফতর ফেলে যখন তখন রাজনৈতিক দলের মিটিং-এ চলে যায় আর ফাইলগুলি লাল ফিতাবন্ধী হয়ে মরণ যন্ত্রণায় কাতরায়। বাবা-মা নিজ সন্ত ানের প্রতি মনযোগী না হয়ে ঘর সংসার ফেলে যদি সমাজ সেবায় যেতে থাকেন তবে তার সন্তানকে পথে আনবে কে? মানুষ করবে কে? তেমনি আমলারা নিজ দফতরে কাজ ফেলে যদি রাজপথের রাজনীতির প্রতি মনযোগী হন তবে ঐ রসের বাতির রসিকতা বন্ধ হবে কেমন করে।

দিনান্তের ক্লান্ত শরীরটাকে যেহাদ আলী বারান্দার মোড়াটির উপর ফেলে রেখে বাতির অপেক্ষা করতে থাকে।

আগে কেরোসিনের কুপি জ্বালাতাম, নিজের ইচ্ছামত জ্বালাতাম, নিভাতাম। টিউবয়েল ছিল, নিজের ইচ্ছামত পানি ব্যবহার করতাম। কোন কিছুর জন্য কোন ব্যাটার তোয়াক্কা করতাম না। আর আজ আলোর জন্য, পানির জন্য পরের মেহেরবানী ভিক্ষে করতে হয়। আলো পানি আসুক না আসুক, দু'চার মাস পর পর বিল ঠিকই আসবে। আবার পাঁচ সাত দিনের সময় বেঁধে দেবে। ঐ সময়ের মধ্যে শোধ না করলে জরিমানা হবে; সারচার্জ হবে। দু'একখানা বিল শোধ না হলে লাইন কাটা যাবে বলে ধমক দিবে...যেন বাবার কালের জমিদারী। বলি, এই যে সাপ্লাই থাকে না, এ যে মাসের বিল মাসে আসে না তার জন্য সারচার্জ হতে পারে না? আমাদের বিল প্রদানের দেরীর জন্য ওরা লাইন কাটতে আসে, ওদের বিল তৈরির দেরির জন্য কেউ ওদের মার্থা কাটতে যায় কি?

জমীলা খাতুন ফোঁস ফোঁস করে কথাগুলো শেষ করে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে, রাত আটটা বাজে, খেয়াল আছে? আগে তো সন্ধাবাতি দিতে একটুদেরী হলে, ঘরে এসে বালতিতে পানি না পেলে বউ ঠেঙাতে যেতে। এখন চুপ করে বসে আছ কেন? যাওনা, ওয়াসার বউকে ধরে ঠ্যাঙাও, বিদ্যুতের বউকে ধরে ট্যাঙাও।

যেহাদ আলীঃ তবে কি ওখানে গিয়ে এখন মারামারি করতে বলছ?

জমীলাঃ তাতো পারবে না জানি। মোমবাতি হোক, কেরোসিন হোক একটা কিছুতো আন, একটু আলো জ্বালি। দুপুরে বিড়ালের পেশাবের মত ঝির ঝির করে পানি একটু এসেছিল–সর্বসাকুল্যে দুই বালতি। ওটুকু খাবার জন্য রেখেছি আর দু'বালতি হলেই কোন রকমে রান্নাটা সেরে নিতে পারতাম। পানি বন্ধ রেখে ওরা পানির ব্যবসা করে –আল্লাহয় বিচার করব।

যেহাদ আলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায়। জমীলা খাতুন বলেঃ সারাদিনে রাতে কোনদিনই দু'চার বালতির বেশি পানি আসে না। যা আসে তার সবটুকুই রান্না খাওয়ার জন্য রাখতে হয়। গা গোসল ধোওয়া তো নেই–ই, পায়খানা পেশাবের জন্যও এখন ন্যাকড়া ব্যবহার করতে হবে দেখছি। অথচ ওদিকে দেখ, বড় বড় বাড়িতে ওরা গাড়ি ভর্তি করে চড়া দামে পানি বিক্রি করে যায়। আজ আবার পানি অফিস হতে নোটিশ এসেছে তোমাকে বাণিজ্যিক রেটে পানির বিল দিতে হবে। কারণ, তুমি বাড়িতে ছেলে মেয়েদের খাৎনার ব্যবসা কর।

জমীলা খাতুনের শেষ বাক্যটি শুনে যেহাদ আলী হো হো করে হেসে ওঠে। নোটিশ আর নোটিশের স্টীমে ক্ষিপ্ত নিজের মেজাজ আর পানির অভাবে ক্ষিপ্ত স্ত্রীর মেজাজকে আজ যেহাদ আলী একটু হালকা করে নিতে এবং দিতে চায়। জমীলা খাতুনের দিকে তাকিয়ে বললঃ এই যে শুন, ঐ যে ছেলেমেয়ের খাৎনার কথা বললে না? বলি, মেয়ের খাৎনাটা কি রকম গো?

জমীলা খাতুন হাসি চেপে মুখ ফিরিয়ে বললঃ খাৎনা করাও তুমি আর জানব বুঝি আমি?

যেহাদ আলী আঁচল ধরে টেনে পাশের মোড়াটিতে স্ত্রীকে বসিয়ে কাঁধে হাত রেখে রসিকতার সুরে বললঃ গল্প শুনবে, গল্পঃ

জমিলা খাতুন ঝাড়া মেরে স্বামীর হাত সরিয়ে দিতে দিতে বললঃ হ্যাঁ, গল্পের মৌসুম বটে ষোল বছর বয়স পেয়েছ যে গাছের ডালে কোকিল ডাকবে আর নিচে বসে তোমার গল্প শুনব?

যেহাদ আলী বলল, তবে শোন, এক বুড়ো দাদা একেদিন পাঁচ বছরের এক নাতনী আর ছয় বছরের এক নাতিকে নিয়ে মাঠে গেছে বেড়াতে। গরীব মানুষ, নাতি ন্যাংটা, নাতনীও ন্যাংটা । দাদা বসে আছেন। নাতি আর নাতনী মহানন্দে ঘাসের উপর ছুটে বেড়াচ্ছি। কখনও আগাছার ফুল ছিঁড়ে এনে,

কখনও ঘাসের বীচি এনে দাদার হাতে দিচ্ছে। কখনও ব্যাঙের বাচ্চা দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে দাদার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হঠাৎ নাতি এক ফড়িং ধরে এনে দাদাকে বললঃ দাও, সুতা দিয়ে বেঁধে দাও, ঘুড়ি ওড়াব।

দাদা গায়ের চাদরের আচঁল খুটেঁ সুতা বের করে ফড়িং বেধে দিলেন। তাইনা পেয়ে নাতির খুশী দেখে কে? ফড়িং ঘুড়ির মত উড়ছে আর উড়ছে, নাতি সুতা ধরে ছুটছে আর ছুটছে।

হঠাৎ নাতির হাত থেকে সুতা ফসকে গেলে ফড়িং আকাশে উড়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে নাতি আর একটা ফড়িং ধরে এনে বললেঃ দাও, শক্ত করে বেঁধে দাও যেন ছুটতে না পারে।

দাদা রসিকতা করে এবার সুতার এক মাথায় ফড়িং বেঁধে আর মাথা ন্যাংটা নাতির নুনুর সাথে বেঁধে দিলেন।

বাঃ কি মজা, এবার আর সুতা হাতে ধরতে হচ্ছে না, ফড়িংও ছুটে যেতে পারছে না। নাতি তার নুনু উঁচিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে আর বাতাসে ফড়িং উড়ছে।

ঐ না দেখে এবার নাতনীও একটা ফড়িং ধরে এনে দাদার হাতে দিয়ে বললঃ দাও, ভাইয়ার মত করে বেঁধে দাও।

বেখেয়াল বুড়ো দাদা চাদরের আঁচল খুঁটে আর একখানা সুতা বের করে এক মাথায় ফড়িং বেঁধে অন্য মাথা বাঁধার জন্য নাতনীর পুরুষাংগ খুজছেন আর বলছেনঃ গেল কোথায়?

অনেক পরে বুড়োর হুঁশ হলে বললেনঃ ওঃ তাইতো।

ওদিকে ভাইয়ার মত করে ফড়িং বাঁধা হচ্ছে না দেখে নাতনী কাঁদতে শুরু করেছে, আর অর্থব দাদা কেবলই বলছেন বলতো, এখন বাঁধি কোথায়?

বুঝলে বউ, আমাদের সরকারেরও ঐ দশা হয়েছে। দেশের কতগুলো কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করে হাজার কোটি টাকা লোকসান দিয়ে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে কোন ছল ছুতায় কোথায় কিসের উপর নতুন নতুন ট্যাক্স বসানো যায়। দাম বাড়ানো যায়। ওদের কান্ডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে ঐ দাদার মত যেন বলছে–ট্যাক্সটা বসাই কোথায়।

কিন্তু জমীলা বিবি, তুমি একটা বড় বোকা। ওসব লোকগুলি এলে সবাই পাঁচ দশ টাকা দর্শনী দিয়ে দেয়। তার ফলে পঞ্চাশ–ষাট টাকার বিল

দশ–পাঁচ টাকায় নেমে আসে। ওটুকুর জন্যই ওরা ছুতানাতা খুঁজতে আসে। কিন্তু তুমি কিছুই দাওনি বলেই ঐ নোটিশটা জারি হল।

একটু হাসিতে একটু বিরক্তি মিশিয়ে জমিলা খাতুন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললঃ কালকে একবার অফিসে গিয়ে সাহেবদের বুঝিয়ে বলে দেখ না।

আমাদের বাড়িটাতো আর খাৎনার ফ্যাক্টরী নয় যে, বাণিজ্যিক রেট দিতে হবে। বছরে দুতিন মাস খাৎনার মৌসুম, আর কয়টা ছেলেকেই বা খাৎনা দিয়ে থাক। বুঝয়ে বললে তারা নিশ্চয়ই শুনবে। দেশের আইন নিশ্চয়ই মানুষের আহসানীর জন্য হয়, পেরেশানীর জন্যতো নয়।

যেহাদ আলী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললঃ হা, আহসানীর জন্যই বটে, তবে সবার জন্য নয়। সরকারী দফতরের শরাব–ই আশরাফের নেশাগ্রস্ত মানুষেরা দু'পয়সা উপরি আয়ের উদ্দেশ্যে আহসানীর জন্য তৈরি আইনকেই পেরেসানীর বস্তুতে পরিণত করে দেয়।

জমীলা খাতুনঃ আচ্ছা, শিক্ষিত মানুষের হাতে খড়ি হয়, 'মিথ্যা বলা মহাপাপ, অন্যায় করা মহাপাপ, এসব কথা দিয়ে। ঐ কথাগুলি অশিক্ষিতেরা ভোলে না, শিক্ষিতেরা ভুলে যায় কেন?

যেহাদ আলীঃ তার কারণ, বাল্য শিক্ষায় আর একটা কথাও আছে, লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। গাড়ি ঘোড়ার একটা স্বরূপ আছে, অবয়র আছে তার প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। লেখাপড়া যত বাড়ে, গাড়ি ঘোড়ার প্রতি শিক্ষিতের আকর্ষণও তত বাড়ে। কিন্তু পাপের তো কোন স্বরুপ নাই, অবয়ব নাই। আবার উচ্চশিক্ষার সাথে ধর্মশিক্ষার সংশ্রব না থাকায় পাপ সম্বন্ধে কোন ধারণাও জন্মে না।

সুতরাং উচ্চ শিক্ষা লাভ করে গাড়ি ঘোড়ার নেশায় মত্ত হয়ে মানুষ কোন অন্যায় করতেই দ্বিধাবোধ করে না। যখন হালাল আয়ে গাড়ি ঘোড়ার পথ প্রশস্ত হয় না তখন হারাম উপায়ে আয় বাড়াতে দেশের আইনকে তারা পেরেসানীর আইনে পরিণত করে। কিন্তু অশিক্ষিতেরা জানে যে. তারা লেখাপড়া শিখেনি বলে গাড়ি ঘোড়ায় তাদের কোন অধিকার নেই । জীবনে তাদের কোন স্বপ্ন নেই। সুতরাং তারা সত্য–মিথ্যা, ন্যায়–অন্যায় ইত্যাদি নীতি বাক্য সম্বল করে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে থাকে।

জমীলা খাতুনকে যত কথাই বলুক না কেন, যেহাদ আলীর অন্তরে তখন একটা চিন্তাই আন্দেলিত হতে থাকে। তা হচ্ছে পানির মূল্য এমনিতেই

আগের দিনের দুধের দামে বর্তমানে পানির দাম দিতে হচ্ছে। এখন যদি বাণিজ্যিক হারে পানির বিল দিতে হয় তবে ঘিয়ের দামে আর পানির দামে যে কোন পার্থক্য থাকবে না। আর সেই দামটা বহন করা দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ যেহাদ আলীর পক্ষে হবে নির্যাতনমূলক।

যেহাদ আলী কোন দিন কোন অফিস আদালতে যায়নি। আর্থিক ভাবনায় আজ তাকে অফিস পাড়ায় আসতে হল। কিন্তু এখন কার কাছে যাবে, কোথায় যাবে, সে খুঁজে পায়না। সারা অফিস পাড়াটি যেন একটি জীন্দাপীরের মাজার। চেয়ারে চেয়ারে বসে থাকা লোকগুলো যেন সেই মাজারের খাদেম। তারা সবাই দর্শন প্রার্থীদের ধমক দিচ্ছে, যেন পীরের ভয় দেখাচ্ছে। আর দর্শন প্রার্থীরা জ্বী হুজুর, জ্বী হুজুর করে হাত কচলাচ্ছে, দারাজ দিলে টেকের টাকা খুলে কারও বাম হাতে আর কারও ডান হাতে তুলে দিচ্ছে।

খাদেমরা খুশী হয়ে সমস্যার কথা শুনতে কান বাড়িয়ে ধরে। সমস্যার কথা শুনে চোখ কপালে তোলে, সর্বনাশ বিরাট সমস্যা। যেন এ সমস্যার সমাধান করতে হলে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শতমূলী অশর্থের শিকড়ের ছাল আনতে হবে। আর তার জন্য বহু টাকার দরকার। টাকার কথা শুনে দর্শনার্থীরা কাটা মোরগের মত ধড়ফড় করে।

অফিসের পর অফিস, কোথাও খাজনা কোথাও ট্যাক্স, কোথাও নিবন্ধন, কোথাও পারমিট। সর্বত্র লোকে লোকারণ্য কোথাও একখানা ফরমের জন্য একগাদা মানুষ কোরবাণীর হাটের গরুর মত লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কর্কশ চাপরাশী আর হবে না, আর হবে না করে অতি মেহেরবাণীর ভঙ্গিতে, অতি কষ্টে দু'একখানা করে ফরম প্রার্থীর হাতে তুলে দিয়ে দূরহ দূরহ ধরনের মুখবাদন করছে।

কোথাও আবার প্রার্থী ফরমে পূরণ করতে পারছে না দেখে টাউটরা তা পূরণ করে দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দর কষাকষি করছে। ফরমে ভুল আবিষ্কার করে আবার কোথাও দরখাস্তকারীকে কেরানী ধমকাচ্ছে আর দু'চারখানা নোট হাতে নিয়ে মেহেরবাণীর ভঙ্গিতে ভুল শুধরে নিচ্ছে।

কোথাও আবার পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিয়ে পাঁচশ' টাকার খাজনাকে পঞ্চাশ টাকায় আনা হয়েছে। এখন পারমিশন টাইপ হবে। কিন্তু টাইপিস্ট নেই। প্রার্থীটি অনেক ছোটাছুটি করে অফিসের সদূর প্রান্তে টাইপিষ্টকে আবিষ্কার করে। কিন্তু যতই আবেদন নিবেদন করে ততই সে সতী মেয়ের প্রণয়

প্রত্যাখ্যানের মত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অবশেষে দু'চারখানা নোট হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে ধরে এনে টাইপ মেশিনের সামনে বসাতে চেষ্টা করছে। কলেরাগ্রস্ত রোগীর মত লোকটি মেশিনের সামনে বসে। নোংরা জিনস হাতে ধরার মতহ নাক সিঁটকিয়ে ফরমখানা মেশিনে বসিযে খটাখট দু'চারটি শব্দ বসিয়ে দিয়ে তা মক্কেলের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়।

এবার ডেসপাচ নম্বর হবে, কিন্তু কেরানী নেই। খোঁজাখুঁজির পর তাকে আবিষ্কার করা গেলো প্যান্ট্রি রুমে। প্রয়োজন নিবেদন করতেই চোখ মুখ লাল করে সে কি যেন বলল, বুঝা গেল না। শুধু বুঝা গেল, ওদিকে গিয়ে বসে থাকুন, সময় হলে আসব লোকটি ফিরে এসে চুরির আসামীর মত টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক্ষণ পর তিনি এসে দাবার গুটি চালার মত মনোযোগ সহকারে এদিকের কাগজ সেদিকে সেদিকের কাগজ এদিকে করতে থাকেন। চোখে মুখে এমন একটি বিরক্তির ভাব যেন একটা দামী জিনিস হারিয়ে ফেলেছেন।

দরখাস্তকারী অনেক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলতে সাহস করে না। প্রথম একটি ছোট্ট কাশি দেয়। কিন্তু না, তিনি কাশির শব্দ শুনেন না পরে দু'একখানা কড় কড়ে নোট হাতে গুঁজে দেয়। এবার কেরানীটি অনেক বিরক্তি হজম করে একখানা মোটা বই টেনে এনে কিছু লিখে পারমিটের কোণে খচ করে একটা নম্বর বসিয়ে দেয়।

শেয়ালের হাত হতে মুক্তি পাওয়া মোরগের মত দরখাস্তকারী লোকটি পারমিটখানা হাতে নিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়ে দরজায় দারোয়ান বেটা আবার পথরোধ করতে চাইলো কিন্তু পারল না। অফিস সীমার বাইরে এসে লোকটি এবার দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই মুক্তি পাওয়া মোরগের মতই জামা কাপড়টা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক হয়ে দাঁড়ায়। নতুন বউ-এর মুখ দেখার মত পারমিটখানা উল্টে পাল্টে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

পাশেই আরেকটি অফিস। সারে সারে স্টাম্প ভেন্ডার বসা। দেখে বুঝা গেল ওটা সাবরেজিষ্ট্রি অফিস। চেঁচামেচি শুনে যেহাদ আলী একটু ঘাড় উঁচিয়ে ব্যাপারটা দেখতে চেষ্টা করে।

একজন লোক ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললঃ তিন টাকার স্টাম্প পেপার দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, এত নতুন কথা নয়।

আর একজন বললোঃ লোকটা বোধ হয় এই প্রথম সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে এসেছে। যেহাদ আলীও এই অফিস পাড়ায় নতুন এসেছে। হঠাৎ মনে হল ওই যে স্টাম্প ভেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখল তার জন্য যদি কেউ পয়সা দাবী করে। যদি বলেঃ ব্যটা, ভেন্ডারের মুখ দেখলে কেন? এখন পয়সা দাও।

যেহাদ আলী এবার নিজের মাঝে ফিরে আসে। সাহস সঞ্চয় করে অফিসের দরজার কাছাকাছি একটি কোঠার দরজার সামনে এসে দাড়ায়। একখানা কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে–রাজস্ব কর্মকর্তা। যেহাদ আলী এতক্ষণ কর্মচারীদের মেজাজের চেহারা দেখেছে। সুতরাং তাদের সাথে কথা বলার দুঃসাহস না করে কর্মকর্তার সাথেই কথা বলবে স্থির করে দরজার পর্দাটা একটু ফাঁক করে দেখতে চেষ্টা করে।

মুখে দাঁড়ি, মাথায় নেটের টুপিওয়ালা কর্মকর্তা টেলিফোন কানে নিয়ে খট খট করে টেলিফোন অপারেটরের করুণা ভিক্ষা করছেন। সামনে দু'জন সুদর্শন দর্শনপ্রার্থী। একজন বিনয়ের ভঙ্গিতে বললঃ দেখুন স্যার, আমি অফিস ফেলে এসেছি। এতক্ষণে হয়তো আমার অফিসের সামনে দু'এক ডজন লোক জমা হয়ে গেছে। কেউ হিসাব দাখিলের জন্য, কেউ হিয়ারীং–এর জন্য, কেউ এসেসমেন্ট – এর জন্য।

আর একজন বললঃ আমারও সেই একই অবস্থা। এখন ট্যাক্স–এর অংকটা জেনে নিয়ে আমার ওষুধের মূল্য ঠিক করব, ডিলার মাল নেবে, রিটেলার স্টক নেবে, সাপ্লায়ার হাসপাতালে সাপ্লা দেবে, তবেই না রোগী ওষুধ পাবে। একজন টেলিফোন অপারেটরের গাফিলাতির জন্য আজ হাসপাতালে ওষুধের অভাবে রোগী মরবে, বাজারে দশ টাকার ওষুধ পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হবে।

স্যার, বরঞ্চ ফোন গাইড বুকটা আমাকে দিন। আমি এসেসমেন্ট অফিসের টেলিফোন নম্বরটা জেনে নিয়ে বাইরের কোন ফোন থেকে কলটা করে আসি।

টেলিফোন গাইডটির দিকে তাকিয়ে কর্মকর্তাটি একটা দুঃখের হাসি হেসে বললেন, কিন্তু ভাই, গাইড বুকে কি আর নম্বর পাওয়া যায়? বছর বছর নম্বর বদলে যাচ্ছে। আর গাইডখানাতো পাঁচ বছরের পুরানো। এখন তো আমরা পরাধীন নই যে ধমক খেয়ে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করব?

স্বাধীনতা পূর্বযুগে বছরের ছয় ঋতুর নিয়মে প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর একখানা নতুন গাইড টেবিলে এসে যেত। আর এখন দেখুন না ছয় বছরে একখানা গাইড প্রকাশ করতে পেরে আমাদের টেলিফোন কর্তারা মহানন্দে প্রকাশনা উৎসব পালন করেন, মোনাজাত করেন, বাণী, বিবৃতি প্রচার করেন, যেন তারা রোম সাম্রাজ্য জয় করে ফেলেছেন।

স্বাধীনতা পূর্ব যুগে যে আমরা ঐ কাজটি করতাম এখনও সেই আমরাই আছি। একমাত্র ব্যতিক্রম তখন অন্যের হুকুমের তাবেদারী করতাম বলে প্রত্যেক ছয় মাসে একখানা টেলিফোন গাইড ছাপাবার ব্যবস্থা করতাম, আর এখন স্বাধীনভাবে কাজটি করি বলে ছয় বছরে একখানা ছাপাতে পারলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি।

একজন দর্শন প্রার্থী বলে উঠলেনঃ অন্যের কথা আর কি বলবেন স্যার, আপনার টেলিফোন অপারেটরকে দিয়েই তো আপনি কাজ আদায় করতে পারছেন না। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারছেন না।

কর্মকর্তাঃ কি করব বলুন। আমার অপারেটরও তো স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলছেন? কি ব্যবস্থা নিব বলুন? একজন কর্মচারীকে শাস্তি দিলে সিবিএ নেতা এসে বলবে কর্মচারীটি তার স্টাফ, মন্ত্রী বলবেন ওটি তার কর্মী, মহল্লার সরদার বলবেন, ওটি তার সদস্য, আর সবার একই কথা–কাজ করুক না করুক, তাকে চাকুরিতে বহাল রাখতে হবে, বেতনাদির সুবিধা দিয়ে যেতে হবে। সরকার নিজেই একটা খুনীকে সাজা দিয়ে দশ বিশটা পলিটিক্যাল পার্টির আন্দেলনের মুখে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আমার অপারেটর তো খুণীও নয়, আসামীও নয়। যেহাদ আলী কোথায় যাবে খুজে পায়না।

রুমের অপর পাশে দরজার দিকে মুখ করে বড় টেবিল সামনে নিয়ে মোচওয়ালা একজন আধা কর্তা ধরনের ব্যক্তি বসে আছেন। দরজার সামনে একজন চাপরাশী বসা্ যেহাদ আলী তাকে বাণিজ্যিক রেটের অফিসারের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে এমনভাবে যেহাদ আলীর দিকে তাকাল যেন সে একটা কয়েন বক্স টেলিফোন–পয়সা না দিলে ডায়াল টোন আসে না, কথাও বলে না।

আশপাশে আরও অনেক খাজনার অফিস রয়েছে। সর্বত্র একই অবস্থা। লাইন আর লাইন। চাষী লাংগল ফেলে, দোকানী দোকান ফেলে, মাঝি খেয়া

ফেলে, শিক্ষক স্কুল ফেলে, অফিসার নিজ দপ্তর ফেলে দিনের পর দিন লাইনে দিন গুজরান করছে।

হঠাৎ হাঠাৎ কোথাও কোথাও ফরম শেষ হয়ে গেছে বলে দারোয়ানের এলান শোনা যায়। কোথাও আবার চাপরাশী চোখের ঠারে লাইনের মানুষকে পাশের পান দোকান দেখিয়ে দেয়। বুদ্ধিমানেরা সেখান হতে মওফতের ফরম দশ বিশ টাকা দিয়ে কিনে নেয়। যে বোকা মানুষ চোখের ঠার বুঝে না, কিংবা যে কিপটে মানুষ টেঁকের গিট খোলে না, তারাই দিনের পর দিন এসে লাইনে দাঁড়ায় দারোয়ান চাপরাশীরা তা দেখে মুখ টিপে হাসে।

সবকিছু দেখে শুনে যেহাদ আলী বাড়ি ফিরে এসে তওবা করে, সে আর খাৎনার ব্যবসাও করবে না, ঘিয়ের দামে পানির বিলও দেবে না। খাজনার অফিসেও আর যাবে না।

কিন্তু যেহাদ আলী অফিসে নাই বা গেল, তাই বলে অফিসের লোকেরা আসবে না কেন? একদিন পানির অফিসের লোকজন এসে যেহাদ আলীর বাড়ী ঘর গরম করে তোলে। যেহাদ আলী বাণিজ্যিক হারে পানির বিল দিচ্ছে না বলে তার পানির লাইন কেটে দেয়া হবে।

যেহাদ্ আলী বার বার অনুনয়ে বলছে সে এখন আর খাৎনার ব্যবসা করছে না, তাছাড়া এটা খাৎনার মৌসুমও নয়। কাজেই বাণিজ্যিক হারে পানির বিল দেয়ার প্রশ্নও আসে না। কিন্তু কার কথা কে শোনে। তারা যে সরকারী ক্ষমতায় ক্ষমতাবান মানুষ।

যেহাদ আলীর দশ বছরের ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল্ একজন পেয়াদা তাকে দেখিয়ে বলে উঠলঃ কে বলে তুমি খাৎনার ব্যবসা কর না? ঐ যে, এখনই তোমার এখানে খাৎনার জন্য ছেলে অপেক্ষা করছে।

যেহাদ আলী রাগে গর গর করতে করতে তার দশ বছর বয়সের ছেলেটিকে ধরে এনে ন্যাংটা করিয়ে বললঃ দেখুন, আপনারা এবার স্বচক্ষে দেখুন, ছেলেটি খাৎনা হতে এসেছে, না খাৎনা আগেই করা আছে। আপনারা স্বচক্ষে দেখুন।

পানি অফিসের লোকজন এবার আরও ক্ষেপে উঠল কি, এত বড় সাহস? এতগুলো সরকারী লোকজনকে এত বড় একটি ছেলের পুরুষাঙ্গ দেখিয়ে এত বড় বেইজ্জতী।

সবাই ফিরে গিয়ে কথাটা আমলাকে জানায় যে যেহাদ আলী নামক লোকটি লুঙ্গি–উচিয়ে পুরুষাঙ্গ দেখিয়ে তাদের সবাইকে অপমান করেছে। আমলাতো রেগে মেগে আগুন।

পরদিন যেহাদ আলীর উপর তিন হাজার টাকার এক বকেয়া বাণিজ্যিক বিল জারি করা হল। সরকারী পাইক পেয়াদার হল্লা–চিল্লায় যেহাদ আলীর বাড়ী সরগরম হয়ে ওঠে।

নোটিশের বিবরণ শুনে যেহাদ আলী হাউমাউ করে ওঠে। এক বেলা খেলে যার আর বেলার সংস্থান থাকে না সে এখন তিন হাজার টাকা দেয় কোথা হতে? না দিলে যে পানির লাইন কাটা যাবে। যেহাদ আলী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

জমীলা খাতুন একবার নীল দর্পণ সিনেমা দেখেছিল। স্বামীর দিকে তাকাতেই আজ তার চোখে সেই নীল দর্পণ সিনেমার একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। বেগুন বাড়ির কুঠিতে ইংরেজ উড সাহেব তার দেওয়ান গোপীনাথ দাসকে বলছেনঃ ইউ বাসটার্ড অব হোর্স বীচ, তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাথ মোলাকাৎ করেগা–শালা কাউয়ার্ড কায়েৎকা বাচ্চা, বলেই গোপীনাথকে এমন লাথী মারেন যে গোপীনাথ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তখনকার দিনে নীলকর সাহেবের হাতের চাবুক দেখে এ দেশের গৃহস্ত মানুষের চেহারায় যে আতংকের ভাব ফুটে উঠত আমলাদের হাতের নোটিশ দেখে আজ যেহাদ আলীর চোখে মুখে সে আতংকই ফুটে উঠেছে জমীলা খাতুন স্বামীর অবস্থা দৃষ্টে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আইন, আদালত, কর, খাজনার ঝঞ্ঝাট দেখা দিলে মানুষ কলির কলন্দর উকিলের স্মরণাপন্ন হয়। কিন্তু যাদের টাকা আছে তারাই তা পারে। কারণ উকিলদের নিজেদের ফি'র সাথে অফিস খরচ নামে একটা আনুষংগিক থাকে। ঐ আনুষংগিকের অংকটা ঠিকঠাক মত পেলে উকিলগণ যুক্তিতর্কের সাথে সাথে মালপানির মায়াজাল বিস্তার করে আমলাদের সম্মোহিত করে দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানিয়ে ফেলে হাজারের কর পঞ্চাশে বা পঞ্চাশের কর পাঁচে দশে বা শূন্যেরকোঠায় নামিয়ে উকিলে, মক্কেলে, আমলায় মিলে সরকারে দেয় কর নিজেদের করায়ত্ত্ব করে সগর্বে সমাজ জীবন যাপন করে।

জমীলা খাতুনদের অত টাকা নেই যে উকিল মোক্তার ধরবে কিন্তু বানোয়াট করের নোটিশ তার স্বামী যেহাদ আলীর উপর যে জিল্লতি নামিয়ে এনেছে তা দেখে জমীলা খাতুন আর স্থির থাকতে পারে না।

যেহাদ আলীদের বাড়ির এক পাশে চুন্নু মিয়ার বাড়ি, অপর পাশে শরাফত মিয়ার বাড়ি। তারা উভয়েই মোটামুটি শিক্ষিত, দরবারি, কারবারি, মোড়ল–মাতব্বর মানুষ। মহল্লার বাপ ব্যাটা চাচা ভাতিজা সবাই তাদের চাচা বলে সম্বোধন করে, সময় অসময় তাদের মগজের সাহায্য প্রার্থনা করে। তারাও সদুপদেশ খয়রাত করে সকলকে কৃতার্থ করেন। আর কমিশনার চেয়ারম্যানের ভোটের সময় ভোট উপভোগ করেন। সুতরাং জমীলা খাতুন আজ শরাফত চাচার স্বরণাপন্ন হওয়া একমাত্র উপায় মনে করে সেদিকটায় পা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু শরাফত চাচার বাড়ী পৌছেই দেখে সেখানে আর এক তুমুল কান্ড ঘটছে। ক্রোকের নোটিশ হাতে নিয়ে পৌর অফিসের একদল লোক হট্টগোল করছে। শরাফত চাচা নাকি সাত বছর পূর্বেকার এক বছরের পৌর কর পরিশোধ করেননি।

শরাফত চাচা সাত বছরের পুরানো রশিদ হাতে নিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছেন যে তিনি ঐ কর ঠিক সময়েই পরিশোধ করেছেন। তিনি দুঃখ করে বলছেন যে যদি তিনি কর নাই দিয়ে থাকবেন তবে ঐ নোটিশখানা আসতে সাত বছর সময় লাগল কেন? কর না দেয়ার জন্য যদি ক্রোকের পরোয়ানা হতে পারে তবে সাত বছর পর্যন্ত কর দাবী না করার জন্য ওদের ফাসির হুকুম হবে না কেন?

শরাফত চাচা আরও দু'খানা ক্রোকের নোটিশ দেখিয়ে বলছেন যে, আরও দুই দুই বার ঐ ধরনের ক্রোকের নোটিশ এসেছিল, দুই দুই বারই তিনি ঐ রশিদ হাতে নিয়ে পৌর অফিসে গিয়েছেন, দুই দুই বারেই তাকে বলা হয়েছে ওটা নাকি ভুল হয়েছে। তারপর নাকি আর অমন হবেনা। কিন্তু তারপরও চার চার বার বকেয়ার দাবি নিয়ে তার কাছে বিল এসেছে এবং চার চার বারেই তিনি পৌর অফিসে গিয়ে রশিদ দেখিয়ে বকেয়ার দাবি কাটিয়ে এনেছেন। তারপরও আজ আবার সেই পুরানো বকেয়ার দাবিতে ক্রোকের নোটিশ?

একজন পৌরলোক শরাফত চাচার কানের কাছাকাছি এসে বললঃ আরে সাহেব, আপনি যে কর দিয়েছেন তা সত্য হতে পারে কিন্তু আমাদের

লেজারের পাতায় উশুল যখন হয়নি তখন সেই সত্য দিয়ে আপনার কোনই উপকার হবে না।

শরাফত চাচা লোকটির দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মত বললেনঃ কর যখন আপনাদের অফিসে গিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছি, বললে তো লেজারের পাতায়ও উশুল দিয়ে আসতে পারতাম।

মাঝখান থেকে কে যেন একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠলঃ আরে ভাই সাব, এখনতো আপনারা নিজের নিজের গ্যাস, বিদ্যুৎ পানির বিল নিজে তৈরি করে আদায় করে আসেন। সেদিনও সামনে আছে, যখন অফিসের কেরানীরা লেজার আগলে বসে থাকবে, আর আপনাদের বিল আদায় করে তা আবার লেজারের পাতায় উশুল দিয়েও আসতে হবে। অন্যথায় কেয়ামত পর্যন্ত তার বকেয়ার দাবী আসতেই থাকবে আর আসতেই থাকবে। আমার বেলায় যা হয়েছে। তা শুনলেই বুঝবেন।

প্রতি মাসে আমার বিদ্যুৎ বিল আসে ষাট সত্তর টাকা থেকে একশ টাকা পর্যন্ত। বিল পাওয়ার সাথে সাথে তা পরিশোধ করে দেয়া আমার চিরদিনের অভ্যাস। নইলে দেনার দায়ে রাতে চোখে ঘুম আসে না। ১৯৮৪ সালে হঠাৎ এক দুপুরে বিদ্যুৎ অফিসের একদল লাইনম্যান হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির। আমি অফিসে। ওরা গেটে দাড়িয়ে একবার ডেকে বললঃ আপনাদের বহু বিল বাকি পড়ে আছে। আমরা আপনাদের লাইন কেটে দিচ্ছি। বলেই ল্যাম্পপোস্টের গায়ে মই খাড়া করে দেয়।

আমার ছেলেটা এসে অনেক করে বলল যে আম্মু বলেছেন আমাদের কোন বিল বাকি নেই, আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের পরিশোধিত বিলগুলি দেখতে পারিন কিন্তু ওরা জানাল যে ওরা বিল টিল বুঝে না, ওদের হুকুম দেয়া হয়েছে লাইন কাটতে সুতরাং ওরা লাইন কাটা ছাড়া আর কিছু বেঝে না।

শেষ পর্যন্ত ওরা বহুত মেহেরবানী করে সেদিন আর লাইন কাটল না। বলে গেল যেন অফিসে গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ফয়সালা করা হয় নইলে আগামী সপ্তাহে এসে লাইন কেটে দিবে।

পরদিন তিন চার বছরের পরিশোধিত বিল বগলদাবা করে বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে তালাশ করে দেখি গত দশ বছর পর্যন্ত বহু বিলের উশুল নেই এবং পরিশোধিত বিল না দেখালে তা লেজারের পাতায় উশুল হবে না কিন্তু দশ বছরের পুরানো বিলতো আমি রাখিনি।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি এসে মনে পড়ল, আমার গিন্নীর তো সংসার খরচের হিসাব লিখে রাখার অভ্যাস আছে, তাতে হয়তো বিল পরিশোধের তারিখটা পাওয়া যেতে পারে। অনেক ঘাঁটা-ঘাটি করে তারিখগুলো পেলাম। আবার গেলাম অফিসে বিলগুলোর পরিশোধের তারিখ বললাম। কিন্তু না, বিল দেখাতে হবে, তাতে পরিশোধের সীল থাকতে হবে। বড় পেরেশানিতে পড়ে যাই। বিলতো রাখিনি পাব কোথায়?

কেরানী সাহেবটিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ব্যাংক থেকে এসব বিলের যে হিসাব বিবরণী আসে সেগুলো পাশের রেকর্ড রুমেই রাখা হয়। তাকে অনেক খোশামোদ করে সে রুমে দিয়ে দেখি পরিশোধের দিন তারিখের ক্রমানুসারে সব বিল সাজানো আছে। তারিখ মোতাবেক বিলের বান্ডিল বের করে আমার বিলটা বের করে কেরানী সাহেবকে দেখালাম, আর উনি টুকে নিলেন। এটা ১৯৮৫ সালের কথা।

১৯৯২ সালে আবার আমার কাছে এক বকেয়া বিলের দাবি আসে তাতে দেখানো হয়, আমার কাছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকার বাকি আছে অর্থাৎ প্রায় ছয় বছরের বিল বাকি। ৭/৯/৯২ তারিখের মধ্যে এই বকেয়া পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়া হবে। এবারও পরিশোধিত বিলগুলো বগলদাবা করে ৭/৯/৯২ তারিখে বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে দেখি তাদের অফিস খোলা আছে। কিন্তু কাজ কারবার বন্ধ। কেউই অফিসের টেবিলে বসা নেই। তাদের আজ ধর্মঘট অনেকে অফিসের চার পাশে ঘুর ঘুর করছে। বেশির ভাগই অন্য কোথাও সভা করতে চলে গেছে। সবাই রাজনৈতিক দলের সদস্য। একজন কর্মকর্তা শুধু তার রুমে বসা আছেন। তার সাথে আলাপ করতেই তার কি যেন একটু দয়া হল। কর্মকর্তা গোছেরই আর একজনকে দিয়ে আমার বিলগুলি লেজারের পাতায় উশুল দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করে দিলেন।

এবার ঐ ব্যক্তিটি গানের সুরে গেয়ে উঠলেন–তার আর শেষ নেই, নেই কোন সমাধান। সবাই তার দিকে তাকালেন।

তিনি কপালে হাত রেখে বললেন, ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে আবার একদল লোক মই নিয়ে এসে হাজির, আমার লাইন কেটে দেয়া হবে। কারণ বিল বাকি আছে। সঙ্গে বকেয়া লিষ্ট হাতে একজন লোক আছে। পরিশোধ করা বিলের ফাইলটি তার সামনে রেখে আমি বসে রইলাম। লোকটি এক এক করে বকেয়ার লিষ্ট–এর সাথে বিলগুলো মিলিয়ে দেখল সব বিল

পরিশোধ করা আছে। সে ৫/৬ হাজার টাকার বকেয়ার লিষ্ট নিয়ে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে এক টাকাও বকেয়া নেই। ভদ্রলোক এবার ফাইল থেকে মুখ তুলে সহজভাবে আমাকে বলল, এগুলো নিয়ে একটু অফিসে যাবেন এবং লেজার উশুল করিয়ে আসবেন।

একজন পৌরলোক শরাফত চাচার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললঃ শুনলেন তো। বাস করবেন পানিতে আর লেজ মোচড়াবেন কুমিরের । তাকি কখনও হয়?

আরে ভাই সাব, শুনেন। ঐ রশীদ হাতে সারা জনম ছুটাছুটি করেও কোন লাভ হবে না বুঝলেন? মালপানি না ঢাললে লেজারের পাতায় উশুলের শিকড় গজাবে না।

অবস্থা বেগতিক দেখে জমীলা বিবি শরাফত চাচার সামনে যেতে সাহস করল না। সে তার অপর পাশের প্রতিবেশী চুন্নু চাচার বাড়ির দিকে ছুটে যায়।

কিন্তু সে কি! চুন্নু চাচার বাড়িতে তখন আবার আর এক জটলা পাকিয়ে বসেছে? বার বছর পর এক ভূমি উন্নয়ন করের বিল এসেছে সাত হাজার টাকার। সাত দিনের মধ্যে ঐ টাকা পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু বিলে আবার চার হাজারের স্থলে সাত হাজার করা হয়েছে।

চুন্নু চাচা কর অফিসে গিয়েছিলেন বিল ঠিক করে আনার জন্য। কিন্তু আমলা সাহেব জমিদার হরে কৃষ্ণ সিং–এর মত ফোঁস করে বলে দিয়েছেন, বিল যা করা হয়েছে ঠিকই করা হয়েছে। সোজাসুজি বড় সাহেবের কাছে যাওয়ায় ছোট সাহেবের গোসসা হয়েছে। বলে দিয়েছেন বিল মোতাবেক টাকা প্রদান করতে হবে। কিছু বলার থাকলে পরিশোধের পর দরখাস্ত দিয়ে বলতে হবে।

চুন্নু চাচা দুঃখ করে বলছেনঃ আগেরদিনের জমিদাররা তবু ভালো ছিল। তারা ফরাস বিছিয়ে বসত, হুক্কা টানত, মন দিয়ে কথা শুনত, ভুল ভাল শুধরে দিত, কিন্তু এখনকার জমিদারেরা পর্দানশীনের মত পর্দার আড়ালে টেবিল চেয়ারে বসেন। এক কথার বেশি দুই কথা বললে গোখরো সাপের মত ফোঁস করে উঠেন। যেন পর্দানশীনদের বেশি কথা বলা নৈতিকভাবে অশোভন।

কিন্তু অতগুলো টাকা সাত দিনের মধ্যে জোগাড় হয় কি করে? তাই দারুণ দুঃখে পড়ে চুন্নু চাচা সিদ্ধান্ত নেন, পত্রিকায় বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়ে অতিস্যাধের টেলিভিশনটি বিক্রি করে দেবেন।

সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে একজন বলে উঠলেনঃ না, না, অমন কর্মটি করলে আরেক ঝঞ্ঝাট বাঁধবে যে। আমি একবার এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম– একটি ব্যবহৃত টেলিভিশন বিক্রি হবে। তার ফল কি হয়েছিল শুনবেন? আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে টেলিভিশন দপ্তর হতে আমার নামে একখানা নোটিশ এলঃ পত্রিকান্তরে দেখা গেল যে আপনি একটি টিভি বিক্রি করতে যাচ্ছেন, আপনি উক্ত টিভির জন্য লাইসেন্স করেছিলেন কি? যদি করে থাকেন তবে নিম্নের ছকে লাইসন্সের বিবরণ প্রদান করুন। না করে থাকলে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট অতিসত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লাইসেন্স ফি ধার্যের নিমিত্ত পেশ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। আপনার টিভি ক্রেতার লাইসেন্স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে টিভি বিক্রয় করবেন ও ক্রেতার নাম, ঠিকানা লাইসেন্স সংখ্যা আমাদের জানাবেন।

ভদ্রলোকটি কাজী নজরুল ইসলামের দারিদ্র্য কবিতা আবৃত্তির ছন্দে নোটিশ খানা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাঠ শেষে যেন রাগে গর গর করতে থাকলেন। গত দশ বছর ধরে তিনি টিভি ব্যবহার করছেন, লাইসেন্স নিচ্ছেন, তার খোঁজতো কেউ কোন দিন নেয়নি। আজ টিভি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখে কেন যে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আঁৎকে উঠলেন তা তাঁর বোধগম্য হয়নি। নোটিশের ভাবটা দেখে তার কাছে মনে হয়েছে যেন বহুদিন পূর্বে বেহেশত হতে একটা টেলিভিশন চুরি হয়েছিল আর এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এতদিন পর সেটা ধরা পড়ে গেছে, ভদ্রলোক চুপ করলেন।

চুন্নু চাচার ঘরে গ্রাম থেকে আসা মেহমানও রয়েছে একজন। মেহমানটি এবার বলে উঠলেন ঃ আরে বাবা চুন্নু তোমরা সব সময় বলে থাক গ্রামগুলো সব টাউট বাটপারে ভরে গেছে। আরে, গ্রামে টাউট বাটপার হয় কারা? যাদের শিক্ষাদীক্ষা নেই, ঘরে চাল কেনার পয়সা নেই, পাশটাস করেও রুজী রোজগারের পথ পায় না, তারাই না টাউট বাটপারী করে পেটের ভাত যোগায়। তোমাদের শহরের মানুষগুলো সবার শিক্ষাদীক্ষা আছে চাকরি করে বেতন নেয় কিন্তু ডিউটি করে না। এরা অফিসে বসে ছলচাতুরী করে মানুষের টেঁকের টাকা খসিয়ে নেয়। এরা কি সকল বাটপারের বড় বাটপার নয়? তার চেয়ে চোরগুলো অনেক ভালো। তাদের একটা অজুহাত আছে। তারা

অশিক্ষিত, পেটের দায়ে চুরি করে। তারা চুরি করে রাত বিরাতে মানুষের অজান্তে, তারা মানুষ দেখলে চুরি ফেলে পালিয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের শিক্ষিতেরা চুরি করে দিনে দুপুরে। বুক ফুলিয়ে, ঠমক সমক দেখিয়ে। এমনকি, যখনই হাইজ্যাক পার্টি ধরা পড়ে, তখনই দেখা যায় তারা কোন শিক্ষিত মানুষের শিক্ষিত ছেলে। ধুষখোর ধরা পড়লে দেখা যায় তারা কোন নামি দপ্তরের দামী আমলা। ঘুষখোর আমলাদের বাপকা বেটা সন্তানেরাই তো ছিনতাইকারী হয় আর বাপ বেটা মিলে সমাজে মোড়লী মাতব্বরী করে।

না বাবা, আমাদের গ্রামেও চোর বাটপার ধরা পড়ে বটে, কিন্তু তারা সব গরীব মানুষের ছন্নছাড়া, ভূখা-নাংগা সন্তান, মানুষ নামের হাড্ডিসার জীব। ক্ষুধার তাড়নায়ইতো তারা চুরি চামারী করে। তোমাদের শহরের মত ফ্রীজ, টিভি আর পাঁচশ পঞ্চান্নের অর্থ সংস্থানের জন্য তারা চুরি করে না।

লোক লস্কর আর কথাবার্তার বাড়াবাড়ি দেখে জমীলা খাতুন চুন্নু চাচার সামনে যেতেও সাহস করল না। ঘরে ফিরে এসে যেখানে যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব উজাড় করে সরকারী পাইক পেয়াদাদের সালামীর সংস্থান করে দিয়ে তাদের কাছে সময় চেয়ে নেয়।

পাইক পেয়াদারা চলে যাওয়ার পর জমীলা খাতুন ভাবতে লেগে যায়। তার মনে হল, হাটবাজারে পুরুষেরা যে সওদা করে এক টাকায়, সে দেখেছে মেয়েরা সেই সওদা করে তিন টাকায়। আবার অফিস আদালতে পুরুষেরা ঘুষ দিয়ে যে কাজ আদায় করে দশদিনে, মেয়েরা সেই কাজ আদায় করে বিনা ঘুষে একদিনে।

আজকাল আবার সচিবালয়ে বড় বড় কাজ আটকালে যখন ঘুষ টুসেও কাজ হয় না কিম্বা যদি ঘুষের দাবি সামর্থ্যের বাইরে হয় তখন বগল খোলা ব্লাউজ পরা সুন্দরী রমনীদের ব্যবহার করা হয়। তারা বড় সাহেবদের রুমে দু'একটা হাজিরা দিয়েই বিনা ঘুষে বড় বড় কাজ আদায় করে আনার নযির স্থাপিত হয়েছে। সচিবালয়ে সুন্দরীদের কদর দেখে তদবীর সুন্দরীর সংখ্যাও নাকি হুহু করে বেড়ে গেছে।

সচিবালয়ে প্রবেশ করতে হলে প্রবেশ পথে পারমিট প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু তদবীর সুন্দরীদের পারমিটের প্রয়োজন হয়না তাদের দেহ সৌন্দর্যই তাদের পারমিট। গেইট পুলিশ তদদবীর সুন্দরীদের হাতে পারমিটের কাগজ আছে কিনা সেদিকে তাকায় না, তাদের দেহ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়েই

এলাউ করে দেয়। জমীলা খাতুন তার দেবরের কাছে এসব খবরা খবর শুনে থাকে।

কথাগুলো জমীলা খাতুন মনে মনে একটু নাড়াচাড়া করে দেখে। শেষে ঘরে গিয়ে তার বিয়ের দিনের শাড়ি ব্লাউজটা খুলে নেয়। এখনো নতুনের মতই রয়েছে। এবার শাড়ি ব্লাউজগুলো আঁটসাট করে পরে নেয়। মেকি গয়নাগুলো দিয়ে শরীর অলংকৃত করে। গরীব মানুষ লিপষ্টিক আইব্রো তো নেই। তাই ঠোঁটে একটু আলতা, ভূরুতে একটু সুরমা লাগায়। শাড়ীটার উপরের অংশটা ভাঁজ করে বড় মানুষের মেয়েদের মত বুকের একপাশ দিয়ে টেনে বুকের ভাঁজটা স্পষ্টকরে ফুটিয়ে আঁচলটা উপরে উঠিয়ে কাঁধের পাশে ফেলে রাখে। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে। নিজের কাছেই নিজেকে মনে হল যেন সুরেশ্বরী ডাঁটা গাছটির আষাঢ়ী লাবণ্য লক লক করতে শুরু করছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জমীলা খাতুন সুরেশ্বরী ডাঁটার স্মৃতিচারণ করে নেয়। লাল টুকটুকে ঐ ডাটা দেখলেই পদ্মার ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করে খাওয়ার জন্য জিহবায় পানি আসত। গোয়ালন্দের ষ্টীমার যাত্রীরা পাঁচ দশখানা সুরেশ্বরী ডাটা হাতে নিয়ে কলকাতা পৌছতেন। কিন্তু এখন আর সেই ডাঁটাও নেই, সেই ইলিশও নেই সেই দিনও নেই।

এবার বাণিজ্যিক রেটের নোটিশখানা হাতে নিয়ে জমীলা খাতুন সোজা আমলার দফতরে গিয়ে হাজির হয়। দরজার কাছাকাছি যায়গায় মোচওয়ালা একজন আধা কর্মকর্তা ধরনের লোক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ফুঁকছিলেন, বাইরে বহু দর্শন প্রার্থী কেউ ছাতা মাথায় দাড়িয়ে কেউ বসে, আর কেউবা কাত হয়ে দেয়ালে মাথা ঠেঁকিয়ে ঝিমুচ্ছে।

মেয়ে মানুষের লাইন লাগে না। জমীলা খাতুন ভিতরে ঢুকে পড়ে। জমীলা খাতুনকে ভিতরে ঢুকতে দেখেই আমলা সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর মনে হল ডাগর ডোগর ফলের ভার বুকে নিয়ে একখানা তরতাজা পেঁপে গাছ তাকে আকর্ষণ করছে। দুধের পাতিলের কাছ ঘেঁষে বসা বিনয়ী বিড়ালের মেও শব্দের মত বিনয়ের ভঙ্গীতে বললেনঃ কি চাই?

জমীলাঃ আপনার কাছে একটু কাজ ছিল, বলব?

আমলাঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়। বলেই চেয়ারের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বসতে বললেন।

কুকুরকে আদর দেখালে যেমন লেজ নাড়তে শুরু করে, জমীলা খাতুনের কথা শুনে আমলার আলাপের লেজটাও তেমনি নড়তে শুরু করেছে। এখন মনে হয় চুক, চুক শব্দটা করলেই হল। জমীলা খাতুন বুঝতে পারে তার কাজ হয়ে গেছে। মুখে একটু হাসির রেশ টেনে নিজের সমস্যার কথাটা বলল।

আমলা এতক্ষণ এক দৃষ্টে জমীলা খাতুনের দিকে তাকিয়েছিল। তার কানে জমিলা খাতুনের কথাগুলো সব পৌছল না। এবার চোখে চোখ পড়তেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। নিজের অজান্তেই দু'বার মোচে হাত বুলাল। একবার সার্টের কলারে হাত লাগাল। শেষে ঠোঁটে একখানা পাঁচ মার্কা হাঁসি ফুটিয়ে বলল তা আপনার কি খেদমত করতে পারি বলুনতো দেখি?

জমীলা খাতুনঃ ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন, পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষের খেদমত করতে যাবেন কেন? তবে হ্যাঁ, আমার কাজ একটা আছে বটে। বলেই জমীলা খাতুন সবিস্তারে নিজের কথাটা আবার বলল।

আমলাঃ ওহো, আপনার স্বামী ঐ যে সেলুনওয়ালা যেহাদ আলী, তাই না? সেদিন তো তাকে দেখেছিলাম এদিকে ঘোরাফেরা করছিল। আহঃহা, সে আমার কাছে এলেইতো পারতো। দেখুনতো কেমন বিদিকিচ্ছি কান্ড। তা সেদিন ওকে না পাঠিয়ে আপনিইতো আসতে পারতেন। তাইলেই তো আর ঐ জরিমানার দাবিটা জারি হত না।

মুখে কৃত্রিম লজ্জার ভাব দেখিয়ে আমলা বলতে থাকলঃ আমার এসিস্ট্যান্টগণ কখন যে কি করে বসে তার ঠিক ঠিকানা নেই। খাৎনা আবার একটা ব্যবসা, তার জন্য আবার বাণিজ্যিক রেট।

বলতে বলতে ড্রয়ার হতে একখানা ফরম টেনে বের করে তাতে কিছু লিখে সই মোহর দিয়ে জমীলা খাতুনের হাতে দিতে দিতে বললঃ যাকগে, যা হবার তো হয়েছে। জরিমানাটা মওকুফ করে দিলাম। এই ফরমখানা পূরণ করে বিলসহ টাকা নিয়ে কাল পরশু আমার কাছে নিয়ে আসবেন। উশুল করিয়ে দেব। দেখবেন, আবার যেহাদ আলীকে পাঠাবেন না যেন, আপনি নিজেই আসবেন যেন। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো।

ফরমটা হাতে নিতে নিতে জমীলা খাতুন বললঃ তাতো বুঝলাম। উনি এলে কাজ হবে না তাতো বুঝতেই পারছি। কারণ, তিনি আমার মত শাড়ি গয়না পরে, ঠোঁটে আলতা, ভুরুতে সুরমা লাগিয়ে, আপনি যে কত সুন্দর তা

বর্ণনা করে এই এমনিভাবে একটি চুমো তো দিতে পারবেন না–বলেই জমীলা খাতুন একটা থুক শব্দ করে হন হন করে বেরিয়ে পড়ে।

আমলার এতক্ষণকার বিড়াল তপস্বীর চেহারাটা হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে দরজায় ছুটে এসে ডেকে বললঃ এই যে শুনছেন? ঐ ফরমটার কথা বলছি শুনছেন?

জমীলা খাতুন ফিরেও তাকাল না। আমলা জোরে ডেকে বললঃ কাল ঐ ফরমটা টাকাসহ যেহাদ আলীকে পাঠাবেন যেন। আপনি আসবেন না কিন্তু শুনছেন কি বলছি? কিন্তু জমিলা খাতুন ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

উপস্থিত সবাই হতবাক। দফতরের লোকজন সবাই রাগে গরগর করতে থাকে। পিয়ন চাপরাশিরা বলে উঠলঃ স্যার, হুকুম করেন তো শালী বেটির ঝুঁটি ঘরে টেনে আনি।

আমলা চুপ কর। দেখছ না, ও মেয়ে মানুষ। হুকুম করলে আর ইচ্ছে করলেই কি ওদের গায়ে হাত দেয়া যায়। ওদের গায়ে যে বারো হাতিয়ার বাধা। যে হাতিয়ার সজারুর কাঁটার মত। বলাৎকার করতে যাওতো ওদের শরীরের প্রতিটি ভাজ বিষাক্ত কাঁটা হয়ে যাবে। আর খোসামোদ করে খোসালিত করলে সেই কাঁটাই কত সুন্দর পোশাকের রূপ ধারণ করে, মধুর স্পর্শ বুলিয়ে দিবে।

চাপরাশিঃ কিন্তু স্যার, ওযে আপনাকে থুক মারল, অপমান করল?

আমলাঃ আরে দূর থুক কি বলছ? স্থান কাল পাত্র বুঝে চড়কেও চুমো মনে করতে হয় বুঝলে? নইলে অনেক বিপদের আশংকা। বেশি উচ্চবাচ্য করেছো তো দেখবে ঐ মহিলা শুধু আঙ্গুল উঁচিয়ে বলবে–ঐ যে, ঐ লোকটা...। ব্যস আর কিছু নয়, দেখবে তখন অবলার বান্ধবেরও অভাব নেই, হাতিয়ারেরও অভাব নেই। মনে রেখ লেডিস আর্ম মানে বাহুলতা নয়, লেডিস আর্ম মানে নারীর অস্ত্র–মারণাস্ত্র। বলেই আমলাটি বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

জমীলা থাকুন যেন বাতাসে ভর করে ছুটে এসে রিকশায় বসে। রিকশা চলছে। রিকশাওয়ালা কিছু দূরে এসেই বলে বসেঃ বিবি সাব, হামাক দশ টাকা ভাড়া দিতি হবি। এই ভাড়ায় অতদূর যাবার পারবার লয়।

জমীলা খাতুনঃ কেন, কেন? আসার সময়তো পাঁচ টাকায় এলাম।এখন দশ টাকা কেন?

রিকশাওয়ালাঃ উইদিক চাইয়া দেহেন। রাস্তার মাঝখানত মিটিং বসিছে। হামাগো প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিবেক। এহন হামাক উইদিক দিয়ে ঘুইরে যাতি হবি।

তখন বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। রিকশাওয়ালার সাথে বক বক না করে জমীলা খাতুন কান পেতে বক্তৃতা শুনতে থাকেঃ প্রিয় দেশবাসী, ঘুষ এবং দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। আপনারা আমলাদের যে দশ বিশ টাকা ঘুষ দিচ্ছেন তদ্দারা সরকারকে দেয়া কর ফাকি দিচ্ছেন না, তদ্বারা আপনারা নিজেকেই ফাঁকি দিচ্ছেন এবং দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করছেন। এর ফলে সরকারকে নিত্য নতুন কর বসাতে হয় নিত্য নিত্য দাম বাড়াতে হয়।

আপনারা ঘুষ দেয়া বন্ধ করুন, দেখবেন সরকার করের বোঝা কমাতে পারবে, জিনিস পত্রের দাম কমাতে পারবে। মনে রাখবেন, আপনারা অধিকারের চেয়ে যদি কর্তব্যকে বড় মনে করেন তবে এক টাকার শ্রমশক্তি দিয়ে হাজার হাজার সুই তৈরি করতে পারবেন। আর যদি কর্তব্যের চেয়ে অধিকারকে বড় মনে করেন তবে হাজার টাকার শ্রম দিয়েও হয়তো দশটি সুই তৈরী করতে পারবেন না অর্থাৎ দশটি সুই এর দাম হাজার টাকা। আপনারা কি তাই চান বলুন? সভায় বিরাট জনতা, না শব্দ করে ওঠে।

প্রেসিডেন্ট বলতে থাকেনঃ ভাইসব, আপনারা ধর্ম ও জীবনকে এক করে দেখতে চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনাদের দুর্নীতির এবং উচ্ছৃংখল মানসিকতা দূর হয়ে যাবে। আমি তাই ঘোষণা করছি–এখন হতে স্কুলে, কলেজে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে ততক্ষণে রিকশা অনেক দূর চলে গেছে। জমীলা খাতুন মাইকের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

যেহাদ আলী ঘরেই ছিল। জমীলা খাতুন ঘরে পৌছে ফরমখানা যেহাদ আলীর হাতে দিয়ে হাপাতে থাকে।

যেহাদ আলী বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বললঃ কত টাকা ঘুষ দিলে?

জমীলা খাতুনঃ স্বাধীন দেশের অধিকার সচেতন মেয়ে ঘুষ দিতে হবে কেন?

যেহাদ আলীঃ আমার বিশ্বাস হয় না।

জমীলা খাতুনঃ মেয়েদের রাঙা ঠোঁট, আর বগল খোলা ব্লাউজ দেখাতে পারলে আর ঘুষ দিতে হয়না।

যেহাদ আলীঃ অমনটাতো নিষিদ্ধ পল্লীতে হয়।

জমীলা ঃ পুরুষরাতো আশা করে নিষিদ্ধ পল্লীর দৃশ্য যেন সর্বত্রই পাওয়া যায়। এবং এ কারণেই সচিবালয়ে আজকাল ১১১ সুন্দরীর তদবীর বাহিনী রূপ দেখিয়ে বড় বড় কাজ আদায় করে চলেছে। বিদ্যুৎতের নোটিশখানাও কালকে আমাকে দিও, দেখবে সেটাও মাফ করিয়ে নিয়ে আসব।

পরদিন ভোর বেলা। দেবরকে দোকান খুলতে পাঠিয়ে দিয়ে যেহাদ আলীকে ঘরে থাকতে বলে জমীলা খাতুন বিদ্যুৎ অফিসে যাবার জন্য আগের দিনের মত সাজ সজ্জা করতে থাকে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে দেবর ঘরে ফিরে আসে। যেহাদ আলীর দিকে তাকিয়ে বলেঃ ভাইয়া মিছিল। বিরাট মিঠিল। ওরা ঢিল ছুঁড়ছে, ভাঙছে, আগুন দিচ্ছে আর শ্লোগান দিচ্ছে–ধর্ম শিক্ষা, ন্যায় শিক্ষা চাই না, চাই না। শিক্ষার নামে অবিচার চলবে না, চলবে না।

যেহাদ আলীঃ ওরা কারা?

ছোট ভাইঃ অনেক দলের অনেক লোক। তাদের প্রথম সারিতে রয়েছে পাজামা-পাঞ্জাবী পরা, কাঁধে চাদর ঝোলানো দলনেতারা। তার পরের সারিতে যারা রয়েছে তাদের কেউ সার্ট প্যান্ট পরা, কেউ পাজামা পাঞ্জাবী পরা। এদের হাতে পানির জগ গেলাস রয়েছে। এরা দলনেতাদের পানির গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে। কেউ বলে এরা দলনেতাদের সহকর্মী, কেউ বলছে সহজীবী। পরের সারিতে রয়েছে যোয়ান যোয়ান ছেলেরা। এদের কারও পায়ে স্পঞ্জের চপ্পল, কারও পায়ে চামড়ার সেন্ডেল, আবার কারও পায়ে রয়েছে দামী জুতা। এরা ইয়েস ইয়েস করে নেতাদের কাছাকাছি থাকার চেষ্ট করছে, আর নেতাগণ নিজেরা সিগারেট ধরিয়ে তাদের মুখে তুলে দিচ্ছেন এবং কার আগে কে তাদের মুখে সিগারেট তুলে দিবেন তা নিয়ে দলনেতাগণ প্রতিযোগিতা করছেন। কেউ বলছে এরা ছাত্র, কেউ বলছে এরা বেকার শিক্ষিত।

তার পরের সারিতে রয়েছে হাঁটুর ওপর লুঙ্গী পরা কতগুলো জীর্ণশীর্ণ মানুষ। এরা নাকি যোয়ান ছেলেদের বাপ চাচা। এদের শুধু 'চাই না, চলবে না' শ্লোগান বলতে বলা হয়েছে, কিন্তু কি চায় না তা তারা জানে না।

তার পরের সারিতে রয়েছে হাজার হাজার ভূখা নাংগা কিশোর বালক। তারা শুধু ঢিল ছুঁড়ছে, ট্রেনে বাসে আগুন দিচ্ছে, বাড়ি ঘর দোকান পাটের জানালা কবাট ভাংছে, তাদের মধ্যে বয়স্ক একটা অংশ বড় বড় বাজার ব্যাগ

হাতে নিয়ে বড় বড় দোকানের আশপাশে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। তা দেখে আমি দোকান বন্ধ করে চলে এসেছি।

যেহাদ আলী জমীলা খাতুনের দিকে তাকিয়ে বললঃ বুঝলে জমীলা বিবি, যা ভাঙ্গা চোরা যাচ্ছে, তা পুষিয়ে নেবার জন্যে দেখবে আবার নতুন করে সরকারী সরবরাহের মূল্য পুনঃনির্ধারন হবে, নতুন নতুন কর বসানো হবে, আর দেখবে যে পানির বিল এখন দুধের দামে দিচ্ছ, কদিন পর সে বিল ঘি–এর দামে দিতে হবে। দেখবে, নতুন নতুন অফিস বসবে, নতুন আমলা বসবে, নতুন নতুন বাড়ির প্লান বানিয়ে তারা বাম হাতি ড্রয়ার ওয়ালা টেবিল লাগিয়ে বসবে।

জমীলা খাতুনঃ ওসব কথা থাক। আমাদের দোকানটা যদি ভেঙে ফেলে বা জ্বালিয়ে দেয়?

যেহাদ আলীঃ তাতে কি? মালিক আবার নতুন করে দোকানটা বানাবে। ভাড়ার রেট ডবল করে সে খরচ পুষিয়ে নেবে।

জমীলা খাতুনঃ ভাড়া বাড়ালে তোমার ব্যবসা যে লাটে উঠবে সে খেয়াল আছে?

যেহাদ আলীঃ লাটে উঠতে যাবে কেন? আমার চুল কাটার রেটও গলা কাটা রেটে উঠবে। যাদের জ্বালানী পোড়ানির জন্য ঐ গলাকাটা রেট, দেখবে তারাই মাথা নুইয়ে ঐ রেট দিয়ে চুল ছাঁটিয়ে যাবে।

সমাপ্ত

নষ্ট দর্শন

ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা, চাকুরি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও ভাগ্যাহত মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সনে বাংলাদেশকে বিভক্ত করে মুসলমান প্রধান একটি পূর্ববাংলা করা হয়েছিল। এতে মুসলমানরা একটা আশার আলো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। মুসলমানদের উল্লাস দেখে বিশিষ্ট হিন্দুরা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গান গেয়ে বঙ্গ ভঙ্গ রোধের জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ করে। তখন উল্লসিত হিন্দুরা আশাহত মুসলমানদের বিদ্রূপ করে বহু ব্যঙ্গ কাব্য রচনা করেছিল।

যেমনঃ

কি অইল গো নানী
লাট বাহাদুর আশা দিছিল
কইরা মেহেরবাণী
দারোগাগিরী চাকরী দিব
বিলাতি মেম সাদী দিব
এহন দেহি হায় নসিবের
সানকি ধোয়া পানি।

.....

বিশ্বে বিদ্যা চর্চার সূচনা হয়েছিল ধর্ম চর্চার প্রয়োজনে, শিক্ষার প্রসার হয়েছিল ধর্মতত্ত্ব ভিত্তি করে। আজও বাল্যশিক্ষার ছবক শুরু হয় ধর্মকথা দিয়ে এবং দর্শন চর্চা হয় ধর্মতত্ত্ব দিয়ে। অথচ দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের কিছু মানুষ উচ্চ শিক্ষা শেষে দর্শন-পন্ডিত হয়েই ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়। এরা যেন অমৃত পান করে বিষ উদগারণ করে। প্রাচীন কবি দন্ডিদাস এদের ডালে মূলে উপড়িয়ে সাগরে ভাসাতে বলেছেনঃ

অন্তরে অসাড় বাঁশি
বাহিরে সরল
পিবয়ে অধর সুধা
উগারে গরল
যে ঝাড়ের তরল বাঁশি
তারে যদি পাও
ডালে মূলে উপড়িয়া
সাগরে ভাসাও।

লেখক পরিচিতি

গ্রন্থকার জনাব আবদুল মবিন চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানাধীন বলাখাল গ্রামের মরহুম আলহাজ্জ আবদুল ওয়াহেদ মিয়া সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। শিক্ষা জীবনে তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হতে বি.এ পাশে করেন এবং কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন।

ছাত্র জীবনে তিনি তাঁর পিতার সংগ্রহে রক্ষিত হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের মুসলিম রেনেসাঁ কালের মাসিক মোহাম্মদী ও মাসিক সওগাতের বাঁধাই করা ভলিউম পাঠ করার মাধ্যমের চিন্তাচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন। পঞ্চাশের দশকে দৈনিক সংবাদ, আজাদ ও মিল্লাত প্রত্রিকায় তাঁর কিছু গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকে দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার ও কিছু প্রবন্ধ লিখেন।

সত্তরের দশকে মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধাবোধের সংকট কালের সামাজিক অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলা ও সহিংসতা দৃষ্টে তার লেখনী প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রত্রিকায় তাঁর প্রতিবাদী প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে।

তাঁর চিন্তার মূল সুর হচ্ছে, "সৎকর্মের অভিজ্ঞতায় মানুষের জ্ঞান বাড়ে, বংশ উন্নত হয় এবং সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ত হয়। অসৎ কর্মের অভিজ্ঞতায় অজ্ঞানতা বাড়ে, বংশ নষ্ট এবং দুর্ভাগ্যের পথ প্রশস্ত হয়।"

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থঃ ১. সাংস্কৃতিক বখাটেপনা (১৯৮৮), ২. হজ্জ-উমরা জিয়ারত (১৯৯২), ৩. সাংস্কৃতিক নষ্টামি (১৯৯৩), ৪. নষ্ট দর্শন (১৯৯৬), ৫. প্রজন্ম প্রমাদ (২০১০), ৬. এইডস এর টিকা (২০১০), ৭. সাংস্কৃতির রীতি নীতি (২০১০), ৮. নষ্ট দর্শন, ২য় সংস্করণ (২০১১)

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

design one ltd-8350845,01911750520